মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায়ণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

[একটি সমীক্ষণবাদী উপস্থাপনা]

মোঃ মাহবুব উল আলম

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী [একটি সমীক্ষণবাদী উপস্থাপনা]

– মোঃ মাহবুব উল আলম

Pluralist Sociological Grammar of Maizbhandari Wilayah & Hazrat Syed Delaor Hossain Maizbhandari (a critical presentation) - Md. Mahbub ul Alam

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ট্রাস্ট-এর নিয়ন্ত্রণাধীন মাইজভাণ্ডারী একাডেমির প্রকাশনা শাখা 'আলোকধারা বুক্স'-এর পক্ষে

প্রকাশক :

সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান

গাউসিয়া হক মন্‌জিল

মাইজভাণ্ডার শরিফ,

ডাক- ভাণ্ডার শরিফ, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম-৪৩৫২

স্বত্ত্ব : প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ :

২৬ আশ্বিন ১৪২৭ বাংলা, ১১ অক্টোবর ২০২০ খ্রি.

দ্বিতীয় সংস্করণ :

২২ চৈত্র ১৪২৯ বাংলা, ৫ এপ্রিল ২০২৩ খ্রি.

নক্শা: ইমেজ সেটিং

মুদ্রণ:

দি আলোকধারা প্রিন্টার্স

এস জেড এইচ এম ট্রাস্ট

ডিউ উদয়ন (১৩ তলা)

বাস টার্মিনাল সংযোগ সড়ক, চান্দগাঁও, চট্টগ্রাম- ৪২১২।

ISBN:978-984-8083-18-5

মূল্য: টাকা ৩০০.০০

মার্কিন ডলার $ ১২.০০

Published by Syed Mohammed Hasan on behalf of Alokdhara Books, a concern of Shahanshah Hazrat Syed Ziaul Huq Maizbhandari Trust, Gausia Huq Manzil, Maizbhandar Sharif. Po. Bhandar Sharif, Fatikchari, Chittagong-4321

উৎসর্গ

আল-কুরআন, হাদিসে রসূল (দ.) এবং
প্রকৃতিতে ব্যক্ত, বর্ণিত ও বিন্যস্ত
শাশ্বত মূল্যবোধ সন্ধানী
বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক, মানবহিতৈষী এবং
মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা বেলায়তে মোত্লাকার
উদার আলোর পথের
অভিযাত্রীদের হাতে–

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

পূর্বলেখ – ৮

০১. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের প্রকরণ ও অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) – ২৫

০২. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের পটভূমি বা তাসাওউফের মাইজভাণ্ডারী স্বরূপ – ৩৯

০৩. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বাগান ও বাগবান – ৫২

০৪. মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত : গতানুগতিক সুফি মতবাদে যুগোপযোগী সংস্কার – ৫৬

০৫. উসুলে সাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি : মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আত্মশুদ্ধিমূলক সার্বজনীন মৌলিক আচরণবিধি – ৬৩

০৬. বেলায়তে মোত্লাকা রচনার পটভূমি – ৮১

০৭. শরিয়ত ও মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত – ৮৬

০৮. বেলায়তে মোত্লাকা : তৌহিদই যার হৃদপিণ্ড – ৯১

০৯. নবী জীবনে বেলায়তে মোকাইয়াদা ও বেলায়তে মোত্লাকা – ১৩০

১০. তৌহিদে আদ্বীয়ান ও রবুবিয়াত – ১৩৪

১১. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের ধর্মসাম্য ও ধনসাম্য প্রসঙ্গ – ১৬৫

১২. প্রাচীন ভারতে ধর্ম-চিত্র: একমেবাদ্বিতীয়ম্-পৌত্তলিকতাবাদ-নাস্তিক্যবাদ – ১৬৯

১৩. আল-কুরআনে বিভিন্ন দার্শনিক ধারণা ও ধর্ম-বিশ্বাস লালনকারীদের পরিচিতি ১৮২

১৪. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে বহুত্ববাদী (Pluralist) রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা – ১৮৯

১৫. পালনবাদী সমাজবাদ : মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা – ১৯৭

১৬. হানাফী ফিকাহ্'র আলোকে মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত – ২০৯

দ্বিতীয় ভাগ

মহান বারো দার্শনিক আউলিয়ার জীবন

১৭. হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী হাজবিরী দাতা গঞ্জেবখ্শ (র.) [হিজরী ৪০০-হিজরী ৪৬৫] – ২২০

১৮. হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম হযরত আবু হামেদ মোহাম্মদ আল-গাজ্জালী (র.) [১০৫৮-১১১১ খ্রিস্টাব্দ] – ২২৩

১৯. হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন
আবদুল কাদের জিলানী (র.) [১০৭৭-১১৬৫ খ্রিস্টাব্দ] – ২৫৪
২০. গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.)
[১১৪১/৪২-১২৩৬ খ্রিস্টাব্দ] – ২৫৯
২১. শায়খুল আকবর হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.)
[১১৬৫-১২৪০ খ্রিস্টাব্দ] – ২৬৪
২২. আরিফ বিল্লাহ্ হযরত আবদুল করিম ইবনে ইব্রাহিম আল-যিলি (র.)
[১৩৬৫-১৪১৭ খ্রিস্টাব্দ] – ৩০০
২৩. দার্শনিক মাওলানা জালালুদ্দিন রুমী (র.) [১২০৭-১২৭৩ খ্রিস্টাব্দ] – ৩০২
২৪. হযরত গাউসুল আযম শাহ্‌সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)
[১৮২৬-১৯০৬ খ্রিস্টাব্দ] – ৩০৬
২৫. হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)
[১৮৬৫-১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দ] – ৩১৯
২৬. ড. মুহম্মদ ইকবাল [১৮৭৩-১৯৩৮ খ্রিস্টাব্দ] – ৩২৮
২৭. অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন
মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৮৯৩-১৯৮২ খ্রিস্টাব্দ] – ৩৩৪
২৮. শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)
[১৯২৮-১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ] – ৩৪১

তৃতীয় ভাগ

২৯. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আচার প্রকরণ
[ritual methodology of maizbhandari wilayah] – ৩৫৩

চতুর্থ ভাগ

ঐতিহাসিক মদীনা সংবিধান : বহুত্ববাদী রাষ্ট্র প্রকল্প

৩০. মদীনা সনদ : জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে বহুত্ববাদী
রাষ্ট্র ও মানবিক ভ্রাতৃত্ববাদী সমাজ নির্মাণের ফর্মূলা – ৩৬৭
৩১. খ্রিস্টান ও ইহুদীদের সাথে নবীজীর (দ.) ঐতিহাসিক চুক্তিনামার বয়ান – ৩৮৯

উপসংহার

৩২. হযরত মুহাম্মদ (দ.) তথা ইসলামের শাশ্বত আধুনিক বহুত্ববাদী
পালনবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে চারজন মনীষীর অভিমত – ৩৯৩

মুখবন্ধ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

বিশ্বব্যাপী মুসলিম অধ্যাত্ম কেন্দ্রগুলোতে তিনটা বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান ঃ (ক) ধর্মতত্ত্ব, (খ) জ্ঞানতত্ত্ব, (গ) সমাজতত্ত্ব। বিংশ শতকে মহান মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম ঘরানার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এখানে এই তিন বিষয়ে চর্চা গভীরভাবে চলেছে এবং আধুনিক বিশ্বের বিবিধ সমস্যার সমাধান সূত্র নির্দেশকারী একটা জাহেরী-বাতেনী দর্শন গড়ে উঠেছে।

"মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী ঃ একটি সমীক্ষণবাদী উপস্থাপনা"–গ্রন্থে জীবন-ঘনিষ্ঠ এই বাস্তববাদী দর্শনের যথার্থ পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস। মাইজভাণ্ডারী জ্ঞানতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক রূপরেখা এখানে সংক্ষিপ্ত অথচ সুবিন্যস্ত আকারে পরিবেশিত হয়েছে, যা হাল-জমানার বহু যুগ-জিজ্ঞাসার জবাব ও যুগ–যন্ত্রণার উপশমের নিদান ধারণ করে। এই গ্রন্থে আল-কুরআন-হাদিস শরিফ এবং মনীষীদের পরিবেশিত বিদ্যাকে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শন এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে প্রক্ষেপিত করা হয়েছে, যাতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাশাস্ত্র আল-কুরআনের শাশ্বত বহু তত্ত্ব, সিদ্ধান্ত ও

পরামর্শের অনুবর্তী হয়ে পড়েছে। দর্শনের বিভিন্ন বিষয় যথা জ্ঞানবাদ, সৃষ্টির অভিব্যক্তিবাদ বা বিবর্তনবাদ, একত্ববাদ, জড়বাদ, বহুত্ববাদ, পরমাণুবাদ, যান্ত্রিকতাবাদ, আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ, সংশয়বাদ, উদ্দেশ্যমূলক সৃষ্টিবাদ প্রভৃতি আল-কুরআনের আলোকে যথাসম্ভব তুলনামূলক পদ্ধতিতে নিরীক্ষিত ও পরিবেশিত হয়েছে। আল-কোরআন ও হাদিস শরিফের বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনা এই গ্রন্থের অন্যতম প্রধান উপজীব্য। মাইজভাণ্ডারী সামগ্রিক জীবনবোধ ও চেতনা অনুসন্ধানীদের জন্য এ গ্রন্থে তাঁদের বহু জিজ্ঞাসা ও অনুসন্ধিৎসার আধুনিক প্রগতিবাদী মানসম্মত উত্তর ও সমাধান রয়েছে, যা জ্ঞান ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধতর করতে সহায়ক হবে। আমীন।

ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী
[মাইজভাণ্ডারী গবেষক]
সিনিয়র ফুলব্রাইট স্কলার,
রকফেলার ফাউন্ডেশন স্কলার;
প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান
অর্থনীতি বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়,
চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

পূর্বলেখ

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. আল্লাহু রাব্বুল আলামিনের রহমত, রহমতুল্লিল আলামিন হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর অপার মমতা, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) [১৮২৬-১৯০৬], হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৮৬৫-১৯৩৭], অছি-এ-গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৮৯৩-১৯৮২], শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) [১৯২৮-১৯৮৮]-এর মেহেরবাণী সম্বল করে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের প্রকরণ (methodology of maizbhandari o'layet), বহুত্ববাদিতা, জাহেরী-বাতেনী সব গুরুভার বিষয় অধ্যয়নের নিয়্যৎ করা হলো।

২. বিজ্ঞ পাঠক সমীপে শুরুতেই নিবেদন করছি, এই পুস্তকের নামকরণ প্রসঙ্গ। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ, এই মহান দরবারের প্রাণপুরুষ হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) এবং কুতুবুল আকতাব হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) সম্পর্কে লেখালেখি শুরু হয়। হযরত বাবা ভাণ্ডারীর প্রথম জীবনী গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের অন্যতম 'কুতুব-মিনার' ড. মুহাম্মদ এনামুল হক, যা সাম্প্রতিক সময়ে প্রকাশিত সংস্করণে রাখা হয়নি। হযরত আকদাসের (ক.) সহপাঠী, খলিফা এবং ভক্তবৃন্দের মধ্যে ছিলেন বহু উচ্চমার্গের শিক্ষিত ব্যক্তি, আলেম। তাঁদের অনেকেই হযরত আকদাস (ক.) তথা মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের মারেফতি দিক নিয়ে উচ্চমার্গের এন্তার গজল, গীতি-কবিতা রচনা করেন, যা বাংলা মরমী ও লোক সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সাহিত্যের ভাণ্ডার এখনো প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে। এসব গজল, গীত রচয়িতাদের মধ্যে মশহুর শায়ের-কবিদের তালিকাও বেশ দীর্ঘ। এরা সবাই নিজেদের সাংসারিক জীবনের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক চর্চায় নিবেদিত ছিলেন। মওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী, মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী, মওলানা

মোসাহের উদ্দিন শাহ্‌পুরী, মওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরি, কবিয়াল রমেশ শীল প্রমুখ বিখ্যাত মরমী সাধক-কবিদের নামে এই তালিকা সমৃদ্ধ। উল্লেখ্য, এই মহান মরমী সাধকদের মধ্যে মুসলিম কবি-গীতিকাররা সকলেই মাদ্‌রাসা ঘরানার শিক্ষায় উচ্চতর ডিগ্রীধারী এবং ব্যক্তিগত জীবনে সর্বজন শ্রদ্ধেয় পরহেজগার ও সাত্ত্বিক। সময়ের চাহিদার সাথে সঙ্গতি রেখে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আধ্যাত্মিক কাণ্ডের পাশাপাশি বাস্তব সামাজিক শাখা-প্রশাখার বিস্তার ঘটেছে দর্শনীয়ভাবে। বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে এই বেলায়তের সমাজ-রাষ্ট্র-অর্থনীতিক চিন্তাসমৃদ্ধ সারগর্ভ গ্রন্থমালা রচিত হচ্ছে। জীবনবাদী এই চলিষ্ণুতার সাথে সাযুজ্য রেখে এবং এই গতিশীলতার প্রধান কারিগর অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কথা মাথায় রেখে এই পুস্তকের নামকরণ করা হয়েছে: "মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতাত্ত্বিক ব্যাকরণ ও হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী"।

৩. এখানে আপাতদৃষ্টিতে অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও একটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার যে, বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম সমাজে গান-বাজনা নিষিদ্ধ বা 'উপেক্ষিত' বলে একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীর ঢালাও মন্তব্য নিতান্তই অগভীর ও অজ্ঞতাপ্রসূত। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী থেকে এযাবৎ বিশ্বময় মুসলিম সাহিত্য-সঙ্গীতের ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময় ও সমৃদ্ধ। বাংলায়ও এর ব্যতিক্রম নয়। এই মাটিতে ইসলামের বহুত্ববাদী সাম্যবাদ ও বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের বাণীর প্রচার শুরু হয়েছিল পরিশীলিত, সুরুচিপূর্ণ সঙ্গীতের মাধ্যমে; যার সূত্রপাত ঘটান হযরত শেখ নূর কুতুবে আলম (শেখ নূর বাঙালি, মৃত্যু ১৪১৫/১৬ খ্রি.); যিনি সেই জমানার বাংলা ভাষা সমভিব্যহারে গজল রচনা করেছিলেন। আল-কুরআনেও সুরুচিপূর্ণ, সুস্থ, পরিচ্ছন্ন মনোবৃত্তি জাগরুককারী সাহিত্য-কবিতা-গীতিকে নিরুৎসাহিত করা হয়নি। বরং এর বিপরীতক্রমে কুরুচিপূর্ণ, স্বীয় কথা ও কাজের মধ্যে সঙ্গতিহীন কবিদের সৃষ্টি সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, যা বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে [সূরা শুয়ারা (কবিগণ): ২৬: ২২১-২২৭]। নবীজী (দ.) নিজেও সুস্থ সুরুচিপূর্ণ কাব্য-সাহিত্যের পরিপোষক ছিলেন, যা তাঁর নিরবচ্ছিন্ন কর্মবহুল জীবনের ইতিহাসেই লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর উন্নত কাব্যপ্রীতি, কাব্যের মঙ্গল-দর্শন সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় মূল্যবান পুস্তকও রয়েছে। কবি হাসান ইবনে সাবিত, কাব ইবনে মালিক প্রমুখকে তৎকালীন রেওয়াজে সভা-কবি এবং আধুনিক প্রশাসনিক পরিভাষায় 'জনসংযোগকর্তা', শিক্ষা-প্রচারক বলা যায়। নবী-নন্দিনী মা ফাতিমা, হযরত আলী (রা.) সহ নবী পরিবারের অনেকেই ছিলেন কবি, এমনকি তাঁর চাচা হযরত হামজা (রা.), হযরত আবু তালিবও। এই সব মহান কবিদের কবিতা পরবর্তীকালে ইতিহাসের তথ্য-ভাণ্ডার হয়ে উঠে। কারণ, তখন লিখবার উপকরণ ও রেওয়াজ ছিল সীমিত। কবিতাগুলোই ঐতিহাসিক তথ্য-ভাণ্ডাররূপে মুখে মুখে মুখস্ত থাকতো। তবে

ইতিহাসের প্রত্যয়ন (assertion) হলো এই যে, নবীজী (দ.) কবি ছিলেন না। তাঁকে কবিদের সাথে গুলিয়ে ফেলার প্রতিপক্ষীয় অপপ্রয়াস খণ্ডন করে কুরআনে তাই দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ বিষয়টা বর্ণিত হয়েছে। প্রতিপক্ষরা প্রথম দিকে যখন ওহীকে 'কবিতা' ও তাঁকে 'কবি' বলে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে খেলো করার প্রয়াস পাচ্ছিল, তখন আল্লাহ্ সুস্পষ্টভাবে প্রত্যয়ন করেন যে, "আমি রসূলকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং তা তাঁর জন্যে শোভনীয়ও নয়। এটা তো কেবল উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন (সূরা ইয়াসীন : ৩৬:৬৯)। উল্লেখ্য, প্রাক ইসলামী যুগে হেলেনিক সভ্যতার দার্শনিকগণ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বস্তুবাদী সমাজতান্ত্রিক কবি-দার্শনিকগণ কাব্য ও সাহিত্যকে মানবিক সুস্থ, সুন্দর, সৃজনশীল উন্নত মানসিকতার বহিঃপ্রকাশের বাহন হিসেবেই প্রত্যক্ষণ ও প্রত্যাশা করেছেন। নবীজী (দ.) বলেন: "কোন কোন কাব্য জ্ঞান ও শিল্পমণ্ডিত। অসার কথন ও অতিরঞ্জন মুনাফেকীর দুটো শাখা। কোন কোন কথায় যাদুকরী শক্তি আছে, কোন কোন বিদ্যা মূর্খতা নির্দেশক এবং কোন কোন কাব্য দর্শনশাস্ত্রস্বরূপ, আর সত্যই কোন কোন ভাষণ গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ্ তাঁর আরশতলে রত্ন ভাণ্ডার রেখেছেন। এর চাবি হল, কবির রসনা।" কাব্য-সাহিত্য সম্পর্কে নবীজীর (দ.) এমন মূল্যায়নের ঐ যুগে তো উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক রাজনীতির আবির্ভাব ঘটেনি! অথচ কী উন্নত চিন্তা!!

৪. বাঙালি মুসলিম সমাজে সাহিত্য-সঙ্গীতের প্রতি বিরূপতার একটা অমূলক অভিযোগ এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী অত্যন্ত হালকাভাবে করে থাকেন। বাংলা তথা ভারতবর্ষে ইসলামের সার্বজনীন সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববাদের বাণী প্রচারের বাহন হয়ে এসেছে গজল, সামা, সঙ্গীত। বাংলার সুলতানী আমল বাংলা ভাষা, লিপি প্রভৃতির সংরক্ষণ ও পরিচর্যার পাশাপাশি সাহিত্য সম্পদেও সমৃদ্ধ, যদিও তাকে 'বটতলার পুঁথি সাহিত্য' বলে উপেক্ষা করার উন্নাসিকতা অনেকের মধ্যে দেখা যায়। অবশ্য, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের' পুরোধা মনীষী ড. দীনেশ চন্দ্র সেন, ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, ড. সুকুমার সেন, ড. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ড. এনামুল হক, ড. আহমদ শরীফ, ড. কাজী দীন মুহাম্মদ, প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ পুঁথি সাহিত্যের গৌরবময় যুগকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করেছেন। কারণ, পুঁথি সাহিত্য ছিল সমকালীন লোকসমাজের একমাত্র সাংস্কৃতিক অবলম্বন; মেহনতী, শ্রমজীবী, নিম্নবর্গীয় মানুষের আত্মার খোরাকের যোগানদার। মুসলিম-হিন্দু-বৌদ্ধ সর্ব শ্রেণীর পুঁথিকাররা সুলতানী আমলে সকল প্রকার পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত। তবে ঊনবিংশ/বিংশ শতকে ঔপনিবেশিককালে ভারতের ও পরে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রাজধানী কোলকাতার ইন্টেলেকচুয়াল এলিটরা এই লোকজ-লোক সাহিত্যের প্রতি যথাযথ দৃষ্টিপাতের ফুরসৎ পাননি। তাঁদের সিংহভাগই বৃটিশ ঔপনিবেশিক ছত্রছায়ায় মুৎসুদ্দি-পুঁজিনির্ভর

সামন্ততান্ত্রিক জড়োয়া সজ্জিত একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীগত 'ইমারত' নির্মাণের সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ইট-সুরকির যোগান দেওয়াকে আশু কর্তব্য স্থির করেছিলেন। মাইজভাণ্ডারী সাহিত্যের প্রাথমিক পর্বের (বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) কবি-সাধকরা তৎকালীন এ্যাংলো-বাঙালি মহলে ন্যূনতম সাহিত্যিক কদরটা না পেলেও অক্ষরজ্ঞান বর্জিত, প্রায় অশিক্ষিত সাধারণ চাষী-মজুর-মাঝি-জেলে-মুটেদের হৃদয়ের মণিকোঠায় ঠাঁই করে নিয়েছিলেন, যেমনটা সমাজের নিম্নবর্গের দুর্গত মানুষরাই সর্বাগ্রে নবী ও রসূলদের পানে ছুটে গিয়েছিলেন পরিত্রাণের আশায়।

৫. বাংলার মুসলিম সমাজে কাব্য-সঙ্গীতের প্রতি অনীহার গড়-পড়তা অভিযোগ যে নেহাতই অমূলক, তা পূর্বের অনুচ্ছেদে প্রদত্ত সামান্য আঁচড়েই স্পষ্ট হয়ে উঠে। একটু তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, (ক) বৃটিশ ঔপনিবেশিক-সামন্ত আমলে যে মধ্যস্বত্বভোগী, সামাজিক সুবিধাভোগী শ্রেণী–যাদের অবস্থান কৃষক-মজদুর শ্রেণী থেকে উন্নততর ও পৃথক ছিল–একটি মেকী আভিজাত্যের আতর মেখে বিচরণ করতো। গান-বাজনাকে অশিক্ষিত, কৃষিজীবী, জেলে-জোলা-ক্ষৌরকার তথা অন্ত্যজ শ্রেণীঋণক্ত নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবীদের (যাদের গরিষ্ঠ সংখ্যকই ছিলেন মুসলিম) একাধারে পেশা ও বিনোদনের ব্যাপার হিসেবে ভাবতে তাঁরা তৃপ্তি পেতেন। ঊনবিংশ শতাব্দী এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের এই মেকী অভিজাত মুসলিমরা নিজেদের পরিবারবর্গকে এসব থেকে দূরে রাখতেন এবং নিরুৎসাহিত করতেন। অবশ্য, তাঁদের এই মনোভাবের পশ্চাতে সমকালীন সামাজিক জটিল পরিস্থিতিও দায়ী ছিল। অতএব, ঢালাওভাবে সমগ্র মুসলিম সমাজকে কাব্য-সঙ্গীত বিরোধী তথাকথিত রক্ষণশীল বলে চিহ্নিত করা চলে না। এরা লক্ষ্য করেননি যে, বাংলার মুসলিম কৃষক-মজদুর শ্রেণীর নারী-শিশু-কন্যারা পুরুষদের পাশে থেকেই উদয়াস্ত মাঠে পরিশ্রম করতেন, কাঠ কাটতেন, মাছ ধরতেন, গবাদি পশু-প্রাণী পালন করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এখনো করেন। এসব শ্রমজীবীকে কী রক্ষণশীলতার বোরখায় ঢাকা যায়? (খ) মুসলিম সমাজের বিরুদ্ধে ঢালাওভাবে গোঁড়ামীর অভিযোগের আরেকটা ছুতো হতে পারে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর দুর্ধর্ষ কৃষক-বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহের সূত্রপাত (১৭৬৬ খ্রি.) ঘটান ফকির মজনু শাহ্, যিনি বিহারের বুরহানা সুফি ঘরানার ফকির। তাঁর নামানুসারে এ বিদ্রোহ ফকির বিদ্রোহ নামে অভিহিত, যাতে তিনি সন্ন্যাসীদেরও সামিল করতে সক্ষম হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর ৬০-এর দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথম চার দশক পর্যন্ত বাংলার কৃষক-বিদ্রোহ ও সংগ্রামে বিরতি ঘটেনি। বাংলায় ছিয়াত্তরের (১৭৭৬ খ্রি.) মন্বন্তর, কৃষক পীড়ন-নিধন যখন ধারণাতীত চরম পর্যায়ে, তখন এশিয়া-আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানেও বৃটিশ তথা ইউরোপীয় শোষক-ঔপনিবেশিক শক্তির লুণ্ঠন, হত্যাযজ্ঞ সমানে চলছিল। এসবের বিরুদ্ধে অসম

প্রতিরোধও চলছিল। মিশর তথা উত্তর আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষে কৃষক শ্রেণীর এই প্রতিরোধ স্থানীয় পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে গড়ে উঠেছিল। এসব বিদ্রোহের নায়করা ছিলেন মূলতঃ রাজনীতিবিদ এবং ইসলাম-ধর্মীয় সামাজিক-সুবিচারবাদী আদর্শ ছিল তাঁদের প্রেরণার অন্যতম উৎস। মিশর-আরব-সুদান-আফগানিস্তানে গড়ে উঠা উপনিবেশবাদবিরোধী এসব প্রতিরোধের উত্তাল তরঙ্গ বাংলায় আছড়ে পড়ে তিতুমীর প্রমুখ কৃষক নেতাদের বদৌলতে। তিতুমীরের আধ্যাত্মিক পথ প্রদর্শক, সংগ্রামে বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ও সহচর ছিলেন হযরত শাহ্ মিসকিন আলী চিশ্‌তি (র.)। তাঁর রচিত একখানা দীওয়ান রয়েছে। তিনি চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার নিজামিয়া শাখার মিস্‌কিনিয়া উপশাখার প্রবর্তক। হযরত মিস্‌কিন শাহ ছিলেন হযরত সৈয়দ খায়ের উদ্দিন ওরফে সাদেক আলী চিশ্‌তির (র.) মুরিদ এবং বাংলাদেশস্থ খলিফা। উল্লেখ্য, দিল্লীর বিখ্যাত পীর হযরত ফখরুদ্দীন ফখরে জাঁহা (র.)-এর মুরিদ শাহ সাদেক আলী (র.) বাংলা-আসাম-বার্মায় হিদায়ত কাজ সম্পন্ন করেন। তিনি রেঙ্গুনে ইন্তিকাল করেন। তিনি মুরিদ করতেন চিশ্‌তিয়া নিজামিয়া ত্বরিকা অনুযায়ী। তাঁর রচিত কিছু গজল ও দীওয়ান রয়েছে। উল্লেখ্য, হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়াকে (র.) 'সুলতানুল মাশায়েখ' উপাধিতে ভূষিত করে নিজের একটি জুব্বা রুহানীভাবে পরিয়ে দেন হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.)[১]। প্রগতিশীল, বাম-ঘরানার ইতিহাসবিদরা এসব বিদ্রোহকে নির্ভেজাল কৃষক বিদ্রোহ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন, যাতে ইসলামের বহুত্ববাদী সাম্য-সুবিচারবাদী চেতনাকে প্রেরণার মজবুত উৎস হিসেবে নেওয়া হয়েছিল, যা ধর্মের শাশ্বত প্রগতিশীল রূপ। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসক ও তাদের এদেশী তাঁবেদাররা ইসলাম ধর্মের সাম্যবাদী চেতনাকে বিকৃত করে সেগুলোকে গোঁড়ামীপূর্ণ ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে বিকৃতভাবে চিত্রিত করতে সক্ষম হয় তাদের প্রকাশনা-প্রচারণার জোরে। বাংলার তৎকালীন সামাজিক পরিবেশে রাহবানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদী সংস্কৃতির যে জোয়ার চলছিল, এসব সশস্ত্র কৃষক বিদ্রোহ তার সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বটে। এসব বিদ্রোহের নায়করা জীবন-বিমুখতা, পলায়নী মনোবৃত্তিকে প্রশ্রয় না দিয়ে বরং শরিয়তের সমাজবাদী সংগ্রামশীল প্রকৃতিকেই আশ্রয় করেন [নবীজীর (দ.) হাদিস: 'জীবন সংগ্রাম আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিধান'। জালেম শাসকের সম্মুখে ন্যায় বিচারের হক-কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ (আবু দাউদ, তিরমিযী), যারা ওদেরকে হস্ত দ্বারা, বাক্য দ্বারা ও অন্তর দ্বারা বাধা দেয়, তারা মুমিন এবং এটা ছাড়া ঈমানের মধ্যে আর কিছুই নেই, সরিষা প্রমাণও]। ফলে বিদ্রোহবাদী এবং নিষ্ক্রিয়তা-স্থিতাবস্থাবাদীদের মধ্যে ফারাকের সৃষ্টি হয়। এ পার্থক্য ইসলামের শরিয়ত-তাসাওউফ দর্শনকেও পরস্পরবিরোধী যুক্তির কাঠি দিয়ে স্পর্শ করে এবং মুসলিম সমাজে

দীর্ঘমেয়াদী একটা তাত্ত্বিক মতানৈক্য রেখার জন্ম দেয়। বিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য-প্রাচ্য বিশেষজ্ঞরা তাসাওউফের যে পঠন বিন্যাস করেছেন, সে আলোকে বিশ্লেষণ করলে এই ফারাকটা অনেকটা পরিষ্কার হয়ে আসে। ইসলামে যে তাসাওউফ শাস্ত্র গড়ে উঠেছে, তা সক্রিয়তাবাদী (active) এবং নিষ্ক্রিয়তাবাদী বা বিলোপনবাদী (passive) – এই দুই ক্যাটাগরিতে মোটা দাগে ভাগ করা হয়েছে। হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র.) এবং এই ধারার সাথে তাত্ত্বিকভাবে যুক্ত তাসাওউফপন্থীরা সক্রিয়তাবাদী এবং হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) এবং তাঁর ধারার হযরত মনসুর হাল্লাজের (র.) পথের পথিকরা বিলোপনবাদী।

তবে হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.), হযরত ইবনুল আরাবী (র.), মওলানা রুমী (র.), শাহওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভীতে (র.) এই দুই ধারার যৌক্তিক সমন্বয় সাধনের সফল দার্শনিক প্রয়াস সর্বস্বীকৃত। হযরত ইবনুল আরাবী (র.)সহ এরা কেউ শরিয়তের সক্রিয়তাবাদকে গৌণ করে দেখেননি। দার্শনিক ড. ইকবাল তাঁর আসরারে খুদী (খুদীর রহস্য) আর রমুজে বেখুদীতে (আত্মলয়ের রহস্য) এই দুই ঋণবনের দার্শনিক কাব্য-চিত্র অঙ্কন করেছেন। শেষোক্ত গ্রন্থে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের সাগরে আত্মলয়ের সার্থকতার কথা বলা হয়েছে, সমাজ ও জীবন-বাস্তবতার সাথে সম্পর্কহীন কৃন্যতার মধ্যে নয়। এই মানদণ্ডের নিরিখে বাংলার তিতুমীর প্রমুখদের বিদ্রোহ ও সংগ্রাম তাসাওউফের সক্রিয়তাবাদী রূপ, যা ব্যক্তি, সমাজ ও মানবতার জাহেরী-বাতেনী কল্যাণধর্মী। এই সুদীর্ঘ ইতিহাসে একটা নিরেট তথ্য পরিষ্কার যে, বাংলার তাসাওউফ জগৎ, শোষিত-কৃষক-বিদ্রোহ, উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন-পীড়ন বিরোধী সংগ্রাম পরস্পর একাকার হয়ে আছে।

বলা বাহুল্য, অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী কর্মবাদী, সক্রিয়তাবাদী (active) তাসাওউফপন্থী হিসেবে নিজেকে জীবনে, কর্মে, সংগ্রামে, চিন্তায়, রচনায় ও সাধনায় উপস্থাপন করেছেন; যা তাসাওউফের বিংশ শতকীয় বাস্তবতায় নির্মিত হয়ে উঠা ভাষ্য। তিনি "মাইজভাণ্ডারী বেলায়তকে" গতানুগতিক সুফি মতবাদে যুগোপযোগী সংস্কার হিসেবেই অভিহিত করেছেন (পুস্তকের গর্ভে এসব ব্যাপারে আরো আলোকপাত রয়েছে)। অতএব, বাংলার মুসলিম সমাজের পিঠে গোঁড়ামী, পশ্চাদপদতা ইত্যাদি তাচ্ছিল্যমূলক অপবাদের সিলমোহর মারার অবকাশ ঐতিহাসিকভাবে অনুপস্থিত।

৬. হযরত আকদাসের তাসাওউফের প্লাবনের কল্লোল গীত-গজলের রূপ ধরে মরমী সাহিত্য হয়ে যখন ধীরে ধীরে স্থিতি লাভ করছিলো, তখন 'মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের' সাগর তলে লোকচক্ষুর অন্তরালে দর্শনের পলির স্তর জমতে থাকে। সুর-ছন্দ-তাল-কবিতার তরঙ্গের পাশাপাশি গড়ে উঠতে থাকে গদ্য সাহিত্যের চর। নির্মিত হতে

থাকে দার্শনিক সাহিত্য। হযরত আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী (র.) বাংলা শেয়র-কছিদা-গজলের পাশাপাশি 'উর্দূ-আরবি ও ফার্সি' ইত্যাদি মিশ্রিত ভাষায় গদ্যে-পদ্যে 'আয়নায়ে বারী' [খোদাতায়ালার দর্পণ] গ্রন্থটা রচনা করেন। হযরত মওলানা আমিনুল হক ফরহাদাবাদী (র.) [১৮৬৬-১৯৪৪] গদ্য-পদ্য রীতিতে রচনা করেন 'তোহফাতুল আখিয়ার'। এই ধারাবাহিকতায় বাংলা গদ্যে 'মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত' সংক্রান্ত দার্শনিক গ্রন্থ রচনারও যাত্রা শুরু হয়।

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী বিংশ শতাব্দীর প্রথম দেড় দশকে অর্থাৎ হযরত আকদাসের ওফাতের বছর দশেকের মধ্যে তাঁর দাদাজানের নামানুসারে প্রাইমারী স্কুল, জুনিয়র মাদ্‌রাসা, মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠা করে সক্রিয়তাবাদী সৃজনশীল তাসাওউফের সীমাহীন ঋণবনে পদার্পণ করেন। অতঃপর, ১৯১৮ সনে খিলাফত আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন এবং তাঁর ভাষায় এই আন্দোলনের 'অবাস্তবতা ও ভ্রান্তি' উপলব্ধি করে 'সক্রিয় রাজনীতি' পরিত্যাগ করে 'সক্রিয় সুফিবাদে' আত্মনিয়োগ করেন। অতঃপর, ১৯২১-২২ সনে তিনি আজমীর শরিফসহ ভারতবর্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং 'গণসভ্যতা ও বিভিন্ন সমাজ জীবনে ধর্মীয় প্রভাব, প্রকৃতি, ফলপ্রসূ কর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান' লাভ করেন।[২] উল্লেখ্য, আল-কুরআনের একাধিক আয়াতে জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য মানুষকে বিভিন্ন দেশ ও জনপদ সফরের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে (৩:১৩৭+)। ১৯২৪ সনে তিনি হযরত আকদাসের উরস্ শরিফ ও রওজা মোবারকের এন্তেজামের ভার গ্রহণ করে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্, তাসাওউফ বিষয়ক গ্রন্থাবলী আরো নিবিড়ভাবে অধ্যয়নপূর্বক বেলায়তের 'হেরা-কন্দরে' প্রবেশে সচেষ্ট হন। দীর্ঘ সাধনার ফলশ্রুতিতে তিনি ১৯৬০ সনে 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' বা 'অর্গলমুক্ত ঐশী প্রেমবাদ' নামে একটি অমূল্য দার্শনিক গ্রন্থ বাংলা গদ্যে প্রকাশ করে বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চার ইতিহাসে নবতর অধ্যায় যোজনা করেন। এরপর হযরত আকদাসের জীবনী গ্রন্থ (১৯৬৭) সহ বারোটা মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। এগুলোতে তাত্ত্বিক, সাংগঠনিক, আচরণবিধি, ধর্মীয় ইবাদত-বন্দেগী, সামাজিক সম্পর্ক সমেত বিভিন্ন বিষয়ে উন্নত পরিশীলিত কানুন, প্রকরণ বর্ণিত হয়েছে।

এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) নিজেও শায়েরী প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন। এর সাক্ষ্য বহন করছে তাঁর রচিত একটি ফার্সি চতুর্দশপদী বয়েত। বাস্তবে ক্ষেত্রবিশেষে তাঁকে ফার্সি রুবাইয়েও জবাব দিতে দেখা গেছে। তবে শায়েরী অভিধার বহু ঊর্ধ্বে তাঁর অবস্থান।

ত্বরিকার প্রসারের পাশাপাশি মাইজভাণ্ডারী মারেফাতের বাগানে একে একে ফুটতে থাকে সুবাসিত সাহিত্য ও সঙ্গীত কুসুম। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)

এবং হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) প্রতিভাধর খলিফা ও আশেক-ভক্তরা এই আধ্যাত্মিক সঙ্গীত-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করে তোলার সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মওলানা আবদুল হাদী কাঞ্চনপুরী, মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরী, মওলানা বজলুল করিম মন্দাকিনী, মুফ্তি আবদুস সালাম ঋণজপুরী, আবদুল্লাহ্ শাহ্ বাঞ্ছারামপুরী, সৈয়দ মোসাহাব উদ্দিন আহমদ সাহাপুরী, মওলানা আমিনুল হক হারবাংগিরী, আবদুর রহমান ফরিদপুরী, মৌলানা শাহ্ অলি উল্লাহ্ রাজাপুরী, কবিয়াল রমেশ শীল, আবদুল গফুর হালী প্রমুখ শতাধিক সাধক গীতিকার রচনা করেছেন শেয়র, গজল প্রভৃতি। তাঁদের এই পবিত্র আবেগ-উৎসারণ নিতান্তই প্রাণের তাগিদে, যা সম্পূর্ণ স্বার্থলেশশূন্য। এ তালিকার প্রতি নজর দিলে দেখা যাবে যে, এঁদের অধিকাংশই আনুষ্ঠানিক মাদ্‌রাসা ঘরানার আলেম এবং তাঁরা অনেকে চট্টগ্রামের বাইরে বিভিন্ন জেলার বাসিন্দা। এ তালিকা দিন দিন বাড়ছে। শায়ের-লেখকদের এ তালিকা বিগত শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের প্রসার ও বিস্তারের সাক্ষ্য বহন করে।

৭. মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত, দর্শন, সমাজ চিন্তা, লোক-কল্যাণ বিষয়ক গবেষণামূলক আলোকিত সাহিত্যের প্রসার ঘটছে আকর্ষণীয়ভাবে, যা আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মানুষদেরকে এই মহান দরবারের বিশ্ববীক্ষার (world vision) প্রতি আকৃষ্ট করে চলেছে। খোদ অছিয়ে গাউসুল আযম সূচিত এ ধারার সমকালীন মননশীল উন্নত বুদ্ধিবৃত্তিক দর্শনসমৃদ্ধ গবেষণা ও প্রকাশনার এই গুরুভার উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল, গাউসিয়া হক মন্‌জিল। জনাব জামাল আহমদ সিকদার প্রণীত "শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী" জীবনী গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে (১৯৮২) এই ঋণবনে পদচারণা শুরু হয় গাউসিয়া হক মন্‌জিলের। বাংলা-ইংরেজী উভয় ভাষাতেই চলছে এই নতুন ধারার বিচরণ। পরিকল্পিতভাবে চলছে গবেষণা ও প্রকাশনা। গাউসিয়া হক মন্‌জিলের এই উদ্যোগ সৃষ্টি করে চলেছে নতুন নতুন মেধাবী গবেষক ও লেখক। জামাল আহমদ সিকদার, প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, প্রফেসর ড. ইফতেখার উদ্দিন চৌধুরী, সৈয়দ আমিরুল ইসলাম (ইংরেজী), মুহম্মদ গোলাম রসূল (ইংরেজী), ড. সেলিম জাহাঙ্গীর, সৈয়দ লুৎফুল হক ফরহাদাবাদী, ড. মওলানা মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্, অধ্যাপক এ ওয়াই এম জাফর, অধ্যাপক জহুর উল আলম, আবসার মাহফুজ, এ এন এম এ মোমিন, মুহম্মদ ওহীদুল আলম, অধ্যাপক মুহম্মদ গোফরান, মাওলানা শায়েস্তা খান আল আজহারী, মাওলানা হাবিবুল হোসাইন, অধ্যাপিকা বদরুন্নেসা সাজু, কবি তাহেরা ফৌজী, শওকত হাফিজ খান রুশ্নি (মরহুম), খন্দকার গোলাম কিবরিয়া (মরহুম) প্রমুখের অন্তর্ঋণক্তি এই তালিকাকে সমৃদ্ধতর করে চলেছে। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের মারিফাতের স্নিগ্ধ আলোর আকর্ষণের পাশাপাশি নিরেট বাস্তব-পার্থিব জীবনের কল্যাণ

ও শান্তির মানবিক আকুতির প্রতি এই আদর্শের সচেতনতা সর্বস্তরের মানুষকে দিন দিন আকর্ষণ করছে।

শুধু তাই নয়, বিশিষ্ট আলেম-ওলামারাও গাউসিয়া হক মন্‌জিলের নূরানী চাঁদোয়া তলে সমবেত হয়ে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের চর্চার পাশাপাশি কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্, উসুল সমৃদ্ধ শরিয়তের চর্চা ও তালিমের কাজে নিয়োজিত আছেন। এই তালিকায় আছেন অধ্যক্ষ আল্লামা খায়রুল বশর হক্কানী, হাফেজ আবুল কালাম, আলহাজ্ব মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা, মওলানা নেজাম উদ্দিন চিশ্‌তী, মওলানা মোহাম্মদ মিশকাত, কাজী মোহাম্মদ মেজবাউল আলম, সৈয়দ মুহাম্মদ ফখরুল আবেদীন, সৈয়দ আবু আহমদ, মওলানা কে এম বেলাল হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, মুফতি আ ফ ম সাইফুল্লাহ্ সুলতানপুরী, শেখ আবু আহমদ শহীদুল্লাহ্ ফারুকী, সৈয়দ ফরিদুল আবছার আমিরী, সৈয়দ এ জেড এম শেহাবউদ্দিন খালেদ, পীরজাদা এ কে এম রওশন মিয়া, সৈয়দ নুর আহমদ বাবর, সৈয়দ জাহেদুল আলম, পীরজাদা সৈয়দ মেজবাহ্ উদ্দিন আহমদ প্রমুখ। এভাবে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক মজলিশে আমাদের দেশের জাহেরী-বাতেনী শিক্ষার বিভিন্ন শাখার মশালবাহীদের সৃজনশীল সমাবেশ ঘটছে।

৮. এর পাশাপাশি মাইজভাণ্ডারী অন্তঃপুরের স্নিগ্ধশীতল জ্যোতিঃ এবং মৃদু সমীরণ সমানভাবে অগণিত মহিলাসমেত মানুষের জীবনে প্রশান্তির পরশ ছড়িয়ে দিচ্ছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আকদাসের একমাত্র কন্যা সৈয়দা আনোয়ারুন্নেসার নাম সর্বাগ্রে এসে পড়ে। পিতা তাঁকে পরম স্নেহভরে 'তোতা ময়না' বলে ডাকতেন। তিনি তাঁর মহান পিতার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্, উসুলসহ বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। তিনি নবীজী হযরত মোহাম্মদ (দ.) পরিবারের মহীয়সী কোন কোন সদস্যার মতো জটিল বিষয়ে ঘরোয়াভাবে সুচিন্তিত অভিমত প্রদান করতেন। তিনি বাংলায় কসিদা, গজল রচনায়ও পারঙ্গমতার পরিচয় দিয়েছেন।

হযরত আকদাসের ব্যক্তিগত জীবন বড়ই বেদনাময়। কঠোর রিয়াজতের দিনগুলোতে তদীয় পিতার অকাল মৃত্যু তাঁকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে নিক্ষেপ করে। এরপর যথাসময়ে মা হযরত খায়রুন্নেসা বেগম পুত্রের বিবাহের ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রথমা পত্নী বিয়োগের পর দ্বিতীয়া পত্নীর গর্ভজাত একে একে পুত্র-কন্যাবিয়োগ, আরো পরে যুবক পুত্রবিয়োগ এবং কৈশোরোত্তীর্ণ প্রথম পৌত্রবিয়োগ তাঁকে প্রিয়জন হারানোর মর্মান্তিক বেদনার অনলে বিদগ্ধ করে ধারাবাহিকভাবে। নির্জন সাধনাকালে তাঁর রুজি-রোজগার বিঘ্নিত হতে থাকে। তাঁর পারিবারিক জীবনে নেমে আসে ভয়ঙ্কর দুর্যোগ। তাঁর সংসারকে পৃথক করে দেওয়া হয়। যৎসামান্য জমির বর্গা চাষের আয় থেকে অতি কায়ক্লেশে চলতে থাকে তাঁর সংসার। মারিফাতের মহাসাগরে তিনি তখন অশান্ত

ডুবুরী। পার্থিব জীবন ভাসছিল প্রবল বন্যার জলে কেয়াপাতার নৌকার মতো। সাধক পিতার এই জাগতিক-আধ্যাত্মিক ক্রান্তিকাল নিকটতম অবস্থান থেকে প্রত্যক্ষ করলেন একমাত্র কন্যা সৈয়দা আনোয়ারুন্নেসা। সময়ের প্রয়োজনে তিনি নিজেকে নিয়োজিত করেন পৈতৃক ভিটে-মাটির প্রহরায়[৩]। এই ইতিহাস মনে করিয়ে দেয়, সম্রাট শাহজাহানের কন্যা জাহানারার জীবন কথা, যিনি পিতৃসেবায় বর্জন করেছিলেন নিজের সংসার। লক্ষ্যণীয় যে, গাউসিয়ত ও কুতুবিয়তের অসীম জগতের প্রতিটা স্পন্দন নিয়ে সতত ব্যস্ত হযরত আকদাসের জীবন-মুদ্রার অপর পিঠ-ক্ষুদ্র, নিস্তরঙ্গ, ব্যক্তিগত সংসার জীবন আবর্তিত হয়েছিল 'তোতা ময়না' আর 'দেলা ময়না'– এই দুই ময়নার কক্ষপথে।

মাইজভাণ্ডার দরবারের অন্তঃপুরের এ জ্যোতিঃ এখনো অনির্বাণ এবং তা দীপ্তি ছড়াচ্ছে গাউসিয়া হক মন্‌জিলে, আপামর মানুষের শ্রদ্ধেয়া আম্মাজান সৈয়দা মুনাওয়ারা বেগমের প্রকোষ্ঠরূপী ইবাদতগাহ্ থেকে[৪]।

৯. আল্লাহু রাব্বুল আলামিন ও নবীজীর (দ.) ইপ্সিত পবিত্র পার্থিব জীবন এবং মারিফাতের তৃষ্ণাকাতর সাধনার জীবন তথা মানব জীবন-মুদ্রার এই উভয় পিঠের দিশা ও দীক্ষা দিচ্ছে মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত। আন্তর্জাতিক ঘটনা প্রবাহের ক্রিয়া-বিক্রিয়া, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক-অর্থনৈতিক যোগ-বিয়োগের ফেরে নবীজীর (দ.) ইসলামের শাশ্বত আধুনিকতাকে পাশ কাটানোর কিম্বা পিছনের সারিতে ঠেলে দেবার দুঃখজনক অপপ্রয়াসের ঐহিক-পারত্রিক পর্যায়ে মোকাবেলা করে মানব সমাজের কল্যাণমুখী ইসলামের শাশ্বত মানবিক মূল্যবোধ ও আধুনিকতাকে 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন অছিয়ে গাউসুল আযম, যা সম্পূর্ণরূপে যুক্তিসিদ্ধ, ফিকাহ্‌সম্মত। এই মূল্যবান পুস্তকটা একটা 'প্রিজমের' মতো, যাতে বহুবিধ বিষয় সুস্পষ্টভাবে সংক্ষেপে সুবিন্যস্ত। আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সাংসারিক, মনোজগৎ, দৃশ্যাতীত মহাজগৎ, রূহানী জগৎ সম্পর্কে জানার ও অনুশীলনের সহজবোধ্য যে রূপরেখা এতে পেশ করা হয়েছে, পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা সেগুলো নিবিড়ভাবে ধ্যানী মন নিয়ে অধ্যয়নের চেষ্টা করবো।

কোন গতিশীল উপযোগী আদর্শের প্রগতিমুখী বিবর্তন ও কালোপযোগী বিকাশ সম্বন্ধে শেষ কথা বলে কিছু নেই। সজীব, সক্রিয় মূল প্রতিনিয়ত নবতর উদ্ভিদের জন্ম দেয়, যা মূলের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় মৌলিক আদর্শের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই প্রাকৃতিক নিয়ম মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের এই উপস্থাপনা এক্ষেত্রে অবশ্যই শেষ কথা নয়। সময়, সমাজ ও উন্নত চেতনা এই বেলায়ত-ক্ষেত্র থেকে ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্ম-দর্শনের নবতর চিন্তা ও নির্দেশনার ফসল তুলে নেবে। এটা আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র শাশ্বত সৃজন-বিবর্তন সূত্রেরই

অধীন। আল্লাহু রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, আক্‌ল, পবিত্রতা অর্জন ও অনুধাবনের তৌফিক দিন।

এই গ্রন্থ 'মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত' সম্পর্কে একটা ধারণাপত্র বিশেষ। বিজ্ঞ-জ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ এ ব্যাপারে আরো গবেষণা ও সাধনা করবেন বলে আমাদের প্রত্যাশা। তবে এটা সুস্পষ্ট যে, 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থের ভিত্তি শাশ্বত 'বিশ্লেষণাতীত তৌহিদ (absolute monotheism beyond any adjective and analysis)' এবং গ্রন্থের আহ্বান এই তৌহিদের প্রতিই।

১০. এই গ্রন্থে উদ্ধৃত হাদিস শরিফগুলো নেওয়া হয়েছে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ আল্লামা স্যার আবদুল্লাহ্ আল-মামুন আল-সুহরাওয়ার্দীর বিশ্ববিখ্যাত 'The Sayings of Muhammed (Sm)' [রাসূলুল্লাহ্‌র বাণী] নামে ইংরেজীতে সংকলিত হাদিস-সঙ্কলন থেকে, যা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত ও মুদ্রিত। পবিত্র সিহাহ্ সিত্তা থেকে বাছাই করা ৪৫১টি হাদিস শরিফের এই ইংরেজী সঙ্কলন ইউরোপ, আমেরিকাসহ সমগ্র বিশ্বের মনীষী মহলে আলোড়ন তোলে এবং তাঁরা নবীজীর (দ.) অপরিমেয় জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে কিঞ্চিৎ পরিচিত হবার সৌভাগ্য অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে রয়েছেন রাশিয়ার লিও টলস্টয়, ভারতের মহাত্মা গান্ধীসহ অনেক দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, সমাজতত্ত্ববিদ। বৃটিশ-ভারতের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সভ্য এই শিক্ষাবিদ গবেষক ছিলেন 'Pan Islamic Society of London'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

১১. (ক) এই পুস্তক মুখ্যতঃ সাধারণ দর্শন (general philosophy) বিষয়ক গ্রন্থ। ধর্ম বিষয়ক কিম্বা ধর্ম প্রচারমূলক গ্রন্থ নয়; বলা যেতে পারে, গবেষণা ও তুলনামূলক অধ্যয়নধর্মী গ্রন্থ। সাধারণ দর্শন আলোচনার কায়দায় মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের দর্শন এখানে আলোচিত। প্রত্যেক দর্শন তত্ত্বের মতো মাইজভাণ্ডারী বেলায়তেরও একটা স্বীকৃত মত (postulate) রয়েছে, তা হচ্ছে তৌহিদ (absolute monotheism) এবং পার্থিব জাগতিক ও মহাজাগতীয় বাস্তবতা (worldly and cosmic reality)। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের এই postulate–এর নৈয়ায়িক যথার্থতার প্রমাণসিদ্ধতার অন্বেষণে অন্যান্য দর্শনের তত্ত্বের পাশাপাশি 'আল-কুরআনের' শিক্ষাকেও তুলনামূলকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

যেহেতু এটা দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ, সেহেতু এখানে দার্শনিক, নৈয়ায়িক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ তথ্যের উপস্থাপনাই প্রাধান্য পেয়েছে গতানুগতিক ধর্মীয় বিশ্বাসের তথ্যের তুলনায়। তৌহিদের দার্শনিক, নৈয়ায়িক সিদ্ধতার পাশাপাশি বৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক, মনস্তাত্ত্বিক ও নৈতিক গ্রাহ্যতাও বিশ্লেষণাত্মকভাবে নিরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণ দর্শন-পুস্তকের আদলে এই বইটিতেও সৃষ্টিতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, স্রষ্টাতত্ত্ব (philosophy of God), বস্তুবাদ, জড়বাদ, যান্ত্রিকতাবাদ, আস্তিক্যবাদ,

নাস্তিক্যবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ, আত্মার দর্শন (philosophy of soul), আত্মার অমরত্ব ও অনন্ত জীবন (future life and eternity) প্রভৃতি জটিল বিষয়ও আলোচনায় এসেছে। এসব বিষয়ের তুলনামূলক বিশ্লেষণে ধর্মীয় বিশ্বাসের মানদণ্ডের সরল প্রয়োগের চেয়ে দর্শন, বিজ্ঞান ও যুক্তির আলোকেই সম্পাত করা হয়েছে। শুধু ধর্ম বিশ্বাস নয়, দর্শন ও বিজ্ঞানের যুক্তিসিদ্ধ বাস্তবতামুখী দৃষ্টিতেই এসব তথ্য অবলোকিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(খ) এ বইয়ে সাধারণ দর্শন (general philosophy) সংক্রান্ত আলোচনা প্রসঙ্গে 'তুলনামূলক দর্শন' বিষয়ক স্বীকৃত গ্রন্থাদির সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শন বিষয়ে আগ্রহী পাঠকদের সুবিধার্থে বহু খণ্ড বিশিষ্ট দর্শন গ্রন্থাদির স্থলে 'বস্তু সংক্ষেপ' হিসেবে বিশ্বে প্রশংসিত ও স্বীকৃত দর্শন বিষয়ক সহজ পাঠ্য গ্রন্থ Jostain Garder-এর Sophies World (Eng. Trans. Paulette Moeller) Berkley edition, New york, USA, 1996; থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে।

(গ) এ পুস্তকের বিভিন্ন স্থানে অভিন্ন বিষয়ে আল-কুরআনের দর্শনের পাশাপশি পাশ্চাত্য-প্রাচ্য দর্শনের তুলনামূলক, সাদৃশ্যমূলক, বৈসাদৃশ্যমূলক কিছু প্রসঙ্গ এসেছে, যা আগ্রহী পাঠকদের আরো দার্শনিক ও বাস্তব চিন্তার খোরাক এবং আল-কুরআনের দর্শনের শাশ্বত মাহাত্ম্য ও যথার্থতা অন্বেষণে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(ঘ) এ বইয়ে 'বেলায়তে মোত্লাকা-র' তৃতীয় সংস্করণকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। বইয়ের প্রিন্টার্স লাইনে সন অনুল্লেখিত; তবে একেবারে শেষ দিকে অধ্যাপক যোগেশ চন্দ্র সিংহের অভিমত–এ প্রদত্ত তারিখ অনুযায়ী ১৯৭৩/৭৪ বলে ধারণা করা হচ্ছে।

(ঙ) এ পুস্তকে 'গড্' শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট ধর্ম-বিশ্বাসের সহজগ্রাহ্যতার প্রয়োজনে।

(চ) মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে আমার স্বচক্ষে দেখা ও প্রত্যক্ষভাবে জানা কিছু কিছু বিষয়ও প্রসঙ্গক্রমে বিভিন্ন নিবন্ধের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

(ছ) এই পুস্তকে 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থ থেকে প্রাসঙ্গিক প্রয়োজনে একই উদ্ধৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে একাধিকবার ব্যবহৃত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরা আল-কুরআনের এই মহতী আয়াতের আশ্রয় গ্রহণ করছি ঃ "আল্লাহ্ উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন যা সুসমঞ্জস এবং যাতে একই কথা নানাভাবে বর্ণিত হয়েছে" (৩৯:২৩; ১৭:৪১)।

(জ) এ গ্রন্থে হযরত আকদাস বলতে হযরত সৈয়দ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) এবং অছিয়ে গাউসুল আযম বলতে খাদেমুল ফোক্বারা শাহ্ সুফি হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) বুঝায়।

(ঝ) বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে যেসব মহান দার্শনিক ও আউলিয়াদের পুস্তক রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখিত হয়েছে, সেসব মহান দার্শনিক, তাসাওউফী লেখকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী দ্বিতীয় অংশে দেওয়া হয়েছে, যাতে একাধারে গ্রন্থকারের বিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের ব্যাপকতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের পাশাপাশি মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের দার্শনিক শেকড়ের বহুমাত্রিক অভিন্নতাও উপলব্ধি করা সহজ হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

(ঞ) এ গ্রন্থে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের জাহেরী ও বাতেনী (বাস্তবে যথাক্রমে হক্কুল ইবাদ বা সৃষ্টের অধিকার ও হক্কুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র অধিকার) উভয় দিকের তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক সম্পূরক ও সাদৃশ্যমূলক অবস্থান সমগুরুত্বসহকারে উপস্থাপিত হয়েছে।

(ট) প্রাকৃতিক সত্যপ্রতিম কুরআনের আয়াতাদি থেকে সঙ্গতিপূর্ণ উদ্ধৃতিসহকারে বেলায়তে মোত্লাকা তথা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের মতো সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল দর্শনের যৌক্তিকতা ও বাস্তবতা উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

(ঠ) এ গ্রন্থ ক্ষেত্র বিশেষে 'বেলায়তে মোত্লাকা'-গ্রন্থের "মর্মার্থের একটি বিশ্লেষণ হিসেবে পরিগণিত হতে পারে"।

১২. এ পুস্তক প্রকাশক্ষণে আমি পরম শ্রদ্ধাভরে বেদনা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে স্মরণ করি, অগ্রজ প্রতিম হযরত সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার শাহ্ (র.), জামাল আহমদ সিকদারকে-- মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ সম্পর্কে আমার জানবার কৌতূহল মিটাবার জন্য যাঁদেরকে সতত তৎপর ও আগ্রহী দেখেছি। আমাদের সবার 'শাহ ছাহেব বদ্দা' (বড়'দা) হিসেবে শ্রদ্ধাভাজন হযরত সৈয়দ নুরল বক্তেয়ার শাহ্ গাউসিয়া হক মন্জিলের বিকাশের একেবারে সূচনা পর্যায় থেকে আমৃত্যু আমাদের প্রকাশনাসহ সামগ্রিক ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে প্রকৃত অভিভাবকের মতো যথার্থ পৃষ্ঠপোষকতা ও নির্দেশনা দিয়ে সম্মুখে এগিয়ে দিতেন অকপটে, নিখাদ আন্তরিকতা সহকারে। জামাল আহমদ সিকদারকেও আমি দেখেছি সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার শাহের মতো ফানা-ফি-শায়খ-এর দৃষ্টান্তরূপে। তিনি হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) সহ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের ইতিহাস, ঐতিহ্য, দর্শন ও গূঢ়তত্ত্ব সংগ্রহ ও প্রচারের ক্ষেত্রে এক অদম্য উৎসাহী নিঃস্বার্থ কর্মী-মুরীদের সফল ভূমিকা পালন করেন ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও পরিবেশগত শত প্রতিবন্ধকতা মাড়িয়ে। ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনী-গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ, গ্রন্থনার ক্ষেত্রে তাঁদের নিজ নিজ অবস্থান থেকে

অবদান অসীম। সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার শাহ্ মন্‌জিল নির্বিশেষে সকল মাইজভাণ্ডারী ভক্তের কাছে বার্তা পাঠালে উৎসাহী ভক্তরা শাহানশাহ্ হুজুর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-অভিজ্ঞতাপুষ্ট তথ্যাদি নিয়ে হাজির হন। রাতের পর রাত জেগে ঐসব তথ্য নোট করা, প্রাথমিক খসড়া করা, বাছাই করার দুরূহ কাজে তিনি নিজে রাতের পর রাত জেগে জামাল আহমদ সিকদার, এই গ্রন্থের লেখক ও অন্যান্য উৎসাহী ভক্তদের উৎসাহ যোগাতেন। এভাবে অতি অল্প সময়ের টার্গেট নিয়ে ১৯৮২ সনের ২৬ ডিসেম্বর, ১০ পৌষ, ১৩৮১ বাংলা প্রথম বারের মতো 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী' শিরোনামে জীবনী-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এই গ্রন্থের নামকরণ নিয়ে আমাদের মধ্যে টানা কয়েকদিন আলোচনা হয়। একাধিক প্রস্তাব আসে। কিন্তু কোন প্রস্তাবই সর্বসম্মতি না পাওয়ায় সৈয়দ নুরুল বক্তেয়ার সাহেবকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি দিন কয়েক সময় নেন এবং 'শাহানশাহ্'– শব্দটাকে বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে 'শাহানশাহ্ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী' শিরোনাম করার প্রস্তাব দেন যা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এক বর্ণনাতীত পবিত্র, স্বার্থলেশহীন, নিষ্ঠামণ্ডিত স্নিগ্ধতায় ভরা অত্যন্ত আন্তরিক মমতাপূর্ণ পরিবেশে ঐ দিনগুলোতে রবিবার সরকারি ছুটির দিন ছিল বিধায় শনিবার সন্ধ্যা থেকে রবিবার গভীর রাত পর্যন্ত গাউসিয়া হক মন্‌জিলের বেড়ার হুজুরাখানায় সভা-বৈঠক চলতো। আমি তাঁদেরকে পেয়েছি অভিভাবকপ্রতিম সহকর্মী হিসেবে, নইলে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ সম্পর্কে এতো সূক্ষ্ম বহুমাত্রিক লেখার ভার বহন করা সম্ভব হতো না। গাউসিয়া হক মন্‌জিলের তাসাওউফীয় সংস্কৃতির আধুনিক অবয়ব নির্মাণে তাঁদের মেধা, শ্রম ও কর্তব্যপরায়ণতা অপরিসীম। 'বিনিময়-বিমুখ' এই দুই মহান তাসাওউফ সাধককে আল্লাহ্ মাগফেরাত মঞ্জুর করুন। এই সুযোগে স্মরণ করি ও শ্রদ্ধা জানাই গাউসিয়া হক মন্‌জিল তথা মাইজভাণ্ডারী তাবৎ ভক্তকুলের প্রতি, যারা আমাদেরকে সাহচর্য ও বিভিন্নভাবে অকপটে অকাতরে সহযোগিতা দিতেন।

আমি আরো স্মরণ করি, আমার সদ্য প্রয়াত সুহৃদ, বিদ্বজ্জন ড. জায়েদ করিমকে (তারেক) যিনি বিংশ শতাব্দীর শীর্ষ দার্শনিক লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেলের স্নেহধন্য এবং বিভিন্ন সময়ে আমাকে George Sale-এর The Koran-এর A Preliminary Discourse; W. Montgomery Watt-এর Muhammed at Mecca, A. J. Arberry-এর Muslim Sain.s and Mystics (হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তারের 'তাজকেরাতুল আউলিয়ার' তথ্যবহুল্য টীকা সমৃদ্ধ ইংরেজী অনুবাদ), Will Durant এবং তাঁর পত্নী Ariel Durant-এর Story of Civilization, The Greatest Minds and Ideas of All Time, Aldous Huxley-i The Perennial Philosophy, Karen Armstrong-এর A History of God, Niall

Ferguson-এর Civilization; A Third Treasury of Kahlil Gibrun, A Treasury of Khalil Gibran সহ অর্থনীতির উপর সর্ব সাম্প্রতিক বহু গ্রন্থ, বৈরুত থেকে প্রকাশিত Anglo-Arabic Dictionary, লর্ড রাসেল, কার্ল পপার, সরেন কিয়ার্কেগার্ড, হাইডেগার প্রমুখ দার্শনিকদের গ্রন্থ আমার হাতে তুলে দেবার পাশাপাশি আল কুরআন ও নবীজী (দ.) সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত সর্বসাম্প্রতিক গবেষণা সমৃদ্ধ উন্নত গ্রন্থের তথ্য দিয়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করে দর্শন-ধর্ম-তাসাওউফ-অর্থনীতি-মাইজভাণ্ডার শরিফ সম্পর্কে অধিকতর জানার সহযোগী ও অংশীদার হয়ে আমাকে কৃতার্থ করেছেন। এসব পুস্তকে আলোচিত বহু তথ্য আমাদের এ গ্রন্থের জন্য সম্পূরক উপাদান হিসেবে সহায়ক হয়েছে। আল্লাহ্ তাঁর রুহের নাজাত দিন।

১৩. ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিক থেকে এই গ্রন্থের খসড়া পাণ্ডুলিপি রচনার কাজ শুরু হয় এবং দীর্ঘ প্রায় দু'বছর ধরে সমীক্ষণমূলক (critical) পর্যালোচনাপূর্বক ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন করা হয়।

চারভাগে বিন্যস্ত এই গ্রন্থের প্রথমভাগে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বিকাশ, তৌহিদের দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক যথার্থতা, রবুবিয়তভিত্তিক সামাজিক প্রকল্পে তৌহিদী গণিত ও প্রাকৃতিক প্রয়োগ, বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসের সংক্ষিপ্ত রেখাচিত্র, মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে বহুত্ববাদী সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা, হানাফী ফিকাহ্'র আলোকে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তসহ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সহজবোধ্য আলোচনা ষোলোটি অধ্যায়ে পত্রস্থ করা হয়েছে। তবে একথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, অন্তহীনতায় একাকার জ্ঞানের মহাজগতে দর্শন-সমুদ্রের কিনারা পাওয়া মানবের সাধ্যাতীত, যার স্বত্ব এবং এক্তিয়ার একমাত্র মহান রাব্বুল আলামিনেরই। অবশ্যই অনুসন্ধিৎসু সাধারণ পাঠক ও শিক্ষার্থীরা পুরো বিষয়গুলো সম্পর্কে একটা comprehensive ধারণা লাভের সহযোগী হিসেবে এই বইটিকে হাতের কাছে পাবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। মানবরচিত কোন গ্রন্থ স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ হতে পারেনা; বিভিন্ন বিষয়ে শব্দচিত্রের একটা ক্যানভাস হিসেবে চিত্রিত হয় মাত্র, যা ক্রমান্বয়ে অধিকতর তথ্য, চিন্তা ও ধারণার পুষ্প-ফসলে সমৃদ্ধতর হবার লক্ষ্যে কেবল এগিয়ে চলে।

দ্বিতীয়ভাগে যুগন্ধর দার্শনিক সাধক হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.), শায়খুল আকবর হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.)সহ বারোজন মহান ওলী-আল্লাহ্র জীবন ও কর্ম-সংক্ষেপ বিবৃত করা হয়েছে, যাঁরা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের রবুবিয়াত নীতিসহ বিভিন্ন সূত্র বাস্তব সংসারক্ষেত্রেও প্রয়োগের অবিনশ্বর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন এবং নিজেরাও এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হিসেবে বিরাজ করছেন।

তৃতীয়ভাগে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আচার প্রকরণ এবং চতুর্থভাগে সার্বজনীন রবুবিয়াত নীতির প্রথম ফলিত রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তিরূপে বিরচিত ঐতিহাসিক মদীনা সনদ / সংবিধান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৪. মাইজভাণ্ডারী সিলসিলার একগুচ্ছ বিজ্ঞ বিদ্বজ্জন প্রফেসর ড. মুহম্মদ আবদুল মান্নান চৌধুরী, অধ্যাপক জহুর-উল-আলম, ড. সৈয়দ আবদুল ওয়াজেদ, মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান টুটুল, মওলানা এস এম এম সেলিম উল্লাহ্ প্রমুখ গ্রন্থটা প্রেসে যাবার পূর্বে আদ্যোপান্ত পর্যালোচনাপূর্বক ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন পরিমার্জন করে সৌষ্ঠব বাড়িয়ে ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

দরবারে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর গাউসিয়া হক মন্‌জিলের সাজ্জাদানশীন হযরত সৈয়দ মোহাম্মদ হাসান (ম. জি. আ.)-এর ইপ্সিত এমন গুরুভার গ্রন্থ প্রণয়নের পরিকল্পনার সাথে সংযুক্ত হতে পেরে আমরা মহান রাব্বুল আলামিনের শোকরিয়া প্রকাশের পাশাপাশি এই দায়িত্ব সম্পাদনে তাঁর রহমত যাঞ্চা করছি। আমীন!

২৪-০১-২০২০ খ্রিস্টাব্দ

মোঃ মাহবুব উল আলম
ই-মেইল :
m.alam71@yahoo.com

কুলসুমা ভিলা
চট্টগ্রাম সাংবাদিক হাউজিং সোসাইটি,
বায়েজিদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ ৪২১০।

টীকা: তথ্যসূত্র

১. (ক) সুফি দর্শন, ফকির আবদুর রশীদ, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা। ১৯৮০, পৃ: ৭৩-৭৪ (খ) হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী-এর জীবনী; এম. শাহজাহান বিন ফজল, মীনা বুক হাউস, ঢাকা, ২০০০ইং পৃ: ১৯০।

২. এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক: খাদেমুল ফোক্বারা মৌলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী; ১৯৭৪ইং।

৩. (ক) হযরত গাউসুল আযম শাহ্‌সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) মাইজভাণ্ডারীর তোতা ময়না: রফিক আনোয়ার; ২০০৮, (খ) হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর ওফাত শতবার্ষিকী সংখ্যা, পৃ: ৮৭, ২০০৬।

৪. গাউসিয়া হক মন্‌জিলের স্নিগ্ধ অন্তর্দ্যুতি : ড. হাসনে আয়মুন, মাসিক আলোকধারা, অক্টোবর, ২০০২ইং।

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের প্রকরণ ও অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

১. প্রকরণ এবং এর প্রয়োজনীয়তা [methodology and its necessity]:

আল্লাহু রাব্বুল আলামিনের অন্তহীন বহু বিচিত্র মাখলুকাতের সৃষ্টি, প্রতিপালন, বিবর্তন, ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ব্যবহারিক বিষয়াদি এক সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে বিন্যস্ত। এই প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি নিতান্তই নিঋর্ণলভাবে সদাসক্রিয় বৈজ্ঞানিক চেতনা-নির্ভর। আল-কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে এ বিষয়টা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নানা প্রকার সহজবোধ্য দৃষ্টান্তসহকারে সাবলীলভাবে বর্ণিত হয়েছে (যেমন: ২:১৬৪, ৭:৫৪, ৬৭:৩-৪ প্রভৃতি)। মানুষের সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নৈতিক, আয়-ব্যয়, ভোগ-দান প্রভৃতি বিষয়েও কুরআনে আদর্শ (model) প্রকরণ পেশ করা হয়েছে। আবার তা অনুসরণ করা কিম্বা না-করার বিষয়ও মানুষকে প্রদত্ত সীমিত ইচ্ছা-অনিচ্ছা নির্ভর করা হয়েছে, যেগুলো আল-কুরআনে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণিত। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মানবজাতির বর্তমান সময় পর্যন্ত অর্জন ও অগ্রগতি কুরআনের সূত্রাবলীর সাথে সর্বাংশে সঙ্গতিপূর্ণ। এই প্রকরণ বা methodization বস্তুজগত, জীবজগৎ, বৃক্ষজগৎ, মানবজগৎ, ভাবনাজগৎ এমনকি মনুষ্য উদ্ভাবিত যন্ত্রজগতেও দৃশ্যমান। অতএব, প্রকরণ (methodization) ফর্মূলা দৃশ্য ও দৃশ্যাতীত সকল জগতে প্রাকৃতিক স্বতঃসিদ্ধভাবে অধিষ্ঠিত ও ক্রিয়াশীল। অন্যথায় কোন কাজ বা সৃজন সুশৃঙ্খল, কর্মক্ষম ও উপকারিভাবে সম্পন্ন করা সম্ভবপর হবার নয়।

অব্যাহতভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার পথ ধরে মানব সমাজ যেসব পরীক্ষিত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় গড়ে তুলেছে, তার নিরিখে দেখলে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতি যেন আল-কুরআনে বাঙ্ময়। এই 'বিজ্ঞানসম্মত' গ্রন্থের (কুরআনুল হাকীম) বিভিন্ন শব্দ, বিভিন্ন আয়াত, বিভিন্ন রুকু বা অনুচ্ছেদ, বিভিন্ন সূরা বা অধ্যায়ের তাৎপর্য, ব্যঞ্জনা

প্রতিনিয়ত বিভিন্ন বিজ্ঞজনের কাছে নব নবরূপে উন্মুক্ত হচ্ছে এবং জিজ্ঞাসু মানুষের জ্ঞান সাধনায় অনুপ্রেরণা যোগাচ্ছে।

এবার মানব সমাজে রাষ্ট্র, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান, সমিতি, এমনকি ক্লাবের পরিচালনায় প্রকরণের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবহারের উপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা যাক। মানবসমাজের লিখিত ইতিহাসের এ যাবৎ পাওয়া তথ্য থেকে জানা যায়, মানুষ গোড়া থেকেই তার টিকে থাকবার প্রয়োজনে সংঘবদ্ধ জীবন যাপন করেছে এবং কিছু না-কিছু প্রকরণ বা নিয়ম-কানুন প্রণয়ন ও অনুসরণ করে আসছে। হযরত মূসাকে (আ.) প্রদত্ত দশ অনুজ্ঞা (ten commandments), রাজা হাম্বুরাবি প্রণীত কোড বা আইন বিধি, সম্রাট অশোকের প্রচারিত বৌদ্ধবাণীর শিলালিপি প্রভৃতি সমকালীন প্রকরণেরই পরিচায়ক। নবীজী হযরত মুহাম্মদ (দ.) তাঁর মিরাজ-পরবর্তী পার্থিব জীবনের জাহেরী অধ্যায়ে ইপ্সিত রাষ্ট্রীয় ও সমাজ ব্যবস্থার পত্তনের সূচনাতেই লিখিত প্রকরণ প্রণয়ন করেন, যা পৃথিবীর প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ইতিহাসে স্বীকৃত। তাঁর কৈশোর জীবনের 'হিল্‌ফুল ফুজুল' বা কল্যাণ সংঘের আচরণবিধিও এক প্রকার প্রকরণ। একইভাবে আমরা দেখি যে; রাষ্ট্র, সমাজ, ক্লাব, সমিতি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, শিল্প প্রতিষ্ঠান, এমনকি পারিবারিক পর্যায়েও কিছু কোড বা আচরণবিধি লিখিত, অলিখিতভাবে প্রণীত ও অনুসৃত হয়ে আসছে। সংবিধান, গঠনতন্ত্র, আইন, উপবিধি, মোমোরেন্ডাম কিম্বা আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন প্রভৃতি এই প্রকরণেরই বিভিন্ন রূপমাত্র। অতএব, মানব সমাজের গঠন এবং প্রগতিশীল স্থিতির প্রয়োজনেই প্রকরণ বা মেথডাইজেশনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। যুগে যুগে প্রেরিত সহিফা, কিতাব, গ্রন্থ, প্রভৃতিও বৃহত্তর পরিসরে পদ্ধতিকরণ রূপ।

২. ত্বরিকা ও বেলায়তের সংজ্ঞা এবং মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা ও মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত (Definition of Tariqah and O'layet : Maizbhandari Tariqah and Maizbhandari O'layet):

ত্বরিকা আরবী শব্দ। এর বাংলা অর্থ: পদ্ধতি, পথ, পন্থা, নিয়ম, প্রণালী। এর দার্শনিক বর্ণনামূলক সংজ্ঞা : 'সুফি' পথ অনুসরণকারী কোনও একটি ভ্রাতৃসংঘ বা মতবাদ, যাদের নিজস্ব বিশেষ জিকির এবং শ্রদ্ধাভাজন নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ ইমাম পীর-মাশায়েখ আধ্যাত্মিক অভিভাবক রয়েছেন।" বর্তমানে মুসলিম জাহানে তিন শতাধিক ত্বরিকা বিদ্যমান। এর মধ্যে চার ত্বরিকা ও চৌদ্দ খান্দান প্রসিদ্ধ। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)-এর কঠোর রিয়াজত-সাধনা এবং তিতিক্ষার ফলশ্রুতিতে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ১৮৬৬ খ্রি. থেকে মাইজভাণ্ডারী রুহানী ও মারিফাতী পুষ্পদ ও ফলদ তরুর উদ্‌গম ও বিকাশ ঘটতে থাকে। এরপর থেকে তৎকালীন রেওয়াজের আবহে হযরত আকদাসের এই মারিফাতী ঘরানা

'মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা' হিসেবে অভিহিত হতে থাকে। হযরত আকদাস (ক.) নিজের জীবদ্দশায় এই ত্বরিকার তালিম প্রবর্তন ও জারী করে যান তাঁর যোগ্য খলিফায়ে কেরামের মাধ্যমে।

কালপ্রবাহে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মধ্যে অধ্যাত্ম বিজ্ঞান, অধিবিদ্যা বা metaphysics-এরও প্রভূত বিকাশ ও উন্নতি সাধিত হতে থাকে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যে হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.), হযরত ইবনুল আরাবী (র.), মওলানা রুমী, দার্শনিক ড. মুহাম্মদ ইকবালসহ মুসলিম মনীষার চিন্তা-চেতনা নিয়ে ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়। ফলে মারিফত তত্ত্ব বা অধ্যাত্ম বিজ্ঞানের ক্ষেত্র ও প্রভাব দৃশ্যমান ও অদৃশ্য জগতে প্রসারিত হতে থাকে। এই ধারাবাহিকতায় 'মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা' হিসেবে অভিহিত 'ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন যাপন প্রক্রিয়া' নতুন ব্যঞ্জনা ও রূপ লাভ করতে থাকে। ত্বরিকায় নির্দিষ্ট অর্থে ইবাদত-বন্দেগী, সদাচার, জিকির, ধ্যান প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে পরিশুদ্ধ ব্যক্তি-মানুষ নির্মাণের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়।

এই লক্ষ্যে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার নিজস্ব জিকির পদ্ধতি, ইবাদত-বন্দেগীর কায়দা, ত্বরিকতী ভাই-বেরাদরদের সাথে শান্তিপূর্ণ-গঠনমূলক সহযোগিতাভিত্তিক রুহানী সমাজ নির্মাণের সুশৃঙ্খল বিধিবদ্ধ নিয়ম-পদ্ধতি গড়ে উঠে, যেগুলো অতীতের অনেক ত্বরিকার পদ্ধতির তুলনায় সহজতর। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর রচিত মূলতত্ত্ব বা তজকিয়ায়ে মোখতাছার, মুসলিম আচার ধর্ম, মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া পুস্তিকায় সংক্ষিপ্ত সার্বজনীনভাবে এসব পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করে গেছেন, যা মাইজভাণ্ডারী আশেক-ভক্ত-মুরীদরা নিষ্ঠাসহকারে অনুসরণ করেন।

এই ত্বরিকার অন্তর্নিহিত শক্তি ক্রমান্বয়ে বিকাশ ও বিস্তার লাভ করতে থাকে এবং ব্যক্তি মানুষের ধার্মিকতার সীমা পেরিয়ে মানব সমাজের তাবৎ জাগতিক ও রুহানী চাহিদা ও জিজ্ঞাসার ফলপ্রসূ খোরাক সরবরাহ করতে থাকে। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা এক নির্মল শান্তিময় বিশ্ববীক্ষা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে কালিক সমস্যাবলী সমাধানের উপকরণও যোগাতে থাকে। এই ব্যাপক প্রেক্ষাপটে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ১৯৬০ সন থেকে 'মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত' পদ বা টার্মটা প্রয়োগ করে এসেছেন।

বেলায়ত ধর্মাচার-প্রধান ত্বরিকত পন্থার পার্থিব-অপার্থিব, জাহেরী-বাতেনী উভয় ক্ষেত্রের সম্প্রসারিত রূপ। নবীজীর (দ.) সূচনা বিন্দু থেকে অগ্রসর হলে প্রতীয়মান হয় যে, বেলায়ত বৃহত্তর অর্থে ব্যক্তি-পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র-পৃথিবী-বিশ্বজগতকে পরিবেষ্টনকারী একটি বাস্তবমুখী জীবন-পরিকল্পনা। বেলায়ত শুধু জাগতিকতার মধ্যে সীমিত না থেকে জাহেরী-বাতেনী সকল দিক ও বিষয়কে আত্মস্থ করে মানব জীবনের একটা পূর্ণাঙ্গ গোলক উপস্থাপন করে।

অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) প্রদত্ত সংজ্ঞা : "বেলায়ত 'অলা' শব্দ হইতে উৎপন্ন। 'অলা' অর্থ নৈকট্য লাভ। প্রেম, মহব্বত সম্পর্ক। খোদাতায়ালার নিকট-সম্পর্ককে বেলায়ত বলে। বেলায়ত দুই প্রকার: বেলায়তে ঈমান ও বেলায়তে ইহছান। বেলায়তে ঈমান শুধুমাত্র খোদার সম্পর্ককে বুঝায়। এই বেলায়ত সমস্ত মোমেনগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বেলায়তে ইহছান খোদার নিকটতম রহস্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং ক্ষমতাকে বলা হয়। শুধুমাত্র নবী ও ওলীগণই ইহা প্রাপ্ত হন। নবী করিম (দ.) এর সত্তায় নবুয়ত ও বেলায়ত, দুইটিই পরিপূর্ণতা লাভ করে। তাঁহার পর আর কোন নবী নাই এবং ইহার প্রয়োজনও নাই। কিন্তু বেলায়তে ইহছান আবহমানকাল পর্যন্ত জারি থাকিবে।" এই সংজ্ঞা বিবৃত করার পর তিনি বেলায়তের প্রকার ভেদ এবং বেলায়তের স্তর ভাগ সংক্ষিপ্ত সহজহবোধ্যভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।[১]

৩. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের প্রকরণ প্রণয়নের পটভূমি [prologue to the O'layet-e-maizbhandari methodization]:

নবুয়তি ধারার অবসান (৬৩২ খ্রি.) বিশ্বমানব সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত একটি বাস্তব অভিজ্ঞতা। তবে একই সাথে এটাও স্বীকৃত অভিজ্ঞতা যে, মানুষের বেলায়তি (স্রষ্টার নৈকট্য) ধারার বিকাশ ও ক্রমসম্প্রসারণ রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে, যা সদা বিবর্তনশীল মানব সমাজের বিভিন্ন বর্গ ও অংশের সমকালীন সংস্কারমূলক চাহিদা, আচার-বিধি ইত্যাদির মডেল বা আদর্শ নির্দেশনা দিয়ে মানুষ ও তার সমাজকে মানবিক গুণের পরিচ্ছদে শোখিণ করে রাখবে। আল কুরআন ও নবীজী (দ.) সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, স্রষ্টার সাথে তাঁর বান্দাদের সম্পর্ক সরাসরি। নবী-ওলীরা এই সম্পর্কের সহজ সূত্রটা যোগ্য প্রার্থীর হাতে তুলে দেন। তাই বেলায়তী ধারার অস্তিত্ব ও ক্রমবিকাশ বাস্তব ক্ষেত্রে পরীক্ষিত সত্য।

হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মাধ্যমে উদ্গাত (sprouted) মাইজভাণ্ডারী বেলায়তি ধারার পবিত্র ঐতিহ্যের ক্রমঃসম্প্রসারমান বিবর্তনশীলতার সমকালীন (আমাদের বর্তমান সময় একবিংশ শতাব্দীও এই দাওরা বা কালের অন্তর্গত) ও চলমান বিকাশ। ওলী-আল্লাহ্দের নিরবচ্ছিন্ন ধারার প্রবহমানতার বিবর্তনের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তাঁরা নিজ নিজ স্থান-কাল-পরিবেশে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে আত্মস্থ করে গরিষ্ঠ সংখ্যক সাধারণ মানুষের সাংসারিক, পার্থিব উন্নতি ও শান্তির পাশাপাশি রূহানী বা আত্মিক জ্ঞান ও উপলব্ধির অচঞ্চল প্রশান্তি অর্জনের কার্যকর নির্দেশনা দিচ্ছেন। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জাগতিক ও চিন্ময় বৈশিষ্ট্যগুলো লক্ষ্য করলে এ বিষয়টা খোলাসা হয়ে যায়। তিনি সমানভাবে সমকালীন জাগতিক,

আর্থনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ভারসাম্যমূলক অবস্থানের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের পাশাপাশি রুহানী উন্নয়নের ক্ষেত্রে তালিম দিয়ে গেছেন। উল্লেখ্য, আধ্যাত্মিক মহাপুরুষদের শিক্ষা ও নির্দেশনা স্ব-কালের সীমা পেরিয়েও কার্যকর থাকে।

অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর পিতামহের এই শিক্ষাকে প্রণালীবদ্ধ করার দুরূহ কাজটা আধুনিকতার মানদণ্ডসম্মতভাবেই সম্পন্ন করেছেন। এই কাজের যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছেন যুগপৎ একাডেমিক ও রুহানীভাবে। তাঁর দাদা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছাত্র হিসেবে যেমন মেধাবী ছিলেন, তেমনি শিক্ষক হিসেবেও ছিলেন প্রসিদ্ধ ও সর্ববীকৃত। অতএব, পিতৃহারা পৌত্রের শিক্ষার 'বিস্‌মিল্লাহ্' মহান দাদার হাত দিয়েই শুরু হবে, তা প্রকৃতি-নির্ধারিত। অতঃপর তিনি তাঁর যুগপৎ গৃহ শিক্ষক ও খালু হাফেজ মওলানা সৈয়দ তফাজ্জল হোসেনের নিকট আরবী, ফার্সী, উর্দু, বাংলা এবং পবিত্র কুরআন শিক্ষা লাভ করেন আনুষ্ঠানিকভাবে। এরপর উচ্চতর শিক্ষার জন্য তাঁকে প্রেরণ করা হয় তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম শহরের মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসায়, যেখানে ইতোপূর্বে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন একাধারে তাঁর পিতৃব্য, শ্বশুর ও পীরে তাফায়ূজ হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)। অধ্যাত্ম পরিমণ্ডলের রেওয়াজ অনুসারে তিনি তাঁর দাদাজানের নির্দেশে কুতুবুল ইরশাদ হযরত মওলানা সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারীর (ক.) নিকট বায়াতে-সুন্নাত গ্রহণ করেন। হযরত আমিনুল হক ওয়াসেলের (ক.) ইন্তিকালের পর তাঁর দাদাজান তাঁকে পুনঃবায়াত করান। মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসায় তিনি সেখানকার সিলেবাস অনুযায়ী কুরআন, হাদিস, ইজমা, কিয়াস, মন্তেক, ফিকাহ্, উসুল প্রভৃতি সফলভাবে অধ্যয়ন করেন। তাঁর জ্ঞানস্পৃহা সকলকে মুগ্ধ করে। তাঁর দাদাজানের ওফাতের পরও এই মাদ্‌রাসায় তাঁর অধ্যয়ন অব্যাহত থাকে। ১৯১১ সনে এই মাদ্‌রাসায় অধ্যয়নকালে 'অহম' [আসাম] শাসনামলের একটি তাম্রমুদ্রা মাদ্‌রাসা পাহাড়ের মাটিতে অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়, যা তিনি চন্দনপুরাস্থ দারোগাবাড়ির মৌলভী আবদুস সালাম বি.এ সাহেবের মারফত চট্টগ্রাম সরকারী কলেজের পালি ভাষার প্রফেসরের নিকট পাঠিয়ে দেন। প্রফেসর সাহেব তা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়ে দেন, যা এখনো সেখানে প্রাচীন মুদ্রার স্মারক-সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত আছে। তাঁর তীক্ষ্ণ ধীশক্তি, বিশাল দূরদৃষ্টি ও প্রবল জ্ঞানস্পৃহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এই ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে নিহিত। মওলানা রুমির 'মসনবী শরিফ', ইবনুল আরাবীর বিখ্যাত 'ফুসুসুল হিকম', ইমাম গাজ্জালীর কিমিয়ায়ে সাআদাত, ইয়াহিয়া উলুমুদ্দীন, খৈয়াম, সাদী, দার্শনিক ইকবাল প্রমুখের অমর অজর

গ্রন্থ ভুবনে তাঁর পরিব্রাজন ছিল আটপৌরে অভ্যাসের মতো। সংবাদপত্র, ম্যাগাজিন ছিল তাঁর নিত্যসাথী। এখানে আমরা তাঁর বাস্তব বা জাহেরী শিক্ষা ও চর্চা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবহিত হলাম। এছাড়া মৌলিক জ্ঞানের ফল্গুধারার সাথে তাঁর যোগাযোগ তো তাঁর মহান দাদাজানের মাধ্যমেই ঘটে। এটা সর্বস্বীকৃত যে, কোন বিষয় পাঠ করার পাশাপাশি তার গভীরে প্রবেশ করা এবং তা আত্মস্থ করে সামনের পানে এগিয়ে যাওয়ার যোগ্যতা জন্মসূত্রেই মানুষের মেধা-মননে নিহিত থাকে, যা জাহেরী ব্যবহারিক শিক্ষায় শাণিত হয়। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) দৃশ্যমানভাবে এই মহতী মেধা-মনন-বিশ্লেষণ ক্ষমতা, অনুধাবন-পর্যবেক্ষণ শেষে সঙ্গত উপসংহারে উপনীত হবার দক্ষতার অধিকারী ছিলেন।

সামাজিক শ্রেণীগতভাবে তাঁর দাদাজান ছিলেন বড় জোর নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর। এই সুবাদে সমাজের অনুচ্চতর অন্ত্যজ সামাজিক বর্গের লোকেদের সাথে সান্নিধ্যই বেশী ছিল তাঁর। তদুপরি যে মহান আধ্যাত্মিক বৈভব তিনি অর্জন করেছিলেন, সে বৈভব বিতরণের মুখ্য ক্ষেত্র ছিল এসব মানুষেরই সমাজ ও বর্গ–, যা নবীদের ইতিহাসেও লক্ষ্যণীয়। সমাজের বঞ্চিত, নিপীড়িত, সহায়-সম্বলহীন, উপেক্ষিত মানুষরাই ছিলেন নবীদের "বিনামূল্যে, বিনিময়-প্রত্যাশা মুক্ত" কল্যাণকর্ম ও ধারণার বীজ বপনের উর্বর ক্ষেত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীতে হযরত আকদসের জীবৎকালে বাংলার গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষের সমাজ-সংসার ক্ষেত্রেও ইতিহাসের এই ধারার কার্যকারিতা দৃশ্যমান। অতএব, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কর্মজীবনের মিশনের সুবিন্যস্ত, সহজবোধ্য, উপস্থাপন ও প্রয়োগপূর্বক ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখার গুরুদায়িত্ব ঐতিহাসিকভাবে অছিয়ে গাউসুল আযমের উপর অর্পিত হয়েছিল। তিনি প্রাকৃতিকভাবে, রূহানীভাবে তাঁর মহান পূর্বতন পুরুষ, শিক্ষক, পালক ও দিশারীর দ্বারা সেভাবেই যে নির্মিত হয়েছিলেন, তা দিবালোকের মতো সত্য।

আরবী শব্দ 'দ্বীন' এবং সংস্কৃত শব্দ 'ধর্ম'-এর ৩৪টিরও বেশী প্রতিশব্দ ও অর্থ আছে। এসব অর্থ মানুষের ব্যক্তিক, পারিবারিক, ব্যবহারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীক, আন্তর্জাতিক প্রভৃতি সকল প্রকার কর্ম-প্রবাহকে বেষ্টন করে থাকে। বৃক্ষজগৎ, প্রাণীজগৎ, বস্তুজগৎ, নক্ষত্রলোকের বিভিন্ন অবস্থা, অবস্থান ও বিবর্তন প্রভৃতি বহু বিষয় বুঝাতে আরবী ও বাংলায় সাধারণতঃ এই দুটো শব্দ ব্যবহৃত হয়। ইংরেজীতে অবশ্য জীব, বৃক্ষ ও পদার্থের বিভিন্ন অবস্থান্তর বুঝাতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ব্যবহৃত হয়, যেমন custom, manner, behavior প্রভৃতি। কিন্তু, ইসলামী কিম্বা সংস্কৃত ঐতিহ্যে 'ধর্ম' শব্দের ব্যঞ্জনা কেবল আচার-অনুষ্ঠান কিম্বা ritual এর মধ্যে সীমিত নয়। মাইজভাণ্ডারী জীবনবোধ বা ত্বরিকা 'ধর্ম'কে এই বৃহত্তর অর্থেই গ্রহণ করে এবং তা হযরত আকদাসের জীবদ্দশাতেই ব্যাপক প্রচার ও প্রসার লাভ করে। কেবল মুসলিম সমাজ

নয়; নিপীড়িত, বঞ্চিত অন্যান্য লোক সমাজও এই মহীরুহের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে এগিয়ে আসেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর এই ঐহিক ও পারত্রিক (জিসমানী ও রুহানী) কর্ম-প্রক্রিয়ার যুগোপযোগী পরিমার্জন, প্রসারণ ও উন্নততর বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া সূচিত হয়। অচিরেই তাঁর জন্মস্থান ও বাসস্থান মাইজভাণ্ডার গ্রামটি, অতীতের যুগ প্রবর্তক ওলী আল্লাহ্দের নিবাসস্থলের মতোই সর্বস্তরের কল্যাণকামী গণমানুষের মিলনস্থল তথা ধর্মীয় পরিভাষায় তীর্থস্থানে পরিণত হয়।

এ অবস্থায় রোজকার এই মহান স্বতঃস্ফূর্ত কল্যাণকামী লোকসভার জন্য স্বীকৃত রেওয়াজ অনুযায়ী সর্ববৈষয়িক বহুমাত্রিক প্রকরণ প্রণয়ন জরুরী হয়ে পড়ে। কারণ, কল্যাণার্থী মানুষরা অনুসরণীয় কোন প্রকার রূপরেখার অবর্তমানে নিজ নিজ মনোমত আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতি পালন করতে থাকেন, যাতে সামগ্রিক গড় সমন্বয়, শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থাপনার অভাব ছিল। তদুপরি এই মহান আধ্যাত্মিক কেন্দ্র মানুষের শৈক্ষিক, নৈতিক জীবনাচার, সাংস্কৃতিক অনুশীলন ও রুহানী উন্নয়ন চর্চার প্রশিক্ষণ-আগার হিসেবে বিকশিত হয়ে উঠায় জীবন-সংশ্লিষ্ট সর্ববিষয়ে পদ্ধতিকরণ বা methodization অপরিহার্য হয়ে উঠে। উল্লেখ্য, হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.), গরীবে নেওয়াজ খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্তী (র.), শেখ আহমদ ফারুকী সরহিন্দী (র.) প্রমুখের দরবারে সমসাময়িকতার সাথে সঙ্গতি রেখে আচার-অনুষ্ঠানের প্রকরণ করা হয়েছিল, যেগুলোর অনেক কিছু এখনো সেসব স্থানে প্রচলিত আছে। এমন কি খ্রিস্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, উপজাতীয় সমাজের ধর্মীয় ভরকেন্দ্রগুলোতেও নির্ধারিত বিধিবদ্ধতা প্রবর্তিত আছে।

বিদ্বান ও বিজ্ঞ অছিয়ে গাউসুল আযমের আলোকিত আধুনিক মানস এই পদ্ধতিকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্যক উপলব্ধি করেন এবং নিজের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বশক্তি দিয়ে এই দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৬০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর পরিণত ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ বয়সে রচিত ও প্রকাশিত "বেলায়তে মোত্লাকা"-মাইজভাণ্ডারী প্রকরণের আকরগ্রন্থ–এই লক্ষ্য এবং সাধনারই ফলশ্রুতি। প্রথম সংস্করণের মলাটে এই পুস্তকের নাম মুদ্রিত ছিল এভাবে;

"বেলায়তে মোত্লাকা
অথবা মাইজভাণ্ডারী
মুক্ত সুফিবাদ"

এই গ্রন্থটাকে বাংলায় 'সার্বজনীন রুহানী নৈকট্য প্রক্রিয়া' রূপে অভিহিত করা যায়। এই গ্রন্থে মানুষের জৈবিক, পার্থিব, অপার্থিব, সাংস্কৃতিক, কাঙ্ক্ষিত প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, আন্তর্জাতিক, বর্ণ-ধর্ম-ভাষা-আচার-সংস্কৃতিগত পার্থক্য নির্বিশেষে কাঙ্ক্ষিত সর্বমানবিক কল্যাণমুখী ঐক্যবিধানের প্রয়াসের নির্দেশনার সন্ধান পাওয়া

যায়; যা চিন্তা ও কর্মের জগতে নতুন নতুন ফসলী ক্ষেত্রের পত্তন ঘটাতে সক্ষম। এই গ্রন্থ মূলতঃ একটি সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যসম্পন্ন দার্শনিক, সমাজ-বিজ্ঞান ও মৌলিক অধ্যাত্মচর্চার পরামর্শমূলক গ্রন্থ; নিরেট কোন ধর্মীয় কিম্বা ধর্মাচার বিষয়ক পুস্তক নয়। বরং বলা যায়, বাস্তব কর্মপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে মারিফাত অর্জনের সূত্রবিশিষ্ট পথ-নির্দেশক গ্রন্থ।

৪. মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত প্রকরণ [methodology of maizbhandari o'layet]:

প্রথমেই আমরা methodology-র অর্থ দেখি। এই শব্দটার বাংলা অর্থ : নিয়ম বিষয়ক বিদ্যা বা কোন কাজে ব্যবহৃত নিয়ম বা পদ্ধতিসমূহ (বাংলা একাডেমী: ইংরেজী-বাংলা অভিধান)। অক্সফোর্ড অভিধান মতে "A set of methods and principles used to perform a particular activity" (নির্দিষ্ট কোন কর্ম সম্পাদনে ব্যবহৃত এক প্রস্থ পদ্ধতি ও নীতিমালা)।

এই সংজ্ঞার আলোকে আমরা মাইজভাণ্ডারী প্রকরণ অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হলে হাতের কাছে একমাত্র যে গ্রন্থটা পাই, তা'হলো 'বেলায়তে মোত্লাকা'। এ প্রসঙ্গে আমরা মানব-সভ্যতার বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক স্তর সক্রেটিস (৪৬৯-৩৯৯ খ্রি. পূ:), প্লেটো (৪২৮/৪২৭-৩৪৭/খ্রি. পূ:) এবং এ্যারিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি. পূ.) বুদ্ধিবৃত্তিক অবদানের কথা স্মরণ করতে পারি (তাঁরা তিনজন আরবী সাহিত্যে যথাক্রমে সাক্রাত, আফলাতুন এবং আরাস্তু উচ্চারণে লিখিত)। সক্রেটিসের মুখ থেকে শ্রুত ও সংগৃহীত উক্তিগুলো গ্রন্থাকারে সন্নিবেশিত করেন প্লেটো তাঁর বিখ্যাত 'ডায়লগ' গ্রন্থে। এ্যারিস্টটল প্লেটোর রচনা ও শিক্ষার বীজতলা থেকে রাষ্ট্র, দর্শন, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে উত্তম ফসলের উদ্ভব ঘটান। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ছিলেন মহান শিক্ষক ও দার্শনিক, যার শিক্ষকতার আলো পেশাদারিত্ব ছাড়িয়ে দার্শনিক ও রুহানী স্তরে প্রসারিত হয়ে আছে। আমরা এক্ষেত্রে হযরত আকদাসের ব্যাপারে যুগপৎ শিক্ষক ও দার্শনিক শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছি। বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিকত্রয় দর্শন-রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষেত্রে নিজেদের চিন্তা ও ধারণা প্রসূত তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ করে গেছেন। হযরত আকদাস কেবলা তাঁর পূর্ববর্তী গ্রীক-ইসলামী/মুসলিম এবং পরবর্তীতে বিকশিত দর্শনের বিশাল বুদ্ধিবৃত্তিক পটভূমিকায় সমকালীন সক্রেটিস রূপে আবির্ভূত হয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় ঋণবনে কার্যকর শিক্ষক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি লিখিত কিছু রেখে গেছেন বলে জানা যায় না। তাঁর শিক্ষার লিপিকার-প্লেটোর অনুরূপ হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)। তবে এই ভাগ্যবান লিপিকারের সুবিধা ছিল এই যে, তিনি জন্মের পর (১৮৯৩ইং) থেকে তেরো বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর দাদাজানের প্রত্যক্ষ

স্নেহ, ছত্র ও শিক্ষা ছায়ায় থাকার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। হযরত আকদাসের ওফাত হয় ১৯০৬ইং। ইতিহাস আরো সাক্ষ্য দেয় যে, অছিয়ে গাউসুল আযম তাঁর ১৮ বছর বয়সে ১৯১১ সনে মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসার কৃতি ছাত্র ছিলেন। অতএব, তাঁর দাদাজান সম্পর্কে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং এর সঙ্গে ছিল পারিবারিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নত শিক্ষা। কিছু পড়ে, জেনে, শুনে আত্মস্থ করা এবং বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করে উপযুক্ত পয়েন্ট বের করে আনার দক্ষতা ও জ্ঞান যে তাঁর মতো মানুষদের অন্তর্জাত, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। অতএব, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) চেতনা, শিক্ষা, কর্ম-পরিক্রমাকে লিখিত আকারে পুস্তকে বিন্যস্ত করার দায়িত্ব যথোপযুক্ত প্রতিভার উপরই অর্পিত হয়েছিল বলতে গেলে প্রাকৃতিকভাবেই এবং তা তিনি সফলভাবে পালন করেছিলেন প্রায় ২২ শত বছর পূর্বের প্লেটোর মতোই। তিনি তাঁর দাদাকে দেখেছেন, শুনেছেন, অনুভব করেছেন, অনুধাবন করেছেন এবং সেসব আবার সর্ব সাধারণের কল্যাণার্থে সহজ ভাষায় প্রকাশ করে একাধারে দার্শনিক, ধর্ম ও সমাজসেবকসুলভ দায়িত্ব পালন করে গেছেন। অবশ্য কাল ও পরিবেশগত বিশ্লেষণে সক্রেটিস-প্লেটো আর গাউসুল আযম হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ভূমিকায় পার্থক্য অনেক। পূর্বতনেরা দাস সামন্ত যুগের অভিজাত প্রভু শ্রেণির বিজ্ঞ দার্শনিক আর পরবর্তীরা যন্ত্রশিল্প বিপ্লব, সাম্রাজ্যবাদ-ঔপনিবেশবাদ কবলিত যুগের সর্বকল্যাণবাদী মহান আউলিয়া।

এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত গ্রীক ও অন্যান্য দার্শনিকদের তুলনায় যুগপৎ শিক্ষক ও সিদ্ধ পুরুষ হিসেবে হযরত আকদাস ও অন্যান্য ওলী আল্লাহ্‌দের প্রত্যক্ষ জনসম্পৃক্ততার ক্ষেত্র বেহিসাব অধিক এবং তাঁদের জীবন সাধনায় তত্ত্বের চেয়ে বাস্তব কর্মের ফসল ও গুরুত্ব ঢের বেশী।

৫. মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার প্রকরণের বীজ বপন ও লালনের সূত্রপাত ঘটে হযরত আকদাসের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানেঃ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার পদ্ধতিগত উদ্ভব, তালিম ও অনুশীলনের সূত্রপাত ঘটে হযরত আকদাসের (ক.) জীবদ্দশায় তাঁর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায়। এই তালিমগুলোই 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে সুবিন্যস্তভাবে গ্রথিত। সূচনা থেকে এ যাবৎকাল পর্যন্ত তালিমগুলো অবিকৃত ও অপরিবর্তিতভাবেই বিদ্যমান থেকেছে এবং সেগুলো অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর 'এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক' গ্রন্থের 'হযরতের কথামৃত' শীর্ষক অনুচ্ছেদে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[২]

এই তালিম নিয়মিত চলতো 'ওয়াছেলে মাইজভাণ্ডারী' মৌলানা সৈয়দ আমিনুল হক (ক.)-এর পরিচালনায় হযরত আকদাসের নির্দেশ ও ইচ্ছাক্রমে। হযরত আকদাস তাঁকে 'আমার আমিন মিঞা' বলে সম্বোধন করতেন এবং বলতেন, "দফতর খানায় আমার আমিন মিয়ার নিকট গিয়া বস"। হযরত আকদাসের হুকুমে তিনি নির্দেশিত ব্যক্তিগণকে তলকীন, তালিম দান করতেন। মাগরিবের নামাযের পর বাদ্য সহযোগে গজল, জিকির, অজদ, হালকার তালিমও দিতেন। অনেককে আরবী শিক্ষাসমেত প্রথাগত শিক্ষাও দিতেন।[৩]

এই লেখক স্বীয় কৈশোরে নিজ গ্রামের (এনায়েতপুর, ধলই ইউনিয়ন, হাটহাজারী থানা, চট্টগ্রাম) প্রবীণ মাইজভাণ্ডারী ভক্ত-অনুসারীদের কাছ থেকেও এই বিবরণ শুনেছেন, যাদের মধ্যে রয়েছেন ধলই গ্রামের মশহুর মাইজভাণ্ডারী আশেক, দীর্ঘজীবী গুরা মিঞা চৌধুরী (মরহুম)।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে; এই তালিম, জিকির, আজকার-আচরণ বিধি প্রবর্তন, খলিফাদের প্রতি বিভিন্ন নসিহত ও আমলের নির্দেশনামা প্রভৃতি কার্যতঃ এই ত্বরিকার সরাসরি তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক রূপই ধারণ করে। মহান কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া প্রভৃতি মশহুর ত্বরিকার শিক্ষা, দর্শন, মর্ম, পদ্ধতি সংশ্লেষণ করে হযরত আকদাস (ক.)-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই কার্যতঃ এই ত্বরিকার কাঠামো ও অবয়ব নির্মিত হয়। পরবর্তীতে কালিক চাহিদা পূরণের তাগিদে উন্নততর বিকাশ ঘটতে থাকে, যা এখনো অব্যাহত। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা/বেলায়ত কার্যতঃ হযরত আকদাসের নিজ ধ্যান, সাধনা-পদ্ধতি এবং তাঁর স্বহস্তে রোপিত, রচিত, পরিচর্যিত এক মহান 'আধ্যাত্মিক বৃক্ষ' বটে। অছিয়ে গাউসুল আযম এই ত্বরিকা/বেলায়তের তালিম ও অনুশীলনের সার্থক সূত্রাবদ্ধকারী লিপিকার।

৬. হযরত আকদাস একাধারে আউলিয়া ও দার্শনিক:

এখানে 'দার্শনিক' শব্দের প্রয়োগ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরকার। অন্তর্গত তাগিদে যথার্থ জ্ঞানের অন্বেষকই দার্শনিক। কি ছিল, কি আছে, কি হবে বা হওয়া উচিত–এসব নিয়ে প্রণালীবদ্ধভাবে চিন্তা-ভাবনা-কল্পনার যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে উত্তর খোঁজাই তাঁদের নেশা। তাঁদের উপরোক্ত 'কি'-গুলো আবার প্রকৃতি, সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, লৌকিক-অলৌকিক সর্বক্ষেত্রে বিচরণশীল। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবে একজন দার্শনিক বিরাজ করে। মানুষ জন্মগতভাবেই 'সু' এবং 'কু', 'ভালো' এবং 'মন্দ', 'ঔচিত্য' এবং 'অনৌচিত্য' সম্পর্কে একটা ধারণা নিয়ে জন্মায়; ক্ষেত্রবিশেষে যেগুলোর প্রাবল্য তার কর্ম ও চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত করে[৪]। 'ধর্ম' হিসেবে বিবেচিত বিষয়টা 'কু'-কে নিয়ন্ত্রিত বা দমন

করে, 'সু'-কে লালন ও পরিচর্যা করে। দার্শনিকদের সাধনার এই ধারা অব্যাহতভাবে চলমান, যেমন অব্যাহত বিজ্ঞানীদের গবেষণার ধারা।

হাজার বছর ধরে শাণিত যুক্তি-তর্কের অপারেশন থিয়েটারে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর নবী-রসূলগণকে দার্শনিকের মর্যাদা দেন প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের জ্ঞানের করিডোর বিজ্ঞানী-দার্শনিক ইবনে সিনা (৯৮০-১০৩৭ খ্রি.)। যুগপৎ মুসলিম ও খ্রিস্টান জগতের ধর্মীয় পণ্ডিত ও দার্শনিকরা মানুষের বোধাতীত সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে নৈর্ব্যক্তিক যুক্তি-তর্কের জালে আটকে পড়ে মানুষের জীবন-জীবিকার সমস্যাগুলোকে আলোচ্যসূচী থেকে প্রায় বাদ দিতে বসেছিলেন; সে সময়ে তিনি 'দর্শন ও বিজ্ঞানের সত্য' এবং 'ধর্মীয় বিশ্বাসের সত্য' তত্ত্বের পত্তন করেন, যাতে বলা হয় যে, ধর্মের (বিশেষ করে ইসলাম) এবং দর্শনের মৌলিক সত্যগুলো অভিন্ন। ধর্ম (মৌলিক, তাত্ত্বিক, ব্যবহারিক) কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক বৃত্তের মধ্যে সীমিত নয়, সর্বজনীন এবং তাই অপরিহার্যভাবে সর্বস্তরের গণমানুষের বুদ্ধিমত্তার পর্যায়ে বিস্তৃত হয়। কাজেই 'ধর্ম হচ্ছে জনগণের জন্য এক ধরনের দর্শন', যা দুর্বোধ্য নৈর্ব্যক্তিক ভাষায় সত্যের প্রকাশ না ঘটিয়ে বরং, সর্বসাধারণের সহজবোধ্য দৃষ্টান্তসমৃদ্ধ উপদেশপূর্ণ হিতকথারূপে বিবৃত হয়। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রে কুরআনের অবস্থান সর্বোচ্চে।

ইবনে সিনার এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে দার্শনিক আবু রুশদের (১১২৬-১১৯৮ খ্রি.) বিখ্যাত, কিন্তু এক শ্রেণীর মুসলিম ও খ্রিস্টান গোঁড়াপন্থীদের দ্বারা তীব্র বিতর্কিত, 'দ্বৈত সত্যের' (ধর্মীয় বিশ্বাসের সত্য এবং দর্শন ও বিজ্ঞানের সত্য) তত্ত্ব এবং এর ধারাবাহিকতায় বিপরীতক্রমে সেইন্ট টমাস এ্যাকুইনাসের (১২২৭-১২৭৪ খ্রি.) 'ধর্ম ও যুক্তির মধ্যে সমন্বয়ী দর্শন' নির্মাণের প্রয়াসের ইতিহাস গড়ে উঠেছে, যা ধর্ম-দর্শন-রাষ্ট্র-যাজক সমাজ-লোক সমাজের প্রগতিশীল বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ গড়ে তুলেছে। অবশ্য কুরআনে বিজ্ঞান, যুক্তি ও ধর্মের মধ্যে কোন বিরোধের অবকাশ রাখা হয়নি অকাট্য যুক্তিসহকারেই। উপরন্তু মহাসৃষ্টির উদ্ভব, বিকাশ, বিবর্তন, গতিশীলতা এবং পরিবর্তনজাত অবিনশ্বরতার এক ধারাবাহিক সহজবোধ্য যুক্তিসিদ্ধ বিবরণ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। দুঃখের বিষয়; ইউরোপ মাত্র দুশো/আড়াইশো বছর আগ পর্যন্ত কুরআনের প্রকৃত শিক্ষা ও বার্তা সম্পর্কে সম্যক অবহিত না থাকায় বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়, যা এখন জ্ঞান-বিজ্ঞান-গবেষণার বিস্তারের ফলে কেটে যাচ্ছে।

অতএব, স্বীকৃত দার্শনিক সূত্রমতেই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)সহ তাঁর পূর্বেকার মহান লোক-শিক্ষক এবং লোক-রক্ষক ওলী-আল্লাহ্দেরকে একাধারে ধর্মগুরু, শিক্ষাগুরু ও দার্শনিক বলে অভিহিত করা যায়, যাদের সাথে সাধারণ জনগণের সার্বক্ষণিক সম্পর্ক বিরাজ করে। রূঢ় বাস্তবে আরো একটা লক্ষ্যণীয় অভিজ্ঞতা এই যে; অসহায়, দুর্গত, বিপন্ন এমনকি সাধারণ নিরাপত্তাকামী মানুষরা

আল্লাহ্‌র মেহেরবাণীর প্রত্যাশায় ছুটে যান মহান অলি-আল্লাহ্‌দের দরবারে; কোন মৃত ক্ষমতাধর রাজা-বাদশা-সম্রাট-প্রেসিডেন্ট-মন্ত্রীর কবরে নয়।

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই মহান শিক্ষক ও দার্শনিকের চিন্তা-চেতনা-কল্যাণ কর্মের বর্ণিল ফুল-ফসলে ভরা বিশাল উদ্যানে বিচরণ ও হিতকরী ফসল আহরণের পদ্ধতিকরণ করেছেন। এই দুরূহ কর্ম সম্পাদন করতে গিয়ে 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলেছেন: "আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ দাদাজান, ওলীকুল শিরোমণি সুফি সম্রাট গাউসুল আযম জনাব শাহ্ সুফি মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)-যাহার মহান জীবনাদর্শ আমাকে 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' লিখারূপ কঠিন কাজে অনুপ্রাণিত করিয়াছে....।" অতএব, স্বতঃসিদ্ধভাবে উপসংহারে আসা যায় যে, এই গ্রন্থে হযরত আকদাসের জীবনাদর্শ বর্ণিত, বিশ্লেষিত, ব্যাখ্যাত হয়েছে এবং এটা মাইজভাণ্ডারী মেথডলজির ভিত্তি হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

এই মাইজভাণ্ডারী দার্শনিক আকরগ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি ১৫টি পরিচ্ছেদে ৭৪টি উপশিরোনামে সংক্ষিপ্ত অথচ সহজবোধ্য (comprehensive) আকারে পরিবেশিত হয়েছে। এতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া, নবুয়ত, রিসালাত, বেলায়ত, হেদায়ত, সুফি সভ্যতা, শরিয়ত-ত্বরিকত-মারিফত-হাকিকত, অধ্যাত্ম সঙ্গীত, নামায-রোজা-হজ-যাকাত, হালাল-হারাম, এমনকি তৌহিদে আদ্বীয়ান, আদলে মোত্‌লক (সর্বজনীন বিচারসাম্য) প্রভৃতি মুসলিম তথা মানবজীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তব ও রূহানী বিষয়াদির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। 'সুফি চেতনা বা কল্যাণ ও পবিত্রতার চেতনা' মানুষের জন্মগত। সামাজিক পরিবেশে এই চেতনার বিকাশের পটভূমির উপরও এই পুস্তকে আলোকপাত করা হয়েছে।

৭. সুফিবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ [হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে হযরত ইবনুল আরাবী (র.): [sufism, mysticism-Hazrat Hasan-al-Basari to Hazrat Ibnul Arabi]:

মুসলিম ইতিহাসে প্রতিষ্ঠানগতভাবে সুফিবাদের সুবিশাল পটভূমিসম্পন্ন বিকাশ ও অন্তর্ভুক্তি ঘটে খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকে নবীজীর (দ.) ওফাতের তিন শতাধিক বছর পর। আব্বাসীয় শাসন আমলে সুফিবাদ একটি তত্ত্ব ও অতীন্দ্রিয় আকর্ষণীয় আচারপদ্ধতিরূপে বিকশিত হতে থাকে (সময়টা অষ্টম শতাব্দীর শেষ দিক থেকে নবম শতাব্দীর প্রথমার্ধ ধরা যেতে পারে)। অবশ্য এর আগে হযরত হাসান বসরী (র.) [মৃত্যু ৭২৮ খ্রি.], হযরত আবু হাসিম মক্কী (র.) (মৃত্যু ৭৭৮ খ্রি.), হযরত জাবীর বিন হায়ান (মৃত্যু ৭০০ খ্রি.), হযরত রাবেয়া বসরী (র.) [মৃত্যু ৭৭৬ খ্রি.] প্রমুখকে প্রাথমিক পর্যায়ের সুফি হিসেবে মান্য করা হয়, যদিও আরবী কিম্বা ফার্সি কোন সাহিত্যেই ঐ সময়ে 'সুফি' শব্দটি ব্যবহৃত হয়নি। হযরত জুননুন মিসরী (র.) [মৃত্যু

৮৬০ খ্রি.), হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) [মৃত্যু ৮৭৪ খ্রি.], হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) [মৃত্যু ৯২২ খ্রি.) প্রমুখের সময়ে সুফিবাদের বিবর্তনের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়। হযরত জুননুন মিসরীর (র.) মতবাদকে লিপিবদ্ধ, বিন্যস্ত ও সুসংহত করেন হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) [মৃত্যু ৯১০ খ্রি.)।

হযরত জুননুন মিসরী (র.) সর্বখোদাবাদী বা panentheist ছিলেন না। এই সুফি-দার্শনিক 'হাল'-কে খোদা সম্পর্কিত জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় বলে উল্লেখ করেন এবং 'হাল ও মকাম' বা 'তন্ময়তা ও স্তর' সম্পর্কীয় মতবাদ প্রচার করেন। হযরত বায়েজিদ (র.) এবং হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) সুফি ধারণাকে সর্বখোদাবাদের দিকে (panentheism) নিয়ে যান, যা হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) [মৃত্যু ১২৪০ খ্রি.] হাতে প্রণালীবদ্ধ মতবাদ হিসেবে গড়ে উঠে। তিনি 'বহু এবং এক'-এর মধ্যে পার্থক্য ও অভিন্নতার সুপ্রাচীন সূত্র ধরে গাণিতিক পদ্ধতিতে 'তৌহিদে আদ্বীয়ান'-তত্ত্বে উপনীত হন, যা বাংলা ভাষায় সহজে এভাবে বলা যায়, "সকল উপাসনাই স্রষ্টার উপর বিশ্বাস সম্পর্কীয়। এছাড়া বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে আচারগত পার্থক্য যাই থাকুক না কেন, সবই এক সার্বজনীন ধর্মের অন্তর্ভুক্ত।" সহস্রাধিক বছর ধরে ইউরোপ-এশিয়ার মরমী জগতে প্রবল প্রভাব বিস্তারকারী, প্রায় পাঁচশত পুস্তক প্রণেতা, মহাপণ্ডিত অতীন্দ্রিয়বাদী এই দার্শনিকের মতে "সর্বখোদাবাদ ও একত্ববাদের মধ্যে পার্থক্যটা 'নৈয়ায়িক' বা তার্কিক (logical) সত্য।" তাঁর মতে, "সমগ্র বিশ্বজগৎ একটি সার্বিক আত্মা, যা মানব মনের চেয়ে উন্নত এক ঐক্যের নির্দেশক। কাজেই স্রষ্টা ও সৃষ্টি অভিন্ন। তবে যে পার্থক্য নির্দেশ করা যায়, তা হলো প্রত্যেক বস্তুর বাস্তব অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তা সত্তা (real) নয়। সত্তার বিম্বমাত্র। এক সাধারণ সর্বব্যাপক গুণ সব রূপকে অতিক্রম করছে; সব বৈশিষ্ট্যকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। বহুর দুটো দিক: 'বহু' পরস্পর পৃথক এবং 'এক' থেকেও পৃথক। আবার 'বহু' পরস্পর অভিন্ন এবং 'এক'-এর সঙ্গেও অভিন্ন। প্রথমটা পার্থক্যের দিক, দ্বিতীয়টা অভিন্নতার দিক। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বাস্তব পার্থিব জগতে আন্তর্জাতিকতাবাদী ঐক্যবোধের ধারণাও সঞ্চারিত হতে পারে দার্শনিকভাবে। তবে বিষয়টা যেমন সূক্ষ্ম, তেমন জটিল গাণিতিক রসায়ন ও তার্কিকতামণ্ডিত[৫]। অবশ্য বহির্জগতের বস্তুনিচয়ের সাপেক্ষ অস্তিত্বের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে এ তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গেলে হেত্বাভাষের (fallacy) গোলক ধাঁধাঁয় পড়তে হয়।

'বেলায়তে মোত্লাকায়' অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আদলে-মোত্লক বা সর্বজনীন বিচারসাম্য, সু-শাসন, রবুবিয়াত বা স্রষ্টার পালনবাদী প্রকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। মানব সমাজ গত এক সহস্রাধিক বছর ধরে এক জায়গায় বসে নেই; এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষের চাহিদা, সমস্যা জটিল হচ্ছে ও বাড়ছে। বিশ্ব মানব সমাজ পরস্পর নিকটবর্তী হচ্ছে ব্যবহারিকভাবেও। বিশ্বে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত ও কার্যকর

আছে। কল্যাণকামী চিত্তগুলো দিন দিন সংগঠিত হচ্ছে। তবে কল্যাণময়তার এই মিছিলে আল-কুরআন ও নবীজীর (দ.) শিক্ষা ও যাবতীয় মূলনীতি অপরিবর্তিত থেকেই তুলনামূলকভাবে শ্রেয়তর নিশ্চিত কল্যাণের পথ নির্দেশ করে চলেছে। 'বেলায়তে মোত্লাকা'য় বিংশ শতাব্দী-উত্তর আধুনিক মানব-কল্যাণ চেতনা বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে এবং বাঙালি জাতি, বাংলাদেশী রাষ্ট্রসত্তা, মুসলিম বিশ্ব তথা সমগ্র বিশ্ববাসীকে পারস্পরিক ভারসাম্যমূলক কল্যাণের পথে আহ্বান করছে, যা আল-কুরআন ও নবীজীর (দ.) শিক্ষা ও চেতনার মর্মবাণী।

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই অতি সাধনা-সাপেক্ষ মূল্যবান গ্রন্থটা রচনার সময় একথা সচেতনভাবে মনে রেখেছেন যে, তিনি বিংশ শতাব্দীরই একজন নাগরিক। বর্তমানকেই ধারণ ও প্রক্ষেপণ করতে হবে তাঁকে। অতীত থেকে তিনি বিদ্যা আহরণ করবেন, কিন্তু অতীতের বৃত্তে আবদ্ধ থাকতে পারেন না। তাঁর পদ-বিক্ষেপ ও দৃষ্টি অনাগত আলোকিত সম্মুখের দিকে এবং তিনি নিঃসঙ্কোচে এগিয়েছেন তাঁর মহান শিক্ষক ও দিশারী দাদাজানের হাত ধরে। এই আলোয় চলার জন্য ডাক দেন সবাইকে।

টীকা: তথ্যসূত্র

১. খাদেমুল ফোক্বারা মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী : বেলায়তে মোত্লাকা, প্রথম অধ্যায়ের 'বেলায়ত' অনুচ্ছেদ,

২. এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক : সম্পাদিত সংস্করণ ২০১৭ইং, পৃ: ১৪,

৩. ইবিড পৃ: ১৫,

৪. এ প্রসঙ্গে 'সূরা শামস'-এর ৭-১০ আয়াত প্রণিধানযোগ্য: "শপথ মানুষের এবং যিনি একে সুঠাম করেছেন। পরে একে এর সৎকর্ম ও অসৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন; যে নিজের নফ্সের তাযকিয়া বা পরিশুদ্ধতা ও পবিত্রতা অর্জন করেছে, সে কল্যাণ পাবে, আর যে নিজের সত্তা-নিহিত ভালো প্রবণতাকে নস্যাৎ করেছে, সে চরমভাবে ব্যর্থ হয়ে (৯১:৭-১০)"। বঙ্গানুবাদ, তফসীরে তাবারী, আমপারা; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, জুন, ২০০৮ই।

৫. An In.roduction to Islamic Philosophy: Prof. S. Rahman, 1951; মুসলিম দর্শনের ভূমিকা: প্রফেসর রশীদুল আলম, ২য় সংস্করণ (১৯৭৩)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের পটভূমি বা তাসাওউফের মাইজভাণ্ডারী স্বরূপ

১. ইসলামী জীবন-মুদ্রার দুই পিঠঃ কায়িক-সামাজিক এবং রূহানীঃ

ইসলামের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক আবহে বিকশিত মহান অলি-আল্লাহ্‌রা ইসলাম নামক জীবন-মুদ্রার রূহানী বা আত্মিক পিঠ এবং জিসমানী বা কায়িক তথা সামাজিক পিঠের প্রতীক ও প্রতিনিধি। মানুষকে তাদের ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ সাধনের পথে এগিয়ে দেওয়া তাঁদের ব্রত। তাঁরা জীবনের বাস্তবতা-বিমুখ বৈরাগ্যবাদী নন। তাঁরা সুশৃঙ্খল পরিচ্ছন্ন জীবনবাদী। ইসলামে তাসাওউফ হিসেবে চিহ্নিত যে শাখা আছে, তার উৎস হিসেবেও নবীজী (দ.) বিরাজমান। তা হলো, শুধু মিস্টিসিজমটা জীবনের সব কিছু নয়, বরং তা নবীজীর (দ.) এখনো অবিশ্লেষিত বিশাল বহুমুখী কর্ম-বৈচিত্র্যের একটা খণ্ডিত অংশ। 'আসহাবে সুফফা' বলে যাদের বিবেচনা করা হয়; নিবিড়ভাবে ইতিহাস অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তাঁরা তৎকালীন মদীনা রাষ্ট্রের সংসদ তথা প্রশাসনিক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র মসজিদে নববীতে নবীজীর (দ.) একাডেমিক ও পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বা গণশিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত ছিলেন। অতএব, নবীজী (দ.) তথা ইসলাম পার্থিব-অপার্থিব তা সামগ্রিক মানব জীবন তথা মহাজাগতিক জীবনের প্রিজম। অলি-আল্লাহ্‌রা নবীজীর (দ.) এই মহাজাগতিক জীবনের হলোগ্রাম বা বিম্ব ধারণ করেন। যুগপৎ আত্মিক ও ব্যবহারিক জগতে তাঁদের বিচরণ ও বিস্তার। জার্মানির পল ডিউজেন, স্পেনের স্পিনোজা প্রমুখ মহান দার্শনিকবৃন্দ 'ধর্মকে' বাস্তব জীবন-বিচ্ছিন্ন পরকালীয় কৌটা হিসেবে দেখেছেন। বিখ্যাত গবেষক এ জে আরবেরী, নিকলসন, মার্গারেট স্মিথ প্রমুখ মিস্টিসিজম বা অতীন্দ্রিয়বাদকে একটা বিচ্ছিন্ন ধারা হিসেবে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন। অথচ তাসাওউফ মানুষের স্থূল জৈব বলয়ের বাইরে বিদ্যমান মনোজগতের ক্ষুধা ও রসদের লেনদেনের কারবারও করে, যার ফোকাস আল-কুরআন ও হাদিস শরিফে রয়েছে। 'তাসাওউফ' বলতে যা বুঝায়, তা-ও কুরআন-হাদিসের নিজস্ব মৌলিক সম্পদ। মানব সমাজের সুবিশাল ইতিহাসের কোন কোন ফসলের সাথে তার কিছু কিছু সাজুয্য রয়েছে বটে। কারণ, মানব ও মাখলুখাতের সৃষ্টির উৎস অভিন্ন। শেকড় থেকে বিভিন্ন শিরা-উপশিরার উদ্গম তো ঘটবেই। এটাই মহান রাব্বুল আলামিন তথা প্রকৃতির বাস্তবতা। তবে লক্ষ্যণীয় যে, কুরআনের বীজ ও ফসলের নিজস্ব স্বকীয়তা অবিমিশ্রই

রয়ে গেছে। প্রকৃত প্রস্তাবে মানুষের জীবন হচ্ছে দৃশ্য-অদৃশ্য সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির ঘণ্ট বা ককটেল। ইসলাম এ বাস্তবতারই শিক্ষা দেয়। মিঃ রুবেন লেভী তাঁর 'ইসলামের সামাজিক কাঠামো' গ্রন্থে বলেন, "অধিকতর জ্ঞানালোকপ্রাপ্ত অনেক সুফি দৃঢ়তা সহকারে বলেন যে, প্রকৃত সুফি সাধক তাঁর নিজের লোকদের মধ্যেই বসবাস করেন, তাঁদের সাথেই কাজ-কারবার করেন, তাদের সাথেই ঘর-সংসার করেন এবং সামাজিক কাজ-কর্মে অংশ নেন, অথচ এক মুহূর্তও আল্লাহ্‌র স্মরণ বিচ্যুত হন না"[১] (Some of the more enlightened Sufis insisted that the true sain. lives among his fellowmen, trades with them, marries and takes part in social activities without ever forgetting God for a moment.- [বিঃ দ্রঃ মিঃ লেভীর দশ অধ্যায় বিশিষ্ট এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায় 'ইসলামের নৈতিক ভাবধারা' ব্যতীত অপরাপর অধ্যায়গুলো আইনবিদদের অন্তহীন বিতর্কে কন্টকাকীর্ণ ও দৃশ্যমানভাবে বিভ্রান্তিকর বিধায় এই পুস্তক অধ্যয়নে সত্যান্বেষী পাঠকদের পর্যাপ্ত সতর্কতা বাঞ্ছনীয়।]

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.), তাঁর পূর্বসূরী হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.), হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলা (ক.) সবাই মানব জীবনের রূহানী ও ব্যবহারিক উভয় দিক অর্থাৎ ইসলামী জীবন-মুদ্রার উভয় পিঠের প্রতি শাশ্বত মানবতার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এটা একটা অবিরাম অব্যাহত শিক্ষা-প্রক্রিয়া, যা প্রত্যেক জেনারেশনের জন্য দরকার হয়। মহান ওলী-আল্লাহ্‌রা এই ক্ষেত্রে শিক্ষাদান ও সংস্কারের গুরু দায়িত্ব পালন করেন বিধায় এই বিশাল প্রেক্ষাপটে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের ঝাণ্ডাবরদাররা সমকালের এক একজন মহান শিক্ষক, সমাজ সংস্কারকও বটেন।

২. তাসাওউফের মাইজভাণ্ডারী স্বরূপ নির্ণয়ে খাদেমুল ফোক্বারা হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অবদানঃ

দার্শনিক সক্রেটিসের চিন্তা ও বাণীকে শব্দায়িত করে মানব সমাজ ও সভ্যতার ইতিহাসে একটা নতুন ঋণবন আবাদ করে গেছেন তাঁর শিষ্য দার্শনিক প্লেটো। মুসলিম বিদ্যাবত্তার জগতে সক্রেটিস পরিচিত 'সাক্রাত' এবং প্লেটো পরিচিত 'আফলাতুন' হিসেবে। আবার প্লেটোর ছাত্র দার্শনিক এ্যারিস্টটল পরিচিত 'আরাস্তু' হিসেবে। এই তিনজনের ধারাবাহিকতায় মানব-সমাজ-রাষ্ট্র-জীবন-শিক্ষা-ধর্ম ব্যবস্থায় যে পরিবর্তন ও অব্যাহত সৃজনশীলতার জোয়ার আসে, তার তরঙ্গ এই একবিংশ শতাব্দীতেও গতিশীল। সক্রেটিস-প্লেটো-এ্যারিস্টটলের চিন্তা-লতিকার আলোকে আমরা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের উদ্ভবকাল থেকে এযাবৎ বহমান বিকাশধারা

অবলোকন করলে দেখতে পাই যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.), কুতুবুল আকতাব হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বাণী, আচরণ, রূহানী-জিসমানী অর্থাৎ আধ্যাত্মিক-জাগতিক বিষয়ে প্রকাশ্য কিম্বা ইঙ্গিতমূলক নির্দেশনাগুলোকে সহজ-সরল বাংলা ভাষায় বিন্যস্ত করেছেন অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী তাঁর 'বেলায়তে মোত্লাকা'-গ্রন্থে; যেমন সক্রেটিসকে ধারণ করেছেন প্লেটো তাঁর 'ডায়ালগ' গ্রন্থে। তবে এই দু'জনের মধ্যে অন্যতম মৌলিক পার্থক্য হল: প্লেটো ছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব চার শতকে তৎকালীন গ্রীসের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় অভিজাত শাসক শ্রেণীর লোক, যে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ভিত্তি ছিল দাস প্রথা এবং অন্যান্য নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী মানুষের শোষণ। আর হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) হলেন প্লাটোর প্রায় ২৩ শত বছর পর বিংশ শতাব্দীর আটপৌরে বাঙালি মুসলিম ঘরানার মানুষ, যিনি শৈশবে পিতৃহীন হয়ে মহান অধ্যাত্ম পুরুষ পিতামহের তত্ত্বাবধানে প্রতিপালিত ও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর সময়কালের পৃথিবী একদিকে যেমন যন্ত্র-বিজ্ঞানে উন্নত, তেমনি অন্যদিকে উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-গণতান্ত্রিক প্রভৃতি বিপ্লবী-প্রতিবিপ্লবী চিন্তা-কর্ম-আদর্শ ও সংগঠনের দ্বন্দ্ব-জর্জরিত। তিনি ছিলেন মানুষের সামগ্রিক মুক্তিবাদী গণতান্ত্রিক চেতনামণ্ডিত সর্বজনীন পালনবাদী (রবুবিয়াত) সমাজ-নির্মাণ প্রয়াসী ঘরানার বাস্তববাদী মানুষ। কবরস্থ দাসপ্রথার প্রেতাত্মাও তাঁর ধারণার ধারে-কাছে ঘেঁষেনি। তিনি ইসলামের সামগ্রিক ঐতিহ্যের ধারায় স্নাত মানুষ, যাঁর মধ্যে ইসলামের সামাজিক-রাষ্ট্রিক-অর্থনৈতিক-মারিফাত-তাসাওউফ চিন্তার যুগোপযোগী সমন্বয় ঘটেছে। তাঁর 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থ হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে শুরু হয়ে বিংশ শতাব্দীতে সাত্ত্বিক-মানবিক শিক্ষার ধারাবাহিকতার বরেণ্য উত্তরাধিকার হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) স্বজ্ঞা সঞ্জাত (কাশ্ফ) চিন্তা-চেতনার ভাষ্য এবং আল কুরআনের আলোকে নবীজীর (দ.) কাঙ্ক্ষিত পালনবাদী বা রবুবিয়াতবাদী সমাজ বিনির্মাণে মাইজভাণ্ডারী অনুসারীদের জন্য দিক-নির্দেশনা। তাঁর 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে মাওলানা রুমী সমেত বিভিন্ন মহান অধ্যাত্ম সাধকের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি যে বিষয়টার প্রতি অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন, তা হলো মসনবীর ভাষায়: খোদাকে ঋণলে যাবার নামই দুনিয়া। সংসার-সামগ্রী-টাকা পয়সা ও স্ত্রী, পুত্র, দুনিয়া নহে (হাস্তে দুনিয়া আজ খোদা বুদন্.....)। বলা বাহুল্য, আল-কুরআনের সূত্র ধরেই মওলানা রুমী এই সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন যাতে বৈরাগ্যবাদ নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে নবীজীর (দ.) হাদিস স্মতর্ব্য: "আমার উম্মতদের জন্য সেই অবসর গ্রহণই শোভনীয়, যাতে তারা সংসারে বাস করেও মসজিদের কোণায় ইবাদতের আশায় বসবে"। অনেকে বিভ্রান্তিবশতঃ তাসাওউফ আর বৈরাগ্যবাদকে গুলিয়ে

ফেলেন। শরিয়তের মতো তাসাওউফের উৎসও যদি নবীজী (দ.) হয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চিত্রই এ ক্ষেত্রে বিতর্কাতীত দিক-নির্দেশনা। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, যা 'তাসাওউফের মাইজভাণ্ডারী স্বরূপ' তথা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের স্বরূপ নির্ণয়ের যুগপৎ ভিত্তি ও উপকরণ।

৩. নবীজীর (দ.) জীবন-সাধনার রেখাচিত্র এবং পরবর্তী স্তরসমূহ:

নবীজীকে (দ.) জানতে ও বুঝতে হলে কুরআন ও তাঁর হাদিসের মর্মবাণীর আলোকেই অবলোকন করতে হবে। তাঁর একটি বিখ্যাত হাদিস: "জীবন সংগ্রাম আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ্ যা বিধান করেছেন, শুধু কঠোর চেষ্টা দ্বারাই তা লাভ করা যায়। ইহজীবন যেন কর্ষিত জমি মাত্র, পরজীবনে ফসল লাভের জন্য। এখানে সুকর্ম কর, তবে সেখানে ফল পাবে।" নবী-জীবনকে লক্ষ কোটি এ্যাঙ্গল থেকে শিক্ষণীয়ভাবে অবলোকন করা যায় এবং কাল-পরিক্রমার সাথে সঙ্গতি রেখে বিশ্ব মানবতার মেধাবী সৃজনশীল অংশ তাঁর জীবনের বস্তুনিষ্ঠ মূল্যায়নের মাধ্যমে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইতিবাচক অবদান রেখে চলেছেন।

আল-কুরআনের মর্মমতে আল্লাহ্ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন কর্মমুখী করে। পৃথিবীকে তৈরি করা হয়েছে মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের জন্য এবং আল-কুরআন পৃথিবীতে প্রেরিত মানুষের জন্য হেদায়েতের রূপরেখা, যা প্রথম সূরা আল-ফাতিহার ৫নং আয়াতে মানুষের প্রার্থনারূপে বিবৃত হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষের করণীয় কাজগুলোর নমুনা প্রত্যেক নবীর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং 'মোহাম্মদী জীবন' এসব কর্মের নিখুঁত সঞ্চয়িতা। পিতৃহারা এতিম হিসেবে জন্মগ্রহণকারী নবীজী হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর পৃথিবীতে বিচরণ শুরু আধুনিক পরিভাষায় 'সর্বহারারূপে' এবং ইন্‌তিকালের সময়েও তাঁকে পৃথিবী দেখেছে সম্পূর্ণ অবৈষয়িক হিসেবে। তাঁর পুরো জীবনটাই সৃজনশীল সফল সংগ্রামের ইতিবৃত্ত ও দিনলিপি। জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার কায়িক ও মানসিক শ্রমের অভিজ্ঞতায় তিনি পুষ্ট। জীবিকা অর্জনের সংগ্রামের আগুনে পোড়ানো তাঁর শরীর-মন ও জীবন। তাঁর একটি হাদিস: "কোন ভয় করোনা। আমি বাদশাহ্ নই। আমি কুরায়েশের এক গরীব মহিলার পুত্র, যে মহিলা শুষ্ক গোশ্‌ত ভক্ষণ করতেন (আরবের গরীবরা অভাবের তাড়নায় শুকনা গোশ্‌ত খেতে বাধ্য হতো–বুখারী)।" সামাজিক অস্থিরতা-চাঞ্চল্য-সংঘাত নিরসনে 'হিল্‌ফুল ফুজুলের' সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা এবং একই সাথে অনন্ত অসীম মহাবিশ্ব-প্রকৃতির সাথে উন্নত আত্মিক সংযোগের সাধনা তাঁকে অতিমানবিক স্তরে উন্নীত করেছিল বলে বিগত প্রায় দেড় হাজার বছরের বিজ্ঞ-মনীষীরা অকুণ্ঠ চিত্তে স্বীকার করেছেন। মানুষের জীবনে দুটো দিকই প্রধান। একটি মা'আশ (ইহজীবন) এবং

অন্যটি মা'আদ (পরজীবন)। প্রথমটা হচ্ছে মানুষের সাথে মানুষের এবং বিশ্ব জগতের অন্যান্য সৃষ্টির সাথে সম্পর্কিত। আর, দ্বিতীয়টা হচ্ছে মানুষের সাথে তার মহান সৃজন-পালন-বিবর্তনকর্তা 'রব'-এর সম্বন্ধ সম্পর্কিত। প্রথমটির দৃশ্যমান সর্বোচ্চ স্তর ঃ প্রশাসন ক্ষমতার অধিকার লাভ। আর, দ্বিতীয়টির সর্বোচ্চ স্তর বা মর্যাদা হচ্ছে মানব জীবনের সামগ্রিক বিষয়াবলী সম্পর্কে যথার্থ বাস্তবসম্মত, যুক্তিসিদ্ধ দিক-নির্দেশনা প্রদানের গুরুদায়িত্ব লাভ। নবীজী হযরত মুহাম্মদের (দ.) জীবনে এই দুটো প্রান্ত এক বিন্দুতে একাকার হয়ে সৃষ্টি ও জীবনের এক অনুপম বৃত্ত রচনা করেছে। তাইতো তিনি 'সরওয়ারে কায়েনাত', তিনি 'রহমতুল্লিল আলামিন', তিনি 'মুস্তফা-মুজতবা'।

নবুয়তী ধারা বন্ধ হবার পর মা'আশ এবং মা'আদ এর সমন্বিত কার্যক্রম মানব সমাজে প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পাদন করার গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় বেলায়তী মোড়কে; হযরত আলী মর্তুজার (ক.) মাধ্যমে যে অধ্যায়ের সূত্রপাত ঘটে। বেলায়তের এই ধারা হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) হাত দিয়ে সমকালীন লোক চেতনা ও সমাজ চেতনার সাথে সঙ্গতি রেখে বিকশিত হতে থাকে, যা 'বেলায়তে মোকাইইয়াদা' নামে অভিহিত। এ পর্যায়কে শরিয়ত তথা ব্যবহারিক পন্থায় ইসলামী ধারার mysticism বা অতীন্দ্রিয়বাদের সাংগঠনিক পর্যায় বলা হয়। এই পর্যায়ের সাধকগণকে অতি শুদ্ধাচারী, ধর্মাচারের আনুষ্ঠানিকতার বিশ্বস্ত অনুসারী, সংযমপন্থী হিসেবে দেখা যায়। এটাকে 'ইনকিশাফী' অর্থাৎ কঠোর পদ্ধতিপন্থী বলা হয়। এই পর্যায়ে কঠোর সংযমপন্থীগণ একাধারে ভক্তি, বুদ্ধিবৃত্তি ও মানসিক প্রশান্তির অনুসারী ছিলেন। হযরত আলী হাজবিরী দাতা গঞ্জে বখ্শ (র.), হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা মঈন উদ্দিন চিশ্তী (র.) প্রমুখকে এই প্রাথমিক পর্যায়ের দিশারী হিসেবে গণ্য করা হয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সমাজে চেতনায় ও সম্পর্কে যে বিবর্তন আসে, তার সাথে সাথে অতীন্দ্রিয়বাদী বহিঃপ্রকাশেও পরিবর্তন ঘটে। এই পর্যায়ে আবির্ভাব ঘটে হযরত ইবনুল আরাবী (র.), মৌলানা জালাল উদ্দিন রুমী (র.) প্রমুখের এবং এটাকে ইসতিদলালী অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক অতীন্দ্রিয়বাদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। তাঁদের প্রদর্শিত দিশা ও শিক্ষা এখনো সক্রিয়। এদিকে অবশ্য এই দুইটি স্তরের পূর্বের পটভূমিতে ইসলামী ব্যবহারশাস্ত্রের (jurisprudence) বিকাশের প্রসঙ্গটিও বিবেচনায় আনা হয়। এই ব্যবহারশাস্ত্র বিভিন্ন ফুলে-ফসলে বিকাশ লাভ করে হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (র.), ইমাম হযরত মালিক ইবনে আনাস (র.), ইমাম হযরত মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রিস আল শাফেয়ী (র.) এবং হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র.) এর মাধ্যমে। এই মহান চার ইমামের শিক্ষা-সাধনা কেবল ইসলামী ব্যবহারশাস্ত্র নয়, কুরআন-হাদিসের মর্মবাণী অনুসারে বিশ্ব-মানবিক ব্যবহারশাস্ত্রের বিকাশেও কালোত্তীর্ণ প্রভাব রেখেছে।

তাঁরা সমকালীন শাসকবর্গের হাতে নিগৃহীত হন। ইমাম আবু হানিফা (র.) এর ইসতিহসান নীতি, হযরত ইমাম মালিকের (র.) মাসলাহাত বা জনহিতকর নীতি মানব সমাজের কল্যাণমুখী আদর্শ-নীতির সড়ক নির্মাণে ও সংস্কারে এখনো যুক্তিসিদ্ধ অবদান রেখে চলেছে।

খোলাফায়ে রাশেদার পর তৎকালীন রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বজাত অস্থিরতা ও সংঘাতের আবর্তে মাসলাহাত বা জনহিতকর নীতি উপেক্ষিত হতে থাকে। বায়ুলমাল পরিণত হয় শাসকবর্গের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পত্তিতে। ইসলামের মৌলিক ধর্মীয় আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক দর্শন এবং চিন্তা-চেতনা বিক্ষত হতে থাকে। এমনকি বাগদাদের আব্বাসীয় সুলতানরা পবিত্র কলেমা তৈয়বার নয়া এক আরবী ভার্সান বা পাঠ তৈরী করেছিলেন : "লা-মাবুদা ইল্লাল্লাহ্ মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্!!"[২] এই অবস্থায় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে নৈতিক শৃঙ্খলা, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহ্র সান্নিধ্য কামনায় একটি চিন্তাশীল গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে। ইতিহাসে তাঁরা সত্যের পায়রবীকারী বা আহল-আল-হক নামে অভিহিত এবং তাঁদেরকে কেন্দ্র করে তাসাওউফ নামে ইসলামের মরমীবাদী বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব ঘটে। নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে 'সুফি' শব্দটি একটি দরবেশ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং প্রখ্যাত চিকিৎসক জাবির ইবনে হায়য়ান 'সুফি' উপাধিতে আখ্যায়িত হন। কালক্রমে এটা একটা অরাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে বিকাশ লাভ করতে থাকে; যা গোঁড়া রক্ষণশীলতা, অন্ধ আচার-ধর্ম ও শাসকবর্গের ইসলামী মূলনীতি বিরোধী কার্যকলাপ, এক শ্রেণীর মুসলিমের বিলাস-বৈভবজনিত ভোগমুখিতার প্রতিবাদ হিসেবে সমকালে প্রতিভাত হতে থাকে। দার্শনিক সুসতারী সুফিবাদের সংজ্ঞা নির্ণয় করেছেন এভাবে: "সুফি দর্শন অনুযায়ী বাস্তবতা হচ্ছে সার্বজনীন ইচ্ছা, প্রকৃত জ্ঞান, চিরন্তন জ্যোতি এবং সর্বোত্তম সৌন্দর্য। এর 'ধর্ম' হচ্ছে সার্বজনীন দর্পণে প্রতিফলিত আত্মপ্রকাশ"। ইসলামী মরমীবাদের প্রধান প্রবক্তা হিসেবে হযরত আবু সুলাইমান আদ দারমীকে (র.) চিহ্নিত করা হলেও এর 'প্রতিষ্ঠাতা' হিসেবে স্বীকৃত হযরত মারুফ-আল-কারখী (র.)। সুফিবাদের বিকাশের ধারায় দেখা যায় যে, প্রথম পর্যায়ের সুফি সাধকগণ ছিলেন কঠোরভাবে সংযমী, সংসারত্যাগী এবং মানসিক প্রশান্তির অধিকারী। এই তালিকায় রয়েছেন হযরত আম্মার, হযরত আবু জর গিফারী, হযরত জাবির ইবনে হায়য়ান, হযরত হাসান আল বসরী, হযরত রাবেয়া বসরী এবং হযরত ইব্রাহীম ইবনে আদহাম। শেষোক্তজন 'জুহদ' বা প্রশান্তিময় সন্ন্যাসব্রতের প্রয়োগকারী। তবে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সুফি অভিধায় পরিচিহ্নিত ব্যক্তিবর্গ, প্রতিভাবান, সৎ এবং অন্যায়কারীর সম্মুখে সভ্যভাষণে নির্ভিক ছিলেন বিধায় সমকালীন শাসকদের সাথে তাঁদের দ্বন্দ্ব লেগেই থাকতো এবং তাঁরা নিগৃহীত হতেন। অনেকের জীবনপাত

হয়েছে। এ ধরণের দ্বন্দ্বে বৈষয়িক লোভে-লাভে ক্ষমতাসীনদের সমর্থক 'দরবারী আলেমগোষ্ঠীর' আবির্ভাব ঘটে এবং ধর্মাচার-দর্শন বিতর্কের আবরণে মূলতঃ শাসন ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ লাভের অঘোষিত সংঘাত চলতে থাকে। অরাজনৈতিক গোষ্ঠীটাই সুফি জুব্বা ধারণ করে প্রকারান্তরে ইসলামের মৌলিক সামাজিক-আধ্যাত্মিক শিক্ষার চেরাগ জ্বালিয়ে রাখতে সচেষ্ট থাকেন। বিংশ/একবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য সমাজতাত্ত্বিক-দার্শনিকরাও তাঁদের সমীক্ষণবাদী মূল্যায়নে এই অভিমত প্রকাশ করেছেন।

প্রণিধানযোগ্য যে, সুফি চেতনা ইসলামে বিশেষ কোন সংজ্ঞায়ক শব্দের মধ্যে আবদ্ধ নয়। বিভিন্ন সময়ে সমকালীন চেতনার সাথে সঙ্গতি রেখে 'মাসলাহাত' বা জনহিতকর নীতি অনুসরণকারীরা সমূহ প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করে ইসলামের মূলনীতি সমুন্নত রেখেছেন। তাঁরা ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন ত্বরিকার প্রতিষ্ঠাতা, মুজাদ্দিদ, গাউস, দার্শনিক [যেমন, হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.)] হিসেবে ইতিহাস আলোকিত করে আছেন। কেউ উপেক্ষণীয় নন। তাঁরা নিজ নিজ সময়ে কর্তব্য-করণীয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। এছাড়া কামেল-ওলী-দরবেশদের অবস্থান ও ভূমিকা কোন মানবিক সংজ্ঞায় আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তাঁদের পদচারণা প্রচলিত 'সুফি-সীমানাতীত'।

ইতোমধ্যে আমরা দেখেছি যে, সুফিবাদের ক্রমবিকাশে প্রধান দুটো পর্যায়ের অস্তিত্ব রয়েছে, যথা (১) ইনকিশাফী বা কঠোর পদ্ধতিপন্থী, (২) ইসতিদলালী বা বুদ্ধিবৃত্তিক। হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.), হযরত জালাল উদ্দিন রুমী (র.) ইসতিদলালী বা বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার পথিকৃত হিসেবে বরিত। ইতিহাস এবং তথ্য-উপাত্ত থেকে এই সাক্ষ্য মিলছে যে, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা একাধারে 'মাসলাহাত বা জনহিতকর' নীতি এবং 'ইসতিদলালী' বা বুদ্ধিবৃত্তিক নীতিকে আত্মস্থ ও সমন্বিত করে বিকশিত হয়ে চলেছে, যার তাত্ত্বিক ও ফলিত নিদর্শন হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে বিধৃত রয়েছে।

৪. তাসাওউফের মাইজভাণ্ডারী স্বরূপ বা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের স্বরূপঃ

তাসাওউফের মাইজভাণ্ডারী স্বরূপ প্রত্যক্ষরূপে উপস্থাপিত হয়েছে 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে যাতে দেখা যায় যে, এর শেকড় আল্লাহু রাব্বুল আলামীনের তৌহিদ এবং এর 'প্রতিফলন আয়না' নবীজীর (দ.) জীবন-সাধনার গভীরে প্রোথিত অর্থাৎ নবীজীর (দ.) যুগপৎ জাহেরী ও বাতেনী সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) শরিয়ত-মারিফাত উভয় ফল-ফুলের বৃক্ষরোপণের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। কুতুবুল আকতাব হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন এবং কর্ম-কৃতিতে প্রধানতঃ নির্মল বাতেনী দিকটাই প্রস্ফুটিত রয়েছে। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবেই হযরত আকদাসের অধ্যাত্ম

'বাগানের গোলাপ ফুল'। তাঁর শৈশব, শিক্ষা-জীবন, অধ্যাত্ম সাধনা, বাকাবিল্লাহ্ স্তরে তাঁর স্বীকৃত ও অনুভবযোগ্য কামালিয়াত তারই সাক্ষ্য বহন করে, যা মাইজভাণ্ডারী ঘরানায় বেমিছাল। হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন-কর্মে প্রচ্ছন্ন বাতেনী পটভূমিকায় প্রধানতঃ জাহেরী দিক বিকশিত। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মধ্যে যথার্থ প্রেক্ষাপটে বাতেনী-জাহেরী উভয় দিকের বিচ্ছুরণ ঘটেছে।

নবীজীর (দ.) অন্তহীন আলোকিত বৈশিষ্ট্যের মাত্র একটির উপর আলোকপাত করার চেষ্টা করা হয়েছে এ অধ্যায়ের ৩নং অংশে। তাঁর কয়েকটা মুখ্য জাহেরী বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে মা খাদিজার (র.) মুখে, প্রথমবারের মতো ওহী নাজিল হবার অব্যবহিত পর, এভাবে : (১) আপনি আত্মীয়ের হক আদায়কারী, (২) আপনি সদা সত্যবাদী, (৩) আপনি পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসী আমানতদার, (৪) আপনি অনাথ, অক্ষম, এতিম, বিধবা, অন্ধ, খঞ্জের বোঝা বহন করে থাকেন, [অর্থাৎ উপার্জনে অক্ষমদের রুজি-খাওয়া-পরা ও থাকার ব্যবস্থা করে থাকেন], (৫) আপনি বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে সহায়তা করেন, (৬) আপনি যাবতীয় প্রাকৃতিক দুর্যোগ-দুর্ঘটনা ক্ষেত্রে দুঃস্থ জনগণের সাহায্যকল্পে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করতে কুণ্ঠিত হননা[৩]। নবুয়তী জীবনের সূচনালগ্নেই এভাবে একই সাথে নবীজীর (দ.) বাতেনী ও জাহেরী দায়বদ্ধতার সার্থক পূর্ণাঙ্গ চিত্র অঙ্কিত রয়েছে ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। কুরআনে মানুষের দেহ ও ক্বলবে 'সৃষ্টির দৃশ্যমান ও দৃশ্যাতীত প্রবাহের মিলন-বিন্দু' সম্বলিত বৃত্ত চিত্রিত হয়েছে।

তাসাওউফের মাইজভাণ্ডারী ডায়াগ্রাম বা রেখাচিত্র অংকন করতে গিয়ে 'বেলায়তে মোত্লাকা'য় কুরআনের এই নির্দেশনাকেই অবলম্বন করা হয়েছে। 'বেলায়তে মোকাইইয়াদা' অর্থাৎ ইনকিশাফী পর্যায়ের পরবর্তী স্তরে হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.) এবং মৌলানা রুমী (র.) প্রমুখ মনীষীগণ সময়ের চাহিদা পূরণে যে ইসতিদলালী অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিক ধারার সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন, তা বিংশ শতাব্দীতে বেলায়তে মোত্লাকা নামে অভিহিত হয়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অন্যতম তাত্ত্বিক ভূমি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। বলা যায়, মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার 'বেলায়তে মোত্লাকা' হযরত ইবনুল আরবী (র.), মৌলানা রুমী (র.) প্রমুখদের ইসতিদলালী চিন্তা ও সমাজবোধের আধুনিক সম্প্রসারণ ও সংস্করণ। পরাবাস্তবতা এবং বাস্তবতা, ইসতিহসান ও মাসলাহাত তথা জীবনের জাহের-বাতেনের ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয় ঘটেছে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায়।

'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে এই জগতের বিভিন্ন স্তর ও বিকাশের পর্যায় অত্যন্ত সুচিন্তিত-সুপরিকল্পিত অথচ যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত আকারে বিন্যস্ত হয়েছে। বাতেনী ও

জাহেরী উভয় ক্ষেত্রের পরিচিতি এবং শেষোক্ত বিষয়ে হাল-জামানায় করণীয় বিষয়ের উপর সুস্পষ্টভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। এই পুস্তকে গ্রন্থকার নিজের কোন মতামত বা সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেননি, বরং ইসলামের জাহেরী-বাতেনী উভয় দিকের শীর্ষস্থানীয় মনীষীদের বক্তব্যকে সুবিন্যস্তভাবে পেশ করেছেন, যা উপসংহারে এসে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের রেখাচিত্র হিসেবে ফুটে উঠেছে। এই ত্বরিকা রূহানী উন্নয়নের পাশাপাশি মানুষের ব্যবহারিক জীবনের কল্যাণকে সমান গুরুত্ব সহকারে স্থান দিয়েছে। বেলায়তে মোত্লাকা'র বিশ্লেষণে বলা হয় যে, 'ন্যায়-নীতি, সাম্য, দয়াগুণ এই তিনটিকে ইসলাম মূলতঃ প্রাধান্য দান করিয়াছে'।[৪] আরো বলা হয়েছে, "এই বেলায়তে মোত্লাকার দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্ব মানবতার জন্য স্রষ্টা অনুমোদিত শান্তিধারা। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ধন-সঞ্চয় ও বণ্টনে বা ধর্মকে চতুর জনের ব্যবসা রূপ দেবার ফলে যাহারা ধর্ম বিমুখ বা নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, তাহাদের জন্য ইহা একটি উত্তেজনাবিহীন পন্থা এবং এই 'বেলায়তে মোত্লাকা' বিশ্ব মানবতার কল্যাণধর্ম দিশারী। ইহা ধনতন্ত্র ও নাস্তিকতাবাদের মূল উৎপাটনকারী, ধনসাম্যে উৎসাহী, বিশ্বশান্তির প্রতীক"।[৫] এ ধরনের আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ উক্তির মধ্যে তাসাওউফের মাইজভাণ্ডারী স্বরূপ তথা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে, যা মানব কল্যাণমুখী এবং অব্যাহতভাবে প্রগতিশীল চেতনার দ্যোতক। এখানে নাস্তিক্যবাদ, বস্তুবাদ সম্পর্কে একটা আধুনিক পর্যবেক্ষণ উদ্ধৃত করা প্রয়োজন: 'সকল বস্তুবাদী তত্ত্ব' তত্ত্বগতভাবেই অসম্পূর্ণ।[৬]

'বেলায়তে মোত্লাকা' বা মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত যদৃচ্ছা বিচরণকারী 'বন্ধনবিহীন কোন উটের মতো' তত্ত্ব নয়। এর শেকড় বিশ্ব মানবিক ঐক্যের ভিত্তি 'তৌহিদ'-এর গভীরে প্রোথিত, যা লতিয়ে উঠেছে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (দ.) এর জীবন-সংগ্রাম ও সাধনাকে অবলম্বন করেই। এ গ্রন্থে বলা হচ্ছে, "তৌহিদ, দ্বৈতভাব পরিহারকারী বিধায়, বিশ্ববাসীকে একই চারিত্রিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে সমাবেশ করিতে ক্ষমতাসম্পন্ন। ইহা এই মৌলিক ত্বরিকত পন্থাতেই সম্ভব। যাহা খাতেমুল বেলায়ত মওলানা সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) মালামিয়া কাদেরীয়ার মসরবে পাওয়া যায়। তাঁহার এই অপূর্ব নির্বিলাস সুফি সভ্যতা বিশ্ববাসীর জন্য সুরক্ষিত।... যে কোন সম্প্রদায় হোক না কেন, এই মোকামের লোক নিজ ধর্ম আচরণে নিষ্ঠাবান থাকা দরকার। ইসলাম বিধান ধর্মের শেষ সংস্কার এবং কুরআন পাক চির অবিকৃত ও রক্ষিত থাকায় ঋণল-ভ্রান্তি মুক্ত। কুরআন সর্বযুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্ম ব্যবস্থা দিতে সমর্থ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্বমানবতার প্রতীক"।[৭] এ প্রসঙ্গে হযরত ইমাম গাজ্জালীর (র.) এহ্য়াউল উলুম এবং হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) তফসীর থেকে উদ্ধৃতিসহকারে এই পুস্তকে নবীজীর (দ.) হাদিস শরিফ

বর্ণিত হয়েছে: "আমি নিশ্চয়ই মানব জাতিকে চারিত্রিক মানের উচ্চ সোপানে আরোহণ করাবার জন্য প্রেরিত হয়েছি"।[৮] অতএব, দেখা যাচ্ছে যে, বেলায়তে মোত্লাকার চেতনা ও ধারণার মধ্যে রুহানী তরক্কির পাশাপাশি পরম মানবিক বিকাশ ও বিশ্ব মানবিক সমন্বিত কল্যাণ চেতনাই অগ্রণী।

৫. মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত বা বেলায়তে মোত্লাকার সার্বজনীন প্রয়োগযোগ্যতা:

হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.), হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.), মৌলানা রুমী (র.) প্রমুখ মনীষীর চিন্তা ও লেখনীর মধ্যে সমাজবদ্ধ জীব মানুষের 'ইসতিহসান ও মাসলাহাত' অর্থাৎ রুহানী ও দুনিয়াবী হিতকরী যে সুফি দর্শন বা আদর্শের বীজ রোপিত হয়েছিল, পরবর্তী কয়েক শতাব্দীতে তার কাঙ্ক্ষিত বিকাশ না ঘটলেও অবলুপ্তি ঘটেনি। বরং পুষ্পিত বনসাইয়ের মতো বহু পবিত্র উর্বর হৃদয়ের চিন্তার মধ্যে সুরক্ষিত ও জীবিত থেকেছে। হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বেলায়তে মোত্লাকারূপী মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের মর্মবাণীর বৃক্ষ শাখাকে তাঁদের বৃক্ষের সাথে সংযুক্ত করে দিয়ে বিংশ শতাব্দীর পরিবেশে নতুন ফসল উৎপাদনের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর বিশ্লেষণ মতে, বেলায়তে মোত্লাকা মুক্ত বা সর্বজনীন বেলায়ত, যা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে তৌহিদ, ঐতিহাসিক মদীনা সনদের মর্মবাণী তথা 'সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্বমানবতার প্রতীক' হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার (দ.) সাথে সম্পর্কিত। বলা যায়, তিনি সুফিবাদের মধ্যে গিঁট বেঁধে থাকা অবাঞ্ছিত স্থবিরতা অপসারণ করে সৃজনশীলভাবে গতিশীল করে তোলার মহান উদ্যোগ নিয়েছিলেন, যা সুফিবাদের দীর্ঘ ইতিহাসে এক আলোকময় নতুন অধ্যায়ের সংযোজন করেছে। সে হিসেবে তিনি হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.), হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.), মৌলানা রুমী (র.), বাস্তববাদী সুফি চেতনার বিংশ শতকীয় সার্থক প্রতিভূ ও উত্তরাধিকারী।

হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) 'মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত' সম্পর্কে কেবল কেতাবী আলোচনার মধ্যে সীমিত থাকেননি কিম্বা তত্ত্ব পেশ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং বাস্তব সমাজ জীবনে এর প্রয়োগেও সচেষ্ট ছিলেন। তিনি 'সুফি সভ্যতা' নামে একটি বিশেষ সৃজনশীল সংস্কৃতির রূপরেখা প্রণয়নেও আত্মনিয়োগ করেছিলেন[৯], যার লক্ষ্য ছিল একটি 'সুফি চেতনা ভিত্তিক সমাজ নির্মাণ' যা 'গণতান্ত্রিক সমাজ', 'সাম্যবাদী সমাজ', 'সমাজবাদী সমাজের' ধারণা ও বাস্তবতার মতো নবতর একটা 'শান্তিপূর্ণ সমন্বিত মানব সমাজবৃত্ত' রচনার সম্ভাবনা ধারণ করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি কালোপযোগী আধুনিক ও সৃজনশীল বলে স্বীকার না করে উপায় নেই।

'সুফি সভ্যতা' কিম্বা 'সুফি সংস্কৃতি' নির্মাণে যে সাংগঠনিক কাঠামো ও শক্তি প্রয়োজন; তা অনুধাবন করতে তাঁর মতো আধুনিক দর্শন-ধর্মবেত্তার মোটেই বিলম্ব ঘটেনি। সুফি চেতনাকে কিতাবে কিম্বা খানকায় সীমিত না রেখে, কিম্বা কেবল রূহানী উরুজের নিরুদ্দেশ পথে ছেড়ে না দিয়ে তিনি 'রূহানী উরুজের উড্ডয়নস্থল পার্থিব জীবন-কর্মযজ্ঞে' পা রেখেছিলেন, যেমনটা কুরআন-হাদিসে গুরুত্বসহকারে বলা হয়েছে, 'ইহকালীন জীবন তোমাদের পরকালের ফসল তোলার ক্ষেত্র স্বরূপ।' বিংশ শতাব্দীতে সুফি ভাবধারায় তাঁর স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য এখানেই। বস্তুতঃপক্ষে একটি সুফি সমাজ বিনির্মাণের সুবিশাল কর্মতৎপরতার সূচনাবিন্দু হিসেবে তিনি একটি সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, যার নাম 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী'। এই সংগঠন অপরাপর কল্যাণধর্মী সংগঠনের মতো শত শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে একটি মহীরুহে পরিণত হয়ে একটি আধুনিক সভ্যতা-সংস্কৃতি-সমাজ নির্মাণে দিশারী ভূমিকা পালন করবে, এমন নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও প্রত্যাশা তাঁর ছিলো। এই সংগঠনের একটা সহজ-প্রয়োগযোগ্য গঠনতন্ত্রও তিনি রেখে গেছেন, যার প্রথম কথাটা হলো "নবীজী হযরত মুহাম্মদের (দ.) জবানীতে পবিত্র কুরআনের আয়াত: 'আমি তোমাদের মধ্যে বিচারসাম্য রক্ষার্থে আদিষ্ট হয়েছি (ওয়া আমিরাতু লি আদিলা বাইনাকুম – ৪২:১৫) এবং 'বিচার সাম্য রক্ষা কর। কেননা বিচার-সাম্যই পরহেজগারীর মূল' (ফা আদিলু ইন্না আল্ আদ্লা জা আতুত্ তাকওয়া)"।[১০]

এই সংগঠনের ৮ দফা সম্বলিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যাবলী আমাদের বিদ্যমান সামাজিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত বাস্তব সম্মত। চতুর্থ দফায় "মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অনুসারীদিগকে ইসলামী শরার বিধান মানিয়া চলিতে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করা এবং বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের ধর্মীয় স্বাধীনতা স্বীকার করার" কথা এবং অষ্টম দফায় 'নৈতিক শিক্ষা'র গুরুত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছে[১১]। গোটা গঠনতন্ত্রে 'মানুষের রূহানী উন্নয়নের' পূর্বশর্ত হিসেবে বাস্তব সামাজিক শান্তি, পবিত্রতা রক্ষার বিষয়টাকে গুরুত্বসহকারে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা একাধারে মহান মদীনা সনদ, বর্তমান যুগে জাতিসংঘের সার্বজনীন কল্যাণ কর্মসূচীর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের শেকড় পবিত্র কুরআন-হাদিস-হযরত আলী মর্তুজা (ক.), হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) সুমহান ঐতিহ্যের সাথে যেমন সম্পৃক্ত, তেমনি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নবীজীর (দ.) মদীনা সনদ থেকে সমাজ-সঞ্জীবনী সুধা সংগ্রহ করে চলেছে। জীবন ও জগৎ সংসারকে উপেক্ষা করে আত্মনিগ্রহ ও আত্মপীড়নের দ্বারা সিদ্ধি লাভের ব্যক্তিক সাধনার বেষ্টনী থেকে আধ্যাত্মিকতা, সুফিবাদী ঝর্ণাধারাকে অবমুক্ত করে মোত্লাকা বা সার্বজনীনরূপ দানের প্রয়াস এই ত্বরিকার প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই বেলায়তের শিক্ষা মানুষের বাস্তব

সমাজ-জীবনে সৃজনশীল ও কল্যাণমূলকভাবে প্রয়োগের উপযোগী। মোদ্দা কথায়, বেলায়তকে মানুষের বাস্তব জীবন-সাধনার তথা বহুমুখী কল্যাণের উপযোগী করে উপস্থাপন করতে পারা এই ত্বরিকার মহত্তম কৃতিত্ব এবং এটাই তাসাওউফের মাইজভাণ্ডারী স্বরূপ যা 'মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত' নামে বর্ণিত হয়েছে।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. Reven Levy: Social Structure of Islam. Cambridge, 1955.

২. Abul Hashim: The Creed of Islam: 1950 Dhaka, [Ch. 1, Caption: The Kalima:] The Kalima or the belief in the oneness of God and the Prophethood of Muhammad (peace be on him) is the corner stone of Islam.... To be free from the sovereignity of the Contents of the Kalima the Abbaside Sultans of Bagdad and their feudal chiefs, the noblemen and the aristocracy of Bagdad induced the Ulemas and the Pundits of theology who for material advantages would always manufacture religious sanction for all un-Islamic actions of the Sultans to mutilate the Kalima. They invented a new Arabic Version of the Kalima, "La Ma'buda Illallah Muhammed al-Rasullullah or "There is no object of worship but God and Muhammed is his Prophet." Thus Islam was reduced to a mere form of worship and life divided in.o two water-tight compartments--- temporal and spiritual. No time was lost in creating temporal and spiritual lords. The Ulemas themselves became the spiritual lords and called themselves representative of the Prophet. The Sultans became the temporal lords. The temporal and the spiritual lords in perfect harmony and concord with each other conspired to exploit the people. For securing the pleasures of Heaven, obedience to the spiritual lords and for securing pleasures of the earth, obedience to the Sultans became the order of the day. There is a saying of the holy prophet: "The rulers are shadows of God" which means that the rulers must sustain the people under their charge faithfully in the manner in which God sustains His creatures. This Hadith or the saying of the prophet was again mutilated to give divine rights to the Sultans. This novel and un-Islamic conception of religion found development in materialistic Europe and has very nearly destroyed religion.

এখানে হযরত সাহেব কেবলার একটা উক্তিও স্মর্তব্য: "কম্‌বখতরা কালামুল্লাহ্‌ বেচিয়া কলামোলা খাইয়াছে"[১২]। হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেন: "প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ধন-সঞ্চয় ও বণ্টনে বা ধর্মকে চতুর জনের ব্যবসা রূপ দেবার ফলে যাহারা ধর্মবিমুখ বা নাস্তিকতার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে, তাহাদের জন্য ইহা একটি উত্তেজনাবিহীন পন্থা...।"[১৩] উপরের ইংরেজী উদ্ধৃতির সাথে এই বয়ানের সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়।

৩. বুখারী শরিফ, প্রথম খণ্ড, পৃ-১৪, অনুবাদ: মাওলানা শাসমুল হক ফরিদপুরী এবং মাওলানা আজিজুল হক, ১৯৫৭ইং ঢাকা]।

৪. বেলায়তে মোত্‌লাকা, প্রথম পরিচ্ছেদ নবুয়তে ইব্রাহিমী অনুচ্ছেদ।

৫. ইবিড, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, 'ছুফি সভ্যতা দিশারী' অনুচ্ছেদ।

৬. Prof. P.B.Chatterjee, 'All materialistic theories are theoretically incomplete' : An In.roduction to General Philosophy, (vol-1) Calcutta; Eleventh Edition, 1956.

৭. বেলায়তে মোত্‌লাকা, দশম পরিচ্ছেদ।

৮. ইবিড. দশম পরিচ্ছেদ।

৯. ইবিড. দ্বাদশ পরিচ্ছেদ: 'সুফি সভ্যতা দিশারী' অনুচ্ছেদ। এ বিষয়ে এই গ্রন্থের চতুর্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে; যাতে দেখা যায় যে, মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের চিন্তা ও চেতনা আধুনিক দর্শন, রাষ্ট্র বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি অত্যাধুনিক বিভিন্ন সামাজিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য এ লক্ষ্যের সাথে সাযুজ্যশীল এবং প্রয়োগ যোগ্যতার অনুকূল সম্ভাব্যতা ধারণ করে।

১০. গঠনতন্ত্র; আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী কেন্দ্রীয় কার্যকরী সংসদ, গাউসিয়া আহমদিয়া মন্‌জিল, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ, চট্টগ্রাম। ১৯৬৯ইং, পৃ: ১;

১১. ইবিড.

১২. ইবিড. অষ্টম পরিচ্ছেদ, বেলায়েত রহস্য।

১৩. ইবিড. দ্বাদশ পরিচেছদ; সুফি সভ্যতা দিশারী অনুচ্ছেদ।

তৃতীয় অধ্যায়

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের 'বাগান ও বাগবান'

দেইখা যারে মাইজভাণ্ডারে আজব রঙের ফুল,
ঝাঁকে ঝাঁকে উইড়া পড়ে আশেক অলিকুল।[১]

১. হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) তাঁর বেলায়তের বিকাশ-ক্ষেত্রকে 'বাগান' বলে বর্ণনা করেছেন। তবে তাঁর এই বাগানের বিস্তার কেবলমাত্র মাইজভাণ্ডার শরিফ ক্যাম্পাস কিম্বা মাইজভাণ্ডার গ্রাম কিম্বা তাঁর নিজ জিলা চট্টগ্রাম কিম্বা স্বদেশ বাংলাদেশের আয়তনে সীমিত নয়। তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর অধ্যাত্ম বাগানের বিস্তার তৎকালীন বৃটিশ-ভারতের সীমা পেরিয়ে বহু দূরে ছড়িয়ে পড়েছিল। 'মাইজভাণ্ডার শরিফ-দরবারের' বাগানের প্রেরণা বক্ষে ধারণ করে তৎকালীন সমগ্র বঙ্গের বাইরেও মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত চর্চার রূহানী নার্সারী গড়ে উঠেছিল তাঁর কামেল খলিফাদের যত্নে ও পরিচর্যায়, যেগুলোতে এখনো শত শত প্রকার সুবাসিত ফুল ফুটে চলেছে।

হযরত আকদাস 'আমার বাগান (হামারে বাগ)' শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন ১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জানুয়ারি, রোববার, যখন শিশু হযরত বাবা ভাণ্ডারীকে তাঁর কোলে অর্পণ করার জন্য নেওয়া হয়। জন্মের সপ্তম দিবসে শিশু বাবা ভাণ্ডারীর আক্বিকা সম্পন্ন করেন পিতা সৈয়দ আবদুল করিম শাহ্। তিনি নিজে কোলে করে শিশুকে হযরত আকদাসের কাছে নিয়ে যান। হযরত আকদাস দু'হাত বাড়িয়ে কোলে নিয়ে শিশুর দিকে চোখ রেখে বললেন, "ইয়ে হামারে বাগকা গোলে গোলাব হ্যায়। হযরত ইউসুফ (আ.) কা চেহারা ইসমে আয়া হ্যায়। উছ্কো আজিজ রাখ্খো। ম্যায়নে উছ্কা নাম গোলামুর রহমান রাখ্খা।" (এটা আমার বাগানের গোলাপ ফুল। হযরত ইউসুফের (আ.) চেহারা তাঁর মধ্যে এসেছে। তাঁকে যত্ন করো। আমি তাঁর নাম গোলামুর রহমান রাখলাম)।[২]

ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত সত্য যে, নবী-রসূল এবং ওলী-আল্লাহ্দের জবান দিয়ে অনর্থক একটা শব্দও বের হয় না। সেই ১৮৬৫ সালে আত্মীয়বর্গ সমেত বহু ভক্ত-অনুরাগীর উপস্থিতিতে শিশু বাবা ভাণ্ডারী কেবলাকে সামনে রেখে হযরত আকদাস তাঁর ৪০তম বয়ঃক্রমকালে "মাইজভাণ্ডারী বাগানের বাগবান" হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করলেন। মারিফাত ক্ষেত্রের রেওয়াজ অনুযায়ী ইতোপূর্বে স্বীকৃত গাউসিয়াত ও

কুতুবিয়াতে তাঁর স্থিতির পাশাপাশি মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের 'বাগবান' হিসেবেও তিনি তাঁর অস্তিত্বশীলতার বিষয়টা প্রকাশ্য করলেন।

উত্তরকালের ইতিহাস সাক্ষী দেয় যে, এই 'গোলাপ ফুল'টা স্বীয় ছলুক কিম্বা জজবিয়াত কোন অবস্থাতেই স্বীয় 'বাগবানের' নৈকট্যচ্যুত হননি এবং মাইজভাণ্ডারী বাগানে তিনিই হযরত আকদাসের 'গোলাপ ফুল' হিসেবে এখনো (২০১৯ইং) সতেজ ও ভাস্বর, যা আধ্যাত্মিক গতিধারায় রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থেকে এই পবিত্র বাণীর যথার্থতার স্বাক্ষর হিসেবে প্রোজ্জ্বল রইবে। প্রসঙ্গতঃ স্মর্তব্য যে, তাঁকে খেলাফতদানের বিষয়টা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়ে 'জীবনী ও কেরামত' গ্রন্থে বিশদ ও হৃদয়গ্রাহীভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।[৩]

২. হযরত আকদাসের এই বাগানে ফুল ফোটার পর্যায় আরো আগে শুরু হয়েছিল। তাঁর অনুজ মেজ ভ্রাতা সৈয়দ আবদুল হামিদের দ্বিতীয় পুত্র হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল (ক.)-এর (ওফাত ১৯০৫) বিকাশও এ পর্যায়ে। তিনি 'ছানি গাউসে ধন', 'ছোট মওলানা সাহেব' এবং হযরত আকদাসের 'কুতুবে ইরশাদ' অর্থাৎ হাবভাব, কথাবার্তা, ইশারা-ইঙ্গিতের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা প্রকাশকারী হিসেবেও পরিচিত ও স্বীকৃত ছিলেন। তিনি কোল্‌কাতা আলীয়া মাদ্‌রাসা থেকে টাইটেল পাশ আলেম। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে ইবাদত-বন্দেগী-সামা-হালকায়ে জিকির প্রকরণ প্রভৃতি তাঁর মাধ্যমে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হয়। তাঁর দৈনন্দিন কার্যনির্বাহস্থলকে হযরত আকদাস 'দপ্তরখানা' হিসেবে অভিহিত করতেন এবং তাঁকে 'আমিন মিঞা' বলে সম্বোধন করতেন। ভক্তবৃন্দ তাঁকে উপজীব্য করেও গজল ও কবিতা রচনা করেছেন।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের জাহেরী ভিত্তিভূমি মাইজভাণ্ডার গ্রামে বসতি স্থাপনকারী হযরত সৈয়দ মতিউল্লাহ্‌র (র.) সন্তান-সন্ততি এবং তাঁদের বংশধরদের নিবাসগুলোর সমন্বয়ে "মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ" নামে বিশ্বময় নন্দিত লোকালয়রূপী এই 'বেলায়তের বাগানে' নানা প্রকার সুগন্ধি ফুল ফোটা অব্যাহত রয়েছে। হযরত আকদাসের এই বেলায়তের বাগানে সর্বক্ষণই যেন বসন্তকাল। উপরে বর্ণিত এই দুই মহান 'হাস্তি' ছাড়াও পর্যায়ক্রমে এখানে বিকশিত হয়েছেন হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.), শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) সহ অসংখ্য আওলাদেপাক। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের এই সিলসিলাহ্ (ধারাবাহিকতা) এখনো সক্রিয়ভাবে যুগের পর যুগ ধরে অব্যাহত রয়েছে। বেলায়তের একাধিক পুষ্প এখানে এখানো ফুটছে। ছড়িয়ে পড়ছে সেসব পুষ্পের সুবাস।

৩. একটা মাত্র ফুল দিয়ে বাগান হয় না। বাগানে থাকতে হয় নানান রঙের ফুল। 'মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের' বাগানেও রয়েছে নানান রঙের ফুল। এই দরবার শরিফকে সাধারণ মানুষের ভাষায় 'ওলী পাড়া বা ওলী মহল্লা' বললে বেশী বলা হয় না। ২০০৬

খ্রিস্টাব্দে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ওফাত শতবার্ষিকী উপলক্ষে মাসিক আলোকধারার "সম্পাদক" হিসেবে এই আকিঞ্চন লেখকের দুর্লভ সৌভাগ্য ও সুযোগ হয়েছে এই 'ওলী-মহল্লার' প্রত্যেক অলি-গলিতে ঘুরে ঘুরে ছোট-মাঝারি-বড় সকল 'খানকারূপী ঘরে' প্রবেশ করে মুগ্ধ চিত্তে সব স্বচক্ষে দেখার। প্রত্যেক ঘরে প্রশান্ত অচঞ্চল চিত্ত, মৌন কিম্বা সবাক, যেসব মুখ ও অবয়ব অবলোকনের সৌভাগ্য আমার হয়েছে, সেসব নিরুত্তাপ-নিরুদ্বিগ্ন সাধারণ অথচ ধ্যানী মুখের বিবরণ ভাষায় প্রকাশ কিম্বা তুলিতে অঙ্কন করা সম্ভব নয়। প্রত্যেক মন্‌জিলেই বিভিন্ন রকমের সুবাসিত ফুলের সাক্ষাৎ আমি পেয়েছি, যারা নীরবে-নিভৃতে লোকচক্ষুর অন্তরালে বুনো ফুলের মতো হৃদয় আকুল করা প্রাণবন্ত সুবাস ছড়িয়ে যাচ্ছেন। আশ্চর্য! তাঁদের কোন বাহ্যিক আড়ম্বর নেই, পার্থিব চাহিদাও নিতান্তই সীমিত। অনেকটা 'জিকির' করতে করতেই জীবনটা এই মহান মৃত্তিকায় উৎসর্গ করতে পারলেই যেন নিজেকে পরম সার্থক ও কৃতার্থ বোধ করবেন! বাইরে বিপুল আলোকসজ্জার জৌলুসের অন্তরালে এসব কুঠরিতে অনির্বাণ মোমের আলোগুলোর স্নিগ্ধতায় আমি মুগ্ধ ও বাকহারা হয়ে পড়েছিলাম। বিচ্ছিন্নভাবে কয়েক দিন ছাড়াও একটানা তিন দিন তিন রাত ছিল আমার এই 'পুণ্য কুটিরগুলো' দর্শন। সব খানেই এক স্নিগ্ধ আবেগময়ী মমতার বৃষ্টিতে আমি স্নাত হয়েছি। প্রত্যেক মন্‌জিলে, প্রত্যেক ঘরে-কুটিরে বসবাসী প্রতিটা আত্মার গহীনে আমি দেখেছি এ বেলায়ত বাগানে পারস্পরিক পরম শ্রদ্ধাবোধ। হযরত আকদাস, হযরত বাবা ভাণ্ডারীসহ প্রত্যেক প্রয়াত মহান পুরুষ যেন বর্তমানদের মাথার উপর আলোক নির্ঝররূপ অভিন্ন সামিয়ানা! তাঁদের মধ্যে আমি দেখেছি, এক পবিত্র-সুন্দর-রূহানী একত্ববোধ ও ঐক্যসূত্রিতা। এই ঐক্য চেতনাবোধ মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সার্বজনীন শান্তিপূর্ণ অভেদ ছায়াতলে আনতে পারে সমগ্র পৃথিবীবাসীকে।

সীমিত পার্থিব মানদণ্ডে এখানে ক্ষুদ্র-বৃহতের একটা প্রশ্নবোধক চিহ্ন হয়তোবা জাগতে পারে। কিন্তু মহাকাশ বিজ্ঞানের দর্পণে দেখলে দেখা যাবে যে, অগুণতি নক্ষত্র মন্‌জিলে যেমন ভারসাম্য রক্ষার জন্য মহান রাব্বুল আলামিন বিবিধ প্রকারের জ্যোতিষ্ক সৃষ্টি করেছেন, এই পৃথিবীতে পরিবেশ ও আনুষঙ্গিক উপাদানগুলোর ভারসাম্য রক্ষার জন্য বিবিধ উপকরণ, জীব জগৎ ও বস্তু জগতের অবতারণা ঘটিয়েছেন; মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বাগান বা জগৎও তেমনি বিজ্ঞানময়ভাবে ভারসাম্যপূর্ণ। সকল জ্যোতিষ্ক একই উপাদানে সৃষ্ট, কিন্তু প্রত্যেক জ্যোতিষ্কের মান ও ভূমিকার মধ্যে ভারসাম্যমূলক সম্পর্ক বিদ্যমান। সামগ্রিক পরিস্থিতির বিবেচনায় শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ওলী-আল্লাহ্‌দের ব্যষ্টিক মানের সারবত্তা সম্পর্কে ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে একাধিকবার বহু ভক্তের সামনে আল-কুরআনের সূরা বাক্বারার ১৩৬নং আয়াতাংশ সুমিষ্ট স্বরে তেলাওয়াত করে শুনিয়েছেন, "..লা নুফার্‌রিকু বাইনা আহাদিম্

মিনহুম---” (আমরা তাঁহাদিগ হইতে কাহারো মধ্যে কোন পার্থক্য করি না---)। এই উক্তি শাশ্বত তাৎপর্যবহ।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত-বৃক্ষের ‘কলম’রূপী– চরম পরীক্ষা-উত্তীর্ণ খলিফামণ্ডলীর সুবাদে তাঁদের নিজ নিজ আস্তানা-বাসস্থানকে কেন্দ্র করে বাংলার প্রত্যেক জিলার প্রত্যেক থানায় রোপিত হয়ে অসংখ্য শাখা-নার্সারী সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলো সক্রিয় ও জীবন্ত।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার যে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের মন্‌জিলসমূহে ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ মুর্শিদকে অবলম্বন করে পূর্ব থেকেই মারিফতী গান-গজলের সৃষ্টি ও চর্চা করছেন। এখনো হচ্ছে। একইভাবে খলিফামণ্ডলী এবং তাঁদের ভক্তবৃন্দ নিজ নিজ মুর্শিদকে অবলম্বন করে এই সঙ্গীত, সাহিত্য ও ইতিহাস চর্চা করে চলেছেন। এই নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ফসলরূপেই মাইজভাণ্ডারী সাহিত্য ফুলে-ফসলে প্রতিদিন সমৃদ্ধ হচ্ছে। প্রয়োজন এসবের খতিয়ান তৈরীর।

অতএব, ঐতিহাসিক বাস্তবতার মূল্যায়ন এই যে, মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বাগান সম্প্রসারণশীল এবং মহান ‘বাগবানের’ ‘রূহানী ফুলের’ সংখ্যাও বেড়ে চলেছে। লক্ষ্য একটাই: মানবতার শান্তি, সাম্য, সুবিচার ও সমৃদ্ধি।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. রমেশ শীল: নূরে দুনিয়া,

২. অলিকুল শিরোমণি হযরত বাবা ভাণ্ডারী: মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা মাইজাণ্ডারী : ৫ম সংস্করণ, ১৪০৮ বাংলা।

৩. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত : মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, পঞ্চম প্রকাশ, জুলাই ১৯৮১, পৃ. ১৯৮।

চতুর্থ অধ্যায়

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত : গতানুগতিক সুফি মতবাদে যুগোপযোগী সংস্কার

"সত্যিই, আল্লাহ্ এই জাতির নিকট প্রতি যুগের শতকের প্রারম্ভে এমন একজনকে পাঠাবেন, যিনি এই জাতির ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করবেন"–হাদীস।

১. হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)-এর পবিত্র সাধনা, কর্ম, কৃতি ও কল্যাণময়তাকে (গাউসিয়াত) ভিত্তি করে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের যে রূহানী বা অধ্যাত্ম মাহাত্ম্য গড়ে উঠেছে খ্রিস্টীয় ১৮৬০ দশকের গোড়া থেকে, তা সাধারণতঃ পরিবেশিত হয়েছে "মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা, সিলসিলা, দর্শন, জীবনবোধ" প্রভৃতি ঐতিহ্যবাহী শব্দের তশতরীতে। এসব শব্দমালা মারিফাত জগতের পথের পরিচায়ক।

কিন্তু অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) ঐসব ঐতিহ্যবাহী শব্দ ছাড়াও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্যবহার করেছেন আরেকটা শব্দঃ "মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত (Maizbhandari O'layet)"। বিখ্যাত 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে প্রয়োজনীয় স্থানে তিনি মারিফাত-সাহিত্যে ব্যবহৃত পূর্বোক্ত শব্দগুলোই প্রয়োগ করেছেন বিষয়কে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য। তবে পুস্তকের একেবারে শেষ দিকে "পরিশিষ্ট" অংশে [পৃ: ১৮৩, তৃতীয় প্রকাশ] এই গ্রন্থ রচনার পটভূমি বিশ্লেষণ (backgrounder), উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি মাইজভাণ্ডারী জাহেরী-বাতেনী নেটওয়ার্ককে "মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত" বলে অভিহিত করেছেন।

তিনি বলেছেন, "যেই উদ্দেশ্য ও ভাবধারা লইয়া এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি লিপিবদ্ধ করিয়াছি, আশা করি, তাহা লিখিত বিষয়বস্তু হইতে পাঠকবর্গ সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

জনগণের মধ্যে যেমন আকৃতি-প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে, তেমন রুচির বিভিন্নতা বা পারিপার্শ্বিক অবস্থায় স্বার্থের ঘাত-প্রতিঘাতে বুঝ-ব্যবস্থা এবং চাল-চলনেও বিভিন্নতা দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নহে।

তাই মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত সম্বন্ধে কতিপয় প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জওয়াব দান প্রসঙ্গে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে,

১। মাইজভাণ্ডারী সুফি সভ্যতার বৈশিষ্ট্য এক সর্বজনীন সুফি দর্শন।

২। বিশ্ব মানবতায় এই সুফি সভ্যতা, ধ্বংসের দিকে আগুয়ান মানবের জন্য দিশারী।
৩। গতানুগতিক সুফি মতবাদের ইহা এক যুগোপযোগী সংস্কার।
৪। অত্র বেলায়তের অনুসারীদের মূলনীতি হইল; অনিত্য, অনাসক্তি এবং হুকুম বা আদেশের 'এখতেলাফ' বা বিরোধ পরিহারে অলীয়ে কামেলের জ্ঞান-জ্যোতির অনুসরণ, বিধান-ধর্মের উপর নৈতিক-ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার। তাহারা উপাসনা বা ইবাদতের উপর 'এতায়াত' বা আনুগত্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী।"

প্রণিধানযোগ্য যে, এই ব্যাখ্যার মধ্যে তিনি স্পষ্টভাবে "মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত" শব্দটা সচেতন ও মজবুত তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেছেন। তিনি মাইজভাণ্ডারী সুফি সভ্যতাকে "সর্বজনীন" হিসেবে উৎসর্গ করেছেন এবং বলেছেন, **(ক)** "গতানুগতিক সুফি মতবাদে ইহা এক যুগোপযোগী সংস্কার", **(খ)** মাইজভাণ্ডারী সুফি সভ্যতার বৈশিষ্ট্য যে, এই সুফি দর্শন সর্বজনীন, **(গ)** "ধ্বংসের দিকে আগুয়ান" মানবের জন্য সুরক্ষা-বর্ম, **(ঘ)** "অত্র বেলায়তের অনুসারীদের মূলনীতি হইল: অনিত্য, অনাসক্তি এবং হুকুম বা আদেশের "এখতেলাফ" বা বিরোধ পরিহারে অলীয়ে কামেলদের জ্ঞান-জ্যোতিঃ অনুসরণ; বিধান ধর্মের উপর নৈতিক ধর্মের প্রাধান্য স্বীকার। তাহারা উপাসনা বা ইবাদতের উপর 'এতায়াত' বা আনুগত্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী।

২. মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত, সুফি সভ্যতা প্রভৃতি গুরুভার বিষয়ে যে আলোকপাত "বেলায়তে মোত্লাকা" গ্রন্থে করা হয়েছে, তাতে কেবলমাত্র আল্লাহু রাব্বুল আলামিনের 'অপার জ্ঞানের পটভূমিকায়' এই পার্থিব জীবনে মানুষসহ সকল প্রাণী ও বস্তুজগতের কল্যাণকর বিষয়াদির অনুশীলন ও প্রয়োগকে অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ

(ক) অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্নায়ুযুদ্ধ, সূক্ষ্ম ও উন্নততর মারণাস্ত্র নির্মাণ ও ব্যবহারে পৃথিবীর সব রাষ্ট্রের মোট আয়ের সিংহভাগ ব্যয় হচ্ছে। বিশ্ব ব্যাংকের পরিসংখ্যান মতে, প্রতিদিন বিশ্বের মোট জনসংখ্যার আয়ের মাথা পিছু পাঁচ ডলার ব্যয় হচ্ছে যুদ্ধ ও সংঘাতে। আর অন্যদিকে বিশ্বের দশ শতাংশের বেশি লোকের দৈনিক আয় দুই ডলারের কম (সূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক : ২৯-০৩-২০১৮)। পৃথিবীর অর্থনীতি ও সম্পদ নিয়ন্ত্রণ ও শোষণে পরাশক্তিগুলোর উন্মত্ত হিংসাত্মক প্রতিযোগিতার কবলে পড়ে 'মানব সমাজ ধ্বংসের দিকে আগুয়ান'।

(খ) মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের অনুসারীদেরকে পৃথিবীর অনিত্যতার বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে অনাসক্তিময়তায় উদ্বুদ্ধ করা। ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা যে, বর্তমান জমানায় বিভিন্ন মোড়কে যে 'খাসিয়ত' অনুসৃত হচ্ছে 'তা উৎকট ভোগবাদ'। দর্শন ও বিজ্ঞানের বীক্ষণে প্রকৃত আধুনিকতা, প্রগতি ও সু-সংস্কৃতি বলতে যা বুঝায়, তা এই উৎকট ভোগবাদী প্রবণতা থেকে বহু দূরে। পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার শ্রেণী নির্বিশেষে

অতি ক্ষুদ্র অংশ 'ভোগবাদী' স্পৃহা থেকে নিজেদেরকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। ফলে সামগ্রিক সামষ্টিক কল্যাণবাদী চেতনা ও কর্মোদ্যোগ ব্যাক-ফুটে পড়ে যাচ্ছে। অবশ্য, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে এক শ্রেণীর মানবতাবাদী গ্রুপ 'ভোগবাদিতার' স্থলে সেবাদানকে মুখ্য উপজীব্য করে এই ধারাকে সচল রাখতে সচেষ্ট।

(গ) সামাজিক সমস্যাসহ বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বিরোধে কণ্টকাকীর্ণ মানব-সমাজ। এতে সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হয়। তাই বিরোধ পরিহারের ন্যূনতম একটা মানদণ্ড নির্মাণও বাঞ্ছনীয়। এই বিরোধ রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয়, গোষ্ঠী, পরিবার ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দৃশ্যমান। সমাজের সর্বস্তরে কোন না কোন প্রকার হুকুমে বা পদ্ধতির অধীনে বাস্তব কর্ম-প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত হয়। এসব আদেশ পালন নিয়েই স্বার্থ বৈগুণ্যে অধিকাংশ বৈষয়িক-অবৈষয়িক বিরোধের উৎপত্তি ঘটে। এসব বিরোধ নিরসনে ওলীয়ে কামেল বা পবিত্র আত্মাদের জ্ঞান ও শিক্ষা অনুসরণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। কারণ, তাঁদের নিষ্কাম অভিজ্ঞতাপ্রসূত এসব শিক্ষা বিভিন্ন ব্যক্তির তাৎক্ষণিক খণ্ডিত সমস্যাদির সমাধানে অত্যন্ত কার্যকর। তাঁদের এসব শিক্ষা কোন-না-কোনভাবে কোন-না-কোন ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানে প্রযোজ্য। আউলিয়ায়ে কেরামের জীবনী গ্রন্থসমূহে বর্ণিত নসিহতগুলোর উপর চোখ বুলালেই এ বিষয়ের সত্যতা মিলবে।

(ঘ) মাইজভাণ্ডারী বেলায়তকে তিনি গতানুগতিক সুফি মতবাদে এক যুগোপযোগী সংস্কাররূপে অভিহিত করেছেন। সুফি মতবাদ বা তাসাওউফের পত্তন ঘটে খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে 'আহল-আল-হক' নামে একটি চিন্তাশীল গোষ্ঠীর উদ্ভবের মাধ্যমে, যাদের ধ্যান ছিল নৈতিক শৃঙ্খলার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, আত্মশুদ্ধি এবং আল্লাহ্‌র সান্নিধ্য কামনা। এ সময়ে 'সুফি' শব্দটা দরবেশ গোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় এবং প্রখ্যাত চিকিৎসক জাবির ইবনে হায়য়ান 'সুফি' অভিধায় ভূষিত হন। তিনি নিজেও তৎকালীন রাজশক্তি কর্তৃক নিগৃহীত হয়েছিলেন অপরাপর বহু কামেল, সৎ, জ্ঞানী ও সুফির মতোই। লক্ষ্যণীয় যে, এই সুফি ধারা হযরত হাসান বসরী (র.) থেকে শুরু হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসহ ঊনবিংশ/বিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.), ড. মুহম্মদ ইকবাল পর্যন্ত বিস্তৃত [এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় অনুচ্ছেদের তৃতীয় উপ-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য]। এই ধারা থেমে নেই। এর প্রসারণ ক্রিয়া এখনো অব্যাহত। কালক্রমে তৎকালীন সামন্ততান্ত্রিক-রাজতান্ত্রিক সমাজে এই মতবাদ বিকাশ লাভ করতে থাকে একটা অরাজনৈতিক গোষ্ঠী বা মজহাব (religious school, creed, doctrine, way of life-. অর্থে) হিসেবে। তবে অরাজনৈতিক গোষ্ঠী হিসেবে এই বিকাশ ঘটতে থাকলেও মহান

সুফিবর্গের সাথে আদ্‌ল, ইনসাফ বা ন্যায়বিচার প্রশ্নে অন্যায়কারী শাসকবর্গের হর-হামেশা দ্বন্দ্ব ঘটে। নিগৃহীত হন সুফিরা।

৩. নবীজীর (দ.) শরিয়ত নির্ধারিত আচার-অনুষ্ঠান [যা অবশ্যই যে কোন বিবেচনায় সহজসাধ্য] পালনে কঠোর নিয়মানুবর্তিতার পাশাপাশি নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিয়েছে এবং আল-কুরআনে বিভিন্ন আয়াতে এ প্রসঙ্গে তাগিদ রয়েছে। আল-কুরআন ও নবীজীর (দ.) শরিয়তের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন পরিশুদ্ধ মানুষ তৈরীর পাশাপাশি প্রকৃতিসিদ্ধ সমতাভিত্তিক একটা নৈতিক সমাজ নির্মাণ (to establish a viable social order on earth that will be just and ethically based)। এমনকি মানুষ নিজের উপরও জুলুম করতে পারবেনা (being unjust to oneself: zulm-al-nafs)।[১] কিন্তু ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পবিত্র আত্মাদের এসব শুভ উদ্যোগ বারে বারে ব্যক্তিস্বার্থ কণ্টকিত শাসক-শক্তি, আচারসর্বস্ব ধর্মাড়ম্বর, বিত্তকেন্দ্রিক প্রতিপত্তিচক্র কর্তৃক বাধাগ্রস্ত হয়েছে। তবে সমাজের প্রগতিশীল বিবর্তনের অনিবার্য গতির সম্মুখে কোন না কোন পর্যায়ে এসব অন্তরায় ভেঙ্গে পড়ে। এ প্রসঙ্গে 'বিধান ধর্মের উপর নৈতিক ধর্মের' প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য, মানবিক শুভময়তা-সমৃদ্ধ সমাজ নির্মাণের অনবদ্য নজীর ও মানদণ্ড নবীজী (দ.) নিজেই রেখে গেছেন প্রথমতঃ মদীনা সনদে, দ্বিতীয়তঃ মক্কা বিজয়ের পর গৃহীত প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে। এই দুটো বিষয়ে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রীয় 'আনুগত্যের' ভিত্তিতে সকলের বেঁচে থাকার অধিকার (right to physical existence) সমেত মৌলিক অধিকার বজায় রাখা তাঁর সুন্নত ও শরিয়তের অপরিহার্য অংশ। উপাসনাকারীদের মধ্যে এক শ্রেণীর কপট বা মুনাফিকের অস্তিত্ব তখনও দেখা গেছে, এখনো আছে। তাই ইবাদতের সাথে সাথে আনুগত্যের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী হবার প্রসঙ্গ এসেছে। আল-কুরআন ও হাদিস শরিফে ইবাদতের প্রকৃত স্বরূপের বিকাশ এবং ইবাদতের পরিপূর্ণতার জন্য 'আনুগত্যের' অপরিহার্যতার কথা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মেসাল সহকারে বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখ্য, আল-কুরআনে ইসলামের দ্বিতীয় স্তম্ভ 'সালাত' বিষয়টিতে আনুষ্ঠানিক কায়িক ইবাদত ছাড়াও আত্মিক ও সামাজিক বিষয়াদি সংশ্লিষ্ট।

৪. নবীজী (দ.) প্রদত্ত ইসলামের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: 'সংযম, আনুগত্য, সত্যভাষণ, পরোপকার, সুবিচার'। এই সংজ্ঞাই সুফি মজহাবীদের creed বা মূলনীতি। হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.), শেখ আহমদ সরহিন্দী (র.), হযরত বাহাউদ্দিন নক্‌শবন্দী (র.), হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবী (র.) প্রমুখের মধ্যে এ ধারা প্রখরতরভাবে দৃশ্যমান। অন্যদিকে হযরত শায়খ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী হাজবিরী (দাতা

গঞ্জেবখ্শ), সুফি আবদুল লতিফ ভিটাই, লালন শাহ প্রমুখরা নির্বিরোধ নিস্পৃহ, স্নেহ-কল্যাণময় সাত্ত্বিক জীবন ধারার সুফি। তবে লালন শাহ্কে জমিদারী শোষণের বিরুদ্ধে লাঠি হাতে রুখে দাঁড়াতেও দেখা গেছে। ড. ইকবালের হাতে এসে 'সুফিবাদে' কর্মবাদ ও মরমীবাদের সমন্বয় সম্ভাবনা মূর্ত হয়ে উঠে। তিনি বেদান্ত দর্শন, বৌদ্ধ কূন্যবাদ, পারসিক দ্বৈতবাদ, পাশ্চাত্য দর্শনের থেলিস থেকে শুরু করে হেগেল-নীটশে-মার্কস পর্যন্ত সকলের এবং কুরআন-হাদিস-তাসাওউফের সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রুমীর বন্দরে অবতরণ করে বস্তুজগৎ ও আধ্যাত্মিক জগতের সমন্বয়ে কর্মবাদী, সাম্যবাদী, শান্তিবাদী একটি আধুনিক সমাজের রূপরেখা অঙ্কন করেন এবং একদিকে ইসলামের (ক) সাম্যবাদী বিশ্ববীক্ষা, অন্যদিকে (খ) সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও (গ) নিয়ন্ত্রণহীন নৈরাজ্যের আশঙ্কাপূর্ণ নাস্তিক্যবাদী প্রবণতার মধ্যে সুস্পষ্ট ভেদরেখা অঙ্কন করতে সমর্থ হন।

ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে, ভারতবর্ষে, বাংলাদেশে শোষণ-পীড়ন বিরোধী সাম্যবাদী চেতনার সমান্তরাল ধারা হিসেবে ইসলামী সাম্যবাদী চেতনা-স্রোত মুসলিম মানসে গতি পেতে শুরু করে। বাংলাদেশেও এর কার্যকর প্রভাব ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ে পরিদৃষ্ট হয়। অছিয়ে গাউসুল আযম এর নিজের ভাষায় "আমি কিছু সময় খেলাফত আন্দোলনের প্রভাবে আচ্ছন্ন থাকি" (এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক)। তিনি খেলাফত আন্দোলনের কর্মী হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ-পীড়ন বিরোধী সক্রিয় সংগ্রামে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এসব বাস্তব অভিজ্ঞতা ও ব্যাপক অধ্যয়ন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও চেতনায় বিপুল ইতিবাচক পরিবর্তন আনে, স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সংগ্রামে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যে যার প্রতিফলন দেখা যায়।

৫. বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য নবীজীর (দ.) জীবন-সংগ্রাম। অছিয়ে গাউসুল আযম-এর প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর' গঠনতন্ত্রের প্রথম বাক্য ও অনুচ্ছেদ নিম্নরূপ: "বিশ্ব নিয়ন্তা আল্লাহ্তা'লা, বিশ্ব-ত্রাণ কর্তৃত্বগুণে বিশ্বদরদী 'খোদায়ী অনুগ্রহ' পাপীদের জন্য আশিস বাণীদাতা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর আদর্শ জীবন যাত্রায় 'আল-আমিন' বা বিশ্বস্ত জিম্মাদার, বাল্যকাল হইতে শেষ জীবন পর্যন্ত শত্রু-মিত্র সকলের দ্বারা স্বীকৃত বিশেষণ। সেই বিশেষণের প্রভাবে বিশ্ববাসীকে 'আদলে মোত্লাক বা বিচার-সাম্যের' দিকে আহ্বান করিয়া ঘোষণা করিতেছেন: 'ওয়া আমিরতু লি আয়া-দিলা বায়নাকুম' (বিচারসাম্য রক্ষা কর, কেননা বিচারসাম্যই তাকওয়ার মূল)। আমি আপনাদের মধ্যে বিচার-সাম্য রক্ষার্থে আদিষ্ট হয়েছি।"[২] তাঁর বিশ্লেষণ মতে বিচারসাম্য অতীতে 'নির্বিঘ্নে স্বীকৃতি লাভ' করেনি বহুবিধ সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে। নবীজীর (দ.) অন্যতম এই মৌলিক লক্ষ্য বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তিনি সামর্থ্য অনুযায়ী দুঃসাহসিক সংগ্রাম ও

অভিযানের সূচনা করেন। এক্ষেত্রে তাঁর প্রধান Logistics বা অবলম্বন নবীজীর (দ.) আদর্শ, আল-কুরআনের সূচনায় বর্ণিত আল্লাহ্‌র 'রব-রহমান-রহিম' সিফত এবং বিশ্বের প্রথম মানবিক রাষ্ট্র মদীনার 'সংবিধানের' মর্মকথা।

নাস্তিক্যবাদী দর্শন অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর কাছে কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়নি। কারণ, এটা দার্শনিক যুদ্ধের ময়দানে যুক্তিবাণে বিদ্ধ হয়ে বহু আগেই পঙ্গুত্ববরণ করেছে। সুবিচারসম্পন্ন সমাজই তাঁর মুখ্য আগ্রহ ও কাঙ্ক্ষিত। এমনকি ভারতের চার্বাক দার্শনিক সম্প্রদায়ও তাঁদের নির্বিচারবাদী (dogmatic) নাস্তিক্যবাদকে যুক্তিযুক্তভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি।

সুফিবাদ যেভাবে সংসার-বিমুখ নিষ্ক্রিয় (passive) মতবাদে নিমজ্জিত হয়ে যাচ্ছিল, তা থেকে পৃথক আদলে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের মোড়কে গতানুগতিক সুফি চেতনাকে নব গতিশীলতায় (active) সংস্কার সাধনের দুরূহ উদ্যোগ নেন তিনি। পরিচ্ছন্ন পবিত্র কর্ম-জগতই তাঁর সুফি-ভুবন। এই দুঃসাহসিক কঠিন কর্মে তিনি হযরত আকদাস ছাড়া পূর্ববর্তী যেসব মহারথী দার্শনিক-আউলিয়ার জ্ঞানের আলোকে নিজেকে আলোকিত করেছেন; তাদের মধ্যে রয়েছেন, হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.), শায়খুল আকবর হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.), হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.), হযরত জালাল উদ্দিন রুমী (র.), কবি হাফেজ সিরাজী (র.) প্রমুখ। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা বেলায়তে মোত্‌লাকার বহুমাত্রিক শেকড় সম্পর্কে সম্যক অবহিত হবার জন্য তাঁদের কর্ম-কৃতি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। মুসলিম তথা ইসলামী দর্শন দৃশ্যমান কিম্বা দৃশ্যাতীত সর্বপ্রকার জীবন-জিজ্ঞাসার যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ উত্তর দিতে যে যত্নবান, 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে তিনি এ তথ্য পেশ করতে সফল ও সক্ষম হয়েছেন।

৬. বেলায়তে মোত্‌লাকা বা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আরো কিছু ব্যবহারিক বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখযোগ্য। অছিয়ে গাউসুল আযমের ভাণ্ডারে রয়েছে বাল্যকাল থেকে চেনা-অচেনা লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে নিত্য সাক্ষাৎ ও সাহচর্যের অভিজ্ঞতা। এসব মানুষ আসতেন প্রাণের তাগিদে, ত্রাণের ভরসায়, হতাশার মরুভূমিতে একটু বারি-সিঞ্চনের প্রত্যাশায়। জাত-ধর্ম-ভাষার কোন বালাই এখানে ছিলনা। তাঁদের পরিচয়: তাঁরা সবাই মানুষ, আল্লাহ্‌র বান্দা। তাঁরা এক কথায় মহান ওলী-আল্লাহ্‌র স্নেহ মমতা-দয়া-দোয়া পাওয়ার আর্জি নিয়ে আসতেন। এই নৈকট্য ঐশী নৈকট্য, যা বেলায়তের মর্মবস্তু। মানুষের মহাসাগরে সন্তরণ করতে করতে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর চিন্তা-চেতনা-মনে ঐশী ক্ষেত্রে কোন প্রকার কঠোর বিধি-নিষেধের অপ্রয়োজনীয়তা প্রকট হয়ে উঠে। কারণ; আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের রহমতের কোন গণ্ডী-সীমা নেই। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা-

নির্বিশেষে মানুষ তথা প্রাণীমাত্রেরই এতে হক বা অধিকার আছে। তদুপরি তিনি বিংশ শতাব্দীরই একজন সচেতন মানুষ, যখন জাতিসংঘের মতো সার্বজনীন সম্মিলন সংস্থা গঠিত হয়ে মানবজাতিকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য অক্ষত্ন রেখে অভিন্ন প্লাটফরমে দাঁড় করিয়ে কল্যাণ ও শান্তির ছায়াতলে সংস্থাপনে কার্যকর প্রয়াসের পত্তন ঘটেছে।

তাসাওউফের দৃষ্টিভঙ্গীর বিচারেও মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের জমিতে কোন প্রকার ধর্ম-বিশ্বাস কিম্বা আক্বিদাগত বিধি-নিষেধ দৃশ্যমান নয়। অতীতের যে কোন ত্বরিকার অনুসারীদের জন্য এখানে এসে নিজ নিজ রেওয়াজ অনুযায়ী ইবাদত-বন্দেগী-জিকির-আজকার নিবেদন করে ফয়েজ পাওয়ার সুযোগ অবারিত রয়েছে। এই ব্যবস্থা বেলায়তে মোত্লাকা বা মুক্ত বেলায়তের ধারণা ও দর্শনের পরিপোষক। অন্য ধর্মাবলম্বীরাও হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ (র.), হযরত খাজা বাবা (র.), হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র.), হযরত ফরিদ উদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর (র.) প্রমুখ অলি-আল্লাহ্দের দরবারের মতো এখানে এসে নিরাপত্তা, শান্তি, স্বস্তি ও মুক্তি খোঁজেন এবং সেই নৈতিক-মানবিক অধিকার তাঁদের রয়েছে।

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) একাধিকবার বলতে শোনা গেছে, "দুনিয়াবী সৎ আর্জি আমার ঘেরা-বেড়াকে বলে গেলেও হয়।...আল্লাহ্, মারিফাত তালাশীরা কই?" এ তো যেনো বাউন্ডারী বিহীন উন্মুক্ততা!! তাঁর অমর বাণী: "আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস, আল্লাহ্র ঘর, সকল জাতির মিলন কেন্দ্র"। এই বাণী যেন মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদিতার প্রত্যয়ন মোহর।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা মুক্ত বেলায়তের এই নবতর ভুবনের আবাদ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় মানদণ্ডে গতানুগতিক সুফি মতবাদে যুগোপযোগী সংস্কারই বটে।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. F. Rahman, Major Themes of The Quran, University of Chicago, USA. P-1;
২. গঠনতন্ত্র, আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী, ১৯৬৯, পৃ: ১.

পঞ্চম অধ্যায়

উসুলে সাবয়া বা সপ্ত পদ্ধতি : মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আত্মশুদ্ধিমূলক সর্বজনীন মৌলিক আচরণবিধি

১. তাসাওউফের অন্বিষ্ট মানব-স্তরঃ

হাজার বছরের দর্শন-চর্চার এযাবৎকালীন উপসংহার এই যে, ইনসান-ই-কামিল বা পূর্ণাঙ্গ মানব নির্মাণই তাসাওউফের অন্বিষ্ট। আল-কুরআনের সূরা বাক্বারার (২:২৯-৩৮) আয়াতের বর্ণনানুযায়ী পৃথিবীতে আল্লাহ্ তাঁর খলিফা প্রেরণের ইচ্ছা প্রকাশের জন্য আহূত ফেরেশ্তাদের সমাবেশ অনুষ্ঠানের পূর্বেই হযরত আদম (আ.) এবং অতঃপর তাঁর সঙ্গী পত্নী হযরত হাওয়াকে (আ.) সৃষ্টি করে অভিন্ন নফ্স বা প্রাণসত্তা থেকে (নফ্সে ওয়াহেদাতঃ ৪:১.৩১:২৮)। আল্লাহ্ আদমকে সকল বস্তু সম্পর্কিত জ্ঞানে বিভূষিত করেন। এরপর ঐ সমাবেশে আদম ও ফেরেশ্তাদের জ্ঞানের পরীক্ষা হয় প্রকাশ্যে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ আদমকে ফেরেশ্তারা আল্লাহ্র আদেশে সিজদা করলেন। আর আগুন থেকে সৃষ্ট ইবলিশ অহঙ্কারবশতঃ সিজদা করতে অস্বীকার করলো এবং বললো ঃ "আমি উহা থেকে শ্রেষ্ঠ। আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে" (৩৮:৭৬)। এরপর আদমকে বলা হলঃ "আপনি ও আপনার স্ত্রী (জাউযু) দু'জনেই জান্নাতে বসবাস করতে থাকুন। যেথা ইচ্ছা স্বচ্ছন্দে আহার করুন। কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হবেন না; হলে জালেমদের অন্তর্ভুক্ত হবেন। কিন্তু শয়তান তাঁদের দু'জনেরই পদস্খলন ঘটালো এবং তাঁরা যেখানে ছিলেন সেখান থেকে তাঁদেরকে বহিষ্কার করা হলো। আমি বললাম, "তোমরা একে অন্যের শত্রুরূপে নেমে যাও, পৃথিবীতে কিছুকালের জন্য তোমাদের বসবাস ও জীবিকা রইলো। অতঃপর আদম তাঁর রবের কাছ থেকে বাণী প্রাপ্ত হলেন, (আল্লাহ্) তাঁর প্রতি ক্ষমাপরবশ হলেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। আমি বললাম, তোমরা সকলেই এই স্থান থেকে নেমে যাও। পরে যখন আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সৎপথের কোন নির্দেশ আসবে, তখন যারা সৎপথ অনুসরণ করবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবেনা" (২: ৩৫-৩৮)। এই একই বিষয় সূরা ত্বা-হা-এর ১২৩নং আয়াতে পুনরুল্লেখ করে বলা হয়েছেঃ "আমার পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সরল পথের নির্দেশ এলে যে আমার পথ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না কিম্বা দুঃখ-কষ্ট পাবেনা (২০:১২৩)।"

আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতগুলোর অন্তর্নিহিত দর্শন এই যে, প্রত্যেক মানুষকে তার নফ্স বা রিপুর বিরুদ্ধে লড়তে হবে, যতোক্ষণ না সেগুলোর উপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম হয়। শাশ্বতিক বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট গ্রন্থ আল-কুরআনের বাণী প্রত্যেক আদম সন্তানের জন্যই প্রযোজ্য। উল্লেখ্য, কুরআন সকল মানব সন্তানেরই পথ প্রদর্শক হিসেবে নাজেল হয়েছে। তাসাওউফ নফ্স নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়াকে সহজতর ও কার্যকর করে প্রত্যেক মানুষকে ইনসান-ই-কামিল হবার পথে এগিয়ে দেয়। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে এই প্রক্রিয়া 'উসুলে সাবয়া' শিরোনামে বিবৃত।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, কুরআনে উপরোক্ত পরামর্শ সভা বা সংসদের উল্লেখের মধ্যে পরামর্শমূলক ও প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বীজ বপন করা আছে, যা বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের অন্যতম বাণী ও কাঙ্ক্ষিত বস্তু। আরো একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত জীবনধারণ সম্ভব নয় বিধায় মানুষকে সমাজের সবার মধ্যে থেকেই নিজের ও অন্যদের কল্যাণের কথা ভাবতে হবে ও সেভাবে কাজ করতে হবে। উসুলে সাবয়া কিম্বা তদনুরূপ অনুশাসনগুলো সমাজের সামগ্রিক কল্যাণে প্রত্যেক ব্যক্তিরই উপযোগী। উসুলে সাবয়া রিপু নিয়ন্ত্রণের ব্যবহারিক তালিম। মন-দেহ পরিশোধনের মাধ্যমে সৎ-পরিচ্ছন্ন মানুষ নির্মাণই এর অন্যতম প্রধান লক্ষ্য।

২. উসুলে সাবয়াঃ "মানুষের নিজের প্রতি কর্তব্য ও যথার্থ মানুষ গঠন প্রণালী":

হযরত জুনায়েদ বোগদাদী (র.) কুরআন-হাদিসের বাণী, খোলাফায়ে রাশেদার শিক্ষা এবং মনস্বী সাহাবায়ে কিরাম ও পূর্ববর্তী ওলী-দার্শনিকদের শিক্ষার অন্যতম মর্মাংশ হিসেবে মানবের জাগতিক জীবনকে দু'ভাগে বিভক্ত করেনঃ (ক) হক্কুল্লাহ্, (খ) হক্কুল ইবাদ। অর্থাৎ যথাক্রমে আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্য ও সৃষ্ট জীবের প্রতি কর্তব্য। তবে হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) এই কর্তব্য-তালিকায় একটা নতুন বিষয় যুক্ত করেন; তা হলো 'মানুষের নিজের প্রতি কর্তব্য'। কুরআন-হাদিসের নির্দেশনা অনুসারে তিনি এটাকে আবার দু'ভাগে ভাগ করেছেনঃ (ক) আত্মদোষ সংশোধন, (খ) আত্মসৌষ্ঠব সম্পাদন। মানুষের সুষ্ঠু ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, জীবনের পবিত্র– সৃজনশীল গতিময়তার প্রয়োজনে এতদসংক্রান্ত কর্মানুষ্ঠানের পয়েন্টওয়ারী বিবরণও দেওয়া হয়েছে, যাতে অনুসরণ ও অনুশীলনের সুবিধা হয়। 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে বিন্যস্ত উসুলে সাবয়া বা সপ্ত কর্মপদ্ধতি ইমাম গাজ্জালীর (র.) 'যথার্থ মানুষ গঠন প্রণালীর' সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত সার।[১] মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত মানুষের নিজের প্রতি কর্তব্যকে বাস্তব জগতে যথার্থ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে স্থাপন করেছে এবং এই তাগিদ থেকে অছিয়ে গাউসুল আযম 'কিমিয়ায়ে সাআদাতের' পটভূমিতে 'মুসলিম আচার ধর্মের' মটো নির্মাণ করেছেন কবিতা আকারে :

"প্রবৃত্তি নিবৃত্তি ভবে জান তিনভাবে,
বাক-বিতণ্ডা পরিহারে, জানার আগ্রহে
পরদোষ পরিহারে, নিজ দোষ ধ্যানে,
শুধাইনু সুধিজনে সুধির ভাষণে,
না'দেখাইবে পীর যাকে এই তিন ধারা
আসিবে না সোজা পথে সেই পথ হারা।"[২]

৩. উসুলে সাবয়াঃ মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের অনুসারীদের সহজ আত্মকর্ম পদ্ধতিঃ

ক. প্রত্যেক ত্বরিকা, সিলসিলা প্রবর্তক কামেল অলি-আল্লাহ্‌রা নিজেদের অনুসারী বা বায়াত গ্রহণকারীদের ব্যক্তিগত পরিশুদ্ধির জন্য কিছু প্রকরণ বা নীতিমালা প্রণয়ন করে সেগুলো এস্তেমাল ও আমল করার উপদেশ দেন। এসব নীতিমালা সাধারণতঃ সহজে আমলযোগ্য হয় এবং বহুলাংশে ব্যক্তিগত ইচ্ছা, আগ্রহ ও নিষ্ঠার উপর নির্ভরশীল।

খ. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তেও তেমনি সহজে আমলযোগ্য সাত প্রকার "শুদ্ধি প্রণালী" বা কর্মপন্থা নির্ধারণ করা হয়েছে। এগুলো হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)-এর হেদায়ত বাণীসমূহের সার সংক্ষেপ এবং আচরণবিধি, যেগুলোকে তিনি "কার্যকরী প্রত্যক্ষ কুরআনী হেদায়েত" বলে সাব্যস্ত করেন। পূর্ববর্তী মহান অলি-আল্লাহ্-দার্শনিকদের ধারাবাহিকতায় তিনি নিজ কালে ও পরিমণ্ডলে সহজবোধ্য ও সহজে আমলযোগ্য এই নীতিগুলো "বাংলা ভাষায় লিখিত আকারে" জাহির করেন, যা তাঁর ভাষায় কুরআনী হেদায়ত। নবীজীর (দ.) জবানীতে সমগ্র মানবজাতির জন্য চিরবর্তমান হেদায়েত গ্রন্থ আল-কুরআনের হেদায়েতপ্রসূত এই সপ্ত পদ্ধতি সর্বজনীনভাবে মুসলমানসহ সকল সম্প্রদায় ও সকল ধর্মাবলম্বীর তথা আল্লাহ্‌র সকল বান্দার জন্য বিতর্কাতীতভাবে গ্রহণযোগ্য ও সহজে পালনযোগ্য আইনুল ইয়াকিন ও হক্কুল ইয়াকিন জনিত বস্তু (চাক্ষুষ সত্য ও ধ্রুব সত্য)।

এই সপ্ত কর্মপদ্ধতি[৩] দু'ভাগে বিভক্ত: প্রথম ভাগ ফানায়ে ছালাছা, দ্বিতীয় ভাগ মউতে আরবাআ।

প্রথম ভাগঃ রিপুর ত্রিবিধ বিনাশ বা ফানায়ে ছালাছা। **ক.** ফানা আনিল খাল্ক, অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন। কারো কাছ থেকে কোন উপকারের আশায় বসে না থাকা। যাঞ্চা না করা। এতে মন আত্মনির্ভরশীল হয় এবং নিজের শক্তি-সামর্থ্যের প্রতি আস্থা জন্মে। **খ.** ফানা আনিল হাওয়া, অর্থাৎ অপ্রয়োজনীয় কর্ম ও কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা। এতে অনেক ঝুট-ঝামেলা থেকে রেহাই পাওয়া যায়। **গ.** ফানা আনিল এরাদা অর্থাৎ নিজ বাসনা-কামনা ও নফ্‌সানী ইচ্ছাকে দমন, নির্মূল করে আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতে বিলীন করা, সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কাল করা বা নির্ভরশীল হওয়া।

দ্বিতীয় ভাগঃ মউতে আরবাআ বা চতুর্বিধ মৃত্যু। মউতে আরবাআ সম্পর্কে আলোকপাত করার পূর্বে নবীজীর (দ.) এই হাদিসে কুদসী প্রণিধানযোগ্যঃ "মুতু কাব্‌লা আন্‌-তামুতু (মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণ করো)।" 'মৃত্যুর পূর্বে মৃত্যুবরণ'-এর তাৎপর্য হলো এক কথায় রিপু দমন এবং ফলাফলের আকাঙ্ক্ষাশূন্য সৎ জীবন যাপন।

মউতে আরবাআ বা চতুর্বিধ মৃত্যুঃ

ক. মউতে আব্‌য়্যাজ অর্থাৎ সাদা মৃত্যুঃ এটা সংযম ও উপবাসে আয়ত্ত হয়। নফ্‌স দুর্বল হয় এবং মনে নূরের ঝলক লাগে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা ছাড়া অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরাও উপবাস এস্তেমাল করেন এবং অতীতের হাজার বছরের ইতিহাসেও রোজা বা উপবাসের ইতিবাচক রেওয়াজ দৃশ্যমান।

খ. মউতে আছওয়াদ বা কালো মৃত্যুঃ শত্রুর শত্রুতা, নিন্দা, সমালোচনাকে আত্মসমালোচনার উপায় হিসেবে সহজভাবে গ্রহণ করে আত্মসংশোধনপূর্বক অনুতপ্ত হৃদয়ে আল্লাহ্‌র শোকর-গুজারী করার মাধ্যমে এটা আয়ত্ত হয়। এ প্রসঙ্গে নবীজীর (দ.) হাদিসঃ "সত্যই তোমরা প্রত্যেকে তার ভাইয়ের জন্য দর্পণস্বরূপ। ভাইয়ের কোন দোষ থাকলে তা অবশ্যই তাকে দেখিয়ে দেবে, যেন সে তা পরিহার করতে পারে"।

গ. মউতে আহমর বা লাল মৃত্যুঃ এটা কামভাব ও লালসা বর্জনপূর্বক ভোগস্পৃহা থেকে মুক্তিতে হাসিল হয় এবং বেলায়তপ্রাপ্ত হয়ে অলীয়ে কামেলদের মধ্যে গণ্য হয়। এ প্রসঙ্গে হাদিসঃ "মানুষ যখন ব্যভিচার করে, ঈমান তাকে ত্যাগ করে। কিন্তু, সে যখন এরূপ কুকর্ম পরিত্যাগ করে, ঈমান তার কাছে ফিরে আসে"।

ঘ. মউতে আখজার বা সবুজ মৃত্যুঃ নির্বিলাস জীবন যাপনে অভ্যস্ত হলে এটা হাসিল হয়। যার ফলে মানব-অন্তরে স্রষ্টার প্রেম-ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোন কামনা-বাসনা থাকেনা। এটা বেলায়তে খিজরীর অন্তর্গত।

"এই কুরআনী হেদায়তের সপ্তকর্ম পদ্ধতি জীবনের এক সহজ সরল ও স্বাভাবিকপন্থা, যাহা মানব জীবন পদ্ধতিতে স্বাচ্ছন্দ্য আনয়ন করে। এই সপ্তকর্ম পদ্ধতি সংসার জীবনের বোঝা হাল্কা, সরল ও সহজসাধ্য করে। পরকালীন জীবনকে আনন্দ ও মধুময় করে এবং পরের দুঃখ-কষ্টের কারণ না হইয়া বরং বন্ধুসুলভ হিতার্থীরূপে দেখা দেয়। এই সপ্তকর্ম পদ্ধতি ইসলামী সুফি মতবাদ মতে "ফানায়ে নফ্‌সী" প্রবৃত্তির বিনাশ এবং 'বাকাবিল্লাহ্‌র' বিভিন্ন উসুল বা পদ্ধতির মধ্যে তুলনামূলকভাবে সহজসাধ্য ও ঝামেলা মুক্ত।"

এই উসুলে সাবয়া মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সর্বজনীন প্রকরণ বা আচরণবিধি।

৪. উসুলে সাবয়ার ঐতিহাসিক নূরানী পটভূমিঃ

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদ দু'টোতে ব্যক্ত হয়েছে যে, হযরত আকদাস (ক.) উসুলে সাবয়াকে প্রত্যক্ষ "কুরআনী হেদায়েত" হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শনার্থী-হাযতী-মাকসুদীকে প্রকাশ্যে যেসব নসিহত করতেন, সেগুলোই এই শিরোনামে বিন্যস্ত। এখানে "কুরআনী হেদায়েত"-এর হেরা-কন্দরের দিকে একটু দৃষ্টি-নিক্ষেপ করা যাক। কারণ, কুরআনে বর্ণিত সকল নবী-রসূল এবং তাঁদের উত্তরসূরি সকল অলি-আল্লাহ্, দার্শনিকরা বিশ্বস্তভাবে এই কুরআনী হেদায়েতের আলোর প্রদীপই ধারণ করেন। প্রত্যেক অলি আল্লাহ্ কুরআন ও হাদিসের শিক্ষাগুলো থেকে নিজ নিজ সময় পরিবেশ, পারিপার্শ্বিক চেতনার মানদণ্ডসম্মতভাবে চয়ন করে স্বীয় অনুসারীদের আমলযোগ্য আচরণ-সনদ (charter of conduct) প্রণয়ন করেন।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আচরণ সনদ উসুলে সাবয়ার বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং ফলিত বা আমলের শেকড়ও কুরআনেই প্রোথিত। এ প্রসঙ্গে আমরা কুরআন-হাদিস এবং মহান অলি আল্লাহ্, দার্শনিকদের বাণী ও নসিহত অধ্যয়ন করবো:

(ক) আল কুরআনঃ আল-কুরআনের পুরোটা জুড়ে রয়েছে পৃথিবীর বাসিন্দা মানবমণ্ডলীর প্রতি হিতোপদেশ ও কর্মপন্থার নির্দেশনা। উসুলে সাবয়ার উৎসমূলও যে এখানে, তার প্রামাণ্যতার জন্য নিম্নে কতিপয় আয়াত উদ্ধৃত করা যাচ্ছে, যা মানবজাতির আবির্ভাবকাল থেকেই শাশ্বতরূপে বিদ্যমান : (১) সূরা বনী ইস্রাইল, ১৭: ২৩-৪০; এগুলো নাযিল হয় বনী ইস্রাইলের উদ্দেশ্যে, যার মর্মবাণী তাদের পূর্ববর্তীদের উপরও নাযিল হয়েছিল। এ আয়াতগুলোর শুরুতে এবং সমাপ্তিতে প্রথমেই নিরঙ্কুশ তৌহিদে ঈমান রাখতে, মাতা-পিতা-সন্তান-আত্মীয়-স্বজন-প্রতিবেশীর হক্ব ও তাদের প্রতি কর্তব্য, সৎকর্মশীলতা পবিত্র জীবনাচারের শিক্ষা বিধৃত। তৌহিদের উপর সর্বপ্রথম গুরুত্ব আরোপপূর্বক তেমন উপদেশ রয়েছে সূরা লুকমানের ৩১:১৫-১৯ আয়াতে। বান্দার প্রতি অসীম করুণাময় আল্লাহ্র উপদেশরূপী মমতার নিদর্শন স্বরূপ রয়েছে আরো অনেক আয়াত। (২) সূরা মুমতাহিনার ৬০:১২ আয়াতে মুমিন নারীদের আচরণবিধি সম্পর্কিত শিক্ষা পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ। এখানেও তৌহিদের প্রতি ঈমানই প্রথম শর্ত। এই তৌহিদই মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের প্রথম ভিত্তি-সোপান।

(খ) আল-হাদিসঃ আল-কুরআনের অনুসরণে জীবনের বাস্তবতার আলোকে প্রাত্যহিক জীবনে অনুসরণীয় উপদেশের সমাহার রয়েছে আল-হাদীসে। ব্যক্তিগত ছাড়াও পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, প্রশাসনিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিকসহ সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নসিহত-নির্দেশনা এতে বিদ্যমান। মাত্র দু'একটা উদাহরণ দেওয়া গেল: (ক)

তোমার আপন আচরণের ফলেই তুমি পাবে পুরস্কার কিম্বা দন্ড, যেন এটাই তোমার জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে, (খ) যে আপন শ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, ভিক্ষা দ্বারা নয়; আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহশীল: **ফানা আনিল খাল্ক**।

(গ) আমি নবীজীকে (দ.) জিজ্ঞেস করলাম: ইসলাম কি? তিনি বললেন, 'সংযম ও আনুগত্য'। অতঃপর জিজ্ঞেস করলাম; সর্বোত্তম ঈমান কি? তিনি বললেন 'নম্র স্বভাব'। তারপর জানতে চাইলাম, 'সর্বোত্তম হিযরত কি'? তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ যা অপছন্দ করেন, তা পরিত্যাগ করা': **ফানা আনিল হাওয়া**।

(ঘ) আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কাল রাখলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে পালন করবেন। যেমন পাখীদের করেন; তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়, আর ক্ষুধা মিটিয়ে আপন নীড়ে ফিরে: **ফানা আনিল ইরাদা**।

(ঙ) নফ্সকে জয় করাই সর্বশ্রেষ্ঠ জেহাদ: **মউতে আবয়াজ**।

(চ) অহংকারী ব্যক্তি বেহেশ্তে প্রবেশ করবে না, উগ্রভাষীও না: যে ব্যক্তি নিজেকে ক্রোধ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারেনা, সে বলিষ্ঠ ও শক্তিমান নয়: অভ্যস্ত ব্যভিচারী, মিথ্যাভাষী নরপতি, দাম্ভিক দরবেশ–এরা অভিশপ্ত ব্যক্তি, সত্যিই তোমরা প্রত্যেকে তার ভাইয়ের জন্য দর্পণস্বরূপ, ভাইয়ের কোন দোষ থাকলে অবশ্য তাকে দেখিয়ে দেবে, যেন সে তা পরিহার করতে পারে: **মউতে আসওয়াদের মোড়কের অন্তর্ভুক্ত**।

(ছ) সে মুমিন নয়, যে ব্যভিচার, চুরি, কিম্বা মদ্য পান করে, অথবা যে লুণ্ঠন করে বা পরের ধন আত্মসাৎ করে; সতর্ক হও, সতর্ক হও: **মউতে আহমর**।

(জ) আমি একান্তভাবে সেই বন্ধুটির সমকক্ষ হতে চাই, যে ভারমুক্ত এক মুসলিম অর্থাৎ যার পরিবার ছোট ও টাকা-কড়ি সামান্য, সে সালাতে নিয়মিত ও নির্জনে খাঁটি উপাসক, সে অখ্যাত থাকে এবং যা আছে প্রয়োজন মিটাবার জন্য তাই যথেষ্ট মনে করে; যার মৃত্যু ত্বরা হবে, যার জন্য কাঁদবে অল্প কয়েকজন নারী আর রেখে যাওয়া সম্পদ হবে সামান্যই: **মউতে আখ্জার**।

(ঝ) নবীজী (দ.) বলেন: আমার রব্ আমাকে নয়টি কাজের আদেশ দিয়েছেন, (১) তাঁকে বাহিরে ও অন্তরে ভক্তিকরণ, (২) সুখে-দুঃখে সত্য কথা বলা, (৩) সম্পদে ও দারিদ্রে মিতাচারী হওয়া, (৪) জ্ঞাতিজনের উপকার করা, তারা না করলেও, (৫) যে আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাকেও দান করা, (৬) আমার ক্ষতিকারককে ক্ষমা করা, (৭) আমার নীরবতা হবে ঐশী জ্ঞানের (মারিফাতের) নিমিত্ত, (৮) কথা বলার সময় আল্লাহ্র নাম করা, (৯) আল্লাহ্র সৃষ্ট জীবদের সম্মুখীন হলে তাদের জন্য নিজেকে আদর্শ স্বরূপ করা এবং আল্লাহ্ আমাকে প্রেরণ করেছেন বৈধ পথে চালনা করতে [প্রাত্যহিক আচরণবিধির নির্যাস]।

(গ) নবীজীর (দ.) জীবন থেকে কিছু সর্বজনীন আচরণ বিধির দৃষ্টান্তঃ

(১) আরবের ইতিহাসখ্যাত ফিজার যুদ্ধের (৫৮০-৫৮৫) সময় নবীজী (দ.) তাঁর পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে বারো বছর বয়সে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়ায় যান। বিরোধীয় পক্ষগুলোর মধ্যে চারবার পারস্পরিক জয়-পরাজয়জনিত অগণিত লোকক্ষয় ও সম্পদ ক্ষয়ের প্রেক্ষাপটে পিতৃব্য তাঁকে নিয়ে মক্কায় ফিরে আসেন। উভয় পক্ষ হৃতবল হয়ে সন্ধিস্থাপনে বাধ্য হয়। যুদ্ধের ধ্বংসলীলা তাঁর মনে ভীষণ রেখাপাত করে এবং এই তরুণ বয়সে শান্তি স্থাপনে উদ্যোগী হলেন। কোরেশপক্ষের রণপতাকাধারী তাঁর অন্যতম পিতৃব্য জুবায়ের বিন আবদুল মুত্তালিব ভ্রাতুষ্পুত্রের পাশে দাঁড়ালেন এবং তাঁদের দু'জনের সহ-উদ্যোগে ইতিহাসখ্যাত 'হিল্‌ফুল-ফুজুল' বা শান্তি সংঘ (Confederacy of Fudul) গঠিত হয়, যাতে বনু হাশিম, বনু জোহরা ও বনু তায়েম গোত্রের নেতারা যোগ দেন। এই সংঘের হলফনামা ছিল (১) আমরা নিঃস্ব, অসহায় ও দুর্গতদের সেবা করবো, (২) অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দেবো, (৩) অত্যাচারিতকে সাহায্য করবো, (৪) দেশের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করবো এবং (৫) বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করবো।[৪] এই হলফনামা নবীজীর (দ.) পরবর্তী জীবনে সকল প্রকার কার্যক্রমে সক্রিয় ছিল। এ প্রসঙ্গে একটি হাদিস: "যদি কোন উৎপীড়িত ব্যক্তি বলে "হে, আহলে হাল্‌ফুল ফুযুল! আমি তার আহ্বানের উত্তর দিই। কারণ, সত্য প্রতিষ্ঠা ও উৎপীড়িত ব্যক্তির সাহায্যের জন্য ইসলাম সমাগত হয়েছে"। লক্ষ্যণীয় যে, ১৯৩৯ খৃঃ থেকে প্রায় ছয় বছর ব্যাপী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় সম্মিলিত জাতিসংঘ। এর আগে ১৯২০ সনে গঠিত হয় 'লীগ অব নেশন্‌স'; যা এই মহান উপলব্ধিরই অনুসরণিকামাত্র। আরো আগে অবশ্য বিভিন্ন জাতির সমকালীন উত্তেজনাপূর্ণ যুদ্ধাবস্থা পরিহার করার মানসে কংগ্রেস অব ভিয়েনা, ১৮১৪; হোলি এ্যালায়েন্স, ট্রিপল এ্যালায়েন্স ১৮৮২, ট্রিপল এ্যালটেনটি প্রভৃতি বহুজাতিক শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হয়, যাতে কার্যতঃ হিল্‌ফুল ফুযুলের শান্তির আকুতিই কথা কয়ে উঠেছে।

(২) ৬০৯ খিস্টাব্দের ২৭শে রমজান অর্থাৎ ২৭ শে রমজানের দিবাগত রাতে প্রথম ওহী (সূরা আলাক ৯৬:১-৫) ও নবুয়ত প্রকাশের পর ঘরে ফিরে হযরত খাদীজাকে (রা.) বিবরণ অবহিত করলে তিনি নবীজীকে (দ.) সমর্থন ও অভয় দিয়ে বললেন; (ক) আপনি আত্মীয়তার হক্ব আদায় করে চলেন, (খ) আপনি সদা সত্যবাদী, (গ) আপনি পূর্ণমাত্রায় বিশ্বাসী আমানতদার, (ঘ) আপনি অনাথ, অক্ষম, এতীম, বিধবা, অন্ধ, খঞ্জের বোঝা বহন করেন, (ঙ) আপনি বেকার সমস্যার সমাধান করেন, (চ) আপনি মেহমানদের খেদমত করে থাকেন, (ছ) আপনি যাবতীয় দুর্যোগের ক্ষেত্রে দুঃস্থদের সাহায্যার্থে জীবনকে উৎসর্গ করে রেখেছেন।[৫] হযরত খাদীজার (রা.)

জবানীতে নবীজীর (দ.) নবুয়ত প্রকাশপূর্ব 'শুদ্ধ জীবনের এই বৈশিষ্ট্যগুলো' কার্যতঃ তাঁর নিজস্ব আচরণ-বিধি বটে।

(৩) ৬২১ খৃস্টাব্দে আল-আকাবায় ১২ জন আনসার যে আচরণবিধির প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, তাতে ছিল: (ক) আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরিক করবো না, (খ) চুরি করবো না, (গ) ব্যভিচার করবো না, (ঘ) নিজ সন্তানকে হত্যা করবো না, (ঙ) প্রতিবেশীদের নামে কোন গীবত করবো না, (চ) তাদের ন্যায় কথা অমান্য করবো না। এই প্রথম শপথ ইতিহাসে যেটি 'বায়াত-আন-নিছা' বা 'রজনীর ওয়াদা' নামে পরিচিত। এর মাধ্যমে নবুয়তের কর্মসূচীর সাংবিধানিক ভিত্তি রচনার সূত্রপাত ঘটে।

(৪) ৬২২ খৃঃ ১১ জিলহজ আল-আকাবার দ্বিতীয় ওয়াদায় দু'জন মহিলাসহ ৭৩জন শরিক ছিলেন। এই ওয়াদা কার্যতঃ একটা নতুন রাষ্ট্র পত্তনের ভিত্তি স্থাপন, প্রতিরক্ষা নীতি, প্রতিনিধিত্বশীল সংসদীয় প্রক্রিয়া বিশিষ্ট আধুনিক পরিভাষায় গণতান্ত্রিক-প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থার সূত্রপাত ঘটায়। এরপর গঠিত হয় দৌলতুম মদীনা। এই দ্বিতীয় আকাবার ওয়াদা তথা আচরণ বিধির ব্যাপকতা যুগপৎ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক। ওয়াদাকারীরা এতে আমৃত্যু আনুগত্যশীল ছিলেন।[৬]

(৫) আত্মসংশোধনের পথ ধরে সামাজিক সংশোধনের নীতিমালা অনুসরণের দৃষ্টান্ত আল-কুরআন, নবীজীর (দ.) জীবন থেকে সূচিত হয়ে বহু স্তর পার হয়ে হযরত আলীতে (ক.) এসে নবতর রূপ পরিগ্রহ করে। তিনি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, সামাজিক শৃঙ্খলার পাশাপাশি ব্যক্তির আত্ম-সংশোধনের লিখিত নীতিমালা রেখে যান, যা মানব সভ্যতার অগ্রগতির অমূল্য দলিল। তাসাওউফীয় আত্মশুদ্ধির প্রাতিষ্ঠানিক সূত্রপাতও তাঁর বাণী থেকে।

(৬) তাসাওউফীয় আত্মশুদ্ধির এই ধারা হযরত ওয়াইস করণী (র.), হযরত ইমাম জাফর সাদিক (র.) (৮৩ হিঃ-১৪৮ হিঃ), হযরত হাসান বসরীর (র.) (৬৪২-৭২৮ খ্রি.) হাত ধরে মালিক বিন দিনার (র.) (ইন্তিঃ ৭৪৮ খ্রি.), হাবিব-আল-আজমী (র.), তাপসী রাবেয়া আদাবিয়া (র.) (ইন্তিঃ-৭৫২ মতান্তরে ৮০২ খ্রি.), ফুযায়েল ইবনে আয়াজ (র.) (ইন্তিঃ-৮০৩), ইব্রাহিম আদহাম (র.) (ইন্তিঃ-৭৮২ খ্রি.), বিশর ইবনে হারেস (র.) (৭৬৭ খ্রি., মতান্তরে ৮৪১ খ্রি.), হযরত জুন্নুন মিশরী (র.) (৭৯৬-৮৬১ খ্রি.) [ধর্ম বিষয়ে নব্যতন্ত্র বা heresy-র অভিযোগে সুলতান কর্তৃক কারাবন্দি], হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.) (ইন্তিঃ-৮৭৪/৮৭৭ খৃঃ), আবদুল্লাহ্ বিন আল-মোবারক (র.) (৭৩৬-৭৯৭ খ্রি.), হযরত সুফিয়ান সাওরী (র.) (৭১৫-৭৭৮ খ্রি.), দাউদ আত-তায়ী (র.) (ইন্তিঃ-৭৭৭ মতান্তরে ৭৮২ খৃঃ), হযরত সহল আল তশতরী (র.) (৮১৫-৮৯৬ খ্রি.), হযরত মারুফ কারখী (র.) (মৃত্যু-৮১৫ খ্রি.), হযরত সার্‌রী সাক্‌তি (র.) (ইন্তিঃ-৮৬৭ খ্রি.), ইয়াহিয়া ইবনে মুয়ায (র.) (ইন্তিঃ-৮৭১ খ্রি.), ইউসুফ ইবনে

আল-হোসাইন (র.) (ইন্তিঃ-৯১৬ খৃঃ), হযরত জুনায়েদ বাগদাদী (র.) (ইন্তিঃ-৯১০ খ্রি.), আমর ইবনে ওসমান (র.) (৯০৪ মতান্তরে ৯১০ খ্রি.), আবুল হোসাইন আন্-নুরী (র.) (ইন্তিঃ-৯০৮ খ্রি.), আবু ওসমান হিরি (র.) (ইন্তিঃ-৯১১ খ্রি.), ইবনে আতা (র.) (ইন্তিঃ-৯২২ খ্রি.), আলী ইবনে আল-হোসাইন আল-তিরমিজি (র.) (ইন্তিঃ-৮৯৮ খ্রি.), ইবনে খফীফ (র.) (৮৮২-৯৮২ খ্রি.), মনসুর হাল্লাজ (র.) (৮৫৭/৫৮-৯২২ খ্রি.); [তিনি হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর সাহচর্যে থাকা অবস্থায় তাঁকে নীরবতা ও নির্জনতা অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা না করে সরবতা অবলম্বন করেন এবং চরম জজবিয়াতের পর্যায়ে হযরত আবু বকর শিবলীকে (র.) বলেন, 'আনা'ল হক। কেননা আল্লাহ্ ছাড়া আমাতে আমি অন্যকোন আমি দেখতে পাইনা।' ফলে তাঁর বিরুদ্ধে অবতারবাদ বা incarnation (স্রষ্টার জীবদেহ ধারণ, যীশুতে আল্লাহ্'র শরীর পরিগ্রহ)-এর অমূলক অভিযোগে কূলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়];[৬(ক)] আবু বকর শিবলী (র.) (ইন্তিঃ-৮৪৬ খ্রি.) প্রমুখের মাধ্যমে অদ্যাবধি প্রবাহিত আছে। তাঁদের প্রত্যেকের জীবনী-গ্রন্থগুলোতে তাঁদের নসিহত ও শিক্ষার সংক্ষিপ্তসারসূচক বাণী লিপিবদ্ধ আছে। এগুলোই তাঁদের অনুসারীদের জন্য উসুল হিসেবে অনুসরণীয় ছিল।[৭] এসব মহান অলি-আল্লাহ্ নিজ নিজ স্থান কাল পরিবেশের প্রেক্ষিতে ব্যক্তি ও সমাজ পরিশোধনপূর্বক কল্যাণমূলক একটা সমাজ তথা পৃথিবী নির্মাণের কথা ভাবতেন।

৭. এখানে একটা কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, মানুষের ধর্ম হিসেবে ইসলাম জাগতিক-মারিফতি জিসমানী-রূহানী উভয় দিকের ভারসাম্যমূলক সমন্বয় সাধন করেছে। খোলাফায়ে রাশেদার পর পারিবারিক আমীরতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে মুসলিম সমাজ ইসলামের সমতাবাদী সমাজ-পরিকল্পনার সড়ক থেকে ছিটকে পড়ে। সমকালে অনেক জ্ঞানী-গুণী-দার্শনিক এর প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালে তাদেরকে মৃত্যুসহ চরম নিগ্রহের শিকার হতে হয়। এ অবস্থায় আত্মরক্ষা করে ইসলামের মূলনীতিগুলোকে কার্যকরভাবে চলমান রাখার উদ্দেশ্যে অনেকে সক্রিয় তাসাওউফের আশ্রয় গ্রহণ করেন। মূলতঃ, ইসলামের আবুদিয়াত ও রবুবিয়াত নীতি তাঁদের মাধ্যমেই অবিকৃত থাকতে পেরেছে। তাঁদেরকে ঠেকানোর জন্য তৎকালে এক শ্রেণীর দরবারী উলেমার উদ্ভব ঘটে, যারা আমীরতান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতির ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হন। তবে ইতিবাচক ইতিহাসে এখন এদের নাম-নিশানাও নেই।

এখানে আরো একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, খোলাফায়ে রাশেদার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইসলামের মূলনীতি ও আদর্শ সজীব রাখার জন্যে দার্শনিক-আউলিয়ারা যেভাবে সাধনা ও সংগ্রাম করেছেন, তেমনিভাবে আরো আগে পূর্ণ মাত্রায় জীবন বাজী রেখে ইসলাম তথা কুরআনের আদর্শ পৃথিবীতে পত্তন করার লক্ষ্যে যারা নবীজীর

(দ.) সঙ্গে সংগ্রাম-সাধনা ও কষ্টকর জীবন যাপন করেছেন, তাঁদের বিবরণ বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় কারণে পাশ্চাত্যে উপেক্ষিত ও বিকৃত হয়েছে।

পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী জগতের বৃহৎ অংশ মুসলিম মিস্টিক বা মরমীবাদী সাহিত্যের প্রতি যতোটা আগ্রহ দেখিয়েছেন, সমতামূলক (egalitarian) রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত মহৎ ব্যক্তিদের ইতিহাসের প্রতি তেমন সুবিচার করেননি। ক্ষুদ্র একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রথমে এককভাবে এবং অতঃপর সীমিত সংখ্যক ত্যাগী-দরিদ্র অনুসারীদের নিয়ে কুরআনের বাণী প্রচারে বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার কতিপয় অগ্রধাপ অতিক্রম করার পর অর্থাৎ নবুয়ত প্রকাশের প্রায় ১২ বছর পর ৬২১ খ্রি. ও ৬২২ খ্রি. আকাবা উপত্যকায় প্রথম ও দ্বিতীয় বায়াত গ্রহণকারীদের দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত ও অগ্রযাত্রার ইতিহাস উপেক্ষিত হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। তাঁরা ছিলেন আল্লাহ্ ও রসূলের (দ.) প্রত্যক্ষ সাহাবী-সৈনিক। তেমন কয়েক জনের নাম আসাদ ইবনে জুরারা, আউফ ইবনে হারিস এবং মুয়াজ ইবনে আফরা, রফি ইবনে মালিক এবং জুরায়কসহ বারোজন। দ্বিতীয় আকাবায় আবদুল্লাহ্ ইবনে কা'ব, আল-বারা এবং দুজন মহিলাসহ ৭৩ জন। এই কঠোর ঈমানদার ও দুঃসাহসিক বাস্তব জীবনবাদীদের সংগ্রামের অক্ষয় ফসলই আল-কুরআন ও ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষার অব্যাহত অগ্রযাত্রার পথ সুগম করেছিল, যে পথে কদম ফেলে পরবর্তীকালে অগণিত দার্শনিক, সুফি, আউলিয়া, ঐতিহাসিক, বিজ্ঞানীরা মানব সভ্যতার বিশ্ববাগানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগণিত গোলাপ ফুটিয়েছেন। এঁদের ইতিহাস মোটামুটি এখনো লভ্য। তবে চর্চাটা কম। অথচ প্রয়োজন।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা বেলায়তে মোত্লাকা আল-কুরআনের পার্থিব ও ঐশী উভয় ক্ষেত্রে নবীজী (দ.) নির্দেশিত ভারসাম্যমূলক পরিবেশ সৃষ্টির তাগিদ অনুভব করে এবং তাগিদ দেয়, মুসলিম সমাজ তথা বিশ্ব মানবতার কল্যাণের স্বার্থে ও প্রয়োজনে।

৮. তাসাওউফের তালিমের ধারাবাহিকতায় আমরা এখন মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আশু-পূর্বসূরি কয়েকজন ওলী আল্লাহ্ এবং তাঁদের আত্মশুদ্ধিমূলক শিক্ষার উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করবো। তারা হলেন, (ক) হযরত শায়খ সৈয়দ আবদুল হাসান আলী হাজবিরী দাতা গঞ্জেবখ্শ (র.), (খ) হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.), (গ) গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশ্তী (র.)।

[এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে তাঁদের জীবনীর উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হয়েছে।]

(ক) হযরত দাতাগঞ্জে বখশ (র.) [৪০০ হিজরী-৪৬৫ হিজরী]:

শরিয়তের আহকাম পালনের সাথে তাযকিয়ায়ে নফ্স বা আত্মশুদ্ধির জন্য ইলমে মারিফাত অপরিহার্য। বিখ্যাত কাশ্ফুল মাহজুব গ্রন্থে 'হযরত আলীর (ক.) উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন: "তাসাওউফ সচ্চরিত্রতা ও সৎ স্বভাবের নাম"। এই সৎ স্বভাব বা আখলাকের দুটো অংশ ঃ প্রথমটা, স্রষ্টার সঙ্গে সৎস্বভাব; দ্বিতীয়টা, সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহার। তিনি এছাড়া তৃতীয় প্রকার সৎ স্বভাবের বিবরণে বলেছেন যে, শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে বিরত থাকতে হবে। হযরত জুনায়েদ বোগদাদীর (র.) উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, আট প্রকার চরিত্র নিয়ে তাসাওউফ গঠিত। এই আট প্রকার সৎস্বভাব হলো: ১. সাখাওয়াত (দানশীলতা), ২. রেযা (আল্লাহ্র সন্তুষ্টি), ৩. সবর [ধৈর্য], ৪. ইশারাত (ইঙ্গিত) [এর নিদর্শন হযরত জাকারিয়া (আ.)। তিনি আল্লাহ্র নির্দেশে কথা বলা বন্ধ করে বেশ কিছুদিন ইশারায় কথা-বার্তা বলতেন], ৫. গুরবাত (লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকা), ৬. পশমী পোশাক পরিধান [যেমন; হযরত মুসা (আ.)], ৭. সিয়্যাহাত [আল্লাহ্র জমিনে ভ্রমণ], [যেমন; হযরত ঈসা (আ.) একটা পেয়ালা ও একটা চিরুনী নিয়ে গৃহত্যাগ করেন। পথে একজনকে পেয়ালার পরিবর্তে অঞ্জলি দিয়ে পানি পান এবং আরেকজনকে চিরুনীর পরিবর্তে অঙ্গুলি দ্বারা চুল বিন্যাস করতে দেখে সেই দুটো সামগ্রীও ফেলে দেন]। ৮. ফকিরি (দরিদ্রতা): এর নির্দশন নবীজী (দ.), যিনি গরীবী হালতে জীবন যাপন করতেন এবং মুনাজাত করতেন, "হে আল্লাহ্! আপনি আমাকে দরিদ্র অবস্থায় জীবিত রাখুন, দরিদ্ররূপেই মৃত্যুদান করুন এবং দরিদ্রদের সাথেই আমাকে হাশরে উঠাবেন"। তাঁর মতে এগুলোই সংক্ষেপে তাসাওউফের হাকিকত[৮]। ত্বরিকতপন্থীদের জন্য জাহের-বাতেন উভয় দিক অর্জন করা সমান জরুরী ও প্রয়োজন। বলা বাহুল্য, মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এই শিক্ষাকে ধারণ করে [আরো বিবরণ ২৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]।

(খ) হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) [১০৭৭-১১৬৫ খ্রি.]:

ইসলামের সাম্যনীতির ভিত্তিতে সমাজ-সংগঠনের পক্ষপাতী হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.)-এর তাসাওউফ নীতির মূল কথা; একজন ভোগের প্রাচুর্যে হাবুডুবু খাবে, আরেকজন দারিদ্রের নিষ্পেষণে জর্জরিত হবে, এ বিধান ইসলামের নয়। তিনি বলেন, 'তোমার ঈমান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি তুমি নিজের জন্য যা চাও, অন্যের জন্যও তাই না চাও।' তিনি আমীরতন্ত্রের অন্যায়-অবিচারের প্রকাশ্য প্রতিবাদী ছিলেন। তিনি শরিয়ত ও ত্বরিকতের মিলন ঘটিয়ে ত্বরিকার বিধানে শৃঙ্খলা আনয়ন করেন, যা বেলায়তে মোকাইইয়াদা নামে পরিচিত এবং ভারসাম্যমূলক ইসলামী জীবন বিধান হিসেবে স্বীকৃত ও অনুসৃত। ইসলামী দ্বীন ও দর্শনের খেদমতে জ্ঞান ও জীবন উৎসর্গ করে আত্মনিয়োগ করার জন্য নবীজী (দ.)

কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্টদের মধ্যে তিনি অন্যতম। অপর দু'জন হযরত খাজা বাবা (র.) এবং হযরত ইবনুল আরাবী (র.)।

আত্মশুদ্ধি ও তাসাওউফ অর্জনের জন্য তিনি আট প্রকার আখলাক বা সৎস্বভাব অর্জনের সাধনা করার উপদেশ দেন: ১. হযরত ইব্রাহিমের (আ.) ত্যাগ, ২. হযরত ইসমাইলের (আ.) সহযোগিতা, ৩. হযরত আইয়ুবের (আ.) সহিষ্ণুতা, ৪. হযরত জাকারিয়ার (আ.) গোপন প্রার্থনা, ৫. হযরত ইয়াহিয়ার (আ.) অনটন, ৬. হযরত মুসার (আ.) ছিন্নবস্ত্র, ৭. হযরত ঈসার (আ.) সিয়্যাহাত, ৮. নবীজী হযরত মোহাম্মদের (দ.) দারিদ্র। এসব গুণ যিনি অর্জন করেন, তিনিই অলিয়ে কামেল।[৯]

হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.)-এর শিক্ষা, সাধনা, প্রেরণা ও সমাজদর্শন বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের অন্যতম প্রধান উৎস। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তাঁর এসব শিক্ষার সহজতর ধারাবাহিকতা বটে। অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেন, "ফেরেশ্তাগুণবিশিষ্ট জব্রুত শক্তি অর্জনে খোদার সহিত নিসবত বা সম্বন্ধ সৃষ্টি করিতে সুফি সাধনায় রত বিভিন্ন ব্যক্তি ও সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত ও পথ বা ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম পদ্ধতি থাকিলেও সকলেরই মূল লক্ষ্য এক। (খোদার) এশক যখন মানবের ক্বলব বা অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন 'কছরে নফ্স' বা প্রবৃত্তির ধ্বংসকারীরূপে পথচারীকে নফ্সের কাম্য বস্তু হইতে বিরত করিতে দেখা যায়। ইহা মালামিয়া কাদেরী আহমদী সপ্তকর্ম পদ্ধতিতে পূর্ণব্যক্ত।[১০]

বস্তুতপক্ষে কাদেরিয়া ও চিশ্তিয়া ত্বরিকার মর্ম চেতনার সাথে সম্যক পরিচিত হওয়া গেলে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে (ক.) উপলব্ধি করা সহজ হবে। তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় মানদণ্ডে দেখা যাবে যে, শরিয়তের পূর্ণাঙ্গ পায়রবীকারীরাই প্রকৃত সুফী। নবীজী (দ.) স্বয়ং এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। উসুলে সাবয়া মূলতঃ শরিয়তেরই অনুসরণ এবং বেলায়তে মোত্লাকা শরিয়তেরই সমকালীন manifestation বা প্রকাশ [আরো বিবরণ ৩৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]।

(গ) গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্তি (৫৩৬ হিজরী-৬৩৩ হিজরী/ ১২৬৬ খ্রি. ৬ই রজব):

i হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্তির (র.) মিশন ছিল রেসালতি মিশনের ধারাবাহিকতা। তিনি শরিয়ত ও ত্বরিকত বা তাসাওউফের সংমিশ্রণে আকর্ষণীয় পবিত্র পদ্ধতিতে ইসলাম প্রচার করেন। দ্বীন-দুনিয়ার খেদমতে অবতীর্ণ হবার জন্য নবীজী (দ.)-এর স্বপ্নাদিষ্ট তিনজনের মধ্যে তিনি অন্যতম। অপর দু'জন হযরত আবদুল কাদের জিলানী (ক.) এবং হযরত ইবনুল আরাবী (ক.)। তিনি তৌহিদের বিন্দু আবুদিয়াত থেকে রবুবিয়াতের কম্পাসের ক্রমবৃদ্ধি ঘটিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় সামাজিক, রাজনৈতিক,

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে মানুষের ঐহিক ও পরকালীন মুক্তির যে ধারার সূত্রপাত করেন, তা পৃথিবীর ইতিহাসে যেমন বেমিসাল, তেমনি এখনো কার্যকরভাবে সক্রিয়। তিনি ব্যক্তি মানুষের উপাসনার স্বাধীনতা, বাঁচার অধিকার, চিন্তার স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। কিন্তু তৎকালীন স্বৈরাচারী রাজন্যবর্গ সে সুযোগ দেয়নি। আনা সাগরের তীরে তিনি একটা আশ্রয় কেন্দ্র বা খানকা গড়ার অনুমতি চাইলে তাঁকে তা না দিয়ে বরং সদলে হত্যার চক্রান্ত করা হয়েছিল, যা পৃথিবীর মাটিতে কোন মানুষের বাঁচার, বাস করার ও স্বীয় চিন্তা-ধ্যান ধারণার প্রকাশ ঘটাবার মৌলিক অধিকার অস্বীকারের নামান্তর। তাঁর পরবর্তী হাজার বছরের ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, হাজার বছরের মুসলিম শাসিত ভারতবর্ষে খাজা বাবার স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ এই নীতি, দর্শন ও আদর্শ নিতান্তই প্রাকৃতিকভাবে বজায় ও কার্যকর থেকেছে। মুসলিম রাজতান্ত্রিক শাসকরাও কারো উপাসনার স্বাধীনতা, জীবিকার অধিকার, যোগ্যতার বিচারে কাজ পাবার অধিকার, বসবাসের অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করেননি। মৌলিক অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। খাজা বাবাতে (র.) রিসালাত মিশন, মারিফাত বা আধ্যাত্মিকতা, কল্যাণমূলক রাজনীতি, সমাজ-সংস্কার এবং মানুষের রুচিশীল সুকুমার বৃত্তির যে অপূর্ব সমাহার ঘটেছে, তার দ্বিতীয় কোন তুলনা মানব সভ্যতার ইতিহাসে বিরল। তাঁর জগৎ জ্ঞান, ধ্যান, কর্ম ও কল্যাণের জগৎ– যেখানে অগণিত মানুষ সমকালে জাহেরীভাবে এবং এখন রুহানীভাবে সম্পর্কিত থাকছেন। পাচ্ছেন দিশা, নিরাপত্তা ও শান্তি।

খাজা বাবার অতুল বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি সর্বময় সুযোগ সত্ত্বেও কখনো শাসনদণ্ড গ্রহণ করেননি। যাপন করেছেন খানকার জীবন। পার্থিব বিষয়-সম্পত্তি বলতে দুনিয়াবী আইনে যা বুঝায়, তা তিনি আয়ত্ত করেননি। তিনি নিরঙ্কুশ তৌহিদের (absolute monotheism) আলোকবিন্দুতে সমগ্র পৃথিবী তথা মাখলুককে অভিন্ন সত্তা হিসেবে ধারণ করে যুগপৎ আবুদিয়াত ও রবুবিয়াতের চর্চা ও প্রয়োগ করে গেছেন। রেসালতি কানুনের রীতি অনুযায়ী তিনি তৌহিদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু কাউকে বাধ্য করেননি, যদিও বাধ্য করার যাবতীয় উপকরণ এ সময়ে তাঁর ইশারার অধীনমাত্র ছিল। অথচ এর পাশাপাশি সকল শ্রেণীর মানুষ তথা সৃষ্ট জীবের প্রতি রবুবিয়াতী দায়িত্ব [আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন, আর-রাহ্মানির-রাহিম] পালন করে ঢালাও কল্যাণ সাধন করে গেছেন। কতো রাজা-বাদশাহ্ এ ভূ-ভারতে এসেছেন, গেছেন। কতো সরকার এসেছে, পড়েছে। আসবে, যাবে। কিন্তু রাজনৈতিক ফর্মুলায় রাজধানীবিহীন এই 'সুলতান-উল-হিন্দ'-এর সালতানাত যে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে, তা সংশয়াতীত। তিনি রাজনীতি কিম্বা রাজ্য জয় করেন নি। সেটা তাঁর উদ্দিষ্টও ছিল না। তিনি মানব কুলের হৃদয়

রাজ্য, শ্রদ্ধার আকাশ ও কল্যাণের দরিয়া বিজয়ী। বিংশ শতাব্দীর ভারতের অনেক জবরদস্ত অ-মুসলিম, অ-এশীয় সাংবাদিক, সাহিত্যিক, কবি, দার্শনিক, রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞানীদের চিন্তা ও লেখনীতে এই শাশ্বত নির্মল সত্য বিবৃত হয়েছে। খাজা বাবা ভারতের, দক্ষিণ এশিয়ার, পুরো এশিয়ার, পুরো পৃথিবীর, সব স্থানের সবার একান্ত দরদী, হিতৈষী, উদার, নিঃস্বার্থ আপনজন।

(ii) খাজা বাবা যে সময়ে তৌহিদ ও সাম্যের বাণী নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, সে সময়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশে তাঁর প্রয়োজন ছিল কঠোরভাবে পরীক্ষিত মুরীদ, অনুসারীর। নড়বড়ে ঈমানের লোক দিয়ে আসমান সমান প্রতিকূলতা পাড়ি দেওয়া সম্ভব হতো না। তিনি পরম মারিফাতের খাজাঞ্চী। এই সম্পদ বিতরণ এবং পার্থিব বিবেচনায় সমাজ সংস্কারমূলক কাজ করে রবুবিয়াত নীতি চর্চার মাধ্যমে সৃষ্টির বিবর্তনের এই দুই স্রোতের মিলনসমুদ্র হিসেবে মানব সংস্কৃতির ইতিহাসে তিনি বেমিসাল ব্যক্তিত্ব। তাঁর ত্বরিকার তালিম জবরদস্ত, আয়াসসাধ্য ও কঠোর। বিশাল কর্মের দুরূহ ভার বহনের উপযোগী মানব-চিত্ত নির্মাণ করার লক্ষ্যে তাঁর অনুসারীদেরকে পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাই করে, বাজিয়ে নিতে রিয়াজতের এই কঠোরতার প্রয়োজনীয়তা যুক্তিসিদ্ধ।

হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তির (র.) ত্বরিকার মূল শর্ত কোন ব্যত্যয় ব্যতিরেকে শরিয়তের পায়রবী করা। আহলে চিশ্‌ত বা চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার অনুসারীগণের পালনীয় ওজিফা তাঁর বিখ্যাত অষ্টম মজলিশে (eighth discourse) ঘোষিত হয়। এর পূর্ণ বয়ান তাঁর প্রধান খলিফা হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী (র.) কর্তৃক লিপিবদ্ধ 'দলিলুল আরেফিন' (পুণ্যবানদের সনদ) গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায়ে বিবৃত আছে। উল্লেখ্য, হযরত বখতিয়ার কাকী (র.) খাজা বাবার বারোটি মজলিশের (discourses) বয়ানের লিপিকার, যা দলিলুল আরেফিন নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত[১১]। এতে ৬৭টা ওজিফা নির্দেশিত হয়েছে, যাতে রয়েছে অন্যান্য দোয়া-দরূদের সাথে ফরয-নফল মিলিয়ে ১৪ ওয়াক্ত নামায। তিনি নিজে কঠোরভাবে এ ওজিফা পালন করতেন এবং অনুসারীদেরকে এতে দৃঢ় থাকতে নির্দেশ দেন। ঐ মজলিশে তিনি বলেন, 'যারা এগুলো পাঠ করবেন, তারা মাশায়েখগণের সুন্নতের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবেন।' নবম মজলিশে তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি এই তিনটি গুণের অধিকারী, আল্লাহ্‌তালা তাকে বন্ধুত্বে গ্রহণ করেন: (১) নদীর মতো বদান্যতা, (২) সূর্যের মতো দয়ার্দ্রতা, (৩) মাটির মতো সহনশীলতা ও ভদ্রতা"।

এসব কঠোর ওজিফার পর দশম মজলিশে তিনি বলেন, "তাসাওউফ কোন সাধারণ জ্ঞান বা রসম (আচার-আচরণ) নয়। তাসাওউফ মানুষকে এমন এক চরিত্রের অধিকারী করে, যার তুলনা শুধু বেহেশ্‌তের দ্বাররক্ষী ফেরেশ্‌তা রিদওয়ানের স্বভাবের

মতো। তা মুর্শিদ কর্তৃক আল্লাহ্‌র পথে প্রদত্ত এমন এক শিক্ষা, যা নফ্‌সকে বিনাশ ও মন্‌জিলে (আকাঙ্ক্ষিত স্থানে) পৌঁছবার পাথেয়। আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির সাথে যা সম্পর্কযুক্ত, তা সাধারণ জ্ঞান বা রীতির মাধ্যমে সাধিত হয় না। কেননা শিক্ষা বা রীতি এমন কোন স্বভাব বা চরিত্র গঠনে সহায়ক হয়না, যে-স্বভাব বা চরিত্র আল্লাহ্‌র প্রিয়, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জগতের সাথে সংযুক্ত।" তিনি এই মজলিশে ইলমিয়াত বা জ্ঞান-অর্জনের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর সর্বশেষ অর্থাৎ দ্বাদশ মজলিশের সমাপ্তি পর্যায়ে তিনি বলেন; চারটি জিনিস মনি মুক্তার মতো উপাদেয়: (ক) দরবেশকে যেন ধনী ও অভিজাত মনে হয়, (খ) ক্ষুধার্তকে পর্যাপ্ত অন্ন দান করা, (গ) অন্তরে বিষন্ন থাকা, কিন্তু চেহারায় খুশি ও উৎফুল্লভাব বজায় রাখা, (ঘ) খোদার দুশমনের সাথেও দোস্তী ও দয়া দেখানো। এই মজলিশে সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে তাঁর সমাপ্তি উক্তি: 'ত্বরিকার রাস্তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। এ পথে বীর পুরুষের মতো থাকবে [আরো বিবরণ ৩৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]।'

মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সাথে হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) 'বাগদাদ শরিফ' এবং খাজা বাবার (র.) 'আজমীর শরিফে'র নিগূঢ় রূহানী সম্পর্ক বিদ্যমান। এ সম্পর্কের কথা সমাজের সর্বস্তরে সুবিদিত। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা ও বেলায়তের তালিমে রয়েছে এই দুই ত্বরিকা অর্থাৎ কাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া ত্বরিকার নীতি ও নির্যাস। শরিয়ত ও ত্বরিকত উভয় প্রেক্ষিতের মানদণ্ডে মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এই উভয় ত্বরিকার যৌথ উত্তরাধিকার ধারণ করে চলেছে। 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থে শরিয়ত ও ত্বরিকত উভয় বিন্দুতে সমগুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং তা পূর্ববর্তী এই দুই ত্বরিকার সমন্বিত সংস্করণরূপে ব্যাপকভাবে জনসমাদৃত ও অনুসৃত।

এখানে প্রসঙ্গতঃ শাহানশাহ্‌ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) একটি কালাম প্রণিধানযোগ্য। আজমীর শরিফ জিয়ারতেচ্ছু ভক্তবৃন্দের আরজির জবাবে তিনি মিষ্টি মৃদু স্বরে বলতেন, "আজমীর শরিফ আমাদের পুরান বাড়ি, জ্বি।...[১২] এই সহজ বাক্যটার মধ্যে রয়েছে এক পবিত্র আলোকধারার ক্রমঃসম্প্রসারণের ধারাবাহিকতার নিদর্শন।

এই নিবন্ধের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত যে ধারাবাহিক বিবরণ বিবৃত হয়েছে, তাতে প্রতীয়মান হয় যে, উসুলে সাবয়া মূলতঃ আল-কুরআন ও হাদিস এবং মহান অলি দরবেশদের তরফ থেকে উৎসারিত আত্মশোধনমূলক ধর্মীয় প্রক্রিয়ার ধারাবাহিকতা বিশেষ। হযরত আকদাস (ক.) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দর্শনার্থী-ভক্ত-জায়েরীনদের সামনে ইঙ্গিতে যেসব তত্ত্ব ও উপদেশমূলক কালাম উচ্চারণ করতেন, উসুলে সাবয়া সেসব কালামেরই শুদ্ধ বাংলা ভাষায় রূপান্তর মাত্র, যা বিংশ শতাব্দীর বাঙালি মানসে

সহজে প্রবেশযোগ্য ও আমলযোগ্য। যেমন, তিনি বলতেন, "আমার নিকট একটি পাটী বেতের বা ঘইস্যা ডাওলসের (শ্বেতদ্রোন) ফুলও কি নিয়া আসিতে পার নাই"? এর মানে যে একটা পরিষ্কার শুভ্র মধুময় মন, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা এবং বুঝতেও বেগ পেতে হয় না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে: বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় করো, সালাত কায়েম করো এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না (৩০:৩১)। অতএব, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, শরিয়ত, ত্বরিকত, হাকিকত, মারিফাতের দূরবীনের পরীক্ষায় দেখা যায় যে, উসুলে সাবয়ার বয়ান কোরআনী উৎস থেকে উদ্‌গত ও ধারাবাহিকভাবে বিবর্তিত ও প্রয়োগকৃত অভিন্ন শিক্ষার ধারাবাহিকতার সমকালীন বাংলাভাষিক সংস্করণ। এটা একটা অবিনশ্বর ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ও তালিম। আনকোড়া নতুন কিছু নয়।

উসুলে সাবয়ার মর্মবাণী ও শিক্ষা শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জবানে আরো সহজ ভাষায় বিবৃত হয়েছে : "হালাল খাও, নামায পড়ো, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির করো"। আল-কুরআনের অনেক অনেক স্থানে কর্মে-বিশ্রামে, শয়নে-স্বপনে-নিদ্রায়-জাগরণে "আল্লাহ্‌র জিকির" এর তাগিদ দেওয়া হয়েছে। উসুলে সাবয়ার ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন, যা ব্যক্তিকে অতি-ভোগবাদিতা, মানসিক-শারীরিক উচ্ছৃঙ্খলতা, লোভ-লালসা থেকে মুক্ত রাখে। সমাজে যে হতাশা-উচ্ছৃঙ্খলতার প্রকোপ দেখা যায়, তা এসব অপ্রাকৃতিক সীমাহীন লালসা ফল। না-শোকর সমাজে এর প্রকোপ লক্ষ্যণীয়। ভোগবাদী মনোবৃত্তি নিজের, পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রের, সভ্যতা ও সংস্কৃতির জন্য ক্ষতিকারক। তাই ওলী আল্লাহ্-দার্শনিকরা এই লালসা দমনের তাগিদ দিয়েছেন। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের উসুলে সাবয়া তারই আধুনিক প্রতিধ্বনি মাত্র।

[বি: দ্র: উসুলে সাবয়া ব্যক্তিগত নৈতিক আত্মশুদ্ধিমূলক কর্মপন্থা। এই কর্মপন্থা ছাড়াও মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সমাজ-শুদ্ধি, সমাজ-সংহতি, রাষ্ট্র ও প্রশাসন শুদ্ধিমূলক আচরণ ও কর্মবিধি রয়েছে, যা চতুর্দশ/পঞ্চদশ অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।]

টীকা : তথ্য সূত্র

১. কিমিয়ায়ে সাআদাত: ইমাম গাজ্জালী (র.), বঙ্গানুবাদ: মওলানা নুরুর রহমান, ১৩৭৮ হিজরী, ঢাকা, পৃ. ২৯, 'যথার্থ মানুষ গঠন প্রণালী' অনুচ্ছেদ।

২. মুসলিম আচার ধর্ম: খাদেমুল ফোক্বারা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী 'মটো'।

৩. বেলায়তে মোত্লাকা, অষ্টম পরিচ্ছেদ; সপ্তকর্ম-পদ্ধতি।

৪. (ক) নবী শ্রেষ্ঠ [কুরআন তত্ত্ব: তৃতীয় খন্ড] মোবিনুদ্দিন আহমদ জাহাঁগীরনগরী, ১৯৩১, ঢাকা, ১৯৮১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা, (খ) Muhammed at Mecca, W. montgomery Watt, Oxford, 1953. (গ) বিশ্ব নবী, (দশম সংস্করণ) গোলাম মোস্তফা, ১৯৬৮, ঢাকা।

৫. বোখারী শরিফ (প্রথম খণ্ড): তরজমা, মাওলানা শামসুল হক ফরিদপুরী ও মাওলানা আজিজুল হক, ঢাকা; ১৯৫৭ইং।

৬. সীরাত ইবনে ইসহাক, Alfred Guillaume-এর ইংরেজী অনুবাদের ১৯তম সংস্করণের (২০০৬); বঙ্গানুবাদ: শহীদ আখন্দ, ইসলামী ফাউন্ডেশন/প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা।

৬ক. আজীবন আহলুস্ সুন্নাহ্র অনুসারী মনসুর হাল্লাজ (র.) আধ্যাত্ম বিষয়ে এখনো বহুল আলোচিত বিস্ময়–ব্যক্তিত্ব। প্রশ্চাত্য-প্রাচ্য উভয় দর্শন ঋণবনে তিনি ইমাম গাজ্জালী (র.), ইবনুল আরাবীর (র.) মতোই এখনো বিশ্লেষিত হচ্ছেন। বারো বছর বয়সের পূর্বেই তিনি কুরআনে হাফেজ হন এবং কুরআনের সূরা ও আয়াতের গূঢ় অর্থ সন্ধানে ঝুঁকে পড়েন, যা তাঁকে নূরের সাগরে ভাসিয়ে নেয়। তিনি সহল তুসতারী (র.), আমর ইবনে উসমান মক্কী (র.), জুনায়েদ বোগদাদী (র.)'র সান্নিধ্যে দার্শনিক উৎকর্ষ লাভ করেছেন এবং নিজস্ব পন্থায় 'ইত্তিহাদ' বা একীভূত ও সত্তায় সম্মিলন সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হন। এতে একদল তাঁর বিপক্ষে ও একদল তাঁর পক্ষে যান। তিনি মন্ত্রীদের দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে দুটি পুস্তিকা লিখেন। তাঁর ভক্তরা জাতির রাজনৈতিক-চারিত্রিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে একটা আন্দোলনের সূচনা করেন। কারাগারেও তিনি কয়েদীদের মধ্যে প্রচার কাজ চালাতেন। ৯০৫ খ্রি. তিনি তৎকালীন সুলতানের জ্বর সারিয়ে ও যুবরাজের মরা তোতাপাখী পুনঃজীবিত করে দেন। এর প্রভাবে বিরুদ্ধবাদীরা নানাভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাতে থাকেন। তিনি ও তাঁর অনুসারীরা মন্ত্রীদের অর্থনৈতিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে থাকেন। তাঁর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক, ধর্মীয় অভিযোগ আনা হয়। ওয়াহাদাতুশ্ শহুদ ও ওয়াহাদাতুল উজুদ সম্পর্কেও তাঁকে কেন্দ্র করে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে। দরবারী আলেমরা তাঁর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হন। জীবনের শুরুতে তিনি আবু এয়াকুব আল-আকতারের কন্যা উম্মুল হুসায়নের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ায় আল মক্কী তাঁর প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। হাল্লাজের তিন কন্যা ছিল, যাদেরকে রাজরোষ থেকে রক্ষার জন্য বহু দুর্ভোগ পোহাতে হয়। বহু শিয়া, সুন্নী ও মুতাযিলা আলেম কারামতের জন্য তাঁর বিরুদ্ধবাদী হন। দ্বিতীয়বার হজের পর তিনি সুফি পোশাক বর্জন করে সাধারণ মানুষের ভূষা ধারণ করেন, যাতে তিনি সুফি পরিমণ্ডলের বাইরে থেকে কথা বলার ও প্রচারের সুযোগ পান। তিনি ভারত, পারস্য, খুজিস্থান, বাগদাদ, বসরা সফর করেন ও বিবিধ উপাধিতে ভূষিত হন। ২৫ মার্চ ৯২২ খ্রি. তাঁকে কূলীবিদ্ধ করা হয় ও তাঁর লাশ দজলা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। অবশ্য পরবর্তীতে ইমাম গাজ্জালীর (র.) অভিমত ছিল হাল্লাজের অনুকূলে (দ্র: ইসলামী বিশ্বকোষ, ই. ফা. বাংলাদেশ, ২৪ খণ্ড, পৃ: ৫০০, L. Massighon. L. Gardet প্রভৃতি)।

৭. হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তারের তাজকেরাতুল আউলিয়ার A. J. Arberry কৃত ইংরেজী অনুবাদ Muslim Sain.s and Mystics, 1966, London। মওলানা শামসুল হক, মাওলানা নুরুর

রহমান কৃত তাজকেরাতুল আওলিয়া, যথাক্রমে ৬ষ্ঠ সংস্কারণ ১৯৭৩ এবং দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৭৪, ঢাকা। A. J. Arberry-র ইংরেজী অনুবাদে হযরত আত্তার থেকে সরাসরি ৩৮ জন আওলিয়ার জীবনী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে প্রচুর তথ্য, সন, তারিখ ও উৎসের বর্ণনা সহকারে। মওলানা শামসুল হক দুই খণ্ডে ৯৬ জন এবং মওলানা নুরুর রহমান ৬ খন্ডে দুইশত আওলিয়ার জীবনী লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁদের গ্রন্থে আওলিয়াদের 'তালীম', উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে; তবে জন্ম-মৃত্যু সন, তথ্যের উৎসের কোন উল্লেখ নেই।

৮. কাশ্‌ফুল মাহজুব, অনুবাদ: মুহাম্মদ সিরাজুল হক (ভূতপূর্ব পরিচালক সংস্কৃতি বিভাগ; ইসলামিক ফাউন্ডেশন) ঢাকা, ১৯৯৯ ইং।

৯. ফতহুল গয়ব,

১০. বেলায়তে মোত্‌লাকা তৃতীয় সংস্করণ, পৃ: ১৩৭ ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ,

১১. (ক) দলিলুর আরেফিন, মূল: কুতুবুল আকতাব হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকী আউশী রহমতুল্লাহ্ আলায়হি কর্তৃক ফার্সীতে লিখিত; ফার্সী থেকে উর্দু অনুবাদ; মওলানা গোলাম আহমদ, দিল্লী, ১৩১০ হিজরী; বঙ্গানুবাদ: কফিল উদ্দিন আহমদ চিশ্‌তী, চিশ্‌তীয়া পাবলিকেশন্স, তৃতীয় সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরী। (খ) দিওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিন, অনুবাদ: জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান, প্রথম প্রকাশ, সেপ্টেম্বর, ২০০৩, (দ্বিতীয় অধ্যায়-আসরারে হাকিকি ও পত্রাবলী)।

১২. এই গ্রন্থকারের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

‘বেলায়তে মোত্‌লাকা’ রচনার পটভূমি

১. বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের মলাটে পুস্তকের শিরোনামসূচক পরিচিতিতে লেখা ছিল :

বেলায়তে মোত্‌লাকা

বা

মুক্ত সুফিবাদ

প্রণেতা ও প্রকাশক :

মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী

তিনি পুস্তকের পরিশিষ্ট অংশে (পৃ: ১৮৩, ৩য় সংস্করণ) রচনার পটভূমি বর্ণনা করেছেন, যা এ গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, এই পরিশিষ্ট অংশে তিনি ‘মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত’ শব্দটা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন, যা মাইজভাণ্ডার দরবার কেন্দ্রিক জাহেরী-বাতেনী বৈশিষ্ট্য ও ক্রিয়াকে তাসাওউফের অন্যান্য ত্বরিকা বা পথ কিম্বা খান্দান থেকে পৃথক সত্তা দান করেছে।

২. এই গ্রন্থ রচনার পটভূমির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ‘তাসাওউফ জগতের’ কিছু সূক্ষ্ম বিষয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। অতীন্দ্রিয়বাদ বা সুফিবাদ (mysticism) মানব জাতির আবির্ভাবের সময় থেকেই কোন না কোন নামে বা প্রকারে মানুষের নিজের প্রকৃতিতে ও অন্তরে বিরাজমান। অতএব, অতীন্দ্রিয়বাদ পৃথিবীর সব মানবিক গোত্র, জাতি, নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন রূপে আশ্রয় করে আছে। এটা কার্যতঃ মানবসত্তা থেকে অবিচ্ছিন্ন।

আল-কুরআন এবং নবীজী হযরত মোহাম্মদের (দ.) বিশেষত্ব এই যে, তাঁরা মানবের বাহ্যিক বা জাহেরী (exoteric) এবং গুপ্ত বা বাতেনী (esoteric) সত্তার মধ্যে ভারসাম্যমূলক অবস্থান নির্মাণ ও নির্দেশ করেছেন; সমগ্র সৃষ্টিজগতে বা মাখলুকাতে যে ভারসাম্যের কথা প্রসঙ্গক্রমে বহুবার কুরআনে-হাদিসে বিবৃত হয়েছে।

মানব জীবন, মানবাত্মা, সমাজ, ধর্ম, বিবিধ আচার-দর্শন সম্পর্কে বিজ্ঞ গবেষকমণ্ডলী ইসলামী/মুসলিম সুফিবাদকে অন্যান্য ধর্মীয় অতীন্দ্রিয়বাদ থেকে বাস্তব প্রেক্ষাপটে পৃথকভাবে ভাবতে বাধ্য হয়েছেন। আল-কুরআন, হাদিস শরিফে বর্ণিত ‘মারিফাত’ বা গুপ্ত পরম-বিদ্যার শেকড় হযরত আদমের (আ.) রুহ্ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই ধারা ধারাবাহিকভাবে নিরবচ্ছিন্ন অবস্থায় নবীদের মাধ্যমে এবং নবুয়ত সমাপ্তির পর

ওলীদের মাধ্যমে বহমান। এই ধারা সম্পূর্ণভাবে মৌলিক, নিজস্ব মহিমা ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং মিষ্টিসিজমের অন্যান্য ধারা থেকে পৃথক। এই প্রসঙ্গে হযরত ইবনুল আরাবী (র.), হযরত আবদুল করিম আল-জিলি (র.) সহ বিভিন্ন মুসলিম দার্শনিক-মণ্ডলীর গ্রন্থাদি পর্যালোচনা করে Titus Burckhardt[১] তাঁর "An In.roduction of Sufi Doctrine গ্রন্থে লিখেন : "বিজ্ঞানসম্মত গবেষণাকর্মগুলোতে সাধারণভাবে 'সুফিবাদকে' 'মুসলিম মিস্টিসিজম' (মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদ বা আধ্যাত্মিক রহস্যবাদ) বলে সংজ্ঞায়িত করা হয় এবং আমরাও উপস্থিত ক্ষেত্রে 'অতীন্দ্রিয়বাদী' শব্দটা ব্যবহার করলাম ইসলামের নিরেট ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য ও প্রকরণগুলো থেকে 'সুফিবাদকে' আলাদা করে বুঝানোর জন্য। অতীন্দ্রিয়বাদ বা mystical শব্দটা এখনো খৃষ্টীয় গির্জার গ্রীক পুরোহিতবর্গ এবং তাঁদের আধ্যাত্মিক লাইনের অনুসারীদের আরোপিত অর্থ ও তাৎপর্য বহন করে। 'আধ্যাত্মিক রহস্য' সম্পর্কীয় জ্ঞান বুঝানোর জন্য তাঁরা এ শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, এই mysticism ও mystic শব্দ দুটোর অপব্যবহার ঘটেছে এবং নিছক ব্যক্তিক-আত্মিক ধরণের (individualistic subjectivity) ধর্মাচারমূলক অনুষ্ঠানাদির ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে, যেগুলোর নিয়ন্ত্রকদের মন-মানসিকতা এমন যে, তা বাহ্যিক জগতের দিগন্ত রেখার বাইরে চোখ তুলে দেখার ফুরসৎ পায়না! একথা সত্য যে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সর্বত্র অনেক মজ্‌জুব রয়েছেন, যাদের 'জজব' হাল অত্যন্ত প্রবল। এ অবস্থায় তাঁদের তন্ময়তা এমন এক স্তরে উপনীত হয়, যখন তাঁদের স্বীয় ধ্যানপরায়নতার অভিব্যক্তি প্রকাশের মানসিক কার্যকারিতা তিরোহিত হয়। এটা এমনও হতে পারে যে, (ক্বলব থেকে উৎসারিত) আধ্যাত্মিক বা রূহানী উপলব্ধির স্ফুরণ মোরাকাবা-মোশাহাদার নিয়মানুগ পদ্ধতির বাইরেও ব্যতিক্রমীভাবে ঘটতে পারে।"[২]

৩. হযরত আকদাসের 'জজব' চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করার এবং অনুভব করার অভিজ্ঞতা অছিয়ে গাউসুল আযমের ছিল। এছাড়া তাঁর 'হাল' সম্পর্কিত যথার্থ বিবরণ তাঁর খলিফা ও ভক্তদের মাধ্যমে মুখে মুখে প্রচলিত থাকে এবং সে সব বিবরণ এখনো জীবন্ত।

সুফি অভিজ্ঞতার (কাশ্‌ফ) পরম ও চরম মুহূর্তে ধ্যানস্থ অবস্থায় এমন এক একক সত্তার অনুভূতি অর্জিত হয়, যা ক্ষণিকের জন্য হলেও তাঁকে বেখুদীর (ফানা) গহনে নিয়ে যায়। এই কাশ্‌ফ যতো না আত্মগত, তার চেয়ে অধিক বিষয়নিষ্ঠ। সুফি তাঁর এই অভিজ্ঞতা বাক্য দ্বারা প্রকাশ করতে পারেন বটে। কিন্তু সেই উপলব্ধির অবস্থাকে অন্যের মধ্যে অবিকল প্রবিষ্ট করানো যায় না। যদি ঐ সাধারণ ব্যক্তিটা উক্ত পর্যায়ে উপনীত হতে পারেন, তবে তিনিও এ জ্ঞানের অনুভূতি লাভে সক্ষম। অন্যান্য

অনুভূতির মতো সুফিদের এ অনুভূতির মধ্যেও জ্ঞানমূলক উপাদান আছে। অনুভূতির ধর্মই এই যে, তা ধারণার মধ্যে, বিষয়ের চেতনার মধ্যে জ্ঞানের পরিসীমার মধ্যে ব্যক্ত হতে চায়।[৩]

অছিয়ে গাউসুল আযমের 'রূহানী উরুজ' বিভিন্ন প্রকারে সর্বজন বিদিত। তিনি হযরত আকদাসের জ্ঞানের অনুভূতি লাভে সক্ষম ছিলেন। তাই হযরত আকদাসের বাণীর সঙ্কলন, ব্যাখ্যা এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণের মতো দুরূহ কর্তব্যের অব্যাহত চলিষ্ণুতার ভার তিনি নিজ স্কন্ধে নিতে পেরেছিলেন।

৪. এ প্রসঙ্গে দার্শনিক সক্রেটিসের (৪৬৯-৩৯৯ খ্রি. পূ:) প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যায়। সক্রেটিসের পূর্বে গ্রীসের দর্শন ছিল প্রধানতঃ প্রকৃতিবাদী। তিনি ও তাঁর অনুসারী ভাষ্যকার প্লেটো ভাববাদী দর্শনের প্রবর্তন করেন। তাঁদের মতে; মানুষের মনের ভাব, চরম ভাবের প্রকাশ।

সক্রেটিসের ব্যক্তিগত জীবন কথা খুব একটা পরিজ্ঞাত নয়। তবে এথেন্সের পথে-ঘাটে-বাজারে লোক সমাগমস্থলে তিনি সর্বদা তত্ত্ব কথার আলোচনা করতেন। তিনি তাঁর মধ্যে একটা 'ঐশী কণ্ঠস্বর' বিরাজ করে বলে দাবী করেছেন। প্রাকৃতিক শক্তিকে অবলম্বন করে বহু দেব-দেবীর কাল্পনিক অস্তিত্ব নির্ভর বহুত্ববাদে তিনি বিশ্বাস করতেন না বলে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মদ্রোহিতা, নতুন কোন ধর্ম প্রবর্তনের প্রয়াসের অভিযোগ এনে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও আচরণের যে সামান্য স্কেচ পাওয়া যায়, তাতে একজন জ্ঞান-প্রেমিক 'মজ্‌জুবের' বৈশিষ্ট্যই ফুটে উঠে। অতএব, নিজের চিন্তা ও ভাবকে লিখিতভাবে প্রকাশ করা তাঁর হয়ে উঠেনি। সে দায়িত্ব পালন করেন প্লেটো (৪২৮/৪২৭-৩৪৭ খ্রি. পূর্ব)। সক্রেটিসের ক্লবের অভিজ্ঞতার সার কথা: আমাদের জ্ঞানের জন্য একটা সুদৃঢ় ভিত্তি প্রয়োজন এবং তা হলো যুক্তিমত্তা (reason)। উল্লেখ্য, যুক্তিসহকারে সব কিছুর যথার্থতা নির্ণয়ের তাগিদ আল-কুরআনের ধারার জাহেরী পদ্ধতিতে সকল নবী-রসূলের বৃত্তান্ত ও সর্বপ্রকার বস্তুগত বিষয়ের বিবরণে বিধৃত।

সক্রেটিসের বিশ শতকীয় ভক্তকুল পরম আদর-ভক্তি-শ্রদ্ধা-ভালোবাসায় উলঝুলুল অবয়ব, আচরণ ও পোশাকে ঢাকা এই মানুষটাকে 'এথেন্সের জোকার' হিসেবে ডাকেন! তাঁদের মতে, তাসের প্যাকেটের ৫২টি কার্ডের হিসাবের বাইরে তিনি ৫৩তম কার্ড, যা 'জোকার' হিসেবে অভিহিত; অন্য তাসগুলোর কোন ধাঁচ বা রঙের সাথে যার কোন মিল নেই। অথচ তিনি না-ছকবন্দী, না-নিকৃষ্ট। বরং, যথাক্ষেত্রে এমন প্রবল প্রতাপশালী, যাকে কোন প্রকারে 'টেক্কা' মারা যায় না। এই মহান মানুষটা শুধু একটা জিনিষই জানতেন যে, তিনি 'কিছুই জানেন না'। বলতেন, 'ভালো কি; তা যে জানে, সে-ই ভালোটা করবে'।[৪]

মনে হয়, আড়াই হাজার বছর পূর্বের এথেন্সের এই স্বার্থলেশহীন, বেখেয়ালী, কিম্ভূতকিমাকার কিন্তু জ্ঞান পিপাসায় অতৃপ্ত মানুষটা'র আত্মা 'মজ্জুব' ফকিরদের রূপ ধরে বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন লোকালয়ে-জনারণ্যে যথার্থ জ্ঞান, সত্য ও কল্যাণের পরশ পাথরের সন্ধানে আজো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ধ্রুব সত্য ও জ্ঞানের প্রেমোন্মাদ সক্রেটিসের অন্তর্লোকের বাণীগুলো শব্দের ফ্রেমে ধরে রেখেছেন প্লেটো।
জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নত বিকাশের কল্যাণে সম্পূর্ণ ভিন্নতর পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মাটিতে আল-কুরআন ও হাদিসের নির্ভুল পরীক্ষিত শিক্ষার আলোয় আলোকিত, গাউসিয়াত ও কুতুবিয়াত উভয়-মস্রবের পূর্ণ কামালিয়াতের অধিকারী 'মজ্জুবে সালেক' হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্র (ক.) ক্বলব থেকে উৎসারিত কালামগুলো চয়ন করে মানবতার উত্তরাধিকার (legacy) হিসেবে মজুদ রাখার দায়িত্ব পালন করেন অছিয়ে গাউসুল আযম। 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থ তাঁর সেই দায়িত্ব ও অঙ্গীকারের ফলশ্রুতি।

বি. দ্রঃ সক্রেটিসের প্রতিবাদ ছিল তৎকালে স্বীকৃত পৌরাণিক অবাস্তব অলীক (mythological) দেব-দেবীর উপর বিশ্বাসমূলক ধর্মের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল 'নয়া দেবতার অধিষ্ঠানপূর্বক যুবকদেরকে তৎকালীন রাষ্ট্রীয় নীতি সম্পর্কে বিভ্রান্ত ও বিপথগামী করার (in.roducing new gods and corrupting the youth) এবং প্রচলিত দেব-দেবীর প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টির'।
খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে তর্কবিদ্যায় পারদর্শী 'সোফিস্ট' হিসেবে পরিচিত গ্রীস দেশীয় পণ্ডিতের দল এথেন্সের নাগরিকদেরকে 'উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে' গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তর্কবিদ্যা শিক্ষা দিতেন। প্রতিপক্ষকে যাতে তর্কে ঘায়েল করতে পারে, সেজন্য শিক্ষার্থীদেরকে বিভিন্ন প্রকারের তর্ক-কৌশল এমনকি মিথ্যা যুক্তিও শিক্ষা দিতেন। এদের এ সকল কৌশল ও মিথ্যা যুক্তি শিক্ষাদানের বিরুদ্ধে সক্রেটিস তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং যুব সম্প্রদায়কে তাদের কথায় বিশ্বাস না করতে বলতেন। ফলে সোফিস্টদের সাথে সক্রেটিসের প্রচণ্ড বিরোধ উপস্থিত হয় এবং সোফিস্টরা তাঁর বিরুদ্ধে যুব সম্প্রদায়কে বিপথগামী করার অভিযোগ তোলেন। বিচারে সক্রেটিসের প্রাণদণ্ড হয়।[৫] এর বিপরীতক্রমে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) মজুদ পেয়েছিলেন কুরআন-হাদিসের মঞ্জুষায় ভরা পরম সত্য (হক্ক) ও কল্যাণময়তা, যা মানব সৃষ্টির সূচনা থেকে অক্ষত অবস্থায় বহমান ছিল। বলা বাহুল্য, সত্যের মজ্জুব সক্রেটিস জ্ঞানের এই 'হারানো উটের' সন্ধান করছিলেন; বনে নয়, মানব-সমাজে।

সক্রেটিসের জীবন-বোধের সমীক্ষণবাদী মূল্যায়নে মহান বাঙালী দর্শনবেত্তা ড. গোবিন্দ্র চন্দ্র দেব বলেন : "যে ধর্মবুদ্ধি মানুষকে তার মৃত্যুকালে সক্রেটিসের মতো অবিচল রাখে... তা-ই সম্ভবতঃ আসল ধর্ম"।[৬]

টীকা : তথ্য সূত্র

১. Titus Burckhardt বিখ্যাত Mystic (তাসাওউফ) গবেষক। হযরত ইবনুল আরাবী (র.) এবং হযরত আবদুল করিম আল জিলির (র.) কালজয়ী গ্রন্থাদির অনুবাদ ও ভাষ্য রচনা করে তিনি ফ্রান্স, জার্মান তথা পাশ্চাত্যের জ্ঞানী মহলে নির্ভরযোগ্য আসন লাভ করেছেন। তাঁর বিশেষত্ব এই যে, তিনি তাসাওউফকে বৈজ্ঞানিক কিম্বা পাশ্চাত্যবিদের দৃষ্টিতে অবলোকন করেননি, বরং এই বিষয়টিকে একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে গভীর অধ্যয়ন ও উপলব্ধি করে প্রকাশ করেছেন।

২. Sufism and Mysticism, ch. ii, An In.roduction to Sufi Doctrine, Titus Burckhardt, Eng. Trans. by D. M. Matheson

৩. সুফি দর্শন: ফকির আবদুর রশিদ (পঞ্চম অধ্যায়-সুফি অভিজ্ঞতা), ১৯৮০, ইসলামী ফাউন্ডেশন, ঢাকা।

৪. (ক) Sophie's World, Jostain Guarder (Eng. Trns. Paulette Meller.) (খ) দর্শন কোষ, সরদার ফজলুল করিম, ১৯৭৩, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

৫. পরিভাষা কোষ : সুপ্রকাশ রায়, কলিকাতা, ১৯৫৮ ইং, পৃ: ২৩০।

৬. তত্ত্ববিদ্যা–সার : গোবিন্দ চন্দ্র দেব : স্রষ্টার সন্ধানে অধ্যায়।

সপ্তম অধ্যায়

শরিয়ত ও মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত

১. আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন প্রার্থনা করতে; "আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করুন।"[১] শরিয়ত এই প্রত্যাশিত 'সরল পথের' বাতিঘর। শরিয়ত শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'অনুসরণীয় সুস্পষ্ট পথ'। তবে বর্তমান জ্ঞান ও আইনের জগতে শরিয়ত বলতে "ইসলামের আইনকেই" বুঝায়। শরিয়ত হচ্ছে ইসলাম ধর্ম অনুসারীর ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, গার্হস্থ্য ও একান্ত ব্যক্তিগত জীবন তথা ব্যাপক অর্থে সুসংঘবদ্ধ সামগ্রিক জীবনের কর্তব্যসমূহের অমোঘ সূত্রাবলীর সমাহার। এটা মানুষের সামগ্রিক জীবনের জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন নির্ধারিত যথার্থ ও যুক্তিসিদ্ধ জীবন-বিধান। সংক্ষেপে ব্যবহারিক জীবন-বিধান ও শিক্ষা।

আইন ও বিধান বিশেষজ্ঞগণ মানুষের সকল কাজকে মোটা দাগে তিন ভাবে ভাগ করেছেন: (ক) ইবাদত, (খ) মুয়ামালাত, (গ) উকুবাত।

(ক) ইবাদত: ইবাদত সাধারণভাবে ঈমান, নামায, রোযা, হজ ও যাকাত বুঝালেও কার্যতঃ মুসলিম জীবনের সামগ্রিক সৎ কাজ এমনকি হালাল রুজি-রোজগারের জন্য শ্রমও এর অন্তর্ভুক্ত। প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ্কে হাজের-নাজের জ্ঞান করে যাবতীয় যুক্তিসিদ্ধ কাজ সমাধা করাই মুহসিন বা মোমিনের ইবাদত।

(খ) মুয়ামালাত: যাবতীয় জাগতিক ও সাংসারিক কাজ এর অন্তর্ভুক্ত। দৈনন্দিন কাজ কর্ম, সংসার ধর্ম পালন, বিবাহ, উত্তরাধিকার ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরী-বাকরী, চুক্তি প্রভৃতি এর অন্তর্গত। মুয়ামালাত এসব বিষয়ে আলোচনা বিচার-বিশ্লেষণ (critical analysis) করে এবং ইজমা, কিয়াস পদ্ধতিতে শরিয়তি রায় প্রদান করে।

(গ) উকুবাত: অন্য মানুষ কিম্বা মাখলুকের অকারণ, অযৌক্তিক ক্ষতি সাধনের প্রতিবিধান, দণ্ড কিম্বা প্রতিফল। মানুষের মৌলিক অধিকার কিম্বা অন্য প্রাণী ও প্রকৃতির অধিকারে হস্তক্ষেপ কিম্বা লঙ্ঘনের জন্য শরিয়ত শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করে। অতএব, শরিয়ত শুধু ব্যক্তি বিশেষ বা মানবজাতি বিশেষের জীবন-পথ চলার বিধান নয়, এটা বিশ্বমানবতার উপযোগী সুষ্ঠু জীবন বিধান। ব্যক্তিগত-পারিবারিক-সামাজিক-অর্থনীতিক-রাষ্ট্রনীতিক-বৈশ্বিক ও বিশ্বজাগতিক ইত্যাকার সব বিষয় এর বিবেচনাভুক্ত। মানবতার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ সাধনই নবীজীর (দ.) শরিয়তের লক্ষ্য। শরিয়ত সর্বকালে সর্বজনের উপযোগী আল্লাহ্ প্রদত্ত নৈর্ব্যক্তিক জীবন বিধান।

'শরিয়ত হচ্ছে এমন সব অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক জ্ঞান, যদ্বারা মানুষ তার পার্থিব জীবন যথোপযুক্তভাবে পরিচালনা করতে পারে এবং পরকালীন জীবনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে পারে।'[২] শরিয়ত সহিহ্ (আইনসিদ্ধ) এবং বাতিলের (নিষিদ্ধ) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে।[৩] অবশ্য ঐতিহাসিক ও বিখ্যাত মুফাস্সির আত-তাবারী তাঁর সময়ে শরিয়তের অর্থকে উত্তরাধিকার আইন, দণ্ডবিধান, নির্দেশ ও নিষেধ (আমর ও নেহী) বলে বুঝিয়েছেন।[৪] শরিয়ত ইসলাম-অনুসারীর যুগপৎ ধর্মীয় ও পার্থিব জীবনের সকল দিক চর্চা করে। শরিয়তে মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব (religious and secular) জীবনকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে: (১) হক্কুল্লাহ্ (আল্লাহ্র অধিকার) (২) হক্কুল ইবাদ (বান্দাহ্র অধিকার)। হক্কুল ইবাদ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত: (ক) মানুষের ব্যক্তিগত নিজস্ব অধিকার, (খ) অন্যান্য মানুষের অধিকার, (গ) সকল সৃষ্টজীব তথা সৃষ্টির অধিকার। অতএব, শরিয়ত মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, মনস্তাত্বিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, বৈশ্বিক ভূমিকাসমেত সম্ভাব্য সকল দিক এবং ক্ষেত্র নিয়ে ইতিবাচক চিন্তা-ভাবনা করে এবং বাঞ্ছিত কল্যাণকর সিদ্ধান্তের পথে এগিয়ে দেয়। মানুষের জীবন ও কর্মের ক্ষেত্র ও পরিধির প্রসারের সাথে শরিয়তের আলোকসম্পাতও নিত্য সঙ্গী হয়ে আছে প্রাথমিক-মৌলিক ভিত্তিসমূহ অপরিবর্তিত রেখেই। আল-কুরআনের প্রত্যেকটা শব্দ, আয়াত, অধ্যায় শরিয়তেরই অন্তহীন যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ধারণ করে আছে। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এই শরিয়তেরই পায়রবী করে।

২. ইসলামী শরিয়ত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে উদ্ভবের সময় থেকে বিশ্বমানব সমাজকে বিভিন্নমুখী ইতিবাচকভাবে প্রভাবিত করে চলেছে। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান, জনগোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থ ব্যবস্থার প্রগতিশীল বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে এই তথ্য বের হয়ে আসে। নরবলি প্রথা, সতীদাহ প্রথা, বিধবা বিবাহ, পিতৃপক্ষ ও শ্বশুর পক্ষের সম্পত্তিতে নারীর অধিকার, জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠা, দাসপ্রথার বিলোপন, শোষণ-পীড়ন-স্বৈরাচার বিরোধী প্রক্রিয়া, রাজতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ও প্রশাসনের স্থলে সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন, মানুষের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা, সম্পদের সুষম বণ্টন প্রভৃতি সব কিছুর অতীত ও সাম্প্রতিক বিবর্তন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় মানুষের সচেতনতার ক্রমঃবিকাশে ইসলামী শরিয়তের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ প্রভাব লক্ষ্যণীয়। এমনকি দর্শন, বিজ্ঞান, শিক্ষা, রণনীতি, সহাবস্থান নীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এর কল্যাণময় প্রভাব সুস্পষ্ট। এই প্রভাব বহমান এবং মানুষকে প্রতিনিয়ত উন্নততর সভ্যতা, সংস্কৃতি ও পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিচ্ছে। ইসলামী শরিয়তের রাষ্ট্রিক বয়ান মদীনা সনদে (৬২২-৬২৩) কেবল বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের নিজেদের ধর্মাচার পালনসমেত যুক্তিসিদ্ধ সর্বপ্রকার মৌলিক অধিকারের অভিন্ন

প্লাটফরমে অভ্যর্থনা জানিয়ে সামিল করেনি, উপরন্তু বিভিন্ন গোত্র, গোষ্ঠী, বর্ণগত, ভাষাগত পার্থক্যের অবসানপূর্বক অভিন্ন বহুত্ববাদী মানবতাবাদী পার্থিব সমাজ গঠনের পথে সকল প্রকার বেড়া-প্রতিবন্ধকতাও উৎপাটন করেছে, যার কিঞ্চিৎ খণ্ডিত প্রতিফলন আজকের জাতিসংঘ সনদে দৃশ্যমান।

৩. প্রবর্তিত হবার সময় থেকেই ইসলামী শরিয়ত প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল মানব সমাজ ও মানুষের কল্যাণময়তার সাথে সঙ্গতি রেখে অপরিবর্তনীয় মূলনীতির আলোকে প্রায়োগিক ক্ষেত্রে নির্দেশনা প্রদান করে গতিশীলতা বজায় রেখেছে। এ বিষয়ে বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় হাজার হাজার আইনী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমকালীন মনীষীদের প্রজ্ঞা ও বিদ্যাবত্তা ধারণ করে আছে এবং এই মহতী চর্চা বিশ্বের সর্বত্র এখনো সমানে অব্যাহত আছে। বীজগণিত, পাটীগণিত, জ্যামিতিক পদ্ধতিতে মানব জীবনের বাস্তব কল্যাণময় ক্ষেত্র কর্ষণ এবং তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক ফসল উৎপাদনের কর্মযজ্ঞ চলছে। বিভিন্ন অবস্থায়, ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে বহু-বিচিত্র প্রেক্ষাপটে বাস্তব জীবনের জটিলতা ও গেরো কাটিয়ে উঠতে শরিয়তের বহুমুখী কার্যকারিতার মহাসমুদ্র মন্থন করা সাধ্যাতীত বিষয়। তবে এ বিষয়ে একান্ত মৌলিক মজ্জাগত বস্তুটার সাথে যৎকিঞ্চিৎ পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে আমরা হযরত আবুল হাসান আলী হাজবিরী ওরফে দাতা গঞ্জেবখ্শ (র.)-এর শরণাপন্ন হচ্ছি।

হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ (র.) তাঁর কাশ্ফুল মাহজুব গ্রন্থে 'পৃথিবীতে অসংখ্য প্রকার বিদ্যার বিদ্যমানতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, "সকল প্রকার জ্ঞান আয়ত্ত করা প্রত্যেক মানুষের পক্ষে যেমন সম্ভব নয়, তেমনি আবশ্যকীয়ও নয়। যে জ্ঞান অর্জন করা জরুরী, তা হলো ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োজনীয় বিদ্যা ও জ্ঞান। এ ধরনের জ্ঞানই ফরয এবং ইসলাম ধর্মীয় পরিভাষায় তা হলো শরিয়ত। তাঁর মতে পার্থিব ব্যবহারিক বিষয়ে ফরয ও ওয়াজিবসমূহের জ্ঞান লাভ, এর সাথে শরিয়ত বুঝার জন্য যা কিছু শিক্ষা করা প্রয়োজন, তা স্বাভাবিকভাবেই আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে। যেমন; মনোবিজ্ঞান, অঙ্ক, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, ব্যবসা প্রভৃতি। কেননা, এ সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা করা ব্যতীত মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, ধর্মীয় জীবন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। এগুলো ছাড়া অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জন করা অবশ্যই ভালো। তবে, সাধারণভাবে সকলের জন্য আবশ্যকীয় ও সম্ভব নয়। [এখানে স্মর্তব্য যে, আল-কুরআনে মানবিক পার্থিব জীবন, কর্মক্ষম সময়, চাহিদা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিভিন্নমুখী প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার প্রতি মানুষের দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করা হয়েছে। এই সীমাবদ্ধতার সাথে সতর্ক সঙ্গতি রেখেই কুরআন মানুষকে তার করণীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিয়েছে।] তিনি আরো বলেন, মানুষের জন্য যে ইলম বা বিদ্যা শিক্ষা করা ফরয, তার দুটো অংশ। প্রথমটি; ইলমে হকীকত এবং দ্বিতীয়টি; ইলমে শরিয়ত।

সত্যসন্ধানীদের জন্য ইলমে হকীকত ও ইলমে শরিয়ত (বাতেন ও জাহের) দুটোই সমান জরুরী ও প্রয়োজন"।[৫]

'কাশ্‌ফুল মাহজুব' গ্রন্থে ইলমে শরিয়ত সম্পর্কে বলা হয়েছে: "ইলমে শরিয়তের তিনটি রোকন বা স্তম্ভ: (ক) আল্লাহ্‌র কিতাব, (খ) রাসুলুল্লাহ্‌ (দ.)-এর সুন্নত, (গ) ইজমায়ে উম্মত!

(ক) আল্লাহ্‌র কিতাব: "শরিয়তের প্রথম রোকন আল্লাহ্‌র কিতাবের মুহকামাত[৬] আয়াতসমূহ অনুসরণ করা। এর অর্থ হলো আকাইদ, 'ফরয এবং আদেশ-নিষেধ সম্পর্কিত আয়াতগুলো যেগুলোর অর্থ, উদ্দেশ্য, দাবী-চাহিদা নির্ধারণে কোন প্রকার অস্পষ্টতা, সংশয় কিম্বা দ্বিধাময়তার অবকাশ নেই। যেখানে এবং যে মাস্‌য়ালায় কোন প্রকার দ্বিধা বা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, সেটাকে মুহকামাতের কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখতে হবে যে, কোন অবস্থা মুহকামাতের নিকটতম ও অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ।"

(খ) রাসুলুল্লাহ্‌র (দ.) সুন্নত: "আল্লাহ্‌তায়ালার আহকাম ও সঠিক উদ্দেশ্য উপলব্ধির জন্য মানুষের একমাত্র অবলম্বন হলো নবীজীর (দ.) পবিত্র সত্তা। আর তা হলো তাঁর বাণী, কর্ম ও সমর্থন। আল্লাহ্‌ অত্যন্ত মেহেরবাণী করে হাদিস ও সীরাত গ্রন্থসমূহে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল-কুরআনে বলা হয়েছে, "রসূল তোমাদেরকে যা দান করেছেন, তা গ্রহণ করো এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন, তা থেকে বিরত থাকো (৫৯:৭)।" "তোমাদের জন্য রসূলুল্লাহ্‌র জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ (৩৩:২১)"।

অতএব, নবী জীবনের খুঁটি-নাটি অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ, সমকালীন বাস্তবতা এবং আমাদের বর্তমান বাস্তবতাকে তাঁর পদক্ষেপসমূহের আলোকে নিরীক্ষণ করে কার্যোপযোগী পন্থা নির্ণয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। নবীজী (দ.) যেহেতু পূর্ববর্তী নবী-রসূলদের জ্ঞান, আদর্শ ও কল্যাণমূলক কর্মনীতির উত্তরাধিকার এবং কুরআনের তথ্য-বিন্যাস ও বর্ণনাশৈলী, প্রতিটি শব্দে ইতিহাসের সড়কে retrospective অর্থাৎ অতীত-পর্যালোচনামূলকভাবে পদচারণা করে, সেহেতু ইজমা-কিয়াসের সাম্রাজ্য অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সকল বাস্তবতার সীমারেখা পর্যন্ত সর্বত্র প্রসারিত হতে পারে এবং প্রয়োজনীয় ফসল আহরণ করতে পারে।

(গ) ইজমায়ে উম্মত: শরিয়তের তৃতীয় রোকন হলো ইজমায়ে উম্মত এবং তা রোকন হবার প্রমাণ নবীজীর (দ.) হাদিস: "আমার উম্মত কখনো গোমরাহীর কাজে ঐক্যবদ্ধ হবে না। তোমরা সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠের সাথে থাকবে।" আল-কুরআনে বলা হয়েছে: "কারো নিকট সৎপথ প্রকাশ হবার পর সে যদি রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং

মুমিনদের পথ ব্যতীত অন্য পথ অনুসরণ করে; তবে যেদিকে সে ফিরে যায়, সেদিকেই তাকে ফিরিয়ে দেবো.." (৪:১১৫)।

প্রকাশ থাকে যে, 'মুমিনদের অনুসৃত পথ (ছবিলিল্ মুমিনিন) এর অর্থ ঐ পথ, যাতে সকল মুমিনীন অথবা তাঁদের অধিকাংশই একমত। তবে ইজমার ব্যাপারে বিভিন্ন মনীষীর অভিমত প্রণিধানযোগ্য। ইমাম শাফেয়ীর (র.) মতে: "একটি মাসয়ালার উপর সব উলামায়ে কিরামই একমত হবেন এবং একটা বর্ণনাও এর বিরুদ্ধে পাওয়া যাবে না।" তবে এতে বাস্তবতাভিত্তিক যুক্তি ও চিন্তার সুস্থ স্বাধীনতা সীমিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা নিহিত। হযরত ইবনে জরীর তাবারী এবং হযরত আবু বকর রাযীর মতে, "প্রচলিত অর্থে অধিকাংশের মত হলো ইজমা।" আবার ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র.) যখন কোন মাস্য়ালা সম্পর্কে বলেন যে, "এ বিষয়ের বিরুদ্ধে আমাদের কোন বর্ণনা বা অভিমত নেই, তখন এটা মনে করা হয় যে, এ মাস্য়ালায় তাঁর ঐকমত্য রয়েছে"।

নবীজী (দ.) গবেষণার উপর প্রবল গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেন, "এক ঘণ্টা চিন্তা ও গবেষণা করা ষাট বছরের নফল ইবাদতের চেয়ে উত্তম।" ইজমা-কিয়াস-আকলের প্রয়োগের প্রতি মানবমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে আল-কুরআনে। যেমন, সূরা কূরা ৪২:৩৮: ওয়া আমরুহুম কূরা বাইনাহুম (তাদের কাজ-কর্ম পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে সম্পাদন করে)।

৪. শরিয়ত সম্পর্কে বেলায়তে মোত্লাকা: নবীজী হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর সূত্রে প্রবর্তিত বাস্তববাদী জীবন ও কর্মবিধানই ব্যবহারিক ও দার্শনিক জ্ঞানের জগতে শরিয়ত হিসেবে স্বীকৃত। মোহাম্মদী শরিয়ত সম্পর্কে 'বেলায়তে মোত্লাকা' তথা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের অবস্থান সুস্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন। "ইসলাম বিধান ধর্মের শেষ সংস্কার এবং কুরআন-পাক চির অবিকৃত ও রক্ষিত থাকায় ভুল-ভ্রান্তি মুক্ত। কুরআন সর্ব যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্মব্যবস্থা দিতে সমর্থ বলিয়াই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্ব মানবতার প্রতীক। যাহা তাঁহার বিভিন্ন হাদিস ও সুন্নত আচরণ ইত্যাদি হইতে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়। তাই ইসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম।[৭] বেলায়তে মোত্লাকার গ্রন্থকার শরিয়ত সম্পর্কে তাঁর বিশ্বাস ও সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে গিয়ে আরো বলেন, "হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)-এর চরিত্রাবলী হাদিস শরিফে প্রকাশ ও ব্যক্ত আছে। অবতীর্ণ ধর্মগ্রন্থ কুরআন পাক হাফেজ দ্বারা অবিকৃতভাবে রক্ষিত আছে। এই কুরআন বিশ্বজনীন প্রগতিমূলক যুগোপযোগী ধর্ম ব্যবস্থা দিতে সমর্থ। কুরআন পাক অবিকৃত থাকায় ইহা শেষ ধর্ম ব্যবস্থা। ইহা বিশ্ববাসীকে একই তৌহিদী শিক্ষা এবং অদ্বৈত স্রষ্টার বিশ্বাস ভিত্তিতে সকলের সমাবেশের নির্দেশ দেয়। সেই জন্য এই ধর্ম ব্যবস্থার

কার্যকারিতা অনস্বীকার্য ও গ্রহণযোগ্য। এতদসত্ত্বেও ইহা অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা ও অসম্মান করতে নিষেধ করে।"[৮]

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত আল-কুরআনের শিক্ষার ফসল হিসেবে বিকশিত মোহাম্মদী শরিয়তের আলোকে বিশ্ববাসীকে তৌহিদ বা অদ্বৈত স্রষ্টায় বিশ্বাসের ভিত্তিতে সমাবেশ তথা ঐক্যের আহ্বান জানায়।

অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর এই দৃঢ় প্রতীতি কার্যতঃ আল-কুরআনের সূরা মোহাম্মদ এ বিঘোষিত বার্তার যথার্থ প্রতিধ্বনি ঃ "যারা ঈমান আনেন, সৎ কর্ম করেন এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করেন, উহাই তাঁদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য; তিনি তাদের মন্দ কর্মগুলো বিদূরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন। (৪৭:২)। এই পরম সিলমোহরযুক্ত পরিপূর্ণতার প্রমাণপত্রই বেলায়তে মোত্লাকা তথা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের প্রধান অবলম্বন। মোহাম্মদ (দ.) নামের মোড়কে, তথা নূরে মোহাম্মদী (দ.)-এর অন্যতম ফসল সার্বজনীন কল্যাণময়তা, বিচার-সাম্য (আদলে মোত্লক), ধর্মাচার নির্বিশেষে সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক সমতাবাদ, শহুদিয়া-অজুদিয়ার কেন্দ্রবিন্দু তৌহিদে আদ্বীয়ানের ধারণা, কুল-মখলুকের মমতামূলক পরিচর্যা প্রভৃতি সকল শুভ-র যে সমাহার, বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের প্রতি পৃষ্ঠায় ঝংকৃত হচ্ছে তার অনুরণন। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের তশ্তরীতে পরিবেশিত হয়েছে সামগ্রিক শরিয়তে মোহাম্মদীতে বিধৃত বাস্তব জীবনবাদ।

বেলায়তে মোত্লাকা বা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের এই আহ্বান কেবল ধর্মীয় চেতনা বা বিশ্বাসপুষ্ট নয়, আধুনিক নৈর্ব্যক্তিক প্রগতিবাদী ধ্যান-ধারণার সাথেও সামঞ্জস্যশীল। উদাহরণস্বরূপ, পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ রেনানের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্যঃ 'ইসলাম মানুষের ধর্ম। এটা ফেরেশ্তাদের জন্য নয়। এর প্রতিটি বিধানে সব রকম সহজাত প্রবৃত্তি ও উত্তেজনাসমেত বাস্তব মানব প্রকৃতিকে বিবেচনা করা হয়েছে।' বামপন্থী বাঙালি বুদ্ধিজীবী গোপাল হালদার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "ইসলামে তত্ত্বকথার ও গোঁজামিলের স্থান নাই।...ইসলাম পেশাগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম হইবার স্পর্ধা রাখে।"[৯] লক্ষ্যণীয় যে, এই উক্তির সাথে হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উপরোক্ত মূল্যায়নের তফাৎ নেই।

শরিয়ত অর্থাৎ মোহাম্মদী শরিয়তের প্রতি মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আনুগত্য শর্তহীন ও প্রশ্নাতীত। এই বেলায়ত মোহাম্মদী শরিয়তী তৌহিদের নীতি এবং মদীনা সনদ ভিত্তিক প্রায়োগিক প্রক্রিয়ায় বিশ্বমানবতার কল্যাণমূলক ঐক্যে বিশ্বাসী। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বাগবান হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) এবং তাঁর মহান রূহানী উত্তরাধিকারীরা নিবিড় নিষ্ঠাসহকারে শরিয়তের

সকল শাখা-প্রশাখার পায়রবী করে গেছেন এবং করে যাচ্ছেন। শরিয়তের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ (র.)-এর এই বাণী প্রণিধানযোগ্য: "চিন্তা-গবেষণা এবং আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ কঠোর সাধনা ও প্রচেষ্টা ব্যতীত অর্জন করা যায় না। সকল সাধনার মধ্যে কষ্টকর সাধনা হলো শরিয়তের নির্দেশ পালন করা। যে কোন অবস্থায় ও প্রতিটি কাজে নির্দোষ পন্থা অবলম্বন করা।"[১০] তাঁর আরো উপদেশ: 'যে কোন আলেম, সুফি কিম্বা দরবেশ হোক না কেন, শরিয়তের ইলম সবার জন্য অতীব প্রয়োজন। শরিয়তের ইলম ব্যতীত কাউকে আলিম, সুফি বা দরবেশ বলা যাবে না এবং ইলম ব্যতীত এগুলো কেউ দাবিও করতে পারে না।"[১১]

টীকা : তথ্য সূত্র

(১) আল-কুরআন: ১:৫;
(২) A survey of Muslim Institutions and Culture; Prof. M. A. Hanafi, 1962
(৩) Outlines of Islamic Culture; Prof. A. M. A Shustrery, 1954;
(৪) Shorter Encyclopaedia of Islam,
(৫) কাশ্ফুল মাহজুব : ইলম ও ইলম্ অর্জন অধ্যায়: ইল্মে শরিয়ত
(৬) মিনহু আয়াতুম মুহকামাত হুন্না উম্মুল কিতাব, ওয়া উখারু মুতাশাবিহাত, অর্থাৎ যার কতগুলো আয়াত সুস্পষ্ট দ্ব্যর্থহীন, যেগুলো কিতাবের ভিত্তি, অন্যগুলো রূপক (৩:৭)। মুহকামাত আয়াতগুলো সুদৃঢ় আদেশ-নির্দেশ মূলক [অর্থাৎ করো কিম্বা করো না–dos and donts] এবং কুরআনের মূল, foundation, essence, basis তথা শরিয়তের মূলভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত। লক্ষ্যণীয় যে, সংশ্লিষ্ট আয়াতে 'মুহকামাত' আয়াতগুলোকে 'উম্মুল কিতাব' হিসেবে বিশেষায়িত করেছেন খোদ আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন। আর মুতাশাবিহাত আয়াতগুলো রূপক, প্রেক্ষাপট অনুযায়ী বহু অর্থবোধক, allegorical, ক্ষেত্র বিশেষে অস্পষ্টতাবিশিষ্ট–যার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য কেবল আল্লাহ্ই জ্ঞাত, যদিও মানবিক সীমাবদ্ধ ধারণার আলোকে অনেককে স্থান-কাল-পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজ নিজ বিবেচনা মতো ব্যাখ্যা দিতে দেখা যায়।
(৭) বেলায়তে মোত্লাকা ১০ম পরিচ্ছেদের 'বেলায়তের মোতলাকার বৈশিষ্ট্য' অনুচ্ছেদ।
(৮) ইবিড, চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।
(৯) গোপাল হালদার: সংস্কৃতির রূপান্তর (বাংলাদেশে তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬, পৃঃ ১৯৫-১৯৬)।
(১০) কাশ্ফুল মাহযুব গ্রন্থের 'বাতেনী পবিত্রতায় আহকামে শরিয়তের গুরুত্ব অনুচ্ছেদ'।
(১১) ইবিড, ইলমে শরিয়ত অধ্যায়: 'শুধু ইলম হিদায়তের জন্য যথেষ্ট নয়'–অনুচ্ছেদ।

অষ্টম অধ্যায়

বেলায়তে মোত্‌লাকা : তৌহিদই যার হৃদপিণ্ড

১. বেলায়তে মোত্‌লাকার সংজ্ঞা :

'বেলায়তে মোত্‌লাকার' বিজ্ঞ গ্রন্থকার স্বয়ং এই শব্দদ্বয়ের বঙ্গানুবাদ করেছেন 'মুক্ত বেলায়ত', যা ১৯৬০ সনে প্রকাশিত প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদে মুদ্রিত হয়েছে। এটা তাসাওউফ, দর্শন, ধর্মাচার, সমাজ-কল্যাণ ভাবনা, মানুষের ইহলৌকিক-পারলৌকিক কল্যাণ চিন্তা ও কর্মের তত্ত্ব, আদর্শ ও প্রয়োগ বিষয়ক একটি দার্শনিক গ্রন্থ। 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' তাসাওউফ তথা দর্শনশাস্ত্রের বাস্তবমুখী একটি শাখা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে, যা ইতোমধ্যে সাধারণ্যে স্বীকৃত ও অনুশীলিত হচ্ছে।

এই দর্শনকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বিজ্ঞ গ্রন্থকার অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বলেন, "পৃথিবীকে পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোঁড়াবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক বিরাট কার্যকরী রূহানী শক্তি ও তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এক মহাকৌশল বা হিকমতের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেই বিরাট শক্তির সূচনা হযরত আকদছের জাতে বা বরকতে হইয়াছে এবং সেই মহাকৌশল বা হিকমতের নাম "বেলায়তে মোত্‌লাকা"।[১] "এই বেলায়তি শক্তি ও নীতিকে আরবীতে "বেলায়তে মোহীত" বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত বলে।..সর্ব জাতির ও সর্ব ধর্মের লক্ষ্য স্থলে পৌছিবার এবং সকলের গ্রহণ উপযোগী ইহাই সহজতম পন্থা বা ত্বরিকা। তাই বর্তমান যুগে ইহার প্রয়োজনীয়তা অধিক।[২] বেলায়তে মুহীত বা সর্ববেষ্টনকারী বেলায়ত অর্থাৎ বেলায়তে মোত্‌লাকার রীতিনীতি ও খোদায়ী নীতি অভিন্ন। ইহা খোদার ইচ্ছা শক্তিসম্ভুত বস্তু।[৩] এই বেলায়তে মোত্‌লাকাই মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের ব্যবহারিক প্রকাশ (manifestation)। উপরে উল্লিখিত ফ্যাক্টরগুলো এই বেলায়তের postulate বা স্বতঃসিদ্ধ ভিত্তি হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।

২. তৌহিদ: মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা বেলায়তে মোত্‌লাকার মৌলিক ভিত্তি:

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত, বেলায়তে মোত্‌লাকা, তৌহিদে আদ্বীয়ানের একমাত্র ভিত্তি তৌহিদ। এই তৌহিদ আল-কুরআনে বিবৃত নিরঙ্কুশ তৌহিদ (absolute monotheism).

(ক) তৌহিদের সংজ্ঞা

এই তৌহিদের আল-কুরআনে প্রদত্ত সংজ্ঞা 'সূরা ইখলাস'। মাত্র চারটি আয়াতে ১৫টি শব্দের এই ক্ষুদ্র সূরাকে নবীজী (দ.) 'আল্লাহ্তায়ালার কুষ্ঠিনামা' বলে বর্ণনা করেছেন। ১৫ শব্দের এই সূরার বিশেষণ আছে ২১টি: সূরা তফরীদ (এককত্ব), সূরা তজরীদ (কারো জনক কিম্বা কারো দ্বারা জাত নন), সূরা তৌহিদ (একত্ব), সূরা ইখলাস (বিষয়বস্তু একান্তই আল্লাহ্), সূরা নাজাত (মুক্তি), সূরা বেলায়ত (আউলিয়া পথের পথিক), সূরা নিছবৎ (আল্লাহ্নিষ্ঠ), সূরা মারিফাত (মূল তত্ত্ব), সূরা জামাল (সুন্দর), সূরা মোকাইশ্কেশা (শির্ক ও অন্যান্য রোগমুক্তি), সূরা মোয়াওবেজা (সুরক্ষা), সূরা ছমদ (তাঁর মুখাপেক্ষিতা), সূরা আছাছ (আল্লাহ্র একত্বের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আসমান-জমিন তথা সমগ্র সৃষ্টি), সূরা মানেয়া (কবর আজাব মুক্তি), সূরা মাহ্জেরা (এই সূরা পাঠকালে ফেরেশ্তাদের উপস্থিতি), সূরা মোনাফ্ফেরা (শয়তান খেদান), সূরা বারায়াত (শির্ক ও দোযখ আজাব থেকে মুক্তি), সূরা মোজাক্কেরা (এককত্বের স্মৃতি জাগানিয়া), সূরা নূর (কুরআনের নূর এই সূরা), সূরা আমান (তৌহিদের প্রতি আস্থা), সূরা মোকাইর্রেরা (সর্বদা পাঠে আল্লাহ্র নৈকট্যলাভ) [সূত্র: তফসীরে রুহুল বয়ান, তফসীরে কবির, তফসীরে মায়ালে মোত্তাঞ্জীল, দালায়েলুন্নাবুয়াত]। নবীজী (দ.) প্রত্যেক রাত্রে তিনবার সূরা ইখলাস পাঠের সাওয়াব এক খতম কুরআনের সমতুল্য বলে বর্ণনা করেছেন।

(খ) হযরত আলী হাজবিরী দাতা গঞ্জেবখ্শ (র.) তাওহীদের তিন প্রকার প্রকৃতি ও তাৎপর্য নির্দেশ করেছেন: (১) আল্লাহ্ অংশীদারহীন সংশয়াতীত একক (সূরা মুমিন ৪০:১৬); (২) আল্লাহ্র বান্দা ও সৃষ্টির তরফে তৌহিদের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা (সূরা নিসা ৪:১১৬); (৩) আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সমগ্র সৃষ্টি তাঁর কাছে অভিন্ন ও সমান (সূরা বাক্বারা ২:১৮৬)।

এই শ্রেণী প্রকরণের পূর্বে তিনি আল-কুরআনের কতিপয় আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন: তোমাদের মাবুদ বা উপাস্য একক এক (৩:১৬৩, ১৬:২৩)। নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ মাত্র একজন (৪:৩৭)। হে নবী! তাদেরকে বলুন, আল্লাহ্ একজনই (১১২:১)। দুই [একাধিক] মাবুদ গ্রহণ করোনা, তিনিই তো একমাত্র ইলাহ্ (১৬:৫১)।[৪]

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা বেলায়তে মোত্লাকা এই নিরঙ্কুশ তৌহিদে অনঢ় আস্থার প্রতি সবাইকে আহ্বান জানায় এবং একই সাথে বহু-ঈশ্বরবাদ (poly-theism), দ্বিশ্বরবাদ (di-theism), সংশয়বাদ (scepticism), অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism), নাস্তিক্যবাদ (atheism), পৌত্তলিকতাবাদ (idolatry বা আচনাম: সূরা ইব্রাহিম ১৪:৩৫), অনুমান ও প্রবৃত্তি পূজা (surmise and desires বা 'জোয়ান্না ওয়া মা

তাহওয়াল আনফুস': সূরা নাজম ৫৩:২৩), জড়বাদ (materialism) সরাসরি নাকচ করে। কারণ, এগুলো logical বা নৈয়ায়িকভাবে সিদ্ধ নয় এবং জাগতিক কার্যপ্রণালীর বিজ্ঞানসম্মত বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

৩. পাশ্চাত্য দর্শনে তৌহিদের অঙ্কুর:

তৌহিদের দাশনিক ও নৈয়ায়িক যথার্থতা এবং বাস্তবতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আল-কুরআনের শিক্ষার মশালবাহী বেলায়তে মোত্লাকা/মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আধুনিক অধ্যয়নকারীদের সুবিধার্থে তৌহিদ (monism) সম্পর্কে আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের দৃষ্টিভঙ্গীর উপর যৎকিঞ্চিৎ আলোকপাত করা হলো:

(ক) প্রকৃতি সম্বন্ধী বা যুক্তিনির্ভর দার্শনিকদের (natural philosophers) ধ্রুব সত্যানুসন্ধিৎসা।[৫]

প্রাচীনতম গ্রীক দার্শনিক থেলিস (৬২৪-৫৪৭ খ্রি. পূ:), এ্যানাক্সিম্যান্ডার (৬১০-৫৪৬ খ্রি. পূ:), এ্যানাক্সিম্যানেস (৫৭০-৫২৬ খ্রি. পূ:)–এই তিন গ্রীস দার্শনিককে পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে আদি দার্শনিক হিসেবে গণ্য করা হয়। তাঁরা এশিয়া মাইনরে গ্রীক উপনিবেশ মিলেটাসের (miletus) বাসিন্দা। তাঁদেরকে ঢালাওভাবে জড়বাদী দার্শনিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু প্রকৃতির কার্যকারণ নিরীক্ষা করে তাঁরা সৃষ্টির উৎস সন্ধান করেছিলেন এবং সেজন্যে তাঁরা প্রকৃতিসম্বন্ধী বা যুক্তি-নির্ভর দার্শনিক বলেও পরিগণিত।

থেলিস মিশর সফরকালে পানির রূপ পরিবর্তনে অর্থাৎ বরফ ও বাষ্পে রূপান্তর, বৃষ্টি ও বন্যার ফলে শস্য উৎপাদন এবং ব্যাঙ, পোকা প্রভৃতির জন্ম-প্রজনন নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে ধরে নেন যে, পানিই জগতের মূল উপাদান। পানি থেকেই জগতের উৎপত্তি, পানিতেই লয়। থেলিসের মতে, পৃথিবী জল-সমুদ্রে ভাসমান। পৃথিবীতে বৃক্ষ ও প্রাণী জগতের উদ্ভব দেখে তিনি কল্পনা করেছিলেন যে, পৃথিবী অগণিত অদৃশ্য জীবন-দানায় (life-germ) ভর্তি। তবে তিনি যে গ্রীক কবি হোমারের 'পৌরাণিক গড্গুলোর' কথা বলেননি, দার্শনিকরা সে ব্যাপারে নিশ্চিত।

এ্যানাক্সিম্যান্ডার: গ্রীক ভূ-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের আদি স্থপতি তিনি। প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর গদ্যে লেখা পুস্তকই আদি পাশ্চাত্য দার্শনিক পুস্তক হিসেবে স্বীকৃত। তাঁর মতে বিশ্ব বাষ্পময়। সমুদ্র বাষ্প থেকে সৃষ্ট। এভাবে আকাশ-বাতাস-মাটি সব কিছুই আদি শক্তি তাপ ও শৈত্যের চিরন্তন দ্বন্দ্ব ও বিচ্ছুরণের ফল। জলজ-প্রাণ হিসেবে জীবনের সৃষ্টি। পৃথিবীর প্রথম মানচিত্র, মহাকাশের নক্ষত্ররাজির নক্শা, সূর্যের আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি অনুধাবনের জন্য সূর্য ঘড়ি আবিষ্কার ও ভূ-গোলক তৈরীর প্রথম কৃতিত্ব তাঁর। তাঁর মতে সকল সৃষ্ট বস্তু বা মাখলুক সীমিত এবং আপেরিয়ন বা অসীমতা থেকেই বিশ্বের সূত্রপাত। সকল সৃষ্ট বস্তু যেহেতু সীমিত,

সেহেতু তাদের পূর্বাপর অবশ্যই অসীম হতে হবে। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর ব্যাখ্যা দ্বন্দ্বমূলক (dialectic) চরিত্র বিশিষ্ট, যাতে বিবর্তনবাদী ব্যাখ্যার আভাস রয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, এ্যানাক্সি-ম্যান্ডারের প্রায় এক হাজার সাড়ে ছয়শো বৎসর পূর্বে হযরত ইব্রাহিম (আ.) প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির মাধ্যমে ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর, পরিবর্তনশীল কোন কিছুকে মাবুদ বা উপাস্য বা সর্বময় সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিলেন (সূরা আন আম ৬:৭৪-৮১,৮৩)। তাঁরও বহু পূর্বে ভারতীয় বৈদিক দর্শনের অন্যতম দিকপাল প্রজাপতি পরমেষ্ঠী একই প্রশ্ন তুলেছিলেন [ঋগ্বেদ সংহিতা, নাসদীয় সূক্ত (১০ম মণ্ডল) ১২৯ সূক্ত]। হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মতে, হযরত ইব্রাহিমের (আ.) এই সত্যান্বেষণ প্রক্রিয়া 'জ্ঞান-দর্শন-যুক্তির পর্যায়ঋণক্ত, যাহার সম্পর্ক নবুয়তের সহিত ঘনিষ্ঠতর।... এটা শহুদিয়া মসরব বা পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক পদ্ধতি।'[৬]

এ্যানাক্সিম্যানেস: তিনিও থেলিসের মতোই মাটি, বাতাস ও আগুনকে জীবন সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বলে ভেবেছিলেন। তবে বায়ু বা বাষ্পকে সব জিনিষের উৎস ধরে নিয়েছিলেন। 'ঘূর্ণায়মান বায়ু পর্যায় বিশেষের সাথে মিলিত হতে পারে এবং নয়া অস্তিত্ব তৈরী করতে পারে'–তাঁর এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে 'সংখ্যা থেকে গুণে রূপান্তরের' দ্বান্দ্বিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার আভাস রয়েছে। তবে সকল প্রকার প্রাকৃতিক পরিবর্তনের নেপথ্যে এক বিশেষ 'বস্তু'র অস্তিত্বের কথা তিনিও ভেবেছিলেন থেলিসের মতোই।

তাসাওউফ তথা আল-কুরআনেও জানানো হয়েছে যে, খামসা 'আনাসির' বা পঞ্চভূতের সংমিশ্রণে মানুষ সৃষ্ট। এর মধ্যে পানি, আগুন বা তাপ, মাটি ও বায়ু এই চার 'আনাসির' সৃষ্ট বস্তুর অন্তর্ভুক্ত এবং রুহ্ 'আলম-ই-আমর' (আল্লাহ্র নির্দেশ) এর অন্তর্গত।

প্লেটোর ধারণার (idea) জগতের ধারণাগুলোকে ক্রমানুসারে সাজালে যে সর্বোচ্চ বা সর্বোৎকৃষ্ট ধারণা পাওয়া যায়, তা-ই গড্, যা মঙ্গল বা কল্যাণের সর্বোচ্চ ধারণা। কুরআনে আল্লাহ্ সর্বপ্রকার মঙ্গলময়তা এবং প্রকৃতিনিষ্ঠ সুবিচারের নির্দশন।

স্টয়িকদের বা নিস্পৃহবাদীদের (খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে দ্বিতীয় শতক) মতে গড্ এক সার্বিক বুদ্ধিময় ও সর্বব্যাপক সত্তা এবং মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক বিধাতা। তাঁদের মতে প্রাকৃতিক বা জাগতিক নিয়ম এবং সার্বিক নিয়ম বা বুদ্ধির নিয়ম এক ও অভিন্ন। গড্ এ বিশ্ব জগতের স্রষ্টা, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক। এই অভিমত আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্র গুণাবলীর (সিফত) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

প্লাটিনাসের মতে গড্ এক নির্গুণ, অবর্ণনীয় ও অনির্বচনীয় সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময় সত্তা এবং এই গুণকূন্য অতিবর্তী সত্তাকে [deism অর্থাৎ গডের সাথে জগতের সম্পর্ক

বাহ্যিক; তিনি সৃষ্টির পূর্ব থেকেই অস্তিত্বশীল ছিলেন এবং কোন এক বিশেষ মুহূর্তে এই জগৎ সৃষ্টি করেন] সাধারণভাবে জানা যায় না। তাঁকে জানা যায় কেবল মরমী অভিজ্ঞতা তথা স্বজ্ঞার (কাশ্‌ফ) মাধ্যমে। এই ধারণাও আল-কুরআন ও তাসাওউফের সিলেবাসে যথাযথভাবে আলোচিত।

আধুনিক দার্শনিকদের ধ্রুব সত্যানুসন্ধিৎসা: রেনে দেকার্তের [১৫৯৬-১৬৫০ খ্রী; আধুনিক দর্শনের জনক হিসেবে পরিচিত ফরাসী দার্শনিক] মতে গড্ এক অসীম অনন্ত, স্বাধীন, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, অপরিবর্তনীয় পূর্ণাঙ্গ আধ্যাত্মিক সত্তা এবং জগতের স্রষ্টা। গড্ সম্পর্কে আমাদের ধারণা সহজাত, যা জন্মকালেই তিনি আমাদের মনে গেঁথে দিয়ে থাকেন। তাঁর এই ধারণাগুলো যেন কুরআন থেকে বিজ্ঞজনোচিতভাবে চয়ন করা! স্পিনোজা (১৬৩২-১৬৭৭ খ্রী; হল্যান্ডের প্রখ্যাত দার্শনিক) তাঁর পূর্ববর্তী দেকার্তের মতোই গড্‌কে এক আধ্যাত্মিক সত্তা বলে ধারণা করেন। গডের অসংখ্য গুণের অন্যতম হলো চেতনা ও বিস্তৃতি, যা সমান্তরাল। এই দুটি গুণ ব্যতীত অসীম আধ্যাত্মিক 'দ্রব্য' গড্-এর যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করা সসীম ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দেকার্তের মতো তিনিও মনে করতেন যে, 'সংশয়াতীত সত্যই (হক্কুল ইয়াকীন) চরম সত্য, যা কেবল ঐশী প্রজ্ঞার (কাশ্‌ফ) মাধ্যমেই লাভ করা যায়।' ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা, রাষ্ট্রীয় পদ্ধতির ক্ষেত্রে গণতন্ত্রবাদী, ধর্ম-বিজ্ঞান-রাষ্ট্রীয় সমস্যার ক্ষেত্রে তাঁর মুক্ত চিন্তা (মোত্‌লাকা) সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রগতিশীল চিন্তার বিকাশে সহায়ক শক্তি ছিল। Panentheism বা ওয়াহদাতুল ওজুদ পাশ্চাত্যে স্পিনোজার চিন্তাতেই পূর্ণতা লাভ করে।

লাইবনিজের [সপ্তদশ শতকের (১৬৪৬-১৭১৬) জার্মান বাস্তব-ভাববাদী দার্শনিক] মতে প্রতিটি দ্রব্য বা বস্তু হলো গবাক্ষবিহীন স্বতন্ত্র চিৎপরমাণু (monad) এবং এগুলোর শ্রেষ্ঠতম চিৎপরমাণু (monad of monads) হচ্ছেন গড্, যিনি অন্য পরমাণুগুলোর স্রষ্টা এবং সৃষ্টিকালেই এসব আত্মকেন্দ্রিক চিৎপরমাণুগুলোর পূর্ব-প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা (pre-established harmony) স্থাপন করে দিয়েছেন। তিনিই জগতের সব কিছুর উৎস এবং সব কিছুই তাঁর মধ্যে অধিষ্ঠিত। তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান, পরম দয়ালু, পরম মহৎ ও পরম মঙ্গলময় এক পূর্ণাঙ্গ সত্তা, তাঁর সব কিছুই মহৎ ও মঙ্গলময়। লাইবনিজের এই অভিমতের মধ্যে ওয়াহদাতুল ওজুদের পাশাপাশি আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র বহু সিফাতের প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়।[৭]

স্যার আইজ্যাক নিউটন (১৬৪২-১৭২৭ খ্রি.)

সার্বজনীন মহাকর্ষ ও গতির তিনটি সূত্র আবিষ্কার করার কারণে স্যার আইজ্যাক নিউটন পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রভাবশালী বিজ্ঞানী হিসেবে স্বীকৃত। তিনি কেবল একজন বিজ্ঞানী নন। তাঁর আরেক মহান পরিচয় হলো, তিনি

অনেক বড় একজন ধর্মীয় বিজ্ঞানী ও সাধক। আল্লাহ্তায়ালা বা গডের অস্তিত্ব ও ধর্ম নিয়ে তিনি প্রচুর গবেষণা করেন। এমনকি, বিজ্ঞানের চেয়েও তিনি তাঁর জীবনে বেশি সময় দিয়েছেন গডের উপাসনা ও ধর্ম গবেষণায়। উদাহরণস্বরূপ, গণিত ও বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করার জন্যে নিউটন তাঁর সারা জীবনে মাত্র এক মিলিয়ন শব্দ লিখেন, কিন্তু আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা হাজির করার জন্যে নিউটনকে লিখতে হয়েছে প্রায় তিন মিলিয়ন শব্দ। একইভাবে, পদার্থের গতির অবস্থা বুঝানোর জন্যে নিউটন তিনটি সূত্র দেন। কিন্তু হযরত ঈসা (আ.)-কে সঠিকভাবে বুঝানোর জন্যে তাঁকে দিতে হয় বারটি সূত্র।

আল্লাহ্র অস্তিত্ব ও হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে নিউটনের বারটি সূত্রের অনুবাদ এখানে দেওয়া হলোঃ

সূত্র : ১. আল্লাহ্ এক। তিনি চিরঞ্জীব, প্রতিপালক, সর্বত্র বিরাজমান, সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান এবং আসমান ও জমিনের স্রষ্টা। আল্লাহ্ ও মানবের মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টিকারী মানুষ হলেন নবী হযরত ঈসা (আ.)।

সূত্র : ২. আল্লাহ্তায়ালা হলেন অদৃশ্য, কোনো দৃষ্টি তাঁকে দেখে না অথবা দেখতে পারে না। তিনি ব্যতীত অন্য যা কিছু আছে, তা দৃশ্যমান হয়।

সূত্র : ৩. আল্লাহ্ নিজেই নিজের মধ্যে জীবন্ত এবং তাঁর নিজ হতে বান্দাদের জীবন দান করেন।

সূত্র : ৪. আল্লাহ্ সর্বজ্ঞানী। তাঁর অন্তরে মূলতঃ সকল জ্ঞান রয়েছে। তিনি হযরত ঈসা নবীর (আ.) কাছে ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান প্রেরণ করেন। নবী-রাসূলগণ ব্যতীত আসমানে বা জমিনে অথবা জমিনের নিচে এমন কেউ নেই যে সরাসরি আল্লাহ্ থেকে ভবিষ্যৎ বিষয়ের জ্ঞান লাভ করতে পারে। আর, এ কারণেই হযরত ঈসা (আ.)-এর সাক্ষ্য হলো নবুয়তের স্পৃহা এবং তিনি হলেন আল্লাহ্র বাণী (কালিমাত) বা রূহুল্লাহ্ বা আল্লাহ্র নবী।

সূত্র : ৫. আল্লাহ্ অবিচল। কোনো স্থান-ই তাঁর অনুপস্থিতিতে শূন্য বা উপস্থিতিতে পূর্ণ হয়ে উঠতে সক্ষম নয়। তাঁর উপস্থিতি-ই হলো প্রকৃতির অনন্ত অপরিহার্যতা। তিনি ব্যতীত অন্য সকল সত্তা এক স্থান থেকে অন্যত্র চলাচল করে।

সূত্র : ৬. সকল ইবাদাত, যেমন সালাত, জিকির, বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা, সব কিছু হযরত ঈসা (আ.) আগমনের পূর্বেও কেবল আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নিবেদিত ছিল, এখনো এগুলো কেবল আল্লাহ্র জন্যেই। হযরত ঈসা (আ.) তাঁর প্রভুর উদ্দেশ্যে নিবেদিত ইবাদাত হ্রাস করার জন্যে আগমন করেননি।

সূত্র : ৭. আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে নবীর নাম দিয়ে দোয়া করলে তা খুবই ফলপ্রসূ হয়।

সূত্র : ৮. আমাদেরকে সৃষ্টি, আমাদেরকে প্রদত্ত খাদ্য, পরিধেয় বস্ত্র এবং এই জীবনের অন্যান্য কল্যাণ প্রদানের জন্য আমরা কেবল আল্লাহ্তায়ালার প্রতিই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। কারণ, নবীর নামের সাহায্যে আমরা যা কিছুই সরাসরি আল্লাহ্র কাছে চাই, আল্লাহ্ তা আমাদের দান করেন।

সূত্র : ৯. আমাদের জন্য সুপারিশ করার উদ্দেশ্যে হযরত ঈসা (আ.)-এর নিকট আমাদের প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই। আমরা যদি আল্লাহ্র কাছে সঠিকভাবে প্রার্থনা করি, তাহলে তিনিই আমাদের জন্যে সুপারিশ করবেন।

সূত্র : ১০. পরিত্রাণের জন্য নবীর নাম নিয়ে আল্লাহ্তায়ালা ব্যতীত অন্য কারো নিকট প্রার্থনা করার প্রয়োজন নেই।

সূত্র : ১১. কোনো ফেরেশ্তা বা রাজা-বাদশাহকে আল্লাহ্র গুণবাচক উপাধিতে ভূষিত করলে তা প্রথম আদেশের বিরুদ্ধে যায় না। কিন্তু, কোনো ফেরেশ্তা বা রাজা-বাদশাহকে আল্লাহ্র মতো ইবাদাত করলে, তা প্রথম আদেশের বিরুদ্ধে চলে যায়। প্রথম আদেশের অর্থ হলো: "তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করবে না"।

সূত্র : ১২. আমাদের নিকট আল্লাহ্ হলেন এক ও অদ্বিতীয়। তিনি আমাদের ও সকল বস্তুর প্রভু। তিনি নবী হযরত ঈসা (আ.)-এরও প্রভু। এ কারণে, সর্বশক্তিমান প্রভু হিসেবে আমরা একমাত্র আল্লাহ্তায়ালারই ইবাদাত করি।[৮]

আল-কুরআনে এই দ্বাদশ সূত্র:

নিউটনের এই বারটি সূত্র এক সঙ্গে কুরআনের একটিমাত্র আয়াতে বিবৃত। কোর'আনে সূরা নিসার ১৭১ নং আয়াতে সবগুলো সূত্র এক সঙ্গে রয়েছে। আল্লাহ্তায়ালা বলছেন "হে কিতাবিগণ! তোমরা ধর্মের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহ্র সম্পর্কে সত্য ব্যতীত কোনো কথা বলো না [সূত্র: ২, ৩]। নিশ্চয় মরিয়ম-তনয় ঈসা মসীহ্ হলেন আল্লাহ্র রসূল ও তাঁর বাণী। আল্লাহ্ তাঁর পক্ষ থেকে মরিয়মের নিকট রূহ্ ও তাঁর বাণী প্রেরণ করেন [সূত্র: ৪]। অতএব, তোমরা আল্লাহ্ এবং তার রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর [সূত্র: ১, ৯]। আর, তোমরা একথা বলো না যে, আল্লাহ্ হলেন তিনজন [সূত্র: ১১]। যদি একথা পরিহার কর, তবে তোমাদের মঙ্গল হবে [সূত্র: ৭, ৮]। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়া থেকে তিনি পবিত্র [সূত্র: ৬, ১২]। আসমানে ও জমিনে যা কিছু রয়েছে সবই তার [সূত্র: ৫, ৪]। আর, অভিভাবক হিসাবে আল্লাহ্ই যথেষ্ট" [সূত্র: ৯, ১০] [সূরা ৪ নিসা : ১৭১]।[৯]

ইমানুয়েল কান্টের [অষ্টাদশ শতকের (১৭২৪-১৮০৪ খ্রি.) জার্মান দার্শনিক ও বিজ্ঞানী] বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মধ্যে রয়েছে জ্যোতির্মণ্ডলের নীহারিকা তত্ত্ব অর্থাৎ অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডলের সন্তরণক্ষেত্র। অন্তহীন মহাবিশ্বের অস্তিত্ব, পৃথিবীর আবর্তনে জোয়ার-ভাটার বিপরীত প্রভাব এবং গতি-স্থিতির আপেক্ষিকতার তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা। হেগেল ও

মার্কসের দ্বান্দ্বিক তত্ত্বের বিকাশে কান্টের এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের অবদান রয়েছে। তিনি ভাববাদী দার্শনিক হিসেবেই পরিচিত, তবে তাঁর ভাববাদকে অন্যান্য ভাববাদ থেকে আলাদা করে সমীক্ষণবাদী (critical) এবং সীমাতিক্রমী দুর্জ্ঞেয় অলৌকিক (transcendental) ভাববাদ বলেও অভিহিত করা হয়। তিনি অজ্ঞেয়বাদের (agnosticism) গোলক ধাঁধাঁরও মুখোমুখি হন। কান্ট নীতিশাস্ত্রে শর্তহীন নিয়ামকের (categorical imperative) বিধান প্রণয়ন করেন। এ বিধান মতে, মানুষের আচরণের ন্যায়-অন্যায় নির্দিষ্ট হবে বিষয়-নিরপেক্ষভাবে। তাঁর মতে, গড্ হচ্ছেন সর্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ সত্তা। তিনি পরম দয়ালু, ঐশী ন্যায়-বিচারক; পাপ-পুণ্যের শাস্তি ও পুরস্কারদাতা। ঐশী ন্যায়-বিচারের প্রতীক হিসেবেই তিনি গড্-এর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। লক্ষ্যণীয় যে, প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের নিয়মবদ্ধ আচরণ, এগুলোর নির্দিষ্ট ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, বিচার দিবস, ন্যায়বিচার বা আদ্‌ল সম্পর্কে আল-কুরআনে আছে দ্ব্যর্থহীন বিবৃতি, যা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তেরও অনুষঙ্গ।

ফিকটের (১৭৬২-১৮১৪ খ্রী.) মতে গড্ বা চরম আত্মাই সব সৃষ্টির মূল; যিনি নিজের স্বরূপ প্রকাশের জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেছেন। তিনি গড্‌কে 'দ্রব্য' (matter) বলতে রাজী নন। কারণ, এটা মেনে নিলে তাঁর অসীমত্বের হানি করা হয়। ফিকটের মধ্যেও রয়েছে ওয়াহদাতুল ওজুদের ধারণা।

দার্শনিক শেলিঙের মতে গড্ এক পরম সত্তা, যিনি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় সব কিছুর উর্ধ্বে এক নিরপেক্ষ সত্তা, স্বঅস্তিত্বশীল, স্বনির্ভর এবং স্বীয় অস্তিত্বের জন্য তাঁকে অন্য কিছুর উপর নির্ভর করতে হয় না।

দ্রষ্টব্য, আল-কুরআনের আয়াতুল কুরসী (২:২৫৫)।

হেগেলের (১৭৭০-১৮৩১ খ্রি.) মতে গড্ এক পরম ধারণা (idea); যিনি প্রকৃতি বা জড়, সসীম মন বা সমাজের মধ্য দিয়ে নিজেকে বিভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ ও উপলব্ধি করে থাকেন। হেগেলের গড্ ফিকটের গডের মতো নির্গুণ কিম্বা শেলিঙের গডের মতো জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের মধ্যকার কোনো নিরপেক্ষ সত্তা নন। তাঁর গড্ অনন্ত ও অসীম চেতনাবিশিষ্ট এক সত্তা, যা জড় ও মনের বহির্ভূত হয়েও এদের অন্তর্ভুক্ত। গড্ ও জগৎ এক ও অভিন্ন, তাই জগতকে বাদ দিয়ে গড্ কখনো গড্ হতে পারেন না। হেগেলের এই ধারণার মধ্যেও ওয়াহদাতুল ওজুদ তত্ত্ব নিবিড়ভাবে লেপ্টে আছে।

হেগেলের তত্ত্ব অনুযায়ী, যা কিছু জ্ঞেয় বা দৃশ্যমান, সবই হচ্ছে ভাবের (idea) প্রকাশ ও বিকাশ। জার্মান রাষ্ট্রযন্ত্রে 'ভাবের' চরম বিকাশ ঘটেছে বলে তিনি যে ব্যাখ্যা দেন, তা পরবর্তীকালে স্বৈরতান্ত্রিক ও ফ্যাসীবাদী রাষ্ট্রের আদর্শিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। পরবর্তীকালে হেগেল-দর্শন থেকে দুটো পরস্পর বিরোধী ধারার বিকাশ

ঘটে। এগুলোর একটি হচ্ছে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ বা মার্কসবাদ, অপরটা নবভাববাদ ও স্বৈরতান্ত্রিক, রাজনৈতিক মতবাদ।

ব্রাডলের (১৮৪৬-১৯২৪ খ্রি.) মতে গড্ হচ্ছেন এক পরম-পুরুষ, তিনি পরম সত্তা নন। গড্ ও পরম সত্তার মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। গড্কে পরম-পুরুষ বলে আখ্যায়িত করা গেলেও পরম সত্তাকে তা করা যায় না। পরম সত্তা সকল প্রকার দ্বৈততা ও সম্বন্ধের ঊর্ধ্বে এবং তিনি এক পরম অভিজ্ঞতা। তাঁর ধারণার মধ্যে তাসাওউফের এবং ওয়াদাতুশ্ শহুদের ফানা-বাকার বিষয়টি প্রকট হয়ে উঠেছে। তাঁর মতে, মানুষ একটি নৈতিক প্রাণী এবং তার কার্যের মূল্যায়ন হবে তার নীতি বা লক্ষ্যের ভিত্তিতে। এই বৃটিশ ভাববাদী দার্শনিকের মতে, রাষ্ট্রের ও মূল্যায়ন হবে তার লক্ষ্যের ভিত্তিতে এবং এই লক্ষ্য হলো মানুষের নৈতিক উন্নতি সাধন। এই লক্ষ্য সাধনে রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে পরস্পরবিরোধী শক্তিরূপে বিবেচনা করা অনুচিত। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্র পরস্পরের অঙ্গীভূত, মানব শরীরের ন্যায়। তাঁর এই ধারণার মধ্যে আল-কুরআনের নৈতিক সমাজ ও রাষ্ট্র দর্শনেরও সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। নবীজীর (দ.) হাদিস: "আমি মানব জাতিকে চারিত্রিক মানের উচ্চতম সোপানে আরোহন করানোর জন্য প্রেরিত হয়েছি।" আর আল-কুরআনের অন্যতম সামাজিক লক্ষ্য উচ্চতর নৈতিকতা সম্পন্ন মানব এবং সুবিচারভিত্তিক সমাজ গঠন। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের এটাই সামাজিক মূলনীতি। ইমাম গাজ্জালী, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) সহ সকল মুসলিম দার্শনিক-ওলীরা কুরআন-হাদিসের আলোকে দৃঢ় নৈতিকতা ভিত্তিক সমাজ নির্মাণের কথা বলেছেন।

যোশিয়া রয়েসের মতে, গড্ এক পরম আত্মসচেতন সত্তা এবং এই পরম সত্তা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতকে জানেন 'অনন্ত এখনের' (eternal now) মাধ্যমে। পরম সত্তা আল্লাহ্র চিরবর্তমানতা (দাহ্র বা মহাকাল), সর্বজ্ঞতা, সর্বসচেতনতা [আয়াতুল কুরসী (২:২৫৫) দ্রষ্টব্য] প্রভৃতি মানবিক বোধের ক্ষমতাতীত বৈশিষ্ট্যগুলো আল-কুরআনে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বিবৃত হয়েছে। এটাও মাইজভাণ্ডারী বেলায়েতের মৌলিক বিশ্বাসের অন্তর্গত।

এতোক্ষণ যেসব মহান সত্য ও বাস্তবতা-সাধক দার্শনিকদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো, তাতে দেখা যায় যে, তাঁরা চাক্ষুষ সত্য (হক্কুল আয়ইন) ও শিক্ষাগত বিশ্বাসের (ইলমুল্ ইয়াকিন) পথ ধরে ধ্রুব ও পরম সত্যের (হক্কুল ইয়াকিনের) সন্ধানে 'পরশ পাথর অন্বেষণকারী ক্ষ্যাপার মতো নিজেদের জীবন-ক্ষেত্র চষে বেড়িয়েছেন। তাঁদের এই সাধনা মানবজাতির উত্তরণে কোন না কোনভাবে অবদান রেখেছে। তবে এটুকু বলা যায় যে, তাঁদের সত্যানুসন্ধিৎসা যেমন বিভিন্ন মানবিক সীমাবদ্ধতার কারণে কাঙ্ক্ষিত মন্জিলে-মকসুদে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি, তেমনি পরবর্তী জেনারেশন তাঁদের

অসমাপ্ত অনুসন্ধিৎসার উত্তরাধিকার বহন করেছেন এবং সে অগ্র-সাধনা এখনো অব্যাহত। তাঁদের সকল প্রকার চিন্তা ও জ্ঞান সাধনার সমাপ্তিবিহীন রেখার অপর প্রান্তে যে এক মহাশক্তির কার্যকর অবস্থানের ইঙ্গিত বিদ্যমান, তা স্পষ্ট এবং সেটাই আল-কুরআনের ভাষায় তৌহিদ, হক্কুল ইয়াকিন (ধ্রুব সত্য)।

আলবার্ট আইনস্টাইন

আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) বলেন, 'মানব মনের সবচেয়ে সুন্দর ও গভীরতম উপলব্ধি তার অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মধ্যেই নিহিত। এটাই সমস্ত বৈজ্ঞানিক সত্যের উৎস। অতীন্দ্রিয় অনুভূতিহীন মন, যা সৃষ্টি জগতের সৌন্দর্য ও বিশালত্বে বিস্মিত ও অভিভূত হবার ক্ষমতা রাখেনা, তা মৃতের সমতুল্য। সর্বোচ্চ জ্ঞান ও সৌন্দর্যের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে মানুষের ক্ষুদ্রবুদ্ধির অগম্য বস্তুর অস্তিত্ব অনুধাবন ও উপলব্ধির মধ্যেই চূড়ান্ত ধার্মিকতা নিহিত। কিছু উগ্র নাস্তিক আছেন, যাদের অসহিষ্ণুতা ধর্মীয় উগ্রবাদীদেরকেও হার মানায়। উভয়ের অসহিষ্ণুতার উৎসমূল কিন্তু একই–তারা এমন এক জীব, মহাবিশ্বের সুর-লহরী যাদের কর্ণমূলে প্রবেশ করতে পারেনা। মহাবিশ্বের বিরাজমান ঐকতান আমার মতো সীমিত বুদ্ধির লোকের কাছে প্রকাশিত হলেও কিছু মানুষ তা বুঝতে পারেনা। তারা অন্ধভাবে গড-এর অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। আর সবচেয়ে বেশী রাগ হয়, যখন দেখি তারা তাদের মতের সমর্থনে আমার উদ্ধৃতি দেয়। মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত এই সুন্দরের ঐকতান ও ভারসাম্য কি স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট নয়?"[৯(ক)]

ড. আবদুস সালাম

নোবেল লরেটী পদার্থ বিজ্ঞানী প্রফেসর আবদুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৬) বলেন, "একজন মুসলিম হিসেবে আমি কুরআনের আধ্যাত্মিক বার্তাসমূহের উপর বিশ্বাস রাখি। একজন বিজ্ঞানী হিসেবে কুরআনের মাধ্যমে প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুনসমূহ আমার চোখে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়। কুরআনে বর্ণিত প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বলিত এমন একটি আয়াতও নেই, যা সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।"[৯(খ)]

৪. জড়বাদঃ প্রকৃতির দৃশ্যমান প্রধান দুটো অংশের একটি হচ্ছে জড়জগৎ, অপরটি প্রাণীজগৎ। আল-কুরআনের তথ্যানুযায়ী জড়জগতের সৃষ্টি হয় প্রাণীজগতের আগে, যাতে প্রাণীদের বসবাসের প্রয়োজনীয় পরিবেশ রচিত হয়। দর্শন ও বিজ্ঞানের আলোচনায় এই দুই জগতই প্রধান স্থান দখল করে আছে। জড় হচ্ছে জাগতিক পদার্থের (matter) প্রধান উপাদান এবং দৃশ্যতঃ স্থায়ী ও অপরিবর্তনীয় সত্তা। দর্শনের জগতের এক অংশে জড়বাদকে বিশ্ব জগতের আদি উপাদান বা চরম তত্ত্ব বলে মনে করা হয়। এই মতবাদ মন বা আত্মা বলে কোন আদি সত্তায় বিশ্বাস করে না। বরং, জড় থেকেই প্রাণ ও মনের উদ্ভব এবং মন ও প্রাণ জড়েরই জটিল রূপ বলে মনে

করে। এই মতবাদীগণ স্রষ্টাতত্ত্বে বিশ্বাস করেন না। জড়বাদ মূলতঃ পরমাণুবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। পরমাণুবাদ (atomism) অনুযায়ী জড় পরমাণু থেকেই বিশ্বজগৎ ও তার অন্তস্থিত সকল কিছুর উৎপত্তি। এই মতবাদ ভাববাদের (idealism) বিপরীতধর্মী ও যান্ত্রিকতাবাদী (world of mechanism) এবং সৃষ্টি-প্রক্রিয়া কতগুলো যান্ত্রিক নিয়মের অধীন বলে মনে করে। এই মতবাদ, প্রত্যক্ষণই (এলমুল আয়ইন) জ্ঞান লাভের একমাত্র উপায় বলে মনে করে এবং মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না। তাদের মতে, অতীত ঘটনাবলীই ব্যক্তির কার্যক্রম পরিচালিত করে থাকে, যাকে এক ধরণের 'যান্ত্রিক বিধিলিপি' বলা যায়।

প্রাচীন যুগের দর্শনে থেলিস, এ্যাক্সিম্যান্ডার, এনাক্সিম্যানিস, হেরাক্লিটাস, এমপিডোক্লিস, এনাক্সাগোরাস, ডেমোক্রিটাস, লিউসিপ্পাস, প্লাটো, এ্যারিস্টটল প্রমুখকে জড়বাদী দার্শনিকের বন্ধনীভুক্ত ধরা হয়। কারণ, তাঁরা পানি, বায়ু, আগুন, মাটি প্রভৃতি পদার্থ এবং অন্যান্য পদার্থিক উপাদানে জগৎ ও জাগতিক বস্তু সৃষ্ট বলে মনে করতেন। অথচ তারা যে একই সাথে এসব দৃশ্যমান সৃষ্টির পশ্চাতে অদৃশ্য এক মহাশক্তির ধারণাও প্রকাশ করে গেছেন, সে বিষয়টা অনেকটা উপেক্ষিত থেকে গেছে। আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে দেকার্ত, জন লক, বার্কলে, মিল, হিউম, লাইবনিয, রসায়নবিদ ডাল্টন প্রমুখকে জড়বাদ, পরমাণুবাদ, চিৎপরামাণুবাদী (monadism) দর্শনের সংসারভুক্ত ধরা হয়। এদের অনেকে আবার জড়বস্তুকে মনের ধারণা ও সংবেদনের সমষ্টি বলে অভিহিত করে শেষ পর্যন্ত জড় বস্তুর অস্তিত্বই অস্বীকার করেছেন। এছাড়া জড়বাদে নিশ্চল জড়বাদ বা পরামাণুবাদ (static theory of matter or atoms), সচল জড়বাদ (dynamic theory of materialism) প্রভৃতি নবতর উপশাখা-তত্ত্ব প্রণীত হয়েছে।

কিন্তু জড়বাদীরা নিজেদের বিবৃত সত্যের (postulates) যথার্থতা সপ্রমাণে ব্যর্থ হয়েছেন। অস্তিত্ব 'প্রত্যক্ষ-নির্ভর' বলে তাঁরা যে মতবাদ বিবৃত করেছেন, বিপক্ষীয় দার্শনিকরা তা অ-যথার্থ সাব্যস্ত করে বলেন যে, "প্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কাজেই প্রত্যক্ষকে প্রমাণ করার জন্য অন্য প্রমাণের প্রয়োজন। এছাড়া জড় শক্তি ও প্রাণশক্তির ভিন্নতা, যান্ত্রিক নিয়মের মধ্যে নৈতিকতা-অনৈতিকতার অবান্তরতা, ইচ্ছার স্বাধীনতার অস্বীকৃতি প্রভৃতি অনেক ত্রুটিতে যৌক্তিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ"। "Materialism is not a valid theory... The theory of Materialism as an Ontological Theory involves a number of insuperable difficulties. It virtually assumes everything and explains nothing... The theory leaves too much to chance and thus makes itself quite unscientific... The universe as revealed by modern science is a

system of systems- it comprehends a number of subordinate systems....It (materialism) is a dogmatic theory and is really equivalent to ignoring Logic, Epistomology and Science altogether... . Materialism in its old sense has been rejected by modern Mathematical Physics. Eminent scientists and philosophers have come to the conclusion that only an idealistic in.erpretation of the world-system is warranted by the latest seientific researches... Modern seicnec supposes that there is as much order in a minute atom as in the vast solar system. (also vide: Quran 36:38-40; 55:5-7...)| Such marvellous order and harmony can be explained only in terms of Teleology.10 Thus Materialism is inconsistent with the recent scientific theory as to the nature and constitution of matter... Thus Teleology is justified (also vide Quran... 21:16-17, 22, 31-33, 23:115, 44: 38-39. 46:3)... We may quote the concluding remarks of Sir James Jeans' Presidential Address to the British Association in 1934: "Little is left of forbidding Materialism of the Victorian scientists: modern physics is moving in the direction of philosophical idealism".... The Sciences of Geology and Plaeontology (জীবাশ্মবিদ্যা) prove that there has been advance or progress in the main, and that the history of the earth corresponds throughout and with the history of life on the earth, while each age prepares for the coming of another better than itself (vide: Quran: 93:4). Now, such an advance or progress implies an ideal goal foreseen and selected, and thus indicates the existence and operation of Supreme Mind (The Almighty One).[১১]

অতএব, নৈয়ায়িক (logical) ও বৈজ্ঞানিক উভয় পদ্ধতির নিরীক্ষার অস্ত্রোপচারে বস্তুবাদ অসার প্রমাণিত হয়েছে। এক একক অদৃশ্য মহান শক্তিমন্ত, বিজ্ঞানময়, কল্যাণময়, নিত্য সৃজনশীল পালনকর্তা, বিবর্তনকর্তা, কুশলী স্রষ্টার অস্তিত্ব মানব মন-মস্তিষ্ক-হৃদয়স্থিত জ্ঞান ও গবেষণায় স্বীকৃত। লোকমুখে একটা সাধারণ দার্শনিক সূত্র যুগ যুগ ধরে উচ্চারিত হয়ে আসছে: "যা অস্তিত্বে আছে, তা মানবের মনে-অন্তরে-মস্তিষ্কে-হৃদয়ে-চিন্তায় তরঙ্গ জাগায়।" একক এক স্রষ্টার অস্তিত্ব তাই আপনা থেকেই কি মানব চিত্তের বিশ্বাসের হিরক খণ্ড হয়ে নিত্য জ্বল জ্বল করে!

তবে আল-কুরআনের অন্তহীন দর্শন-রশ্মি 'বস্তুর' অস্তিত্ব ও ভূমিকাকে অস্বীকার ও উপেক্ষা করে না, যদিও অভিজ্ঞতাবাদী (empiricist) দার্শনিক জন লক বস্তুকে অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় না বলে অভিমত প্রকাশ করে 'অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়' হিসেবে স্থির করে বলেছেন; 'জড়বস্তু নয়, তার গুণাবলীকেই পাওয়া যায়।' দার্শনিক বার্কলী বস্তুকে 'ধারণা'য় পর্যবসিত করে জড়ের অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেছেন। মিল ও হিউম জড় বস্তুকে 'সংবেদনের (sensation) সমষ্টি বলে অভিহিত করে বলেন, 'এর পিছনের কোন সত্তাকে পাওয়া যায় না। কাজেই জড়বস্তু বলে কিছু নেই।' দার্শনিক ডিমোক্রিটাসের মতো সৃষ্টিতে অসংখ্য পরমাণুতে বিশ্বাসী দার্শনিক লাইব্‌নিজের মতে 'জড়ের ধারণা এক ভ্রান্ত ধারণা। জড় পদার্থ হলো অপেক্ষাকৃত কম গতিসম্পন্ন এক চিৎপরামাণু (monad)। সুতরাং, 'অচেতন জড় দ্রব্য বলে স্বতন্ত্র কিছুর অস্তিত্ব নেই।' এ ক্ষেত্রে আল-কুরআনে বলা হয়েছে "...আন্না খালক্‌না লাহুম মিম্মা আমেলাত আঈদী না...অর্থাৎ আমার [কুদরতের] হস্তে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্য হতে---(৩৬:৭১)।" বস্তুসৃজনের অপরিহার্যতা ও ব্যবহারিক গুরুত্বের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে 'আমার হস্তে সৃষ্ট' শব্দ কয়টি প্রয়োগ করা হয়েছে। বস্তুর অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্ব অনুচ্ছেদে বর্ণিত দার্শনিকদের ধারণা বা অনুমান (জোয়ান্না) এখানে জাগতিকভাবে খণ্ডিত হয়ে গেছে।

আল্লাহু রাব্বুল আলামিন তাঁর 'কুদরতের হস্তে' সৃষ্ট বস্তুগুলোকে নিরর্থক সৃষ্টি করেন নি (সূরা দুখান ৪৪: ৩৮-৩৯)। এই জড়বস্তু সহযোগেই তিনি পৃথিবীকে প্রাণীকুলের বাসোপযোগী করে বানিয়েছেন (সূরা আর-রাহমান ৫৫:১০)। সৃষ্টি করেছেন প্রাণী কুলের বাহ্যিক অবয়ব, বৃক্ষজগৎসহ সবকিছু। তাই আল-কুরআন তথা আল্লাহ্‌র সৃজন প্রক্রিয়ায় জড় নিজেও একটা অংশ। উপেক্ষিত নয়। এ বিষয়টা আল-কুরআনের আলোকে বিন্যস্ত করেছেন দার্শনিক-শিক্ষাবিদ ড. খলিফা আবুল হাকিম[১২] তাঁর বিখ্যাত Islamic Ideolegy গ্রন্থের Divine Omnipotence and Divine Goodness শিরোনামীয় সপ্তম অধ্যায়ে এভাবে: "...যদি জড়বাদী বিবর্তনবাদীরা বলেন যে, জড়ের মধ্যে জীবনের সূত্রপাত হয়, ভিজা মাটিতে; তাহলে কুরআন তাকে একভাবে সমর্থন করে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তাকে একথা বলে সংশোধনও করে দেয় যে, জড় নিজেই স্রষ্টা নয়; বরং সে নিজেও সৃষ্ট এবং বিবর্তনবাদী সৃষ্টির একটি স্তর মাত্র। নভোমণ্ডল সম্পর্কে কুরআনের বিবরণ হলো যে, প্রাথমিক অবস্থায় এগুলো ছিল স্রেফ এলোমেলো জড়পুঞ্জ। পরবর্তীকালে ক্রমঃবিকাশপ্রাপ্ত হয়ে সুশৃঙ্খল আকৃতিতে পরিণত হয় এবং জীবন সম্ভব হয় পানির জন্মের পরই।... প্রকৃতি ও তার বিবর্তন প্রক্রিয়ার দিকে পর্যবেক্ষণ করলে তার ভাঙ্গন অথবা গড়ন, যে কোন দিকেই জোর দেওয়া যেতে পারে। প্রকৃতি সব সময়েই সন্দেহাতীতভাবে গড়ার কাজে ব্যস্ত, কিন্তু গড়নের অনিবার্য ফলস্বরূপ ভাঙ্গনও

আছে। একটি ছাড়া অন্যটির আশা করা যায় না। কিন্তু যোগ্যতার উদবর্তনও (survival of the fittest : যে নিজকে ভালোভাবে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তার স্থায়িত্ব) মঙ্গলময়তার দিকের একটি নির্দেশক যা আদি ও আসল স্রৈষ্টিক তাগিদ। ইসলামী আস্তিকতা ক্রমবিকাশ নীতিকে সমর্থন করে এবং এই নীতি ঘোষণা করে যে, যা অনাবশ্যক, তা পরিত্যক্ত হয় এবং যা আবশ্যক, তা বেঁচে থাকে। এটা আল্লাহ্‌র বিরোধী হওয়া তো দূরের কথা, বরং একজন মঙ্গলময় আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের একটি জোরদার প্রমাণ। প্রকৃতির তথাকথিত অশুভ ও তার নির্দয়তা হলো অযোগ্যের ধ্বংস, যা জীবনের অগ্রগতির জন্য খুবই জরুরি।"

চতুর্ভূত দ্বারা মানুষের অবয়ব সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় আল-কুরআনে পরিবেশিত তথ্যের দার্শনিকদের ধারনার সাথে মিল পাওয়া যায়, তবে খণ্ডিতভাবে। এ প্রসঙ্গে শীর্ষ মিস্টিক কবি মওলানা রুমীর দৃষ্টিতে প্রতিভাত বিবর্তন প্রক্রিয়ার স্কেচ অবলোকন করা যাক:

"অজৈব (জমাদি) থেকে লয় পেয়ে উদ্ভিদ হয়েছি,
উদ্ভিদ থেকে মৃত হয়ে প্রাণী জগতে উঠেছি।
প্রাণী জগৎ থেকে মৃত হয়ে মানুষে পরিণত হয়েছি;
অতএব, মৃত্যু আমাদেরে নীচু স্তরে ফেলবে, সে ভয় কেন?
মানুষ থেকে মৃত্যু ঘটলে দ্বিতীয়বার হামলায়
আমরা নিশ্চয়ই ডানা ও পালক শোঝিণ ফেরেশ্‌তাহ্ হবো।
ফেরেশ্‌তাহ্ থেকে আর একবার উর্ধ্বলোকে উঠবো-
তখন কী যে হবো, তা আমার কল্পনার অতীত।
তখন আমরা অনন্তে মিশে যাবো, যেমন আদিতে ছিলুম,
আমাদেরে কি বলা হয়নি–কানা ইলায়হে রাজিউন?"
(বঙ্গানুবাদ : আবদুল মওদুদ)

রুমীর এই স্কেচ জড়বাদী বিবর্তন তত্ত্বের সীমা ছাড়িয়ে আরো অনেক দূর বিস্তৃত। তবে আমাদের এ নিবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় সার-সংক্ষেপ হচ্ছে : সৃষ্টিলোকে চলছে অন্তহীন সৃজনশীল জেহাদ বা সংগ্রাম ও বিবর্তন। মানবাত্মা (রুহ্) অবিনশ্বর।

অতএব; বৈজ্ঞানিক ও নৈয়ায়িক বিচারিক মানদণ্ডে বস্তুবাদ নিজেই অস্তিত্বের সঙ্কটের সম্মুখীন, যা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের পূর্বোক্ত স্বতঃসিদ্ধ সত্য বা postulate এর যথার্থতার সাক্ষ্য হিসেবে প্রতিভাত হচ্ছে।

৫. নাস্তিক্যবাদ, পৌত্তলিকতাবাদ, ধর্মীয় গোঁড়াবাদ

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত অর্থাৎ বেলায়তে মোত্‌লাকার অন্যতম আদর্শ ও লক্ষ্য হলো, 'পৃথিবীকে পৌত্তলিকাবাদ, নাস্তিক্যবাদ, ধর্মীয় গোঁড়াবাদিতার কবল থেকে রক্ষা করা

এবং মাবনতাবাদী একটা বিশ্ব সমাজ গড়ে তোলা'।[১৩] এই বেলায়তের দর্শন মতে, এটা আল্লাহ্তায়ালার বাঞ্ছিত পার্থিব সমাজ পরিকল্পনা। নবীজীর (দ.) হাদিস: সমগ্র মখলুকই আল্লাহ্ পরিবার।

(ক) নাস্তিক্যবাদ: নাস্তিক্যবাদ মূলতঃ জড়বাদ বা বস্তুবাদ ভিত্তিক মতবাদ। জড়বাদ যেহেতু নৈয়ায়িক, তাত্ত্বিক বা ফলিত উভয়ভাবে অসার প্রমাণিত, সেহেতু নাস্তিক্যবাদও যথার্থ প্রমাণ ভিত্তিক যুক্তিযুক্তভাবে দার্শনিক স্তরে গ্রহণীয় হচ্ছে না। এটি নির্বিচারবাদী (dogmatic); যা গ্রহণযোগ্য কোন মতবাদ নয়। নাস্তিক্যবাদীরা জ্ঞানকে ইন্দ্রিয় জগতেই সীমাবদ্ধ বলে মনে করেন বিধায় তাদের মতেই 'কোন অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সীমিত জ্ঞানে সম্ভব নয়'। একই যুক্তিতে বিপরীতক্রমে অতীন্দ্রিয় সত্তার অস্তিত্ব নেই–বক্তব্যটিও নৈয়ায়িকভাবে (logically) গ্রহণীয় নয়। দার্শনিক ও ধর্মীয় উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে নাস্তিক্যবাদ তত্ত্বও বস্তুবাদী তত্ত্বের মতো অকার্যকর তত্ত্বে পর্যবসিত হয়ে আছে। (এ প্রসঙ্গে এ অধ্যায়ের ৪নং অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য)। অতএব, নাস্তিক্যবাদ মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সম্মুখে দার্শনিক, নৈয়ায়িক কিম্বা সচেতন বিজ্ঞানসম্বত কোন প্রতিবন্ধকতা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না।

(খ) চার্বাকী নাস্তিক্যবাদ: অঙ্গিরা ঋষির পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতিকে চার্বাক মতের আদি প্রবর্তক বলা হয়। চার্বাক নামে এক দার্শনিক পণ্ডিতকে বৃহস্পতির শিষ্য বলা হয়, যিনি গুরুর মত প্রচার করেন। তবে 'চার্বাক' শব্দটির নির্বাচনেও পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। 'চারু' শব্দটার এক অর্থ বৃহস্পতি। এই 'চারুর বাক অর্থাৎ বৃহস্পতির বাক বা বাক্য' মতের অনুসারীরা 'চার্বাক' হিসেবে পরিচিত বলে বহু পণ্ডিতের অভিমত। চার্বাকগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। পরমত দূষণ বা খণ্ডণই ছিল তাঁদের একমাত্র কর্তব্য। ঈশ্বর, পরলোক, বেদ, আপ্ত, উপনিষদ প্রভৃতি তো দূরের কথা, সর্বজন স্বীকৃত প্রত্যক্ষকেও তাঁরা প্রমাণ বলে স্বীকার করতেন না। সর্বত্র সন্দেহ উৎপাদনই এই মতের চরিতার্থতা। এদের ভাবা হয় 'আদি চার্বাক'। এদের পরবর্তীরা 'ধূর্ত চার্বাক'। তাদের মতে দেহই আত্মা। পরিদৃশ্যমান জগৎ আকস্মিক ও চাতুর্ভৌতিক। পানি, মাটি, আগুন, বায়ু এই চারি পদার্থের স্বভাব শক্তির মিলনে জগতের উৎপত্তি। কর্মফল, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক, পুনর্জন্ম, পরলোকগামী আত্মা, পরমেশ্বর সবই 'প্রত্যক্ষ বহির্ভূত' অনুমানের বিষয়। কার্যকারণ সম্বন্ধও তাঁরা মানতেন না। তাদের মতে ঐহিক, দৈহিক ও ক্ষণিক সুখই স্বর্গ, কণ্টাকাদি ব্যথাজনিত দুঃখই নরক। দেহচ্ছেদেই মুক্তি। 'ধূর্ত চার্বাকই' সর্বজন পরিচিত ও বহু নিন্দিত চার্বাক সম্প্রদায়। এরা লোকযাত্রা নির্বাহের জন্য প্রয়োজনীয় মাত্রার অনুমান ও কার্যকারণ সম্পর্ক স্বীকার করেন। তবে ঈশ্বর, পরলোক, পুনর্জন্ম, কর্মফল, স্বর্গ-নরক প্রভৃতি

প্রতিপন্নকারী অনুমান স্বীকার করেন না। তাঁরা অর্থ ও কাম এই উভয়কেই পুরুষার্থ এবং অথর্ব বেদ ও গান্ধর্ব বেদকে প্রমাণ বলে স্বীকার করেন।

বৈদিক, বৌদ্ধ দর্শন তথা ভারতীয় দর্শনের বিশাল ক্ষেত্র আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ, সংশয়বাদ বা অজ্ঞেয়বাদ (scepticisn), অজ্ঞানবাদ (agnostic) প্রভৃতি বহু বিচিত্র দার্শনিক শাখা-প্রশাখায়পুষ্ট, যা মানব সংস্কৃতির ধারাবাহিক ইতিহাস গ্রীক দর্শন, পারস্য দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শনেও পরিলক্ষিত।

তবে তিন হাজার বছরের ভারতীয় চিন্তাধারা ও দর্শনের ইতিহাস যে বিষয়টা একমাত্র উপজীব্য, তা হলো : 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টি:? কিং কারণং ব্রহ্ম কুতঃস্ম জাতা জীবাম কেন কচ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতবেষু বর্ত্তামহে ব্রহ্মদ্যোব্যবস্থাম্'। শ্বেতাশ্বতরের্ ঋষিও এই প্রশ্ন তুললেন। অদ্যাপি এর তত্ত্ব 'নিহিতং গুহায়াম'। কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক কেহই এর প্রকৃত উত্তর দিতে পারেননি। বৈদিক যুগ থেকে ভারতীয় ঋষি, মনীষী, দার্শনিকরা এ প্রশ্নের (কুত ইয়ং বিসৃষ্টি– কে এই সৃষ্টিকর্তা?) জবাব খুঁজতে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে আসছেন। অনেকেই 'ঈশ্বরই সকল কারণের কারণ' স্বীকার করে সকল বিবাদ ভঞ্জনের চেষ্টা করেছেন। অনেকে কাল, কেহ নিয়তি, কেহবা যদৃচ্ছাকে, কেহ জড়প্রকৃতিকে, কেহ কর্মকে, কেহ বা অচেতন পরমাণুকে জগৎ বৈচিত্র্যের মূলীভূত কারণ স্বীকার করে 'ঈশ্বরের হাত থেকে জগৎকে রক্ষা করার নিমিত্ত' নিজ নিজ শক্তি নিয়োগ করেছেন এবং এর ফলে ভারতীয় দর্শন 'সেশ্বর' ও 'নিরীশ্বর' ভেদে দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রজাপতি পরমেষ্ঠী (নাসদীয় সূক্ত : ১০ম মণ্ডল, ১২৯ সূক্ত) পানি থেকে জগৎ বৈচিত্র্যের উদ্ভব বলে ধারণা করে পরক্ষণেই যে প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন, তা হলো : সলিল কিভাবে সৃষ্টি হলো? সকল কারণের মূল কারণ কি? তিনি হতাশ হয়ে বলেলেন ঃ 'কো অদ্ধা বেদ ক ইহ প্রবোচৎ কূত আজাতা কূত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ। অর্বাগ দেবা অস্য বিসর্জনে, নাথা কো বেদ যত আবভূব।' (এই বিবিধ সৃষ্টি কোন উপাদান-কারণ এবং কোন নিমিত্ত কারণ থেকে প্রাদুর্ভূত হয়েছে, তা কে সম্যকরূপে জানে? এই লোকে কেইবা প্রকৃষ্ট রূপে বলতে পারে? দেবতারাও এ জগতের বিবিধ সৃষ্টির পরে জন্মেছেন)। সুতরাং, জগদ্বৈচিত্র্যের মূলীভূত কারণ কেই বা জানে? তাঁর মতে, পানি স্বভাব নিয়মেই জগৎ বৈচিত্ররূপে পরিণত হলো। এই স্বভাব নিয়ম বা পদার্থের প্রতিনিয়ত শক্তিই হলো তাঁর কাম বা সিসৃক্ষা; এটা ঈশ্বরের নয়। ঋষি বৃহস্পতিও লৌক্য ও সৃষ্টি রহস্যের মূল তত্ত্বের অনুসন্ধান করতে গিয়ে পরমেষ্ঠীর সুরে সুর মিলিয়ে বলে ফেললেন ঃ "অসতঃ সদজায়ত" অর্থাৎ অসত বা অচেতন থেকে চেতনের উৎপত্তি (ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল: ৭২ সূক্ত)। পরবর্তীকালের মহর্ষি কর্ণাদ স্বভাববাদের বিরোধিতা করে বলেন, 'স্বভাব নিজে অচেতন জড় পদার্থ, সে 'সদ্ সদ্ বিচারে সমর্থ নহে। বৈচিত্র্য সৃষ্টি অচেতনের পক্ষে সম্ভব নহে।' অতএব,

জীবের অদৃষ্টানুসারে ঈশ্বরের ইচ্ছাবশে অচেতন পরমাণু থেকেই বিচিত্র জগৎ নির্গত হয়েছে। নিরীশ্বর সাংখ্যবাদীদের মতে, পরমাণুসমূহ 'অনিত্য জন্য' (সৃজিত) পদার্থ, তাই মূল কারণ হতে পারেনা। জড় বা অচেতন প্রকৃতিই জগৎ বৈচিত্র্যের মূলীভূত কারণ। 'সেশ্বর' বা আস্তিক সাংখ্যবাদীগণ বললেন, জড় বা প্রকৃতিরও একজন সচেতন অধিষ্ঠাতা আছেন। কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্যবাদীরা এতে দ্বিমত পোষণ করে বললেন, চেতনের অধিষ্ঠান ছাড়া জড়বস্তু যে কাজ করতে পারে না, সে কথা আদৌ অসিদ্ধ। চেতনা অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে জড়বস্তুর কাজ করার প্রবৃত্তি দৃশ্যমান। যেমন, নবজাতকের জন্য 'অত্যন্ত জড়স্বভাব মাতৃস্তন্য সঞ্চারিত ও ক্ষরিত হচ্ছে, জনকল্যাণের জন্য অতি জড় মেঘও বর্ষণে প্রবৃত্ত হচ্ছে। অতএব, জীবের কল্যাণের জন্য জড়স্বভাবা প্রকৃতি ও জগৎ নির্মাণে প্রবৃত্ত হবে, এতে ঈশ্বরের আবশ্যকতা কোথায়?" কিন্তু নিরীশ্বর সাংখ্য মতাবলম্বী দার্শনিকরাসহ সকলেই 'কার্যকারণ সম্বন্ধ' স্বীকার করে থাকেন। জগৎ মণ্ডলের প্রত্যেক ঘটনারই এক একটি কারণ রয়েছে। কোন পরিজ্ঞাত স্থলেই বিনা কারণে কোন ঘটনা ঘটতে দেখা যায়না। "কিন্তু হায়! কি দার্শনিক, কি বৈজ্ঞানিক, কেউই কার্যকারণ সম্বন্ধের দ্বারা এই বৈচিত্র্যপূর্ণ বিশ্বের আদি কারণ বা মূল রহস্য উদ্ভাবন করতে পারেননি। বৈজ্ঞানিককে যদি জিজ্ঞেস করা হয়, আপনার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কিরূপে সৃষ্টি হলো – কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ? তিনিও প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর মতো বিভ্রান্তভাবে বলবেন, 'কো অদ্ধা বেদ কইচ প্রবোচৎ (কেবা জানে, কেবা বলবে!)। দার্শনিকদের মধ্যে যারা বলেন, কালই (দাহ্র) বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের আদিকারণ, তাদেরকে 'কালের সৃষ্টি' সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তাঁরা নিরুত্তর হয়ে পড়েন। যারা ঈশ্বরকেই জগতের স্রষ্টা বলে স্বীকার করেন, তাদের কাছে 'জগৎস্রষ্টা ঈশ্বররূপ কার্যের কারণ সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করবেন।'[১৪] এ প্রশ্নের উত্তর পাবার গবাক্ষ বুঝি হযরত ইব্রাহিমের (আ.) সেই আদি প্রশ্ন ও এর সমাধানমূলক জবাবের ইতিহাস (৬:৭৪, ৮১,৮৩)।

এ আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে উঠলো যে, গ্রীক দর্শন তথা পাশ্চাত্য দর্শনের মতো ভারতীয় তথা প্রাচ্য দর্শনও অতীতে মহাসৃষ্টির মৌল কারণ নির্ণয়ে প্রচুর মেধা ও শ্রম নিবেদন করেছেন। আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনকে সৃষ্টি, মানুষ, প্রকৃতি, জীব ও বস্তু জগৎ সম্পর্কে যে ধরনের খুঁটি-নাটি বিচার-বিশ্লেষণ ও অন্বেষায় রত দেখা যায়, প্রায় একই ধরনের সূক্ষ্ম দার্শনিক অস্ত্রোপচারের ইতিহাসে সমৃদ্ধ সামগ্রিক ভারতীয় দর্শন। বিজ্ঞানবাদ, যোগমার্গ, বৈরাগ্যবাদ, কূন্যবাদ, ক্ষণিকবাদ, যোগাচারমত, বৈভাষিক মত ও কপিল মতের বহু জটিল গ্রন্থ রচিত আছে। ঋষি পরমেষ্ঠী সংশয়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদ কবলিত হয়েছিলেন। তিনি জগদ্বৈচিত্র্যের মূলীভূত কারণ অজ্ঞেয় বলেই মনে করেন। একইভাবে সংশয়বাদ ও অজ্ঞেয়বাদের আবর্তে নিপতিত ঋষি বৃহস্পতিও

'অসতঃ সদজায়ত' অর্থাৎ অসৎ বা অচেতন বা জড় থেকেই চেতনের উৎপত্তির কথা বলে ফেলেছিলেন প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর অভিন্ন সুরে। কিন্তু লাগোজি ভট্ট প্রশ্ন তোলেন: 'অসৎ জড়বর্গঃ' সৎ চৈতন্যবর্গঃ'–এই অসৎ বা অচেতনকেই বা কে সৃষ্টি করতে পারে? 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ?' এই একক বিশাল প্রশ্নের জবাব হাজার হাজার বছর ধরে খুঁজে চলেছেন জ্ঞান-উৎসুক মানব সন্তানরা। কিন্তু 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টির'–এর কোন যথার্থ উত্তর কারো মেলেনি। শেষ উত্তর 'বিশ্বাসে মিলয় বস্তু তর্কে বহুদূর'।

আল-কুরআন মানবের জগৎ ও জীবন জিজ্ঞাসার হাজার হাজার বছরের জবাব দিয়েছে অসীমতার প্রেক্ষাপটে; মাটির পৃথিবীতে সীমিত সময়ের জন্য সৃষ্ট মানুষ, প্রাণ, জীব ও বস্তু সত্তার পরিমণ্ডলে মানুষের নিজের জন্য করণীয় পার্থিব-অপার্থিব কর্মপন্থা নির্দেশ করে 'পথ-সন্ধানীদের' আশ্বস্ত করলেন (৯৩:৬)। অবশ্য জ্ঞান অন্বেষণের তাগিদের সমাপ্তি ঘটায়নি কুরআন। এখানে আরো একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, পাশ্চাত্য-প্রাচ্য নির্বিশেষে মানবজাতির মেধাবী অংশের সত্য–অন্বেষার স্বরূপ ও পথ প্রায় অভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিতে একাকার হয়ে গেছে। ভারতীয় ঋষি বা দার্শনিক, গ্রীক দার্শনিকদের মধ্যে হাজার বছরের কালিক ব্যবধান সত্ত্বেও স্রষ্টা-সৃষ্টি-মহাজগৎ সম্পর্কে পরম সত্য জানার সাধনার কী সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়াস? সকলেই অভিন্ন দ্বন্দ্বের সম্মুখীন এবং অভিন্ন লক্ষ্যে অভিযাত্রী।

এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের একাধিক আয়াতের মধ্যে অন্যতম আয়াত: আল্লাহু (তিনিই-সে)! তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ্ নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তাঁরই। কে সে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারেশ করবে? তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে, তা তিনি অবগত। তিনি যা ইচ্ছা করেন, তা ছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারেনা। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত, এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করেনা এবং তিনি মহান সর্বশ্রেষ্ঠ (সূরা বাক্বারা ২:২৫৫)। [আরো দ্রষ্টব্য সূরা ইয়াসিন ৩৬:৭৪-৮৩]। এই সর্বময় কর্তৃত্বের অদৃশ্য অধিকারীর সত্তার সন্ধানে ব্যাপৃত আছেন বিজ্ঞানী-দার্শনিকরা, তাসাওউফ বিজ্ঞান-সাধকরা। বিজ্ঞানী-দার্শনিকদের অনুসন্ধানের গ্রাফের আয়তন ও পরিমাণ অনির্দিষ্টভাবে বেড়ে চলেছে। তাসাওউফ বিজ্ঞানীরা, তাঁদের নিজ নিজ ধ্যানের observatory বা মান-মন্দিরে তালাশ করে এক সময়ে মৌন হয়ে পড়েন। যার প্রকাশ্য অর্থ, হ্যাঁ তিনিই সে, তিনিই আছেন, আমাদের পূর্বে তিনিই ছিলেন, আগামীতেও তিনিই থাকবেন, তিনি অনন্ত। অসীম-বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড তাঁর অধরা, অনামিকা বহিঃপ্রকাশ। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত বা বেলায়তে মোত্লাকা এই তৌহিদই ধারণ

করে। এই বেলায়ত একই সঙ্গে বিশ্বের সকল দর্শন, বিজ্ঞানের ফলাফলের পাশাপাশি আল-কুরআনের তথ্যাবলীর নিবিড় তুলনামূলক অধ্যয়ন ও অনুশীলনের তাগিদ দেয়।

পৌত্তলিকতাবাদ বা বহু-ঈশ্বরবাদ (polytheism):

দর্শনশাস্ত্রে স্রষ্টাবাদ, আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ, সর্বেশ্বরবাদ, সর্বধরশ্বেরবাদ, দ্বিশ্বরবাদ, একেশ্বরবাদ, বিশ্বতত্ত্ব, কল্যাণ-অকল্যাণবাদ, আত্মার অমরতা, অদৃষ্টবাদ, নিয়ন্ত্রণবাদ, যন্ত্রবাদ, প্রাণবাদ (vitalism), নব্যপ্রাণবাদ, স্বভাববাদ (naturalism), জড়বাদ, সত্তা (মূর্ত-অমূর্ত একত্ববাদ), সময় ও দেশ (time and space), সৃষ্টিবাদ, বিবর্তনবাদ প্রভৃতি তাবৎ বিষয়ে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য-মুসলিম দর্শনে বিবিধ তত্ত্ব, যুক্তি, নিরীক্ষার বিশাল ভাণ্ডার পাওয়া গেলেও পৌত্তলিকতাবাদ সম্পর্কে বিন্যস্ত দার্শনিক-নৈয়ায়িক কোন তত্ত্ব কাঠামো অনুপস্থিত। অথচ মানব সমাজের বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে পৌত্তলিকতার উপস্থিতি দৃশ্যমান যা, এমনকি কোন নির্দিষ্ট আঞ্চলিক সমাজেও অনৈক্য, বিভেদ, সংঘাত ও পীড়নের জন্ম দিয়েছে। সক্রেটিসের বহুপূর্বে প্রজাপতি পরমেষ্ঠী বলেছেন : 'অর্বাগদেবা অস্য বিসর্জনেন' অর্থাৎ দেবতারাও এই জগতের বিবিধ সৃষ্টির পরে জন্মেছেন। হিরণ্যগর্ভ সূক্তে ঋষি (দার্শনিক) বার বার বললেন : 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম.' যদি সকল দেবতারই এই অর্বাচীনতা, তবে কোন দেবতার উদ্দেশ্যই বা আমরা হর্বিদান করবো? অর্থাৎ কোনও দেবতাই সৃষ্টিকর্তার সম্মান পাবার যোগ্য নহে। একমাত্র 'হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে' প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্বে হিরণ্যগর্ভ ছিলেন। কিন্তু কে এই হিরণ্যগর্ভ? কিরূপেই বা তিনি জন্মগ্রহণ করলেন? 'কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ?[১৫] বহু পরে দার্শনিক সক্রেটিসও গ্রীক পুরানের দেব-দেবীদের সারবত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে বিচারের সম্মুখীন হন এবং হেমলকপানে মৃত্যু বরণে বাধ্য হন। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে জ্যোতির্বিজ্ঞানী কপার্নিকাসকে (১৪৭৩-১৫৪৩) গোঁড়া, বিজ্ঞান ও যুক্তি বিরোধী অন্ধ বিশ্বাসী যাজক সম্প্রদায়ের কোপানলে পড়তে হয়েছিল। তবে উপরোক্ত সব প্রশ্নের যথার্থ জবাব বাস্তব দৃষ্টান্তসহকারে আল-কুরআন, হাদিসে কুদ্‌সীতে লিপিবদ্ধ হয়েছে অবশ্য বহু শতাব্দী পরে।

দৃশ্যাতীত অসীম, অনন্ত মহাস্রষ্টাকে প্রকৃতি অথবা প্রতিমা রূপকে উপাসনার যে যুক্তি অতীতেও দেখানো হতো তার অসারতা এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে বর্ণিত প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সুপ্রাচীন দার্শনিকদের বয়ানে খণ্ডিত দেখা যায়। অসীমকে কল্পনার সীমা ও রূপকে অঙ্কিত করার চেষ্টা 'অসীমের অসীমত্বের' প্রতি বিশ্বাসকেই বিদ্ধ করে এবং তা সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী বস্তুবাদী দার্শনিকদের তত্ত্বগুলোর মতোই স্ববিরোধী ও অসম্পূর্ণ। অবশ্য ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর স্বীকৃত ভারতীয় দার্শনিকরা তাঁদের বহু পূর্বসূরীর সুপ্রাচীন বিশ্বাস-ধারণা-ঐতিহ্যের মূলে পৌঁছে 'একমেবাদ্বিতীয়ম' তত্ত্বেই নির্ভরযোগ্য আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা অসমীচীন হবেনা যে,

বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ দর্শন এবং বৌদ্ধ তীর্থঙ্কর শ্রমণাচার্যদের দার্শনিক-নৈয়ায়িক উপসংহারহীন বিতর্ক প্রাচ্যে দর্শনশাস্ত্রের এক সমৃদ্ধ মহাসাগরের সৃষ্টি করেছে। পরবর্তীকালে জ্ঞান-বিজ্ঞান-সংস্কৃতির উন্নততর বিকাশ সমৃদ্ধ যুক্তি-বিচারের অস্ত্রোপচার থিয়েটারে অনেক তত্ত্ব-যুক্তি অসারতার গুদামে নির্বাসিত হলেও মানবজাতির জ্ঞান-অন্বেষার সুদীর্ঘ সড়ক ও অন্তহীন ময়দানে সাধনার প্রোজ্জ্বল ঐতিহ্য হিসেবে সংরক্ষিত থাকবে।

একক স্রষ্টা-তৌহিদের সন্ধানে:

বেলায়তে মোত্লাকা তথা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের যথার্থ শেকড় অন্বেষায় খৃস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী অর্থাৎ আল-কুরআন নাজিল হবার যুগে সমকালীন মক্কা তথা আরবভূমিতে ধর্ম বিশ্বাস সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে আমরা আল-কুরআনে পরিবেশিত তথ্যের আলোকে, যা মানবিক গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ইতোমধ্যে যথার্থ হিসেবে সপ্রমাণিত, মানব সমাজের বিবর্তনের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করবো। মানব জাতির আবির্ভাব, বিকাশ ও প্রসারের যে ইতিবৃত্ত আল-কুরআনে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্র (যার মধ্যে প্রচলিত ধর্মগ্রন্থাদিসহ মানব রচিত ইতিহাস-দর্শন ইত্যাদি বিষয়ক পুস্তকাদি অন্তর্ভুক্ত) এবং প্রাকৃতিক প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে; তাতে দেখা যায় যে, মানুষকে সৃষ্টির সেরা, আশরাফুল মাখলুকাত (masterpiece of creation) বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হযরত আদম (আ.) খোদ আল্লাহ্ কর্তৃক শিক্ষা প্রদত্ত বলে বর্ণিত। তাঁর সাথে জ্ঞানের পরীক্ষায় ফেরেশ্তারা পিছিয়েছিলেন। তাঁকে ও মা হাওয়াকে অন্তর্জাত জ্ঞান, স্বাধীন বিচার-বুদ্ধি ও তা পৃথিবীতে প্রয়োগ ক্ষমতা, কর্মশক্তি, সৃজনশক্তি দিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক বাজিয়ে দেখে আল্লাহ্র পার্থিব প্রতিনিধি হিসেবে পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়। প্রাকৃতিক বিভিন্ন শক্তি ও উপাদানের রসায়নের মাধ্যমে জীবিকা আহরণের, বাস করার, সন্তান প্রজননের-পালনের মৌলিক জ্ঞানে তাঁরা জ্ঞানী ছিলেন। তাঁদেরকে পেশা হিসেবে প্রথমে শিক্ষা দেওয়া হয় কৃষিকাজ। এর পূর্বে পৃথিবীতে মানব জীবনযাপনের উপযোগী যাবতীয় উপাদান সৃষ্টি করা হয় এবং সেগুলোকে মানুষের আয়ত্তাধীন করে দেওয়া হয় (৩৬: ৭১-৭৩)। হযরত আদম (আ.) হাল চষতেন, মা হাওয়া বীজ ও পানি ছড়াতেন। এসব তথ্য আল-কুরআন, হাদিস, কিতাবুল মোকাইদ্দাসসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। উপরন্তু ঐতিহাসিক যুগের গবেষক-সাধকদের অনুসন্ধান ও চর্চায় প্রায় সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য উঠে এসেছে। মানুষের প্রাথমিক লজ্জা নিবারণ প্রয়াস, গুহা জীবন প্রভৃতির তথ্যও এসব দলিলে মিলে। কৃষিকাজ সম্পর্কে বাণী : কৃষি মানুষের আদিম পেশা। নবীজীর (দ.) হাদিস: "তোমরা ধনী হতে চাইলে কৃষি কাজে নেমে পড়ো। উর্বর মাটিতেই আল্লাহ্ সম্পদ দিয়েছেন।" উৎপাদিত পণ্যসমূহের বিনিময়, ব্যবসারও

পরাপর্শ দিয়েছেন তিনি। বিভিন্ন নবীর জীবনেতিহাসের আলোক সম্পাত থেকে জানা যায়, কৃষির পর কাষ্ঠের ব্যবহার, চাকা আবিষ্কার, নৌকা নির্মাণ, লোহা ও খনিজ পদার্থের ব্যবহার, ভবন যন্ত্র নির্মাণ, নগরায়ন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে এক একজন নবীর সম্পৃক্ততা ও সাফল্য বিদ্যমান। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতবর্ষের সুদূর অতীতের আলোক সম্পাত বিশিষ্ট গ্রন্থ মহাভারত, রামায়ন, বৌদ্ধ প্রাচীন গ্রন্থাবলীতে বিভিন্ন মুনি-ঋষি (দার্শনিক), অবতারের বরাতে ঔষধ আবিষ্কারসমেত বিভিন্ন জাগতিক উপকরণ নির্মাণের তথ্য পাওয়া যায়। এসব তথ্য মানব সমাজ ও সভ্যতার ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের বিবরণই ধারণ করে, যার সাথে নিষ্ঠাবান সমাজবিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ ফসলেরও মিল রয়েছে। অতএব, বিকৃত-অবিকৃত নির্বিশেষে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থাদিতে বর্ণিত তথ্যাদিকে কাল্পনিক কিম্বা অনৈতিহাসিক বলার অবকাশ খুবই কম। এগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যের উৎস হিসেবে যুক্তিসিদ্ধভাবে স্বীকৃত হয়ে আছে।

পূর্ববর্তী ধর্মগ্রন্থসমূহের ধারাবাহিকতায় আল-কুরআনে মানুষকে সভ্য, চিন্তাশীল, সৃজনশীল এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রামশীল সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যা ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে সৃষ্ট অন্যান্য প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তাবিশিষ্ট প্রাণী। বর্বর হিসেবে মানুষের আবির্ভাব ঘটেনি। বিকাশের ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে এসে মানুষের অন্তর্জাত ইগো বা অহম তাকে বেপথু স্বৈরমানসিকতা বিশিষ্ট করে তোলে এবং অভিন্ন উৎস বা তৌহিদী জমিন থেকে তার উদ্ভবের বিষয়কে মননে, তত্ত্বে ও প্রয়োগে অস্বীকার করে বসে। প্রকৃতিকে মানবজাতির নিয়ন্ত্রণাধীন করে দেওয়া হলেও একক ব্যক্তির অন্তহীন প্রত্যাশার পাশাপাশি তার মানবিক সীমাবদ্ধতা তাকে ব্যাকুল ও আগ্রাসী করে তোলে। অদৃশ্য একক আল্লাহ্‌র উপর প্রবল ধৈর্যসাপেক্ষ নির্ভরতার মনোবল অর্জনে ব্যর্থ উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অতিপ্রত্যাশী দুর্বলচিত্ত মানুষ বেপরোয়া হয়ে পড়ে। পার্থিব সম্পদ-শক্তি আহরণ ও অবলম্বন করে নিজেকে অতিমানবিক ভাবতে থাকে। অদৃশ্য সূত্র থেকে পার্থিব বিষয়ে সাহায্য পাবার উগ্র বাসনায় এই শ্রেণির মানুষরা একক আল্লাহ্‌র পরিবর্তে যথাযথ যুক্তি প্রমাণ বিবর্জিত অন্যান্য কাল্পনিক উপাস্য গ্রহণ করে নিজ নিজ সীমিত চিন্তাস্নাত প্রতিমায় স্বীয় বাসনাকে স্থাপন করে। এ প্রসঙ্গে কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য: "তারা তো সাহায্য পাবার আশায় আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে (৩৬:৭৪)। মানুষের এই সম্পদ ও ক্ষমতা-মদমত্ততা হযরত আদমের (আ.) জীবৎকালেই সৃষ্ট পৃথক পৃথক পরিবার প্রথার উদ্ভবকালের মতোই প্রাচীন এবং তা মানবের খারাপ প্রকৃতিগুলোর অন্যতম হিসেবে বিবেচিত।

অতএব, সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, অদৃশ্য একক আল্লাহ্ অর্থাৎ স্রষ্টার উপর নির্ভরতা ও বিশ্বাসের উপর দুর্বলচিত্ততাজনিত অদৃঢ়তা, স্বল্পায়াসে আশু পার্থিব প্রাপ্তির অস্থিরতায় এক শ্রেণির মানুষ কল্পিত দেব-দেবীর উপাসনার দিকে এগিয়ে যায়। এছাড়া প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মোকাবেলায় ব্যক্তি মানুষের অসহায়ত্ববোধও তাকে ঐ পথে মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাড়িত করে।

এ প্রসঙ্গে আধুনিক দর্শন শাস্ত্রের সূচনাকালের (খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দী) সময়কার ও পূর্বেকার গ্রীক, নর্ডিক ভূখন্ডসমূহ, এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের পুরাকথার দেব-দেবীদের (mythological god) বৃত্তান্ত পর্যবেক্ষণীয় ঃ "By philosophy we mean the completely new way of thinking that evolved in Greece about six hundred years before the birth of Christ. Until that time people had found answers to all their questions in various religions. These religious explanations were handed down from generation to generation in the form of myths. A myth is a story about the gods which set out to explain why life is as it is. Over the millenia a wild profusion of mythological explanation of philosophical questions spread across the world. The Greek philosophers attempted to prove that these explanation were not to be trusted.[১৬]

এখানে দুটো বিষয় সামনে এসে দাঁড়ায়: (১) আল-কুরআন এ ব্যাপারে বস্তু ও যুক্তিনিষ্ঠ প্রস্তাবনা সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপন করেছে, (২) খৃষ্ট জন্মের কেবল ছয়শো বছর নয়, তারো হাজার হাজার বছর পূর্বে এশিয়ার পশ্চিমাঞ্চল থেকে শুরু করে পারস্য, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি অঞ্চলে জীবন-জিজ্ঞাসার জবাবী দর্শনের ইমারত গড়ে উঠেছে। ভাববাদী, বস্তুবাদী, যুক্তিবাদী সকল প্রকার দর্শনের জমিতে কেবল গ্রীক বা হেলেনিক সভ্যতাজাত জ্ঞানই নয়, প্রাচ্যের শিক্ষা-সংস্কৃতি-ধর্ম চর্চার ফসল অনেক পূর্ব থেকেই অনেক বেশী। তবে বেদ-বেদান্ত, বৌদ্ধ দর্শনের প্রাচীনত্ব গ্রীক দর্শনের চেয়ে অনেক অধিক। এই বস্তুনিষ্ঠ দর্শন-চর্চার পূর্বেকার ঈশ্বর-তত্ত্ব (philosophy of god) গ্রীক ও আধুনিক দার্শনিকদের ভাষায় 'পুরাকথার জগৎ বা mythological world হিসেবে পরিচিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে প্রজন্মের পর প্রজন্মান্তরে প্রচলিত গ্রীক পুরাকথাগুলো মহাকবি হোমার এবং মহাকবি হেসিয়াড খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর দিকে সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন। কাব্যে কল্পনার রাংতা থাকবেই। একইভাবে দেখা যায় যে, হোমার–হেসিয়াডের কয়েক হাজার বছর পূর্বেই ভারতবর্ষে ইতিহাস আশ্রিত মহাকাব্য মহাভারত[১৭], রামায়ণ রচিত হয়েছিল যথাক্রমে ঋষি ব্যাসদেব ও মুনি বাল্মীকির হাতে। রচিত হয়েছিল বৌদ্ধ জাতক এবং একই সাথে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সমৃদ্ধ দর্শনশাস্ত্র। এগুলোর ঐতিহাসিক সময়কালের উপর আলোকপাত করা যাক: শ্রী

কৃষ্ণের যুগ আনুমানিক খৃঃ পূ. ৩৫০০ অব্দ, হযরত ইব্রাহিমের (আ.) যুগ আনুমানিক খৃঃ পূর্বঃ ২১৬০ অব্দ। হযরত মুসার (আ.) যুগ আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫২০ অব্দ, গৌতম বুদ্ধ খৃঃ পূঃ ৫৫৬ অব্দ, হযরত ঈসা (আ.) [০] খৃস্টাব্দ, হযরত মোহাম্মদ (দ.) ৫৭০ খৃঃ।

গ্রীক দর্শন পুরাকথার দেব-দেবীদের প্রত্যাখ্যান করেছে। কারণ, এগুলোর বস্তুনিষ্ঠতার সপক্ষে কোন প্রকার গাণিতিক কিম্বা নৈয়ায়িক যুক্তি পেশ করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু তারো হাজার বছর পূর্বে ভারতীয় দর্শনের একাংশও পুরাকথার দেব-দেবীদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, যেমন বৃহস্পতি, প্রজাপতি পরমেষ্ঠী। তেমনিভাবে বাস্তব যুক্তিসহকারে প্রত্যাখ্যান করেছেন হযরত ইব্রাহিম (আ.)। রসকাব্য আশ্রিত গ্রন্থগুলোতে বর্ণিত মাইথোলজিক্যাল গডগুলো তৌহিদের চারপাশে কুয়াশা-ধুম্রজাল সৃষ্টি করে। আল-কুরআনের অনবদ্য শব্দ যোজনায় সৃষ্টি-রহস্য সন্ধানী মানুষের যথার্থ-অযথার্থ দর্শন ও শিক্ষার চিত্র ফুটে উঠেছে এবং একক অদৃশ্য মহাশক্তিধর স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করে তাতে আস্থাশীল হবার জন্য মানবমণ্ডলীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। লক্ষ্যণীয় যে, মানব সভ্যতার ধূসর কিম্বা অদৃশ্য অতীতের সকল প্রকার দর্শনই চূড়ান্ত স্তরে সৃষ্টি ও স্রষ্টা-রহস্য সন্ধানের সমুদ্রে নিরুত্তর হারিয়ে গেছে। সমুদয় দর্শন যে সৃষ্টি-রহস্য ও মানবিক আচরণবিধিগত সূক্ষ্ম-জটিল জিজ্ঞাসা ও বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছে; সপ্তম শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে আল-কুরআন এসব জিজ্ঞাসার নীতিগত জবাব উপস্থাপন করেছে বাস্তব যুক্তি ও তথ্যসহযোগে অতীতের ধারাবাহিকতার জের হিসেবে।

বিজ্ঞানী-দার্শনিক আলবার্ট আইনস্টাইনের একটি মূল্যবান উক্তি এখানে উপস্থাপন করা যাক। তাঁর উপলব্ধি অনুযায়ী, "প্রথমে মানুষের নিজের অসহায়ত্বজনিত ভয়, অতঃপর 'সামাজিক বোধ', 'নৈতিক ধর্মে' উত্তরণ ধর্মবোধের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তর। ভয়ের ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মে উন্নতির কাহিনী ইহুদীদের ধর্ম গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণিত আছে। নিউ টেস্টামেন্টে এরই জের চলেছে। প্রত্যেক সভ্য জাতি, বিশেষতঃ প্রাচ্য দেশবাসীর ধর্ম মূলতঃ নৈতিক পর্যায়ের। ভয়ের ধর্ম থেকে নৈতিক ধর্মের স্তরে উন্নীত হওয়া কোন জাতির জীবনে মহত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে আদিম সমাজে মানবের ধর্ম একান্তভাবে ভীতিভিত্তিক, আর সভ্য মানুষের ধর্ম কেবল নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত–এই মনোভাব এমন একটি অন্ধ সংস্কার, যার বিরুদ্ধে আমাদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। সত্য কথা হচ্ছে এই যে, সব ধর্মেই ভীতি ও নৈতিকতার মিশ্রণ বিদ্যমান। বিশেষত্ব এইটুকু যে, সমাজ জীবনের উচ্চ স্তরে নৈতিকতার ধর্ম প্রাধান্য লাভ করে। তবে পূর্বোক্ত সকল ধারারই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গড্-এর মানবীয় ধারণা। একমাত্র আলোকসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি বা সু-উচ্চ মানসলোকাচারী মানবগোষ্ঠীই

সাধারণতঃ এই পর্যায়ের ঊর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়। ...আমার ধারণায় বিজ্ঞান ধর্মকে শুধু গড্-এর নরাকৃতিবাদরূপী (anthropomorphism /প্রতিমায়ন) খাদ থেকেই মুক্ত করে না, বিজ্ঞান আমাদের জীবনবোধের এক ধর্মীয় অধ্যাত্মীকরণও করে থাকে।" এর পরবর্তী স্তরকে তিনি 'মহাজাগতিক ধর্মীয় ভাবনা' আখ্যা দেন এবং "ক্বচিৎ কখনও তা শুদ্ধতমরূপে পরিদৃষ্ট হলেও সকল শ্রেণীর/লোকের ভিতরই এর দর্শন হতে পারে। এ উপলব্ধি যাঁর ভিতর আসেনি, তাঁকে তা বুঝানো কঠিন। কারণ, এর সঙ্গে গড্-এর 'মানবীয় কল্পনার' কোন সংশ্রব নেই। মানুষ যখন তার কামনা-বাসনা ও লক্ষ্যের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করে, তখন বিশ্বপ্রকৃতি ও ভাবরাজ্যের মহিমান্বিত মনোহর রূপ তার মনশ্চক্ষুর সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়। নিজের অস্তিত্ব তার কাছে কতকটা বন্দীদশার মতো প্রতীয়মান হয় এবং বিশ্ব চরাচরকে সে এক তাৎপর্যপূর্ণ অখণ্ড সত্তারূপে সমগ্রভাবে বুঝতে চায়। বিকাশক্রমের প্রথম যুগেই, যেমন ডেভিড (হযরত দাউদ আ.) ও অন্যান্য মহাপুরুষদের পবিত্র গাথায় এই মহাজাগতিক ভাবনার আভাস পাওয়া যায়।... সর্বকালের ধর্মীয় মহাপুরুষদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই-জাতীয় ধর্মীয় ভাবনা। এই ভাবনার মধ্যে কোন রকম সঙ্কীর্ণ গোঁড়ামী নেই এবং গড্কে মানুষের প্রতিরূপে কল্পনার স্থান নেই। সুতরাং, এই আদর্শের আধারে কোন রকম ধর্মীয় সম্প্রদায় বা পন্থা গড়ে উঠেনি। তাই মুখ্যতঃ প্রত্যেক যুগের 'অবিশ্বাসীদের' ভিতরই আমরা এমন সব লোক পেয়েছি, যাঁদের ভিতর উচ্চতম ধর্মীয় ভাবনার সমাবেশ দেখা গিয়েছে। সমসাময়িক যুগ এঁদের কখনো কখনো সাধু-সন্তের মর্যাদা দিলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এঁদের 'নাস্তিক' বলেই বিবেচনা করা হয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে ডেমোক্রেটাস, ফ্রান্সিস অব অ্যাসিসি এবং স্পিনোজা ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সদৃশ। মহাজাগতিক ধর্মীয় ভাবনায় গড্ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট ধারণা নেই বা এর কোন তত্ত্ব দর্শন নেই।.. আমি বিশ্বাস করি যে, মহাজাগতিক ধর্মীয় ভাবনা হচ্ছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও মহত্তম প্রেরণা। বিশুদ্ধ তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অগ্রদূত হবার জন্য কী অপরিসীম কর্মসাধনা ও সর্বোপরি আত্মভোলা নিষ্ঠা প্রয়োজন, এ সম্বন্ধে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁরাই শুধু বুঝতে পারবেন যে, মনে কতো প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি হলে নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের বাস্তবতার সাথে সম্পর্করহিত এই জাতীয় অবদানের জন্ম হতে পারে। বিশ্বচরাচরের ভিতর একটা সুসংবদ্ধ নিয়ম ক্রিয়াশীল। সে সম্বন্ধে কী দৃঢ় প্রত্যয় এবং তাকে উপলব্ধি করার জন্য কী গভীর আকুতি! কেপলার ও নিউটনকে মহাকাশাচারী গ্রহ-নক্ষত্রমালার বলবিদ্যা (mechanics) সংক্রান্ত নিয়মাবলীকে সকল প্রকার অবোধ্যতার প্রভাবমুক্ত করার জন্য যে বহু বর্ষব্যাপী নিঃসঙ্গ সাধনা করতে হয়েছিল, তাতে তাঁদের মনের বিশালতার কতটুকুই বা জনসমক্ষে প্রকটিত হয়েছে? সন্দেহবাদীদের (sceptics)

দ্বারা পরিপূর্ণ পরিবেশের ভিতর যাঁরা সমগ্র পৃথিবী ও সর্বকালের সমমনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের পথের নিশানা দেন, তাঁদের মনোভাব সম্বন্ধে সহজেই সেই সকল ব্যক্তির মনে একটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়ে থাকে, যারা মূলতঃ প্রত্যক্ষ ফলের দ্বারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুণাগুণ বিচার করেন। এসব লোকেদের কোন সে মন্ত্র প্রেরণা দিয়েছে ও অগণিত ব্যর্থতা সত্ত্বেও কোন সে শক্তি এদের আদর্শের প্রতি অবিচল থাকার ক্ষমতা যুগিয়েছে, তা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেন, শুধু সেই ব্যক্তি, যিনি একই জাতীয় কার্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। মহাজাগতিক ধর্মীয় ভাবনাই মানুষকে এ শক্তি দেয়। জনৈক সহযোগী অত্যন্ত সঙ্গত উক্তিই করেছেন যে, আমাদের এই জড়বাদী যুগে তন্ময় চিত্তে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিরত ব্যক্তিরাই একমাত্র নিষ্ঠাবান ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। বিজ্ঞান জগতের দিকপালদের ভিতর কদাচিৎ এমন কাউকে পাওয়া যাবে, যাঁর ভিতর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত একটা ধর্মীয়ভাব নেই। তবে এটা প্রাকৃতজনের ধর্ম থেকে পৃথক। সাধারণ লোকের কাছে গড্ এমন এক সত্তা, যাঁর কৃপাদৃষ্টিতে উপকার হয়ে থাকে এবং তাঁর রোষ আতঙ্কের ব্যাপার। এ জিনিস কতটা পিতার কাছে সন্তানের আনুগত্যের মতো। মনে যথেষ্ট সমীহা থাকলেও এ ব্যাপার হচ্ছে সেই সত্তার সঙ্গে কতকটা ব্যক্তিগত সম্পর্কের মত। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মনে কাজ করে বিশ্বজনীন কারণত্ব। ভবিষ্যতের সবটাই তাঁর কাছে অতীতের মতোই প্রয়োজনীয় ও পূর্ব-নির্ধারিত (determined)। নীতিশাস্ত্র মোটেই স্বর্গীয় কিছু নয়, এ হচ্ছে নিছক মানবীয় ব্যাপার। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর সুসংবদ্ধতা দৃষ্টে উদ্ভূত এক বোধাতীত বিপুল বিস্ময়ভাবই হচ্ছে তাঁর ধর্মীয় অনুভূতি। প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর ভিতর তিনি এমন এক উচ্চগ্রামের সূক্ষ্ম বুদ্ধির পরিচয় পান, যার তুলনায় মানবের যাবতীয় বিধিবদ্ধ চিন্তা ও কর্ম একান্ত তুচ্ছ প্রতিফলন বলে বোধ হয়। নিজেকে স্বার্থপর বাসনার কবলমুক্ত রাখার কাজে এই বোধই তাঁর জীবন ও কর্মের মুখ্য নিয়ামক হয়। সর্ব যুগে যে ভাবনাটা ধর্মীয় মহাপুরুষদের প্রেরণা দিয়েছে, এ যে, তারই একান্ত অনুরূপ, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠতে পারেনা।"[১৮]

বিখ্যাত আপেক্ষিকতা তত্ত্বের (theory of relativity) উদ্ভাবক বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের এই উদ্ধৃতিগুলোতে 'প্রতিভাবান ব্যক্তিরা' আল-কুরআনের বিজ্ঞানময়তার তফসীরের রূপ পেতে পারেন। এগুলোতে একজন 'বিজ্ঞানী দার্শনিকের' জীবন-ভাবনারও স্ফুরণ ঘটেছে। আল-কুরআনে বিজ্ঞানময় বিষয়গুলোর প্রসঙ্গে বার বার জ্ঞানী-প্রতিভাবানদের রেফারেন্স টেনে আনা হয়েছে। সকল প্রকার গোঁড়ামী, সঙ্কীর্ণতা এবং সীমাবদ্ধ ধারণা-বৃত্তের বাইরে এসে আল-কুরআন যে তথ্য ও শিক্ষা পেশ করেছে, তাতে দেখা যায় যে, ইসলামী দর্শন ও মূল্যবোধের বিচারে মানবজাতি

পত্তনকাল থেকেই মহাজাগতিক ভাবনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং এতদসঙ্গে পরিবেশিত 'স্রষ্টাতত্ত্ব' বিজ্ঞানময়। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এই শিক্ষারই সারাংশ ধারণ করে।

বস্তুবাদ ও ধর্মবাদের দার্শনিক মল্লক্ষেত্র প্রাকৃতিক থিওলজী এবং প্রত্যাদিষ্ট বা ওহীকৃত থিওলজী:

আধুনিক বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান ভিত্তিক যুক্তিমত্তার ক্রমঃপ্রসার নিরেট বস্তুবাদকে আরো স্থবির তত্ত্বে পর্যবসিত করছে। বস্তুবাদী তত্ত্ব যান্ত্রিকতাবাদ (mechanism) ভিত্তিক তত্ত্ব বিধায় মানুষের প্রধান বৈশিষ্ট্য সক্রিয় সৃজনশীল ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্তিত্বহীন ও অস্বীকার করে সামাজিক ক্ষেত্রে প্রথমেই হোঁচট খেয়েছে এবং এক ধরনের একদেশদর্শী নিয়ন্ত্রণবাদ, একনায়কবাদের অবাঞ্ছিত উত্থানের খোরাক যুগিয়েছে। অন্যপক্ষে, আল-কুরআনে নিতান্তই বাস্তব মহাজাগতিক প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট্য বলে অভিহিত করেছে। তবে এ ক্ষেত্রে একটা লক্ষ্যণীয় সামাজিক বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, মানুষ স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি ও তা প্রয়োগের কর্মক্ষমতাবিশিষ্ট হলেও তার কর্মের ভালো-মন্দের দায়-দায়িত্ব মানুষের নিজের উপরই ন্যস্ত করেছে। এখানে আল-কুরআনের আরো একটা বৈশিষ্ট্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। Theology [theos (god) and logos (discourse, reasoning or science) thus means Science or Philosophy of God] অর্থাৎ দার্শনিক ধর্মতত্ত্ব বলতে 'প্রাকৃতিক ধর্ম তত্ত্বকে (natural theology) বুঝায়। 'ওহী' বা revealed theology থেকে আলাদাভাবে বুঝানোর জন্যই দর্শনবিদরা natural theology শব্দ বা term ব্যবহার করেন। কিন্তু আল-কুরআনে natural theology-এর সাথে revealed theology পার্থক্যের অবকাশ দৃষ্ট নয়, কারণ দুটোই জীবন ঘনিষ্ঠ বিষয়। উপরন্তু natural theology-কে একাধারে 'ধর্মের বিজ্ঞান'-ও (science of religion) বলা হয়। Natural theology-তে যে পরম স্রষ্টার ধারণা আপনা থেকেই যৌক্তিকভাবে এসে পড়ে, তা ধর্ম বা religion হিসেবে অভিহিত বিষয়টার মৌলিক অনুষঙ্গ। ধর্মের দার্শনিক সংজ্ঞা হলো : "এমন এক সত্তায় মানুষের বিশ্বাস ও আস্থা, যা তার চেয়ে বহুতর শক্তিমন্ত এবং তার সকল প্রকার বোধ ও ধারণার অতীত অগম্য! তবে তার ঐ বিশ্বাস মতে, ঐ মহান শক্তিমন্ত সত্তা তার আবেগ, অনুভূতি, কাজ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি মানবিক ব্যাপার ও আচরণের প্রতি উদাসীন নহেন। বরং স্নেহ ও দয়াপ্রবণ।" এ সংজ্ঞা থেকে সুস্পষ্ট যে, ধর্মীয় বোধের সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক আবেগ, ইচ্ছাশক্তি প্রভৃতি জড়িত। 'ধর্মের' সর্বোচ্চ ধারণার সাথে একক আল্লাহ্ বা মড়ফ এর উপর বিশ্বাস অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানুষ যেমন পঞ্চভূতের রসায়নজাত সমষ্টি, তেমনি আল-কুরআন সকল প্রকার দর্শন চেতনা ও চর্চার পূর্ণাঙ্গ রসায়ন, যা

অগুণতি উপাদানে তৈরী মানুষের জন্য সর্বোতভাবে যে কোন ক্ষেত্রে উপযোগী। আল-কুরআন কেবল মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক, মস্তিষ্কবৃত্তিক, মানসিক বৃত্তিক বিষয়াদি নয়, তার দৈহিক, জৈবিক, পরিবেশগত চাহিদা, চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রাণী জগৎ, বৃক্ষ জগৎ (যা তার জীবন ধারণের জন্য অপরিহার্য) নভোজগৎ (মেঘ, বৃষ্টি, আলোর আধার) ইত্যাকার সব কিছুকে মানব ব্যবহারোপযোগী রসায়নপূর্বক দৃশ্যমান-অদৃশ্য সব কিছুর জ্ঞানপিন্ড আকারে মানবজাতির হাতে তুলে দিয়েছে। এখানেই আল-কুরআনের সাথে অন্যান্য খণ্ডিত দর্শন-বিজ্ঞানের ফারাক।

খঃ বিশ্বসৃষ্টি ও বিবর্তনের তত্ত্বঃ পরম কারণবাদ (teleological) এবং এর বিপরীতে যান্ত্রিকতাবাদ (mechanical) প্রসঙ্গঃ

আধুনিক দার্শনিকদের চিন্তাপ্রসূত বিশ্ব সৃষ্টি ও বিবর্তন তত্ত্বের পাশাপাশি এ ব্যাপারে আল-কুরআনের আলোকসম্পাত নিম্নে উপস্থাপিত হলো। দর্শনের টেবিলে বিশ্ব জগতের উৎপত্তি সম্পর্কে দুটো প্রধান তত্ত্ব বিদ্যমানঃ (১) বিশেষ সৃজন তত্ত্ব (special creation theory) এবং (২) বিবর্তন তত্ত্ব (theory of evolution)। বিশেষ সৃজন তত্ত্ব অনুসারে এক সময়ে গড্ ছাড়া কোন সত্তা ছিলনা। তিনি বললেন, "পৃথিবী হয়ে যাক" এবং বিশ্ব তাৎক্ষণিকভাবে অস্তিত্ববান হলো। এই তত্ত্ব মতে বিশ্বজগতকে ক্রমবিবর্তনের পথ ধরে অস্তিত্ববান হতে হয়নি। গড্ পৃথিবীতে দৃশ্যমান সকল প্রাণী, বস্তু, গ্রহ-নক্ষত্র-ব্যোম এক পলকেই সৃষ্টি করেছেন। বাইবেলের জেনেসিস বা পয়দায়েশ বা সৃষ্টির বিবরণে এ তত্ত্বের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তবে আধুনিক বিজ্ঞানী-দার্শনিকরা বিশ্বের কাঠামো ও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁদের হস্তস্থিত তথ্য ও ধারণার আলোকে বিবর্তনতত্ত্বের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূ-বিজ্ঞান, জীব-বিজ্ঞানের গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বিবর্তন প্রক্রিয়াই অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত বলে তাঁদের প্রতীতি জন্মে। এতদসত্ত্বেও প্রকৃতি এবং বিবর্তনের কারণ সম্পর্কে বহুবিধ অভিমত প্রচলিত আছে। এর মধ্যে দুটো প্রক্রিয়া প্রধানরূপে বিবেচিত হয়; (১) যান্ত্রিক (mechanical), (২) পরম কারণ বা সুপরিকল্পিত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (teleological)। সহজ কথায় বলা যায়, কেউ কেউ অনুমান করেন এই বিবর্তনের প্রক্রিয়া কোন সৃজনশীল ধারণা, সুচিন্তিত পরিকল্পনা ও উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ব্যতিরেকে স্বয়ংক্রিয় অথবা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংঘটিত হয়েছে (mechanical)। আবার কেউ কেউ মনে করেন যে, বিবর্তন প্রক্রিয়া একটি সুচিন্তিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য বা ধারণা দ্বারা পরিচালিত–যা এক পরম সৃজনশীল মন বা গডের (supreme creative mind বা God) কর্ম প্রক্রিয়া বিশেষ (teleological)।

যান্ত্রিক বিবর্তনবাদীদের ধারণা, কোন প্রকার পরিকল্পনাবিহীনভাবে প্রকৃতির অন্ধ পদার্থ বা বস্তু শক্তির যান্ত্রিক ফলশ্রুতি হিসেবে এই বিবর্তন ঘটেছে। দার্শনিক চিন্তাবিদ Tyndall, Huxley, Herbert Spencer প্রমুখ এ ধারণা পোষণ করেন। হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর 'সংশ্লেষাত্মক দর্শনে (synthetic philosophy) এই তত্ত্বের একটা পূর্ণাঙ্গ রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি এ তত্ত্বে Laplace-এর নীহারিকা উপপ্রমেয়' (nebular hypothesis) ব্যবহার করেছেন। তিনি এর পাশাপাশি Lamarck ও Darwin-এর জীবতাত্ত্বিক বিবর্তন (biological evolution), মনস্তত্ত্বের নীতিমালা, সমাজতাত্ত্বিক নীতিমালা, নীতিশাস্ত্রীয় নীতিমালা ব্যবহার করেছেন এবং এগুলোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে তার synthetic philosophy. যাতে তিনি বিবর্তন প্রক্রিয়াকে 'যান্ত্রিক' বলে প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। তিনি এ ধারণাও পোষণ করেন যে, বস্তু ও জীবন, জীবন ও মন; প্রাণীজ মন ও যুক্তিমন্ত মনের (animal mind and rational mind) মধ্যে কোন ফারাক নেই। কিন্তু তাঁর দর্শনের বিড়ম্বনা (irony) এই যে, বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে তিনি সীমাবদ্ধতার উপর জোর দেন এবং অজ্ঞেয়বাদের (agnosticism) আবর্তে পতিত হন। দার্শনিক হিউম, কান্ট ও মিল প্রভাবিত এই চিন্তাবিদের মতে, বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তির সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতা। তাই বৈজ্ঞানিক সত্যের চরম নিশ্চয়তা থাকতে পারেনা। মানবিক চিন্তাপ্রসূত বিজ্ঞানের পক্ষে তাই 'অস্তিত্বের/সত্তার রহস্য' উদ্ধার সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের এই অজ্ঞেয়বাদ তাঁকে 'ধর্মীয় বিশ্বাসের' পরিমণ্ডলে টেনে নিয়ে যায়। ধর্ম বিশ্বাসীদের মতে, বিশ্ব নিয়ন্তা অজ্ঞেয়। কাজেই ধর্ম বিশ্বাস আর বিজ্ঞানের মধ্যে তফাত কোথায় থাকে! ধর্ম ও বিজ্ঞান পরস্পর সংলগ্ন সত্য। তবে তিনি মনে করেন যে, জড় ও জীবন সবটিই বস্তু এবং বিবর্তনের ফল। [বিঃ দ্রঃ আলবার্ট আইনস্টাইনের উক্তি : "বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ, ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান পঙ্গু।[১৯] আল-কুরআন : "তিনি যা ইচ্ছা করেন, তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না (২:২৫৫)"। পৃথিবীতে স্বল্পকালীন স্থায়ী মানুষের জ্ঞান ও জানার সীমাবদ্ধতার প্রতি আল-কুরআনে বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।] শেষ পর্যন্ত সকল কিছুর ভিত্তি হিসেবে হার্বার্ট স্পেন্সার একটি একক নিরঙ্কুশ শক্তিমন্ত সত্তার কথা স্বীকার করেন। তবে এই শক্তি অজ্ঞাত এবং জ্ঞানের অতীত। তিনি এমনকি এতদূর বলেছেন যে, এই নিরঙ্কুশ শক্তিমন্ত সত্তা সম্ভবতঃ নৈর্ব্যক্তিক।

Laplace-এর নীহারিকা হাইপোথেসিস তত্ত্ব হার্বার্ট স্পেন্সার তাঁর synthetic philosophy-তে যুক্ত করেছেন। তবে ঐ নীহারিকা হাইপোথেসিস খগোল বিজ্ঞানের অবিরাম অগ্রগতির গতির সাথে প্রতিযোগিতায় হোঁচট খেয়ে পড়েছে বহু আগেই। Laplace ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিককার মানুষ। স্পেন্সার ছিলেন তাঁর প্রায় এক শতাব্দী পরের মানুষ। ঐ একশো বছরে খগোল

বিজ্ঞান এগিয়ে যায়। এ তত্ত্ব 'যান্ত্রিক মহাজাগতিক বিবর্তন তত্ত্ব' (The Mechanical Theory of Cosmological Evolution)[২০] হিসেবে অভিহিত। খগোল বিজ্ঞানের অবিরাম অগ্রগতি অন্তহীন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে প্রতিদিনকার নব নব তথ্য উদ্‌ঘাটন ও আবিষ্কারের ফলে। লক্ষ্যণীয়, খগোল (cosmos বা কঠোর শৃঙ্খলাবদ্ধ মহাজগৎ) বিষয়ে আল-কুরআনে বহু আয়াত বা নিদর্শন উপস্থাপন করা হয়েছে, যেগুলো সম্পর্কে উদ্‌ঘাটিত নবতর তথ্যাদি ঐসব আয়াতের কিম্বা ইঙ্গিতের যথার্থতা সপ্রমাণ করে চলেছে। বিশ্ব জগৎ বাস্তব জগতের প্রণালীবদ্ধ সংশ্রয় (system of Reals)। এটা বহুতরের ঐক্য (unity in plurality)। ড. পলসনের মতে "Reality represents, so for as we can see, a unitary, organised system governed throughout by laws: a cosmos।[২১] অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক বিধান বলে সুসংগঠিত পদ্ধতিতে সৃষ্ট জগৎ পরিচালিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে বলে আল-কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের পূর্বোক্ত উদ্ধৃতিগুলো আরো নিবিড়ভাবে teleological তত্ত্বের পরিপোষক।

আঙ্গিক বিবর্তন (organic evolution) ও ডারউইন (১৮০৯-১৮৮২ খ্রি.):

এবার যান্ত্রিক জীবতাত্ত্বিক বিবর্তনের (The Mechanical Theory of Biological Evolution) তত্ত্ব খতিয়ে দেখা যাক। এই ধারার বিবর্তনবাদীরা প্রাণীকুলের বিবর্তনকে চার্লস ডারডইনের 'দৈবাৎ পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক নির্বাচন (fortuitious variations and natural selection) এবং লামার্কের 'পরিবেশের প্রভাবজনিত সমন্বয়সূচক পরিবর্তন' (modification by the influence of environment) তত্ত্বের সাহায্যে ব্যাখ্যা করেন। হার্বার্ট স্পেন্সার-ও এই তত্ত্ব গ্রহণ করেন। এই তত্ত্বের ধারণা অনুযায়ী, বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী কয়েকটি মাত্র জীবিত জীবাণু (living germs) থেকে বিবর্তিত হয়েছে। কিন্তু এতে প্রশ্ন জাগে, প্রথম জীবিত জীবাণুচয়ের উৎস কি? কোন কোন বিবর্তনবাদীর অনুমান, নিষ্প্রাণ বস্তু থেকেই আপনা-আপনি জীবনের উৎপত্তি ঘটে। কার্বন, হাইড্রোজন, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি কতিপয় উপাদানের অণুর দৈবাৎ সমন্বয়ে জীবকোষের (protoplasmic cell) উৎপত্তি ঘটে এবং এগুলো থেকে যাবতীয় প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণীর বিবর্তনজনিত উদ্ভব ঘটে। তবে এই আপনা-আপনি (spontaneous generation or abiogenesis) উৎপত্তি তত্ত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। বৈজ্ঞানিক Pasteur, Tyndall, Linster প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত তথ্য হলো ঃ জীবন সর্বদা পূর্ববর্তী জীবন থেকে আবির্ভূত হয়। বিজ্ঞানী ড. ফ্লিন্ট তাঁর 'আস্তিক্যবিরোধী তত্ত্বসমূহ' (antithesis theories) গ্রন্থে প্রশ্ন করেন, অজৈব বস্তু থেকে কিভাবে অন্তস্থ্য সক্রিয় শক্তির উদ্ভব ঘটতে পারে?' অবশ্য বস্তুবাদ অথবা প্রকৃতিবাদ (naturalism) সমর্থক Prof.

Huxley এবং Tyndall স্বীকার করেন যে, পূর্ববর্তী জীবন থেকে জীবনের উদ্ভবের কোন পরীক্ষিত প্রমাণ নেই। তবে তাঁদের বিশ্বাস, অনধিগম্য সুদূর অতীতে অজৈব পদার্থ থেকে আপনা-আপনি জীবনের উদ্ভব ঘটেছে। এটা প্রমাণবিহীন ও প্রমাণবিরোধী 'বিশ্বাস' বিধায় মোটেও বিজ্ঞান সম্মত নয়। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোন প্রকার প্রামাণ্য তথ্য ব্যতিরেকে কোন উপপ্রমেয়তে (hypothesis) বিশ্বাস স্থাপন করা মোটেও বিজ্ঞানসম্মত নয়। পূর্বোক্ত চিন্তাবিদগণ নিজেরাই স্বীকার করেছেন যে, "আপনা-আপনি জীবন উদ্ভবের হাইপোথেসিস প্রমাণের জন্য তাদের সকল প্রকার পরীক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত হাইপোথেসিসের স্বীকৃতির মধ্যে হারিয়ে গেছে। বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতির ফলশ্রুতিতে 'জীবনের পরিপোষক হিসেবে বস্তুর ব্যবহার' উপযোগী হলেও 'বস্তু' থেকে নতুন জীবন সৃষ্টি হচ্ছে না কেন? বস্তুর গঠনের উপাদানে তো কোন পরিবর্তন আসেনি"!

অতএব, বায়োজেনেসিস (biogenesis) তত্ত্বই যথার্থ হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে, যার সার কথা: সকল জীবনের উদ্ভব ঘটেছে পূর্ববর্তী জীবন থেকেই (omne vivium ex vivo)। এ তত্ত্ব বিশ্বজনীন ও অভিন্ন পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। অতএব, জীবনের উৎপত্তির উৎস ব্যাখ্যা করতে হলে স্রষ্টা তথা আল্লাহ্ তত্ত্ব (theory of supreme mind or God) একমাত্র অবলম্বন। এই তত্ত্বের তিনটি বিশেষ ধারণা রয়েছে : (ক) বিশেষ সৃজন তত্ত্ব (special creation); এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্রষ্টা তাৎক্ষণিকভাবে সকল শ্রেণীর জৈবসত্তা সৃষ্টি করেছেন, যেমনটা আমরা এখন দেখি, (খ) সৃজন তত্ত্ব এবং বিবর্তন তত্ত্বের সংমিশ্রণ (Deistic theory of evolution) : এই তত্ত্ব অনুযায়ী স্রষ্টা প্রথমে কতিপয় জীবনসম্পন্ন জীবাণু (germ) সৃষ্টি করেন এবং সেগুলোতে স্রষ্টার কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ছাড়া বিকাশের শক্তি দান করেন, (গ) ওয়াহদাতুল ওজুদ (theory of panentheism or ideal-realism (যা বিবর্তনাত্মক বা evolutionstic): এই তত্ত্ব অনুযায়ী পুরো মাখলুকাত বা বিশ্বজগৎ ব্যবস্থার বিবর্তন একক স্বয়ম্ভু সর্বব্যাপক ধারণা (one immanent idea or mental principle) দ্বারা সৃজিত ও পরিচালিত, যিনি নিজেকে মূর্ত শাশ্বত প্রাণ ও মনন (concrete universal life and mind) হিসেবে মহাসৃষ্টির মধ্যে ও মাধ্যমে প্রতিভাত করেন। সসীম (finite) জীবন শাশ্বত জীবনের সসীম পুনরুৎপাদন (reproduction) মাত্র।

ডারউইন তাঁর দৈবাৎ পরিবৃত্তি (fortuitous variation) তত্ত্বের সাথে লামার্কের জৈবিক বিবর্তনবাদ (biological theory of evolution) সহযোগে যান্ত্রিক জৈবিক বিবর্তনবাদ তত্ত্ব (mechanical biological theory of evolution) নির্মাণ করলেও প্রথম জীবন্ত জীবাণুর (first living germs) উদ্ভব সম্পর্কে নির্দিষ্ট কিছু

বলতে পারেননি। কোন কোন বিবর্তনবাদী এ প্রসঙ্গে আপনা-আপনি উদ্ভবের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেও ডারউইন নিজে এ ধরনের অস্পষ্টতার মধ্যে নিজেকে বিসর্জন দেননি। তিনি বরং একজন 'একক সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসীর' মতোই বলেন যে, সম্ভবতঃ স্রষ্টা 'এক' কিম্বা 'কতিপয়' জীবাণুর মধ্যে 'জীবন-নিশ্বাস (বা রুহ্) প্রবিষ্ট' করে দিয়েছেন এবং এগুলো থেকে বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে। এখানেই প্রথম জীবনের আবির্ভাব প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ডারউইন তাঁর 'অরিজিন অব স্পেসিস' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের সর্বশেষ অধ্যায়ে নিম্নরূপ সমাপ্তি-মন্তব্য করেন : There is a grandeur in this view of life, with its several powers having been breathed by the creator in.o a few forms or in.o one; and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple beginnigs, endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being evolved.[২২]

চার্লস ডারউইনের উপরোক্ত উদ্ধৃতিসহ উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত সুনির্দিষ্ট আলোচিত বিষয়গুলো যে বিষয়টা স্পষ্ট করে তুলেছে, তা হলো সৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে পরিশ্রমী বিজ্ঞানী, দার্শনিকদের সকল হাইপোথেসিস দুর্জ্ঞেয় অস্পষ্টতার মধ্যে বিলীন হয়ে গেছে। তবে তাঁদের সাধনা ব্যর্থ হয়নি। কারণ, এর মধ্য দিয়ে মহাবিশ্বের অন্তহীন গতিময়, প্রাণময় সৃষ্টিজালের কিছু না কিছু ভেদ মানবজাতির জ্ঞানচক্ষুতে ধরা পড়েছে এবং এই মহাবিশ্বের একজন একক অদৃশ্য অথচ সুনিশ্চিত মহাশক্তিধর সুনিপুণ সৃজন-পালন-বিবর্তনকর্তার (রব) নিত্যসক্রিয় অস্তিত্বও যুক্তিসম্মতভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। আল-কুরআনে বিবৃত সত্যের যথার্থতা নিরূপণে চলমান শতাব্দী পর্যন্ত আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞানের সীমিত অনুসন্ধিৎসার অবদান অনেক। দর্শনশাস্ত্রে (১) সৃজন তত্ত্বের আস্তিক্যবাদী তত্ত্বদ্বয় যথা, (ক) নিরপেক্ষ সৃষ্টিতত্ত্ব (absolute theory), (খ) সাপেক্ষ সৃষ্টিতত্ত্ব (conditional theory); (২) বিবর্তনবাদী তত্ত্বসমূহ যথা, (ক) Laplace-এর যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ বা নীহারিকাবাদ, (খ) হার্বার্ট স্পেন্সারের যান্ত্রিক বিবর্তনবাদ, (গ) ল্যামার্কের যান্ত্রিক বা জৈবিক বিবর্তনবাদ (mechanical or biological theory) (ঘ) চার্লস ডারউইনের যান্ত্রিক জৈবিক বিবর্তনবাদ (ঙ) সক্রেটিস থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর দার্শনিক আইনস্টাইন; জে, এ, থমসন, এল, টি, হেন্ডার্সন সমর্থিত উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদ (teleological theory) (চ) ফ্রান্সের স্বজ্ঞাবাদী (কাশ্ফ) দার্শনিক হেনরী বার্গসোঁর সৃজনমূলক বিবর্তনবাদ (creative theory), (ছ) বৃটিশ দার্শনিক লয়েড মর্গান, স্যামুয়েল আলেকজান্ডার এবং মার্কিন বাস্তববাদী দার্শনিক আর ডব্লু সেলার্সের উন্মেষমূলক বিবর্তনবাদ (emergent theory) প্রভৃতি সকল প্রকার দার্শনিক-

বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মানবিক সীমাবদ্ধতায় আকীর্ণ বলে প্রমাণিত। দার্শনিকরা এসব তত্ত্বের সপক্ষে-বিপক্ষে বহু যুক্তি-তর্ক উপস্থাপন করেছেন। এঁদের অনেকেই একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব যৌক্তিকভাবে স্বীকার করলেও সেই স্রষ্টার স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নতুন নতুন প্রপঞ্চের জালে পরিবেষ্টিত হয়েছেন। তাঁদের এই কষ্টকর সাধনার সূচনা অনুমান (hypothesis) দিয়ে। অনুমানের মায়ামৃগ ধরা পড়েনি কারো হাতে!

কবি নজরুলের ভাষায় :

তোমারে বন্দনা করি
স্বপ্ন সহচরী
আমার পাওয়ার বুকে না-পাওয়ার তৃষ্ণা জাগানিয়া।
তোমার বন্দনা করি---

০০০

অসীমা! এলেনা তুমি সীমারেখা পারে!
স্বপনে পাইয়া তোমা স্বপনে হারাই বারে বারে।
রূপে রূপে অপরূপা খুঁজেছি তোমায়
পবনের যবনিকা যত তুলি তত বেড়ে যায়।

০০০

কী যে তুমি, কী যে-নহ, কত ভাবি-কত দিকে চাই!
নামে নামে, অ-নামিকা, তোমারে কি খুঁজিনু বৃথাই? [অ-নামিকা : (সিন্ধু-হিন্দোল)]

সেই মহাস্রষ্টা, মহা নিয়ন্তা আজো অধরা, অ-নামিকাই রয়ে গেলেন। দার্শনিক, বিজ্ঞানী, ঋষি, সুফি, সাধক, সালেক, মজ্‌জুব, সবাই নিজ নিজ পথে খুঁজে চলেছেন তাকে। আল-কুরআনেও নিরাকার, নিরাধার, দিকমুক্ত, দৃশ্যাতীত, ধারণাতীত এই পরম সত্তার নির্দেশক হিসেবে ব্যবহৃত 'আল্লাহ্' শব্দটাই মানব সমাজ-সভ্যতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে উদ্ভূত একমাত্র, অবিকল্প, অদ্বিতীয় শব্দ, যা এমনকি চিন্তা-চেতনায়ও কোন প্রকার সীমাবদ্ধতায় বেষ্টিত নয় এবং তৌহিদের তত্ত্ব ও দর্শনের মর্মবস্তুর সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গতিপূর্ণ। অতীতের সুবিশাল বাবেল সাম্রাজ্যের অধিপতি নমরুদের পূর্বকাল থেকে নবীজীর (দ.) আবির্ভাবকালীন ঐতিহাসিক সূত্র এবং বিগত বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত ভাষাতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক তুলনামূলক ধর্মতাত্ত্বিক উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক প্রখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ, ইতিহাসবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ, শিক্ষাবিদ, মুফাস্‌সির মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর সুবিখ্যাত 'উম্মুল কুরআন' গ্রন্থের 'আল-হামদুলিল্লাহ্' শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখেন : "কুরআন অবতীর্ণ হবার আগেও আরবে 'আল্লাহ্' শব্দটি নামবাচক বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত ছিল।...শামী ভাষা অধ্যয়ন করলে বর্ণমালা ও উচ্চারণের এমন এক বিশেষ বিন্যাস মিলে, যদ্বারা 'উপাস্য' কাহাকেও

বুঝানো হয়ে থাকে। তেমনি ইব্রানী, সুরিয়ানী, আরামী, কালদানী, হামিরী, আরবী ইত্যাদি সব ভাষাতেই এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ শব্দ প্রচলিত রয়েছে। তা হলো : 'আলিফ-লাম-হে' এই তিনটি বর্ণকে ব্যুৎপত্তি রেখে উহার বিভিন্ন রূপান্তর। উহাই কালদানী ও সুরিয়ানী ভাষায় 'ইলাউয়ো', ইব্রানী ভাষায় 'উলূহ্' এবং আরবী ভাষায় 'ইলাহ্' রূপ লাভ করেছে। সন্দেহ নেই যে, আরবী ভাষায় প্রচলিত এই 'ইলাহ্' শব্দের সাথে নির্দিষ্টবাচক 'আল্' যোগ করে কুরআনে 'আল্লাহ্' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই 'আল্' সংযোগই 'ইল্লাহ্' শব্দটিকে নিখিল সৃষ্টির মহান স্রষ্টার জন্য চিরতরে নির্দিষ্ট করে দিল।" (এরপর 'ইলাহ্' শব্দের ব্যঞ্জনার যে বিবরণ তিনি দেন, তার স্রোতধারা মিশে গেছে মারিফাতের সাগরে)। 'হক্কুল আঈন' প্রত্যক্ষণ (২:২৬০) এবং 'হক্কুল ইয়াকিন' অনুধাবনে ধন্য হযরত ইব্রাহিম (আ.) অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবার পূর্বাহ্নে উচ্চারণ করেছিলেন এই 'আল্লাহ্' শব্দটাই (২১:৬৬)। মাওলানা আবুল কালাম আজাদের এই গ্রন্থে বস্তুনিষ্ঠভাবে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, পৃথিবীতে আগমনের সময় থেকেই মানব ছিল তৌহিদবাদী। স্বার্থপরতা, লিপ্সাবশতঃ মানবজাতির কোন কোন অংশ বিভ্রান্ত অংশীবাদী হয়ে পড়লেও তৌহিদের চেতনা ও চর্চা মানব-সমাজের কোন না কোন অংশে সতত বিদ্যমান ছিল। মহান নবী-রাসূলদের পর্যায়ক্রমিক আবির্ভাব এর অন্যতম প্রমাণ। এক অদৃশ্য শক্তির অর্চনার ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় মধ্যপ্রাচ্যের ইরাক, সিরিয়া, আফ্রিকার মিশরসহ বিভিন্ন স্থান, ভারতের মহেঞ্জোদারো, গ্রীস, প্রাচীন চীন, এমনকি অস্ট্রেলিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জের আদিবাসীদের মধ্যেও। হাজার হাজার বছরের বিভ্রান্তি, অজ্ঞতাজনিত অসম্পূর্ণতা ও জটিলতার অবসান ঘটিয়ে আল-কুরআন ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পর্যায়ে মানুষের সাদা চোখে দৃশ্যমান বস্তুগত বাস্তবতা, প্রকৃতির বিস্তার, ইতিহাস, অগণিত প্রত্যক্ষ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, দৃষ্টান্ত সহযোগে বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, গাণিতিক, আধ্যাত্মিক, পার্থিব তথা সকল দৃষ্টিকোণ থেকে তৌহিদের একটা অন্তহীন সরল রেখার প্রকৃত স্বরূপ তুলে ধরেছে। অন্যান্য অনেক কিছুর সাথে মানুষের হৃদয়কেও মেনেছে তৌহিদী প্রতীতির সাক্ষী হিসেবে এবং এই সূত্র নির্মাণ করেছে যে, তৌহিদে বিশ্বাস মানুষের বুদ্ধি সৃষ্ট ব্যাপার নহে; বুদ্ধির অন্তর্নিহিত অনুভূতি; যা না মস্তিষ্ক দ্বারা, না বাইরের কোন কিছুর দ্বারা প্রভাবিত। ক্রমোন্নতিশীল বিজ্ঞান, দর্শন, যুক্তিমন্ত সুশৃঙ্খল চিন্তার রশ্মি এই তৌহিদের বিন্দুতেই স্থিরতা পাচ্ছে। অতীতের সকল বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে, মানবজাতির প্রথম এবাদত গৃহ (মক্কা বা বাক্কার) কাবা শরিফকে তার আদি প্রকৃত অবস্থায় সংস্থাপন করাই ছিল আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর রেসালতি ও নবুয়তি মিশনের অন্যতম দায়িত্ব, যা স্রষ্টার অদ্বিতীয়ত্বেরও বিশেষ নিদর্শনের পাশাপাশি মানবজাতিকে তার রকমারী বৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রেখে যুগপৎ আধ্যাত্মিক ও সামাজিক ঐক্যসূত্রে গ্রথিত করার ক্ষেত্র ধারণ করে।

মানব সমাজের অগ্রগতি ও বিকাশের এই স্তরেই নবুয়ত ও রেসালতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে, যা ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

অতএব, বিশ্ব প্রকৃতি কিম্বা সমাজের কোন শিলাস্তরে সীমিত নামের মোড়কে কিম্বা বৃত্তে আবদ্ধ নহেন, 'ঐ মহান তিনি'–যিনি আল-কুরআনেরই ভাষায় : 'তিনিই আদি-অন্ত-ব্যক্ত-গুপ্ত এবং সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত (৫৭:৩)। তিনি অদৃশ্য: যদিও কুরআনের ভাষায় "আমি তার গ্রীবাস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর (৫০:১৬)"। আল-কুরআনে আরো দ্ব্যর্থহীন বাণী : "মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ্ তার সাথে কথা বলবেন ওহীর মাধ্যম ব্যতিরেকে, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিরেকে, অথবা এমন দূত প্রেরণ ব্যতিরেকে, যেই দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান, তা ব্যক্ত করেন, তিনি সমুন্নত প্রজ্ঞাময় (৪২:৫১)। নবীজীর (দ.) হাদীস : "জ্ঞানের চক্ষুতেই তিনি দৃশ্যমান।" মোদ্দা কথায়, আল-কুরআন ও হাদীসে দৃশ্যাতীত, ধারণাতীত অথচ সর্বগুণাধার অনামিকা এক রহমানুর রহীম, রাব্বুল আলামিন স্বয়ম্ভুর ধারণাই ব্যক্ত ও বিবৃত। রাখা হয়নি anthropomorphism অর্থাৎ প্রাণী বা বস্তুতে দেবত্ব আরোপের ন্যূনতম অবকাশ।

বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাধক-দরবেশদের জ্ঞান-সাধনা কি তাহলে ব্যর্থতার ভারে আক্রান্ত হয়ে পড়বে? না, নবীজী (দ.) বলেন: 'কেহ জ্ঞান সন্ধান করে লাভ করলে দুটো পুরস্কার পাবেন। একটি পুরস্কার জ্ঞান লাভের 'ইচ্ছার' জন্য, অন্যটি জ্ঞান অর্জনের জন্য। অতএব, জ্ঞান লাভের চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও তাঁর জন্য একটি পুরস্কার থাকবে।' লক্ষ্যণীয়, নবীজীর (দ.) উদ্দিষ্ট এখানে কেবল মানুষ।

প্রশ্ন আসে অনুমান বা hypothesis প্রসঙ্গে। গণিত শাস্ত্র 'হাইপোথেসিস' এর বিন্দু থেকে যাত্রা করে স্বতঃসিদ্ধ সত্যে (axiomatic truth) উপনীত হয়। আল-কুরআনে অনুমান (assumption) সম্পর্কে একাধিক প্রেক্ষাপটে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে; .."অনেকেই শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে; সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোন কাজে আসে না (১০:৩৬)। তারা তো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে (৫৩:২৩)। "উহারা তো কেবল অনুমানেরই অনুসরণ করে। কিন্তু সত্যের মোকাবেলায় অনুমানের কোনই মূল্য নেই (৫৩:২৮)।" "তোমরা এন্তার অনুমান করা থেকে দূরে থাকো। কেননা, কোন কোন অনুমান অসঙ্গত (৪৯:১২)।" অনুমান সম্পর্কে এসব সতর্কবাণী জ্ঞানীদের জন্য বহু নির্দেশনা ধারণ করে।

আল্লাহ্ স্বতঃসিদ্ধ সত্য (axiomatic truth)। এই স্বতঃসিদ্ধ সত্য সম্পর্কে আল-কুরআন মানুষকে পরামর্শ দিয়েছে নিজের হৃদয়, অন্তঃকরণ, মনকে প্রশ্ন করতে, পরামর্শ দিয়েছে নিজের চারপাশে বিদ্যমান প্রকৃতি ও তার নিয়ত বিবর্তনশীল রূপ থেকে তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে। একক স্রষ্টার বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব সম্পর্কে সপ্তম

শতাব্দীর পূর্বেকার ও পরবর্তীকালীন সংশয় ও অনিশ্চয়তার প্রান্তরে ঘুরপাকের যবনিকা টেনে মানব জাতিকে সুস্থ, সুন্দর, সমতাপূর্ণ, পবিত্র, সৃজনশীল সমাজ গঠনপূর্বক শান্তিপূর্ণভাবে পার্থিব জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করেছে আল-কুরআন।

তৌহিদ সম্পর্কে বেলায়তে মোত্লাকার বক্তব্য সুস্পষ্ট: (ক) মানবজাতির উপর আল্লাহ্তায়ালা যে আমানত অর্পণ করিয়াছেন, তাহা মায়ারফাত ও তৌহিদই। সুতরাং, ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই তৌহিদ ও মায়ারাফাতের বোঝা বহনকারী। যদি আদায় না করে আল্লাহ্তায়ালার আমানতে খেয়ানত হইবে।[২৩] (খ) কুরআন বিশ্বজনীন প্রগতিমূলক যুগোপযোগী ধর্মব্যবস্থা দিতে সমর্থ।... ইহা শেষ ধর্মব্যবস্থা, ইহা বিশ্ববাসীকে একই তৌহিদী শিক্ষা এবং অদ্বৈত স্রষ্টার বিশ্বাস ভিত্তিতে সকলের সমাবেশের নির্দেশ দেয়।[২৪]

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) খোদ-বেখোদ উভয় অবস্থায় তাঁর দরাজ গম্ভীর কণ্ঠে 'আল্লাহ্', 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি শোনার সৌভাগ্য যাদের হয়েছে, তাঁরা কিঞ্চিৎ উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, এই পবিত্র ধ্বনি যেন অনিঃশেষ আলোক তরঙ্গের মতো সব কিছুকে আত্মস্থ করে নিচ্ছে।

টীকা : তথ্য সূত্র

১, বেলায়তে মোত্লাকা, পৃ: ৭৪, তৃতীয় সংস্করণ,

২. ইবিড পৃ: ১১৩,

৩. ইবিড পৃ: ১০৩,

৪. হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ (র.): কাশ্ফুল মাহজুব: 'তাসাওউফ ও এই পথের প্রতিবন্ধকতা' অধ্যায়ের 'তৌহিদের গুরুত্ব ও শ্রেণী বিভাগ' অনুচ্ছেদ,

৫. (ক) সরদার ফজলুল করিম: দর্শন কোষ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৬; (খ) Jostain Gaarder: Sophies' World (Eng. Translation by Paulette Moller); Berkley edition, New york, USA, 1996; (গ) Prof. Phani Bhushan Chatterjee (P.B. Chatterjee): Outlines of General Philosophy: (pecially Part II. Philosophy of Nature or The World; Part IV. Philosophy of God); 11th edition, 1956, Calcutta (ঘ) প্রফেসর মোঃ মাহবুবুর রহমান, দর্শনের মূল সমস্যাবলি, ঢাকা, ১৪১৬ বাংলা; এবং দর্শন বিষয়ক অন্যান্য গ্রন্থাবলী;

৬. হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.): 'বেলায়তে মোত্লাকা' : প্রথম পরিচ্ছেদ, ছুন্নতে ওজমা,

৭. পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলার (pre-established harmony) দৃষ্টান্তমূলক আয়াত: ২: ১৬৪, ৬:৩৮, ১৪১-১৪৪, ৭:৫৪, ৯:৩৬ ১৩:৮, ১৭; ১৫:১৬-২৭, ৮৫, ১৬:৩-১৬; ২১:৩০-৩৩, ২২:৫, ২৩:১২-২২, ১১৫; ২৪:৪৫, ২৫:২, ৪৫-৫৪, ৬১; ২৭:৬০-৬৪, ২৮:৭৩, ২৯:৬০, ৩০:৮, ৩০, ৩৬:৩৩-৪০, ৩৯:৫-৬; ৪০:৬৪, ৬৭, ৪১:৯-১২, ৪৩:১০-১২, ৪৪:৩৮-৩৯, ৪৬:৩, ৪৮:২৩, ৫৪:৪৯-৫০; ৫৫:৫-১২, ১৯,২০,২৪; ৫৬:৫৮-৬৪, ৬৫:৩, ৪, ৬, ৭, ১২; ৬৭:২-৪, ১৫, ১৯, ৩০; ৭০:৮-১৮, ৭১:১০-২০, ৭৫:১-১৫, ৩৬-৪০; ৭৭:১-১০, ২০-২৭; ৭৮:৬-২০; ৭৯:২৭-৩৩; ৮০:১৮-৪২; ৮১:১-১৮; ৮৪: ১৬-১৯; ৮৬: ৫-৭, ৯৫: ৪, ৯৬: ১-৫। এসব এবং অন্যান্য আরো আয়াতে পৃথিবী ও আসমান, মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী, বস্তু জগৎ ও বৃক্ষজগৎ তথা সমগ্র সৃষ্টিতে সুশৃঙ্খল পদ্ধতি এবং প্রাণীদের জীবিকা, জন্ম, মৃত্যু, পুনরুত্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ও বাস্তব প্রমাণসিদ্ধ তথ্যাদি বিবৃত হয়েছে।

তবে কয়েকটি বিষয়ের সংজ্ঞামূলক বিবরণ অনুধাবনে যত্নবান হওয়া বাঞ্ছনীয়: (১) রুহ্ মানে আল্লাহ্র আদেশ (১৭:৮৫); (২) সৃষ্টির বিবর্তনশীলতা সৃষ্টির মতোই অন্তহীন (১৪:৪৮), (৩) তকদীর: এক প্রকারের আত্মিক সান্তনা (৫৭:২২-২৪) এবং পদার্থ বিজ্ঞানের মহাজাগতিক ধ্রুবের সাথে প্রায় সঙ্গতিপূর্ণ। বস্তুবাদীদের 'যান্ত্রিকতাবাদ তত্ত্ব' নৈয়ায়িকভাবে তকদীর বা বিধিলিপির তত্ত্বের সাথে একাকার হয়ে পড়ে! (৪) আখেরাত ঃ (ক) রুহের অব্যাহত অস্তিত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখা (১৬:৬০), যা পুনরুত্থান তত্ত্বের অভ্রান্ততা ও অনিবার্যতার ভিত্তি এবং নৈয়ায়িক যুক্তির উপাদান। রুহ্ অজর-অমর বিধায় আখেরাতের বাস্তবতা অনস্বীকার্য। (খ) আখেরাত একটা নির্দিষ্ট জবাবদিহিতামূলক গন্তব্য নির্দেশ করে, যার প্রতি বিশ্বাস মানুষের জীবনকে কিছু সৎ কর্মসূচীর প্রতি দায়বদ্ধ রাখে, যে দায়বদ্ধতা ছাড়া জীবন উদভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল, এলোমেলো ও অর্থহীন হয়ে পড়তে বাধ্য (২৭:৪-৫)।

৮. [Isaac Newton, Keynes Ms. 8, King's College, Cambridge, UK]

৯. জোবায়ের আল-মাহমুদ/ দৈনিক ইত্তেফাক: ০৬-১০-২০১৭ইং

৯ (ক) আলবার্ট আইনস্টাইন: The Marging of Spirit and Science

৯ (খ) [১৯৮৪ সনের ২৭ এপ্রিল প্যারিসের হাউসে পঠিত 'ইসলাম এবং বিজ্ঞান সামঞ্জস্যপূর্ণ না সাংঘর্ষিক' শীর্ষক প্রবন্ধ।

১০. Teleology: পরম কারণবাদ; যে সূত্র দ্বারা প্রকৃতিতে অস্তিত্বশীল সব কিছুকে সুপরিকল্পিত, সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে সৃষ্ট বা বিশেষ পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টরূপে ব্যাখ্যা করা হয়, যা যান্ত্রিকতাবাদী (mechanism) ধারণার বিপরীত।

১১. Prof. P. B. Chatterjee : Outlines of General Philosophy; ch. vii-The World as a system of Reals; ch. viii- The World of Mechanism, Ch. ix- The World of Living Beings (Problems of Life), Ch-xx-General Account and Classification of the Theories of The World, ch-xxi-Materialism, Materialism and Modern Science, Monadism of Leibnitz. ch. xxiii. God as Universal Reasm, ch. xxv. Future Life and Eternity. (also other books on General Philosophy). এই উদ্ধৃতিতে কুরআনের আয়াতগুলোর রেফারেন্স এই গ্রন্থকার কর্তৃক প্রদত্ত।

১২. Dr. Khalifa Abdul Hakim : Islamic Ideology, 3rd. edition, Lahore, 1970. তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃত দার্শনিক-শিক্ষক; Founder President, Pakistan Philosophical Congress. Muhammadan Anglo-Oriental College, Aligarh. St. Stepheus College, Delhi, Cambridge University, London, Sorborne University, Paris, Freeburge University-তে পর্যায়ক্রমে দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন এবং Heidelberg University. Germany থেকে ১৯২৫ সনে দর্শনশাস্ত্রে ডি. লিট. ডিগ্রী লাভ করেন। দিল্লীর St. Stephens College থেকে দর্শন শাস্ত্রে অনার্স পরীক্ষায় তাঁর প্রাপ্ত নম্বরের সীমা ১৯৭০-এর দশকেও কেউ ডিঙ্গাতে পারেননি। তিনি দর্শন শাস্ত্র, ইসলাম, ধর্মতত্ত্ব সমেত সমকালীন বিশ্বে বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়ে তুলনামূলক কায়দায় ইংরেজীতে এবং উর্দু ভাষায় এক ডজনেরো বেশী গ্রন্থের রচয়িতা। উর্দু ভাষায় তাঁর মূল্যবান গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে : রুমী-নীটশে-ইকবাল, আফকার-এ-গালেব, হিকামত-এ-রুমী, ফেকর-এ-ইকবাল, ভগবৎ গীতা কা মানযুম তরজমা, তাশবীহাত-এ-রুমী প্রভৃতি। লেবাননে মুসলিম-খ্রীস্টান কনভেনশন, ভারত সরকার কর্তৃক ইংরেজীতে প্রকাশিত 'প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস', যুক্তরাষ্ট্রের নটরডাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন epitome প্রকাশনায় তাঁর মূল্যবান দার্শনিক প্রবন্ধাদি মুদ্রিত।

১৩. হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী : বেলায়তে মোত্লাকা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ। (উপসংহার বাক্য)।

১৪. (ক) দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী : চার্বাক দর্শন, কোলকাতা, ১৯৫৯, স্বভাববাদ অধ্যায় (খ) দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়; লোকায়ত দর্শন, কোলকাতা, ১৯৫৮/ভারতীয় দর্শন বিষয়ক গ্রন্থাদি।

১৫. ইবিড

১৬. Jostein Gaarder, Sophies World, 1996, P-21-22.

১৭. উল্লেখ্য, মহাভারতের মোট চরণ সংখ্যা ৪,৪০,০০ (চার লক্ষ চল্লিশ হাজার), হোমারের ইলিয়াডে চরণ সংখ্যা ১৬,০০০ (ষোল হাজার), ভার্জিলের ইলিয়াডে চরণ সংখ্যা ১০,০০০ (দশ হাজার) এর কম। মহাকবি ফেরদৌসীর (৯২০ খৃঃ-১০২০ খৃঃ) শাহনামায় চরণ সংখ্যা ১,২০,০০০ (এক লাখ বিশ হাজার) : সময়কাল, পারস্যের ৩৯টি রাজবংশের ৩,৮৭৪ বছরের রাজকীয় ঘটনাবলী; রচনাকাল ৩৫ বছর, ফেরদৌসীর ইউসুফ-জোলেখার চরণ সংখ্যা ১০,০০০ (দশ হাজার)। উপরে উল্লিখিত অন্যান্য মহাকাব্যের সাথে ফেরদৌসীর শাহনামার মৌলিক তফাত হলো শাহনামার পাত্র-পাত্রীরা নিতান্তই মানুষ এবং অন্যান্যগুলোর পাত্র-পাত্রীরা প্রধানতঃ mythological; বৌদ্ধ জাতক প্রভৃতিতে অবশ্য মানুষই প্রধান চরিত্র। mythological দেব-দেবীদের প্রচার বেশী হয়েছে কাব্যরস সূত্রেই।

১৮. আলবার্ট আইনস্টাইন: জীবন জিজ্ঞাসা; সঙ্কলক ও অনুবাদক: শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, রূপা এ্যান্ড কোম্পানী, কলিকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩ ইং; অনুচ্ছেদ: ধর্ম ও বিজ্ঞান (১৯৩০ ইং) পৃ:, বিজ্ঞানের ধর্মীয়ভাব (১৯৩৪ইং), পৃ: ৫৪-৫৭; অনুচ্ছেদ: বিজ্ঞান ও ধর্ম (১৯৪১ইং) পৃঃ ৭১।

১৯. ইবিড, অনুচ্ছেদ: বিজ্ঞান ও ধর্ম (১৯৪১ইং) পৃ: ৬৮।

২০. Prof. P. B. Chatterjee, Outlines of General Philosophy, P-123,

২১. Dr. Paulson, In.roduction to Philosophy,

২২. Charles Darwin, The Origin of Species, vol ii, 1859, London.

২৩. বেলায়তে মোত্লাকা, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

২৪. ইবিড. চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

নবম অধ্যায়

নবী-জীবনে বেলায়তে মোকাইয়াদা ও বেলায়তে মোত্‌লাকা অর্থাৎ বিধান ধর্ম ও নৈতিক ধর্মের ফলিত প্রকাশের ঐতিহাসিক বিবরণ

১. বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে 'বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী' এবং 'বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী' শিরোনামে ইসলামের দুটো পৃথক জীবনবাদী নবুয়তী ধারা বা কর্মপথের উল্লেখ করা হয়েছে।[১] অবশ্য এই দুটো পথেরই উৎসস্থল নিরঙ্কুশ তৌহিদ, যে বিষয়ে মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত আপসহীন। 'হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা, আহমদ মুযতবা (দ.) একত্রিতভাবে আহমদী ও মোহাম্মদী দুই নবুয়তী ধারার সমাবেশের ফলে মাজ্‌মাউল বাহারাইন বা সন্ধিস্থল সাব্যস্ত হন। নবী করিম (দ.)-এর বাণী–"লা নবীয়া বায়াদী–অর্থাৎ আমার পর আর নবী নেই। এই বাণীর মর্ম মতে তিনি খাতামুন্নবীঈন।[২] এই দুই ধারার বিশ্লেষণ স্বরূপ বলা হয়; এই দুটো ধারাই বেলায়তের দুটো বস্তুগত বা বাস্তব (objective) রূপের ধারক; যা ব্যক্তি ও সমাজের চলতি বিদ্যমান অবস্থায় প্রয়োজন মতো চাহিদা মেটায়। বেলায়তে মোহম্মদী 'শহুদিয়া' মস্‌রব বা পর্যবেক্ষণ-যুক্তি-দর্শন-জ্ঞান ভিত্তিক কর্মপদ্ধতি, তাসাওউফ দর্শনে যা নবুয়তে ইব্রাহিমী (আ.) নামে অভিহিত। আর বেলায়তে আহমদী 'অজুদিয়া' মসরব নামে পরিচিত যা সর্বাত্মকভাবে মানবতাবাদী, ক্ষেত্র বিশেষে জাগতিক 'বিধি-বিধানের ঊর্ধ্বে যার দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যক্রম; তাসাওউফ দর্শনে তা নবুয়তে ইসায়ী (আ.) এবং আহমদীয়ুল মসরব নবুয়তের জ্বিল বা প্রতিচ্ছবি হিসেবে অভিহিত'।[৩]

২. নবীজী হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর জাহেরী জীবনে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী এবং বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী দুটো'রই প্রকাশ (menifestation) এবং বাস্তবায়ন দেখা যায় (implementation)। এ প্রসঙ্গে তাঁর নামের মাহাত্ম্যের উপর ঈষৎ আলোকপাত প্রয়োজন। দার্শনিক-শিক্ষক আল্লামা আজাদ সুবহানী লিখেছেন: "ইসলাম ধর্ম ও আল-কুরআনের মনোনীত নাম মুহম্মদ (দ.), এ জন্যে এ নামটিই অধিকতর পরিচিতি লাভ করেছে। ইসলাম-পূর্ব যুগে এবং অন্যান্য ঐশী গ্রন্থে তাঁকে 'আহমদ' নামে অভিহিত করা হয়েছে। মোহাম্মদী যুগের ইতিহাসে যাতে 'বর্তমান' 'অতীত' থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে না পড়ে, তজ্জন্য উম্মতে মুহাম্মদী উভয় নামই একত্র করে নিয়েছেন। তাই, কোন মুসলিম যখন তাঁর পুরা নাম উচ্চারণ করেন; তখন তিনি বলেন, 'আহমদ মুযতবা, মুহম্মদ মুস্তফা'। 'মুযতবা' এবং 'মুস্তফা'–এই দুটি শব্দ

নামের অংশ নয়, প্রশংসামূলক লকব। উভয় শব্দের অর্থ একই– অর্থাৎ 'মনোনীত'। নামের সাথে এই শব্দ দুটো যুক্ত করে এটাই ঘোষণা করা হয় যে, তিনি আল্লাহ্‌র মনোনীত ব্যক্তি, তাঁকে সেই দৃষ্টিতেই দেখতে হবে এবং তাঁর সাথে সেই মত সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে হবে।[৪]

৩. নবী জীবনে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী ও বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী এ দুটোরই প্রকাশ ও বাস্তবায়ন– প্রাকৃতিক নিয়মাধীন সামাজিক বাস্তবতারই দাবী। বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদীর প্রকাশ ও রূপায়ণ ঘটেছে শরিয়তের নিয়মবদ্ধতার ক্যানভাসে। আর এর পাশাপাশি বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর প্রকাশ ও রূপায়ণ ঘটেছে 'মদীনা সনদ' তথা Federation of Faiths-এর ক্যানভাসে, যেখানে বিধান বা আচার-ধর্মের উপর নৈতিক-ধর্মের প্রাধান্য চিত্রিত হয়েছে যা একাধারে শরিয়তের বিশ্বজনীনতা ও সার্বজনীনতার বহিঃপ্রকাশও বটে। সাদামাটা দৃষ্টিতে তাঁর মক্কী জীবন বিধান-ধর্মের চর্চাপূর্ণ এবং 'মদীনা জীবন তথা রাষ্ট্র ও প্রশাসনিক জীবন নৈতিক বা মানবিক মূল্যবোধ প্রধান'। আল-কুরআন ও নবী-জীবন গূঢ়ার্থে কাল-বিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে মানবমণ্ডলীর পবিত্র চাহিদা মিটানোর উপায়-নির্দেশনার নির্ভরযোগ্য মানদণ্ড ও বাতিঘর। নবী জীবনই আল-কুরআনের বয়ানের প্রধান তফসীর। কাজেই, অন্যান্য বহু বিষয়ের মতো মোকাইয়াদা/মোত্‌লাকা প্রক্রিয়ার নিদর্শনও তাঁর পবিত্র জীবনেই নিহিত রয়েছে আল্লাহ্‌ রাব্বুল আলামিনের ইচ্ছায়।

মহান ওলী-আল্লাহ্‌দের জীবন ও জীবনাচার সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় যে, তাঁদের মধ্যে কেউ বেলায়তে মোকাইয়াদা, কেউ বা বেলায়তে মোত্‌লাকা প্রক্রিয়া অনুশীলন বা এস্তেমাল করেছেন। আবার কেউ বা উভয় প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করে অনুসারীদের পথ-নির্দেশ করেছেন।

অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্‌ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সাধনার ফসল এই যে, তিনি বেলায়তে মোত্‌লাকা গ্রন্থে নবীজী (দ.) নামক অজর-অমর মুদ্রার এই উভয় পিঠের স্বরূপ সহজভাবে চিহ্নিত করতে এবং তার সাথে মানবমণ্ডলীকে পরিচিত করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। মুদ্রার 'মোকাইয়াদা' পিঠের নমুনা হিসেবে তিনি হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.) এবং মোত্‌লাকা পিঠের নমুনা হিসেবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌কে (ক.) উপস্থাপন করেছেন যথার্থ তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তিসহকারে।[৫] বিংশ শতাব্দীতে ধর্ম নির্বিশেষে বহু মনীষী, দার্শনিক ও সমাজচিন্তাবিদের মতে; There is no doubt that a central aim of the Quran is to establish a viable social order on earth that will be just and ethically based.[৬]

উল্লেখ্য, হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) 'বেলায়তে মোত্লাকা'সহ তাঁর সকল পুস্তকে বার বার আদলে মোত্লাক (just) এবং নৈতিক-ধর্মের ভিত্তিতে সমাজ-বিন্যাসের কথা অপরিসীম গুরুত্বসহকারে বলেছেন। আধুনিক মুসলিম-অমুসলিম বিদ্বজ্জন ইসলামের এই বহুমাত্রিক মানবিক প্রকৃতির সোচ্চার প্রশংসায় মুখর। এই জন্যেই তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তাসহকারে বহুবার আশাবাদ ব্যক্ত করেছিলেন যে, মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের মানবিক, সামাজিক, জাহেরী এবং বাতেনী রূপরেখা সম্যক তুলে ধরতে পারলে সমস্যাসঙ্কুল সমগ্র বিশ্বের দৃষ্টি মাইজভাণ্ডার শরিফের দিকে ঘুরে যাবে।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. বেলায়তে মোত্লাকা: তৃতীয় পরিচ্ছেদ, যুগ বিবর্তন

২. ইবিড, প্রথম অধ্যায়

৩. ইবিড, প্রথম অধ্যায় : নবুয়তে ইব্রাহিমী, নবুয়তে ইছায়ী অনুচ্ছেদ:

৪. তাযকিয়ায়ে মুহম্মদী : আল্লামা আজাদ সুবহানী (বঙ্গানুবাদ-বিপ্লবী নবী), ইসলামী একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ পৌষ, ১৩৭৫ বাংলা, রমজান, ১৩৮৮ (হিজরী): প্রথম অধ্যায়, নাম অনুচ্ছেদ। আল্লামা আজাদ সুবহানীর পুরো নাম আব্দুল কাদির আজাদ সুবহানী। তিনি গত শতব্দীর প্রথমার্ধের মানবতাবাদী রাজনৈতিক দর্শন রবুবিয়াত বা পালনবাদের অন্যতম মৌলিক তাত্ত্বিক দার্শনিক ও প্রচারক। বিখ্যাত এই বাগ্মী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ 'ভ্রাম্যমান অধ্যাপক' হিসেবে ভারতবর্ষ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবুবিয়াতসমেত মানুষের সামগ্রিক জীবন-দর্শনের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে সফর করতেন। ১৯৩৫ খৃঃ ভারতের আমরুহায় তৎকালীন ভারতের শীর্ষ স্থানীয় ১৭জন শিক্ষাবিদ-আলেম-গণমুখী রাজনীতিবিদের বিখ্যাত সম্মিলনে তিনিও হাজির ছিলেন। ঐ সম্মিলনে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সাংবাদিক-রাজনীতিবিদ-কবি হাসরত মোহানী, রাশিয়া প্রবাসী স্বাধীন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীও অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের রাজনৈতিক চিত্রপটে পরিবর্তন আসায় বিশুদ্ধ লোকমুখী আর্থ-সামাজিক-আদর্শ বিরূপ আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়। তবে আজাদ সুবহানী আমৃত্যু তাঁর মিশনে বিশ্বস্ত থেকে দাওয়াত চালিয়ে যান। তাঁর জন্ম ভারতের মধ্যপ্রদেশের বালিয়া জেলার সিকান্দরপুর গ্রামে। তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন জৌনপুর মাদ্রাসায়। তিনি খিলাফত আন্দোলনেও যুক্ত হন এবং সে জন্যে তাঁকে বৃটিশ-রাজের কারাবরণ করতে হয়। তাঁর প্রত্যেকটি পুস্তকই মহৎ। সেগুলো হচ্ছে : (১) তাযকিয়ায়ে মুহম্মদী (বঙ্গানুবাদ: বিপ্লবী নবী), (২) তাফসিরে রব্বানীকা মুকাদ্দামা, (৩) আল্-কুল্লিয়াত, (৪) আল-ফালাসাফাতুর রব্বানীয়া, (৫) আদবিয়াতে রব্বানী (৬) দ্বীনিয়াতে রব্বানী।

তাঁর দর্শন মতে, ইসলাম একটা তথাকথিত ধর্ম নয়, বরং একটা সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত (teleological) সামগ্রিক বিপ্লব, একটা নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক আন্দোলন; যার উদ্দেশ্য পৃথিবী থেকে "শাসনবাদের উচ্ছেদ ও সার্বজনীন পালনবাদের প্রতিষ্ঠা।"

৫. বেলায়তে মোত্লাকা: তৃতীয় পরিচ্ছেদ: 'বেলায়তে মোত্লাকা যুগের সূচনা' অনুচ্ছেদ। চতুর্থ পরিচ্ছেদ: 'খাতেমুল অলীর দর্শন' অনুচ্ছেদ।

৬. Fazlur Rahman: Major Themes of The Quran: Chicago, U,S,A, chapt-3:Man in Society.

দশম অধ্যায়

তৌহিদে আদ্বীয়ান ও রবুবিয়াত

[Federation of Faiths and Universal Right to Survival]

এক. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান:

১. বেলায়তে মোত্লাকা তথা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তৌহিদে আদ্বীয়ান এবং রবুবিয়াত (পালনবাদ)। আল্লাহ্র নিরঙ্কুশ একত্বের নৈয়ায়িক (Logical) যুক্তি এবং দৃশ্যমান জগৎ ও সৃষ্ট বস্তুনিচয়ের প্রাকৃতিক এককেন্দ্রিকতার যথার্থতা সম্পর্কে ইতোমধ্যে আমরা নিশ্চিত হয়েছি। আধুনিক বিজ্ঞান বিশেষ করে পদার্থ বিজ্ঞানের অচিন্ত্যনীয় অগ্রগতির বদৌলতে আমরা মহাজাগতিক ধ্রুব (cosmological constant)-এর ধারণা লাভ করেছি, যা সৃষ্টির বস্তুনিচয়ের 'সুসংঘবদ্ধ সুনিয়ন্ত্রিত একটি অপরিমাপ্য' অবিচ্ছিন্ন সত্তা, যাতে রয়েছে এককত্বের নির্দেশ। বর্তমান সময়ে জড় থেকে অজড়ে পৌঁছানোই বিজ্ঞানের সাধনা, যা বস্তুর অবস্তুকীকরণের (dematerialization of matter) গহীনে প্রবেশ করতে চায়। আমাদের কালে 'বস্তু' নিজেই 'জীবনের' দায়ভার অনেকাংশে গ্রহণ করছে। বিদ্যুৎ, চৌম্বকত্ব এবং ইলেকট্রনের সমীক্ষণ পদার্থবিজ্ঞানে প্রাণশক্তিসম্পন্নতার আভাস দিয়েছে। কাজেই মনোবিজ্ঞানকে পদার্থ বিজ্ঞানের অনুবর্তী করার (যা ছিল ইংরেজ চিন্তাবিদদের কম-বেশী সচেতন অভিলাষ) পরিবর্তে আমরা প্রাণশক্তিসম্পন্ন পদার্থবিদ্যা এবং প্রায় নূরানী বস্তুর (spiritualized matter) সাক্ষাৎ পাচ্ছি।[১] উল্লেখ্য, পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতি 'বস্তুকে' জীবন ও মনের কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। বস্তু ও মনের প্রাচীন দ্বৈত পার্থক্যের দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছে এবং পদার্থবিদ্যা ও মনোবিদ্যা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছে। বস্তুকে শক্তিতে (energy) পরিণত করা হয়েছে–যা এখন গাণিতিক প্রতীকে ব্যক্ত করা যাচ্ছে এবং মানস গঠনেও প্রযোজ্য হতে পারে। অতএব, বস্তু সংক্রান্ত বিষয়ে আজ থেকে (২০১৯ খৃঃ) দেড়শো-দুশো বছর আগের ধারণা বদলে গেছে। মহাজগৎ এক শক্তিময়তার ভাবনাতীত পিণ্ড। ইংরেজীতে অনুবাদিত বাইবেলের বর্ণনায় তা light (নূর/আলো)। আর আল-কুরআনের বর্ণনায় তা 'নূর' (২৪:৩৫)। [এই নূর শব্দটার অর্থ বাংলার 'জ্যোতিঃ' করা হলেও যথার্থ ভাবব্যঞ্জক কোন প্রতিশব্দ পাওয়া কঠিন। প্রয়োগ বৈগুণ্যে 'নূর' শব্দের মধ্যে যেন একটা নিত্য সক্রিয় সৃজনশীলতার গতিময় বিচ্ছুরণের ব্যঞ্জনা বিধৃত। জ্যোতিঃ, আলো, light প্রভৃতি শব্দে একটা বস্তু-বিজ্ঞানীয় স্থিরতার ছাপচিত্র অঙ্কিত

হয়ে আছে। তৌহিদে আদ্বীয়ান এই সামগ্রিক ব্যাপ্তিসম্পন্ন অখণ্ড এককত্বের দ্যোতক–যার দার্শনিক, প্রায়োগিক, সামাজিক, ধর্মীয় ব্যাখ্যা রয়েছে।

২. প্রত্যেক তত্ত্বের মতো মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বিশ্লেষিত তৌহিদে আদ্বীয়ানেরও দুটো পিঠ রয়েছে। একটি তাত্ত্বিক বা দার্শনিক পিঠ, অপরটি ব্যবহারিক পিঠ। এই ব্যবহারিক পিঠের শিকড়ও কিন্তু তৌহিদের সাথে সংযুক্ত। এই ব্যাপক বিষয়টা দুটো পর্বে পৃথকভাবে বিবৃত হচ্ছে। প্রথম পর্বে তাত্ত্বিক বা দার্শনিক বিষয়াদি, দ্বিতীয় পর্বে ব্যবহারিক বিষয়াদি যা মানবমণ্ডলীর জাগতিক ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করে এবং দিশা দেয়।

প্রথম পর্ব

তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিষয়াদিঃ

এক. এই পর্বে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আলোকে তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিষয়টি পত্রস্থ করা হলো।

অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে ছয় বার তৌহিদে আদ্বীয়ানের[২] কথা উল্লেখ করেছেনঃ (ক) তৃতীয় সংস্করণের ৬৬ পৃষ্ঠায় (৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ) মুদ্রিত বয়ানঃ "বেলায়তে মোত্লাকা যে তৌহিদে আদ্বীয়ানের বা ধর্ম ঐক্যের সমর্থক, তাহার প্রমাণস্বরূপ পবিত্র কুরআন পাকের আয়াতসমূহ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ 'নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে, যারা নাসারা ও সাবেঈন, যারা আল্লাহ্ ও আখেরাত দিবসে ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে, তাদের জন্য পুরস্কার রয়েছে তাদের প্রতিপালকের নিকট। তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিতও হবে না (২:৬২)।"

এই আয়াত উদ্ধৃতির পর বিশ্লেষণ স্বরূপ লেখা হয়েছে : "মানবজাতির উপর আল্লাহ্তায়ালা যে আমানত অর্পণ করিয়াছেন, তাহা মায়ারেফাত ও তৌহিদই। সুতরাং, ধর্ম-জাতি নির্বিশেষে প্রত্যেকেই এই তৌহিদ ও মায়ারেফাতের আমানতের বোঝা বহনকারী। যদি আদায় না করে আল্লাহ্তায়ালার আমানতের খেয়ানত হইবে।" এ বিশ্লেষণে আল্লাহ্র আমানত স্বরূপ 'মায়ারেফাত[৩] ও তৌহিদেরই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে, আদম সন্তানেরই কোন কোন অংশ এই তৌহিদে (absolute monotheism) আত্মসমর্পণ করতে ব্যর্থ হয়, যদিও তৌহিদের সমর্থনে গোটা বিশ্ব প্রকৃতি, মানব মন-হৃদয়, বিজ্ঞান, যুক্তিমত্তা সবই অভিন্ন সুরে কথা বলে, অর্থাৎ বেলায়তে মোত্লাকার একমাত্র ভিত্তি তৌহিদ, যা বিশ্লেষণাতীত। বিপরীতক্রমে গোমরাহী, নাস্তিক্যবাদও দার্শনিক মুল্যায়নে নেতিবাচক অর্থে এক শ্রেণীর ধর্ম।

(খ) এই সংস্করণের ৬৭ (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ) পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বয়ান; "ধর্ম সাম্যের বা তৌহিদে আব্বীয়ানের নিকট যে সর্বধর্মের নৈতিক লক্ষ্য বস্তু এক এবং কোন ধর্ম যে ইহার নিকট হেয় নয়, তার পোষকতায় সূরা বাক্বারার দশম রুকুর ৮৫নং আয়াতের উদ্ধৃতি রয়েছে। এই আয়াত ৮৩ ও ৮৪নং আয়াতের প্রেক্ষাপটে বিবৃত। ৮৩নং আয়াতে বলা হয়েছে: "স্মরণ কর, যখন বনী ইস্রাইলের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না, মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন ও দরিদ্রের প্রতি সদয় ব্যবহার করবে এবং মানুষের সঙ্গে সদালাপ করবে, সালাত কায়েম করবে ও যাকাত দেবে। কিন্তু অল্পসংখ্যক লোক ব্যতীত তোমরা বিরুদ্ধভাবাপন্ন হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে। ৮৪নং আয়াতে বর্ণিত হয়েছে... 'যখন তোমাদের অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা পরস্পরের রক্তপাত করবে না এবং আপনজনকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করবে না। অতঃপর তোমরা এটা স্বীকার করেছিলে। আর এ বিষয়ে তোমরাই সাক্ষী।" এরপর ৮৫নং আয়াতে বলা হল: "তোমরাই তারা, যারা অতঃপর একে অপরকে হত্যা করছ এবং তোমাদের একদলকে স্বদেশ থেকে বহিষ্কার করছ, তোমরা নিজেরা তাদের বিরুদ্ধে অন্যায় ও সীমালংঘন দ্বারা পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করছ এবং তারা যখন বন্দীরূপে তোমাদের নিকট উপস্থিত হয়, তখন তোমরা মুক্তিপণ চাও, অথচ তাদের বহিষ্করণই তোমাদের জন্য অবৈধ ছিল। তবে কি তোমরা কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস কর এবং কিছু অংশকে প্রত্যাখ্যান কর? সুতরাং, তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে, তাদের একমাত্র প্রতিফল পার্থিব জীবনে হীনতা এবং কিয়ামতের দিন তারা কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে আল্লাহ্ সে সম্বন্ধে অনবহিত নন।"

সূরা বাক্বারার এই ৮৩-৮৫ আয়াতে ইস্রাইলীদের নিজস্ব ইতিহাস এবং চিন্তা ও কর্মের আলোকেই বর্ণনা করা হয়েছে, কী কী অগ্রাধিকার তারা পেয়েছে এবং কিভাবে এগুলোর অপব্যহার করেছে (২: ৪০-৮৬) এবং এটাকে মানবমণ্ডলীর জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসেবে পুনর্বার উল্লেখ করা হয়েছে।

"ধর্ম-সাম্য বা তৌহিদে আব্বীয়ানের নিকট সর্বধর্মের নৈতিক লক্ষ্য বস্তু এক এবং কোন ধর্ম ইহার নিকট হেয় নহে...।" এই বয়ানের পোষকতায় ২:৮৫ আয়াতের পাশাপাশি ২:১১১ এবং ২:১১২ আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়, "অতএব, বুঝা যায়, ইহুদীদের মতো যাহারা মনে করে, বেহেস্ত কেবল তাহাদের জন্য, তাহারাও এই হুকুমের অন্তর্গত।" তৎকালীন ইহুদী ও খৃস্টান 'ধর্মীয়-বর্ণবাদীরা' অমূলক সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্সের শিকার হয়ে আত্মতৃপ্তিতে ভুগে যে ধরনের গোঁড়ামীপূর্ণ বিভেদ ও বৈষম্যের কল্পপ্রাচীর গড়ে তুলে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলকভাবে পরস্পরকে এবং অন্যান্যদেরকে হেয় প্রতিপন্ন করে দম্ভ প্রকাশ করতো, উপরোক্ত আয়াতগুলোতে তা

নাকচ করে দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ্ তথা 'তৌহিদে আত্মসমর্পণ ও সৎকর্মপরায়ণতাকে পুণ্যতা ও শ্রেয়তার প্রাকৃতিক মানদণ্ড' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দশকেও এ ধরনের মানসিকতা প্রত্যেক ধর্মীয় সমাজে বিরাজ করতো এবং এই একবিংশ শতাব্দীতেও এই বিভ্রান্তিপূর্ণ মানসিকতার অবসান ঘটেছে বলে দাবী করা যায় না। কারণ, ধর্মীয় আবেগ, আচার ও প্রবণতাকে এখনো বিভিন্নভাবে রাজনীতি ও সমাজে অর্থ-বিত্ত-প্রভাব করায়ত্ত করার হাতিয়ার হিসেবে এস্তার ব্যবহার করা হচ্ছে। কুরআনের শাশ্বত সত্য এই পরিস্থিতির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেছে আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বেই।

(গ) এই সংস্করণের ২৩ পৃষ্ঠায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ 'যুগ বিবর্তন' অধ্যায়ে বেলায়তে মোত্লাকা যুগের সূচনার উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলা হয়, সমকালে "সামাজিক আচার-ধর্মে রাষ্ট্রীয় সাহায্যহারা মোসলেম সমাজ-ব্যবস্থা দিন দিন অচলতা ও দুর্যোগের সম্মুখীন হতে থাকে। এই প্রাণহীন দুর্বল শরিয়তি ব্যবস্থাযুগে নৈতিক-ধর্ম-প্রধান এক বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী যুগের আবশ্যকীয়তা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, যেই বেলায়ত বিধান ধর্ম ও রীতি-নীতি বা রেওয়াজ হইতে খোদার ইচ্ছা শক্তিকে অধিকতর প্রাধান্য দেয়, সেই বেলায়তের অধিকারী ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিই বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগের খাতেম বা সমাপ্তকারী এবং বেলায়তে মোতলাকা যুগের আরম্ভকারী ধর্ম-সাম্য তৌহিদে আদ্বীয়ানের সমর্থক।" এ অংশে মোত্লাকা বা মুক্ত বেলায়তের প্রয়োজনীয়তার সপক্ষে যুক্তি পেশ করা হয়েছে।

(ঘ) এই সংস্করণের ১০৩ পৃষ্ঠায় নবম পরিচ্ছেদে 'ফজিলতে রব্বানী অধ্যায়ে' 'সুনেতৃত্ব ও ধর্ম সাম্য' শিরোনামের অধীন একাদশ অনুচ্ছেদে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অন্যতম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বর্ণনায় বলা হয়, "তিনি জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে 'তৌহিদে আদ্বীয়ান' অদ্বৈত খোদা অনুরাগ মতবাদে বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আচার-ধর্মের উপর নৈতিক-ধর্মের প্রাধান্যতার এবং পরস্পর আচার-ধর্মে রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য ও শালীনতার সমর্থক দেখা যায়।[৪] খোদা স্মরণ ও নিজ সত্তার উন্নয়ন ব্যাপারে এবং বিশ্ব সভ্যতার ক্ষেত্রে ধর্ম স্বাধীনতা, মানবতার উন্নয়নমূলে ব্যক্তি সত্তার সমর্থক ছিলেন।" বলা বাহুল্য, এই বয়ানের মধ্যে 'তৌহিদে আদ্বীয়ানের' সংজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে।

(ঙ) এই সংস্করণের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ, 'আত্মদর্শন' অধ্যায়ে ১৩৮তম পৃষ্ঠায় 'তৌহিদে আদ্বীয়ানের' উল্লেখ করা হয়েছে, তাসাওউফ দর্শনের দুই সমান্তরাল চিন্তাধারা ওয়াহদাতুল ওজুদ ও ওয়াহদাতুশ্ শহুদ-এর মধ্যে সমন্বয় বিধানে প্রয়াসী-দার্শনিক হিসেবে প্রসিদ্ধ হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলবীর (র.) 'কওলুল জমীলে' নফসের হাকিকতের বর্ণনা প্রসঙ্গে। "আল্লাহ্র সাথে সম্বন্ধ স্থাপনের উপযুক্ত গুণাবলী

অর্জনের বিভিন্ন মত ও পথ থাকলেও সকলের মূল লক্ষ্য অভিন্ন" বলে উল্লেখ করে শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ্ বলেন, 'তাঁহারা খতিরাতুল কুদ্ছ' অর্থাৎ পবিত্র প্রেরণাস্থলে পরস্পর হাত মিলাইয়া আছেন। ইহারা সবাই 'তৌহিদে আদ্বীয়ানের' বা ধর্ম-সাম্যের সমর্থক ও ওয়াহদাতুল ওজুদের স্বীকৃতিদাতা'।

এখানে ওয়াহদাতুল ওজুদের (panentheism বা সর্বধর আল্লাহ্বাদ) দর্শনকে তৌহিদে আদ্বীয়ানের বীজতলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে, যা হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) দর্শনের চূড়ান্ত রূপ।

(চ) এই সংস্করণের চতুর্দশ পরিচ্ছেদ 'ইবাদাতে মোত্নাফিয়া' অধ্যায়ে রহমতুল্লিল আলামিন নবীজীর (দ.) মহান, উদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও কুরআনের সার্বজনীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়; "এই কুরআন বিশ্বজনীন প্রগতিমূলক যুগোপযোগী ধর্ম-ব্যবস্থা দিতে সমর্থ। কুরআনে পাক অবিকৃত থাকায় ইহা শেষ ধর্ম ব্যবস্থা। ইহা বিশ্ববাসীকে একই তৌহিদী শিক্ষা এবং অদ্বৈত স্রষ্টার বিশ্বাস ভিত্তিতে সকলের সমাবেশের নির্দেশ দেয়, সেই জন্য এই ধর্ম-ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনস্বীকার্য ও গ্রহণযোগ্য। এতদসত্ত্বেও ইহা অন্য ধর্মকে অশ্রদ্ধা ও অসম্মান করিতে নিষেধ করে। "মানবের রুচি অনুযায়ী ধর্মমত গ্রহণের এখতেয়ার বা অধিকার প্রত্যেকের আছে। ইহার নাম ধর্ম-স্বাধীনতা। এই বিষয়ে তৌহিদে আদ্বীয়ান প্রবন্ধে আলোচনা আছে। ইহা বেলায়তে মোত্লাকার যুগোপযোগী ব্যবস্থা যাহা জনগণকে ধর্ম-ঘৃণা বিমুখ করে।" বলা বাহুল্য, 'ধর্মগ্রহণ স্বাধীনতার' বিষয়টার উপর পুরো একটা সূরা রয়েছে, সূরা কাফিরুন, নং ১০৯। এছাড়া ২:২৫৬, ৬:১৭১, ১০:৯৯ আয়াতেও ধর্মকে জবরদস্তির বাইরে রাখার নির্দেশ রয়েছে। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদে' নবীজী (দ.) পার্থিব ব্যবহারিক জীবনে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শর্তের পাশাপাশি ধর্ম ও ধর্মাচারের স্বাধীনতা নিশ্চিত করেছেন প্রায় দেড় সহস্র বছর পূর্বেই। 'বেলায়তে মোত্লাকার' বীজ পবিত্র কুরআন-হাদিস ও মদীনা সনদেই বপিত হয়ে আছে।

দুই. বেলায়তে মোত্লাকায় তৌহিদে আদ্বীয়ানের সংজ্ঞা:

"তৌহীদে আদ্বীয়ান হচ্ছে 'অদ্বৈত খোদা অনুরাগ' মতবাদ।"[৫] এতে 'আচার ধর্মের' উপর 'নৈতিক ধর্মকে' প্রাধান্য এবং আচার ধর্মের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধের নীতি অনুসরণ করা হয়। আল্লাহ্ মানুষকে সীমিত যে 'ইচ্ছা শক্তি' অনুগ্রহ করেছেন, তার হিতকর প্রয়োগের স্বাধীনতাকে স্বীকার করা হয়। ওয়াহদাতুল ওজুদ (panentheism) এই মতবাদের দার্শনিক ভিত্তি।

তিন. এই সংজ্ঞার উপাদান ও লক্ষ্য:

(ক) এই সংজ্ঞার যে সব উপাদানের কথা গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলো হলো (১) তৌহিদ (কুরআনে উল্লেখিত নিরঙ্কুশ তৌহিদ বা absolute monotheism)। শুধু আস্তিক্যবাদে বিশ্বাসই এ জন্যে যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে তৌহিদ অধ্যায়ে আলোচনা রয়েছে। (২) কুরআন সর্ব যুগোপযোগী প্রগতিশীল ধর্ম ব্যবস্থা দিতে সমর্থ,৬ (৩) 'নবীজী হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্বমানবতার প্রতীক। তাই ইসলাম সকল সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য ধর্ম।[৭] তবে ইসলামের নীতি হলো এই যে, 'মানবের বিচার বুদ্ধির তারতম্যের দরুন নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী ধর্মমত বেছে নিতে পারে। অর্থাৎ 'ধর্ম-বিশ্বাসের স্বাধীনতায় ইসলাম বিশ্বাসী। (৪) এটা বর্ণ-বৈষম্য, ধন-বৈষম্য অস্বীকার করে এবং একই সাথে ধনতন্ত্র ও নাস্তিক্যবাদের মূল উৎপাটনকারী, ধনসাম্য উৎসাহী বিশ্ব শান্তির প্রতীক"।[৮] (৫) নিরঙ্কুশ তৌহিদের ছায়াতলে সমবেত হবার জন্য বিশ্ব-মানবতার প্রতি আহ্বান, যাতে মানবিক সমতা ও ঐক্যের প্রশস্ততর ভিত্তি তৈরী হয় এবং বনি আদম (আদম-সন্তান) হিসেবে সমগ্র মানবজাতি বৃহত্তর সৃষ্টিগত অর্থে একটি মাত্র জাতি এবং পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র একক মানব-পরিবার হিসেবে অভাবমুক্তভাবে শান্তিতে বসবাস করে আখেরাতের অফুরান পুণ্যময়তার খোরাক সংগ্রহ করতে পারে। আল-কুরআনের পবিত্র, স্বচ্ছ, নৈতিক পটভূমিতে মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এই আশা পোষণ করে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রেখে বিশ্ব-মানব-সমাজ 'তৌহিদ ভিত্তিক ঐক্যের' মন্‌জিলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

(খ) এবার এই উপাদানগুলোর নৈয়ায়িক (logical) যথার্থতা নিরীক্ষা করা যাক ঃ (১) আল-কুরআনে সৃজন-বিজ্ঞানের যে তথ্য সংক্ষেপে পেশ করা হয়েছে, তাতে দেখা যায় যে, সমগ্র বিশ্ব জগৎ (যা এখনো মানুষের ধারণাতীত) এবং তার ভিতরভাগ, বহির্ভাগ তথা চতুষ্পার্শ্ব সব কিছুই একটি অভিন্ন সত্তা বা ইউনিট। এর স্রষ্টা একক সত্তা। পৃথিবীর মানবজাতি, প্রকৃতি জগৎ, উদ্ভিদ জগৎ, প্রাণী জগৎ, বস্তুজগৎ সব কিছু একটি অভিন্ন অথচ সম্প্রসারমান 'কৌটাভুক্ত'। অতএব, স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে যাত্রা শুরু করে তা একক কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিয়ে যায়। খগোল বিজ্ঞান সমেত সমূহ তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিজ্ঞানের ক্রম অগ্রগতি এ বিষয়টাকে আরো স্বচ্ছতর করে তুলে চলেছে। শুধু তাই নয়, সমগ্র সৃষ্টি যে একটি একক সুবিন্যস্ত প্রণালীবদ্ধ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যাভিসারী বিস্তার ও প্রকাশ (teleology), বিজ্ঞানের অব্যাহত বিকাশ তার সত্যতা প্রমাণ করে চলেছে। মহাজাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবর্তনধারার অন্তর্নিহিত সূত্র বিশ্লেষণ করলে উক্ত সুনির্দিষ্ট বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনার

যথার্থতা উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। অতএব, তৌহিদ তত্ত্ব বরং আধুনিক বিজ্ঞানকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করছে।[৯]

(২) আল-কুরআন যে সর্বযুগোপযোগী প্রগতিশীল ও সর্বশ্রেণীর অনুসরণযোগ্য কল্যাণকর ধর্ম-ব্যবস্থা দিতে সক্ষম, তা বিংশ শতাব্দীর বহু চিন্তাবিদের (যাদের অনেকে ধর্মতঃ মুসলিম নহেন) জবানীতে এই গ্রন্থের একাধিক স্থানে পেশ করা হয়েছে। এমনকি আল-কুরআন নিজেই এর অন্যতম প্রমাণ বহন করেঃ যেমন, (ক) "ধর্মে কোন জবরদস্তি নেই, নিশ্চয়ই সত্য পথ ও ভ্রান্ত পথের পার্থক্য সুস্পষ্ট। যে তাগুতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান আনে, সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে, যা কখনো ভাঙ্গবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ (২:২৫৬)" (খ) "তোমাদের ধর্ম তোমাদের, আমার ধর্ম আমার" (১০৯:৬)। [এখানে নজীবীর (দ.) জবানীতে এক বচনে কথাটা বলা হয়েছে]। আল-কুরআন কেবল মুসলমানদের জন্য নয়, পুরো মানবজাতির জন্য প্রেরিত এবং এই পটভূমিকায় উপরোক্ত আয়াতদ্বয় সকল মানুষের প্রতি প্রযোজ্য (এ সম্পর্কে আরো আয়াত আছে)। অতএব, মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের এই উপপত্তি (logic) নির্ভুল। কেবল ধর্ম বিশ্বাস কিম্বা ধর্মাচার নয়, মানব জীবন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কুরআনের পরামর্শও সবার প্রতি প্রযোজ্য ও সকলের অনুসরণযোগ্য।

(৩) নবীজী (দ.) সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্ব-মানবতার প্রতীক, তার সাক্ষ্য আল-কুরআনেই বিধৃত : "আমি আপনাকে সমগ্র সৃষ্টজগতের জন্য রহমতস্বরূপই প্রেরণ করেছি (২১:১০৭) লক্ষ্যণীয়, কেবল পৃথিবীতে অস্তিত্ববান জিনিসগুলোই নয়, কুল-মখলুকের সব কিছুই এই অনন্ত রহমতের আওতাভুক্ত। তিনি সকলের প্রতি, সব দ্রব্যের প্রতি করুণাশীল। এই অনুচ্ছেদের ২নং ও ৩নং উপ-অনুচ্ছেদে পরিবেশিত কয়েকটি তথ্যেই প্রত্যায়িত যে, ইসলাম ধর্ম সকলের গ্রহণযোগ্যতা ধারণ করে। দীর্ঘ প্রায় ২৩ বছর ধরে পৃথিবীর অতীত ও সমকালীন প্রাকৃতিক, জৈবিক ও সামাজিক ঘটনা প্রবাহের আলোকে মানব-সমাজের কল্যাণময় বিকাশের প্রয়োজনে অভিন্নভাবে সর্ব উপযোগী নীতিমালা ও কর্মপ্রক্রিয়া প্রবর্তনের উপসংহারে দশম হিজরী ৯ই জিলহজ ৬৩২ খৃ. শুক্রবার পূর্বাহ্নে বিদায় হজের ভাষণ সমাপ্তির 'উপসংহার' হিসেবে আল-কুরআনের সর্বশেষ আয়াত নাজিল হয়ঃ "আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম (৫:৩)[১০] ঐ দিনই নবীজী (দ.) আইয়ামে জাহেলিয়াতের (অজ্ঞতাজাত অন্যায়ের যুগ) সকল কুপ্রথা 'পদদলিত' করার ঘোষণা দিয়ে বলেন, "আইয়ামে জাহেলিয়াতের সকল কুপ্রথা আমার পদতলে বিদলিত হলো।" এই দিনেই মানব ইতিহাস রোজ কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহতভাবে চলিষ্ণু

আলোকায়নকালের (period of enlightenment) সূচনা প্রত্যক্ষ করলো। অন্ধকারের অবসানে 'হাসীন ঊষা'র অভ্যুদয় ঘটলো। নবীজীরই ভাষায় : "আন্‌আমু সুবাহ (সুপ্রভাত)। আস্ সাকিনাত্ ইয়া হায়্যুআন্নাস (হে মানবজাতি, স্বস্তিতে থাকুন, সুখে থাকুন)।"

দার্শনিক ড. ইকবাল নবীজীর (দ.) জীবনকে সামগ্রিক ভারসাম্যপূর্ণ ইপ্সিত আধুনিকতার সূচনাবিন্দু হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন, যা জ্ঞান-বিজ্ঞান-রাষ্ট্রব্যবস্থা-জাগতিক চাহিদা ও পারলৌকিক চেতনার যুক্তিসিদ্ধ সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণের প্রগতিশীল বিবর্তনমুখী ধারারূপে রোজ কিয়ামত পর্যন্ত বহতা থাকবে।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের মঞ্জুষা জ্ঞান ও আচরণের এসব মণি-মুক্তোই ধারণ করে আছে।

দ্বিতীয় পর্ব
রবুবিয়াত বা পালনবাদ
(universal right to survival)

এক. তৌহিদে আদ্বীয়ানের ব্যবহারিক পর্যায়ের প্রাথমিক মৌলিক ভিত্তি 'রবুবিয়াত' বা একক স্রষ্টার পালনবাদী ভূমিকা। আল-কুরআনের প্রথম আয়াতেই এ বিষয়টা দিবালোকের মতো স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে: আলহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন অর্থাৎ সকল প্রশংসা জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্‌রই। লক্ষ্যণীয়, কুরআনের শুরুতেই আল্লাহ্‌র পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে রব্ বা প্রতিপালকরূপে।[১১] এ বিষয়টা আল-কুরআনের মতো অত্যন্ত সহজ ও বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় বিধায় সংশ্লিষ্ট কিছু আয়াত নিম্নে পত্রস্থ করা হলো। প্রথমেই একটা বিষয় জেনে রাখা যাক। বলা হয়েছে: "আল্লাহ্ উত্তম বাণী সম্বলিত কিতাব নাযিল করেছেন, যা সুসমঞ্জস এবং যাতে একই কথা নানাভাবে বার বার বর্ণিত হয়েছে" (৩৯:২৩)। 'আমি এই কুরআনে বহু বিষয় বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছি, যাতে তারা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে (১৭:৪১)"। অতএব, আমাদের পরিবেশিত বিষয়ে আল-কুরআনে একাধিক আয়াত থাকলেও গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পরিহারার্থে নমুনাস্বরূপ এক বা স্বল্পতম সংখ্যক আয়াত ব্যবহার করা হবে।

দুই. রবুবিয়াতের আলোচনার প্রয়োজনীয় অনুষঙ্গগুলো নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হলো :

মহাবিশ্ব সৃজন: আল-কুরআন বলেন, আল্লাহ্ আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছুই যথাযথভাবে এবং এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সৃষ্টি করেছেন (৩০:৮)। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটাই প্রকৃত কায়েমী ধর্ম (৩০:৩০)।" শেষোক্ত আয়াতে অমোঘ প্রাকৃতিক আইন, মহাজাগতিক ধ্রুবের (cosmological

constant) তত্ত্বের প্রতিফলন লক্ষ্যণীয়। "আপনি আল্লাহ্‌র নিয়মে কোনই পরিবর্তন পাবেন না (৪৮:২৩)।" "আপনি আল্লাহ্‌র বিধানের কোন পরিবর্তন ও ব্যতিক্রম দেখতে পাবেন না (৩৫:৪৩)। "বালা ওয়াদান আলাইহি হাক্কান" (তিনি নিজ) ওয়াদা নিজের উপর অবশ্যই পালনীয় করে রেখেছেন (১৬:৩৮)। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র স্বচ্ছতার নীতি এতো সুস্পষ্ট যে, তাঁর নিজের আইন নিজের কাছেও অলংঘ্যনীয়।

আল-কুরআনে মহাজগৎ সৃষ্টির ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে: (ক) "আল্লাহ্‌ই আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব কিছু ছয় পর্যাবৃত্তে সৃষ্টি করেছেন (৩২:৪)। (খ) "...পৃথিবীকে দুই পর্যাবৃত্তে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই তো রাব্বুল আলামিন। অতঃপর তিনি ভূ-পৃষ্ঠে অটল পাহাড়-পর্বত স্থাপন করেছেন, পৃথিবীকে বরকতময় করেছেন এবং উহাতে সব সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকের খাদ্য সামগ্রী সঞ্চিত করে রেখেছেন; এসব কাজ চার পর্যাবৃত্তিতে সম্পন্ন হয়ে যায়, ইহা জিজ্ঞাসুদের জন্য পূর্ণ বর্ণনা। তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোযোগ দিলেন, তখন উহা ধূম্রবৎ ছিল। অনন্তর তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন, 'তোমরা ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, অস্তিত্ব ধারণ করো। উহারা বললো, স্বেচ্ছায় অস্তিত্ব ধারণ করলাম। অতঃপর তিনি আকাশমণ্ডলকে দু'দিনে সপ্ত আসমানে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে উহার বিধান ওহী করলেন এবং আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালা দ্বারা সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত করলাম, এগুলো এক মহাপরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞানীর পরিকল্পনা" (৪১:৯-১২)।

উপরোক্ত উদ্ধৃতি দুটোতে আমাদের এ নিবন্ধের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি তথ্য পাওয়া যাচ্ছে; 'ক' উদ্ধৃতিতে বিবৃত হয়েছে যে, (১) ছয় পর্যাবৃত্তে (period) মহাজগৎ সৃষ্টি। এর মধ্যে দুই পর্যাবৃত্তে পৃথিবী সৃষ্টি: (এক) প্রাকৃতিক তথা ভূপ্রাকৃতিক পর্যায় এবং (দুই) পৃথিবীতে সব সৃষ্টির জন্য বরকত (রিযিকসহ সমূহকল্যাণ) মওজুদ ও সংরক্ষণ। এখানে সৃষ্টি বিষয়ে সর্বমোট ছয় পর্যায়বৃত্তের উল্লেখ রয়েছে। এসব আয়াতে ব্যবহৃত আরবী শব্দ 'ইয়াউমের' দ্বিবচন ও বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। বিংশ শতকের শেষ ভাগের বিজ্ঞ অনুবাদকগণ 'আইয়াম' শব্দের অনুবাদে পূর্ববর্তীদের ব্যবহৃত দিন বা day শব্দের পরিবর্তে period শব্দ ব্যবহার করছেন, যাতে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা আরো খোলাসা হয়। তবে প্রকৃত তথ্য তো কেবল আল্লাহ্‌ই জ্ঞাত। পর্যাবৃত্ত বা period বলতে বুঝায়, 'বিধিবদ্ধ কাজের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়সীমা'। এই সময়টার ব্যাপ্তি কেবল আল্লাহ্‌ই জানেন। সূরা হজে'র ২২:২৭ আয়াত এবং সূরা সিজদাহ'র ৩২:৫ আয়াতে পৃথিবীর সৌরজাগতিক দিন আর মহাজাগতিক 'দিনের' তফাত বুঝানোর জন্য উপমা হিসেবে বলা হয়েছে যে, 'এক দিনের পরিমাণ তোমাদের গণনায় এক হাজার বছর'। 'আইয়াম' শব্দের প্রায়োগিক অর্থ অনুধাবনের জন্য উদাহরণ

হিসেবে 'আইয়ামে জাহেলিয়াত বা 'অজ্ঞতার কাল' শব্দ দুটোর ভাব ও ব্যঞ্জনা লক্ষ্যণীয়। অবশ্য মহাসৃষ্টির কৌশল ও হিকমত অধ্যয়নের জন্য বিজ্ঞানের সাধনা ও প্রচেষ্টা সমানে অব্যাহত, যার তাগিদ কুরআনে বারংবার দেওয়া হয়েছে। বিজ্ঞানীরা পৃথিবী ও সৌরজগৎ সৃজন সম্পর্কে বিবিধ প্রকার গবেষণা করে ধারণা করেছেন যে, সৃষ্টির বর্তমান রূপ পরিগ্রহের পূর্বে 'সময়ের' পার্থিব হিসেবে লক্ষ লক্ষ বছর গুজরে গেছে। এই 'সময়'-এর 'মহাজাগতিক' হিসাব এখনো ধারণারও বাইরে রয়ে গেছে।

'খ' উদ্ধৃতিতে পৃথিবীতে সকলের জন্য কল্যাণ বা রিযিক প্রভৃতির মওজুদের কথা বলা হয়েছে। সূরা আর-রাহমানের ৫৫:১০-১২ আয়াতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, "তিনি পৃথিবীকে স্থাপন করেছেন সৃষ্ট জীবের জন্য...।" রব বা সৃজন-পালন-বিবর্তনকর্তা জীব সৃষ্টির পূর্বে জীবের জীবনের প্রয়োজনীয় সব উপকরণ মওজুদ করেছেন। সর্বজীবের বাঁচার সুযোগ ও অধিকারটা সৃষ্টির আদি থেকেই স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত। এটাই রবুবিয়াত। এতে কারো হস্তক্ষেপ করার বৈধ কোন সুযোগ নেই। নবীজীর (দ.) বহুল উদ্ধৃত হাদিস : "পৃথিবীতে যদি কেউ অনাহারে থাকে, তা'হলে ধরে নিতে হবে যে, তার প্রাপ্য রিযিক অন্য কেউ গ্রাস করছে।"

এই রবুবিয়াত আল-কুরআনের অন্যতম মৌলিক নীতি। এই নীতি পৃথিবীর জীব জগতের জন্য যেমন প্রযোজ্য, তেমনি মহাজগতের সকল সৃষ্টির জন্যও নিজ নিজ পরিবেশ-প্রেক্ষিতে প্রযোজ্য। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে অত্যন্ত যৌক্তিক ও বাস্তবভাবেই এই রবুবিয়াত নীতিকে অন্যতম অনুষঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

তিন. মানব ও অন্যান্য প্রাণী এবং প্রকৃতি জগৎ সৃজন:

রবুবিয়াতের আলোচনায় দ্বিতীয় অনুষঙ্গ হলো মানব তথা প্রাণী ও প্রকৃতি জগৎ সৃজন, যা মানুষের পার্থিব জীবনের জন্য আবশ্যকীয়। এখানে প্রথমেই একটা বিষয়ের উপর আলোকপাত করা দরকার যে, আল-কুরআনে মহাজগৎ সৃষ্টি এবং পৃথিবীতে মানব, প্রকৃতি জগৎ সৃষ্টির তথ্য অনেক ক্ষেত্রে একই নাগাড়ে বর্ণনা করা হয়েছে, যাতে দেখা যায় যে, মহাজগৎ ও প্রকৃতি জগৎ যেই সুনিয়ন্ত্রিত ভারসাম্যমূলক তথা সুবিচারপূর্ণ সুবিন্যস্ত, সুসামঞ্জস্য, সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই ভারসাম্যপূর্ণ সুবিন্যস্ত সুবিচারমূলক সুসমঞ্জস অবস্থার নীতি মানুষের সীমিত পার্থিব জীবনে বজায় রাখার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। এতে একটা বিষয় পরিস্ফুট যে; প্রাণীজগৎ, বস্তুজগৎ, মহাজগৎ অভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও নৈতিক সূত্রানুসারে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমন, প্রাণীর যেমন বিশ্রাম দরকার, এমনকি যন্ত্রেরও তেমন বিশ্রাম দরকার। প্রাণীর দৈহিক বিনাশ আছে, নক্ষত্র জগতেও বিনাশ আছে। প্রত্যেক বস্তু ও প্রাণীর নির্দিষ্ট পালনীয় ভূমিকা রয়েছে। কেউই অপ্রয়োজনীয় নয় এবং সবচেয়ে বড় কথা সবাই মিলে একটা অখণ্ড একক (in.egral unit), যার দ্যোতক 'তৌহিদ'।

কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী পৃথিবীতে বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি, অতঃপর বিভিন্ন প্রকারের প্রাণী সৃষ্টির পর 'আশরাফুল মাখলুকাত' মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এগুলোকে মানুষের বশীভূত করে দেওয়া হয়েছে (৩৬:৭১-৭৩)। মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আল-কুরআনে পরিবেশিত তথ্য সম্পূর্ণ বিজ্ঞান ও বাস্তবসম্মত। বলা হয়েছে, 'মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির মতো শুষ্ক মৃত্তিকা থেকে (৫৫:১৪)। "তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন **পর্যায়ক্রমে**। তোমরা কি লক্ষ্য করনি, আল্লাহ্ কিভাবে সৃষ্টি করেছেন সপ্তস্তরে বিন্যস্ত আকাশমণ্ডলী এবং সেখানে চন্দ্রকে স্থাপন করেছেন আলোরূপে এবং সূর্যকে স্থাপন করেছেন প্রদীপরূপে, তিনি তোমাদেরকে উদ্ভূত করেছেন মৃত্তিকা থেকে, অতঃপর উহাতে তিনি তোমাদেরকে প্রত্যাবৃত্ত করবেন ও পরে পুনরুত্থিত করবেন এবং আল্লাহ্ তোমাদের জন্য ভূমিকে করেছেন বিস্তৃত, যাহাতে তোমরা চলাফেরা করতে পারো প্রশস্ত পথে। তিনি যথাযথভাবে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত্রি দ্বারা দিবসকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিবস দ্বারা। সূর্য ও চন্দ্রকে তিনি করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকেই পরিক্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। জেনে রাখো; তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল" (৭১:১৪-২০)। "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই নফ্স বা প্রাণসত্তা (নফ্সে ওয়াহেদাত) থেকে। অতঃপর তিনি তাহা থেকে তার সঙ্গী সৃষ্টি করেছেন, তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন আট প্রকার আনআম (গবাদি পশু), তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভে ত্রিবিধ অন্ধকারে (মাতৃজঠর, জরায়ু ও ঝিল্লির আচ্ছাদন, যেখানে ভ্রূণের সুরক্ষিত অবস্থান) পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন (৩৯:৫-৬)।

এবার শুধু মানব সৃষ্টি ও জীবনের বিভিন্ন **পর্যায়ক্রম** সম্পর্কিত আয়াত অধ্যয়ন করা যাক : "তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মৃত্তিকা থেকে, পরে শুক্রবিন্দু থেকে তারপর আলাক (সংযুক্ত জমাট রক্ত তথা রক্তপিন্ড) থেকে, তারপর তোমাদেরকে বের করেন শিশুরূপে, অতঃপর যেন তোমরা উপনীত হও তোমাদের যৌবনে। তারপর হয়ে যাও বৃদ্ধ। আর তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটে এর পূর্বেই! যাহাতে তোমরা নির্ধারিত কাল প্রাপ্ত হও এবং যেন তোমরা অনুধাবন করতে পারো (৪০:৬৭)। এ আয়াতে মানব জীবন-চক্র সুস্পষ্ট, বিজ্ঞানসম্মত নির্ভুল তথ্যভিত্তিক সহজ ভাষায় বর্ণিত। মানব সৃষ্টি ও জীবনের ব্যাপ্তি বিষয়ে আরো একটা আয়াত : "হে মানবজাতি! পুনরুত্থান সম্বন্ধে যদি তোমরা সন্দিগ্ধ হও, তবে (অবধান করো) আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকা থেকে, তারপর আলাক থেকে, তারপর পূর্ণাকৃতি কিম্বা অপূর্ণাকৃতি গোশত-পিন্ড থেকে– তোমাদের নিকট ব্যক্ত করবার জন্য (আমার শক্তির পরাকাষ্ঠা), আমি যা ইচ্ছা করি, তা এক নির্দিষ্ট কালের জন্য মাতৃগর্ভে স্থিত রাখি, তারপর আমি তোমাদেরকে শিশুরূপে বের করি, পরে যাতে তোমরা পরিণত বয়সে উপনীত হও।

তোমাদের মধ্যে কারো কারো মৃত্যু ঘটানো হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে কাউকে প্রত্যাবৃত্ত করা হয় হীনতম বয়সে, যার ফলে ওরা যা কিছু জানতো, সে সম্বন্ধে ওরা সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে দেখো শুষ্ক, অতঃপর আমি উহাতে বারিবর্ষণ করলে ইহা শস্য-শ্যামলা হয়ে আন্দোলিত ও স্ফীত হয় এবং উদ্গত করে সর্বপ্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ। ইহা এজন্যই যে, আল্লাহ্ সত্য এবং তিনিই মৃতকে জীবন দান করেন এবং তিনি সর্ব বিষয়ে শক্তিমান এবং কিয়ামত আসবেই, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং কবরে যারা আছে তাদেরকে নিশ্চয়ই আল্লাহ্ উত্থিত করবেন (২২:৫-৭)। এ আয়াতে মানবের জীবন-চক্রের আরো ব্যাপকতা সম্পর্কে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রুহের অবিনশ্বরতা, 'আল্লাহ্র সৃষ্টির অপরিবর্তনীয়তা' (৩০:৩০), 'আল্লাহ্র বিধানের অপরিবর্তনীয়তা এবং আল্লাহ্র বিধানের কোন ব্যতিক্রমহীনতার (৩৫:৪৩) বিষয়গুলোকে একই সূত্রে গ্রথিত করলে মানব **রুহের অন্তহীন বহমানতার স্থিরচিত্র** ফুটে উঠে (রুহ্ ছাড়া জীবন স্পন্দিত হয় না, তাই রুহ্ শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে)। উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলোতে দু'জায়গায় 'পর্যায়ক্রম' শব্দটির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে, যা নির্দিষ্ট সময়ান্তর ঘটিত ধারাবাহিক বিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। লক্ষ্যণীয়, এখানে বৃহত্তর তথা সামগ্রিক প্রক্রিয়া-চক্রের তথ্যাংশও সুবিন্যস্ত আকারে উপস্থাপিত আছে।

সৃজনের দীর্ঘ সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া জটিল বৈজ্ঞানিক ও রাসায়নিক সূক্ষ্ম বিষয়। এগুলো হিকমত বা বিজ্ঞান বিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। আল-কুরআনে একাধিক স্থানে মহাজগৎ সৃষ্টির বিষয়টা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে। যেমন: 'তিনি যখন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি শুধু উহাকে আদেশ করেন, 'হও'–তখনই উহা হয়ে যায় (৩৬:৮২)। মহাশক্তিধর রাব্বুল আলামিন-নির্ভর তৌহিদে বিশ্বাসীদের জন্য সৃষ্টির এই ব্যাকগ্রাউন্ডারই যথেষ্ট। তবে এখানে প্রসঙ্গতঃ আমরা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) একটা উক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে চাই। তিনি মাওলানা আবদুল জলিল নামক এক প্রশ্নকর্তার জবাবে বলেন, "যব্ কুন্ কাহা, ছব হোগেয়া। ফের গায়েব কাঁহা হ্যায়? অর্থাৎ আল্লাহ্তা'লা যখন হয়ে যাও বলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গেই সব হইয়া গিয়াছে। তখন আর অদৃশ্য কোথায় রহিল?" (গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত : মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, পঞ্চম প্রকাশ, ১৯৮১ইং, সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, পৃ: ১৮৫)। এখানে তাঁর উক্তির প্রথমাংশ আমাদের আলোচ্য। তিনি বলেছেন, "(আল্লাহ্) যখন কুন্ বা হয়ে যাও বলেছেন, সবই হয়ে গেল। গায়েব কি রইলো!" তাঁর এই উক্তি 'নিত্য বর্তমান' নির্দেশক। এর অর্থ গূঢ়। সৃজন একটা অব্যাহত অন্তহীন বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া; নির্ধারিত নিয়মে সৃজনের প্রকাশ ঘটতেই আছে। পদার্থ বিজ্ঞানের মহাজাগতিক ধ্রুব তত্ত্ব (cosmological constant) তাঁর এই কালামের পরিপোষকও বটে।

চার. তৌহিদে আদ্বীয়ান রবুবিয়াতের রসায়নঃ

তৌহিদে আদ্বীয়ান এবং রবুবিয়াতের বিষয়টা পরস্পর বিচ্ছিন্ন কোন ব্যাপার নয়। বরং, আল-কুরআনের শিক্ষা ও নবীজীর (দ.) ব্যবহারিক জীবনাচার (practical life) কার্যতঃ পার্থিব নিটোল জীবন-পদ্ধতি হিসেবে ইসলামের ফলিত (applied) অভিব্যক্তি তৌহিদে আদ্বীয়ান ও রবুবিয়াতের অভিন্ন ও যৌথ প্রকল্পেরই ফলশ্রুতি। আল-কুরআনের প্রথম সূরা আল-ফাতেহার একেবারে সূচনাতেই এই দুটো বিষয়ের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের রসায়ন ব্যক্ত করা আছে। আল্লাহ্ শব্দটা 'তৌহিদের' দ্যোতক এবং তাঁকেই 'হাম্‌দ বা প্রশংসার' 'অধিকর্তা' হিসেবে নির্দেশ করার অব্যবহিত পাশাপাশি 'রব্' সিফাতের (গুণ) সাথে 'আলামিন' (বিশ্বজগৎ তথা সকল সত্তা) শব্দযুক্ত করে এক অন্তহীন সক্রিয় সৃজনশীল তাৎপর্যমণ্ডিত সংজ্ঞার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। 'আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন; আর-রাহমান, আর-রাহিম, মালিকি ইয়াউমিদ্দিন' পুরো আয়াতটার সরল বাংলা দাঁড়ায়: (প্রশংসা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন, রহমানুর রহীম, বিচার দিবসের মালিকেরই অধিভুক্ত)। আরবী 'রব' শব্দের বাংলা অর্থ: সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, বিবর্তনকর্তা (creator, sustainer, evolver) এবং এই 'রব' শব্দকে অবলম্বন করে 'রবুবিয়াত' বা পালনবাদী দর্শন-সমাজ এবং মহাজগৎ ব্যবস্থাপনার পত্তন হয়েছে। এই রবুবিয়তের দপ্তরে সকল মানুষ, প্রাণী, বস্তু, দৃশ্য-অদৃশ্য সর্বপ্রকার সত্তার অবস্থান একই সমতলে, সমঅধিকার সম্পন্ন, বৈষম্যমুক্ত। এ আয়াতে আল্লাহ্‌র অসীম ব্যাপকতার কিঞ্চিত পরিচয়ের পাশাপাশি মানব জীবনের সূচনা বিন্দু থেকে আপাতঃ অন্তবিন্দু (বিচার দিবস) পর্যন্ত একটা পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা টানা হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে মহাজগৎ বা আলামিনের অন্তহীনতার ধারণা মানসচক্ষে ভেসে উঠে।

আল-কুরআন একেবারে শুরুতেই এই কালাম (statement) পেশ করেই কর্তব্যে ক্ষান্তি না দিয়ে বরং পৃথিবীতে এর জাহেরী রূপায়ন (manifestation) নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে মানবিক আচরণ-বিধি প্রণয়নের সুদীর্ঘ ধারাবাহিক পথ-পরিক্রমা শেষে নবুয়তী-রেসালতী মহাসড়কের প্রান্ত বিন্দু (terminal) নবীজী হযরত মোহাম্মদ (দ.) কে 'রাব্বুল আলামিনের' মনোনীত 'রহমাতুল্লিল আলামিন' (সমগ্র বিশ্ব জগতের জন্য রহমত বা আশীষ) হিসেবে প্রত্যায়িত (২১:১০৭) করে দিয়েছে। **ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নবীজী (দ.)-এর ব্যবহারিক জীবন পৃথিবীতে রবুবিয়াত বা পালনবাদী পদ্ধতির একমাত্র প্রকৃষ্ট উদাহরণ।**

নবীজীর (দ.) ব্যবহারিক জীবনের তথ্যনিষ্ঠ বিবরণের আয়তন বিপুল। এতে একজন মানুষের জীবনের, শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক যতো প্রকার প্রকাশ-চ্ছটা থাকতে পারে, সব কিছু কোন না কোনভাবে বিধৃত, বিম্বিত হয়ে আছে, যাতে দৃষ্টান্ত হিসেবে

তাঁকে সূচনা-বিন্দু রূপে অবলম্বন করা যায়। তাঁকে কল্পনা করা যায়, মানব জীবন ও যুক্তিসিদ্ধ আচরণের বহুভূজাকৃতি প্রিজম (polygon prisom) হিসেবে। আমাদের এ নিবন্ধের জন্য তাঁর মহাজীবন থেকে রবুবিয়াত বা পালনবাদী নীতির প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে ঃ-

(ক). রিযিক : জীবিকা বা আহার্যের সার্বজনীন প্রাপ্যতার নীতি বা রিযিকের প্রাপ্যতার সমতাঃ

গবাদি পশু, বিভিন্ন প্রকার প্রাণী ও মানুষ সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ্ তাদের পার্থিব জীবনের জন্য প্রাথমিক মৌলিক প্রয়োজন আহার্য-সম্পদ সৃষ্টি করেছেন এবং এগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী ভোগ-বণ্টনের নীতিমালা ঘোষণা করেছেন। 'আশরাফুল মাখলুকাত' মানবজাতির জন্য আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রকল্পের রূপরেখা নিম্নরূপঃ (১) "তোমরা কি দেখ না, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবই তোমাদের অধীনস্থ করে কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নেয়ামত সম্পূর্ণ করেছেন? (৩১:২০)। "ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আমার হাতে সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে ওদের জন্য আমি সৃষ্টি করেছি 'আনআম' (গবাদিপশু, প্রাণী প্রভৃতি) এবং ওরাই এগুলোর অধিকারী? এবং আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি। এগুলোর কতেক তাদের বাহন এবং উহাদের কতেক তাহারা আহার করে। তাদের জন্য এগুলোতে আছে বহু উপকারিতা, আর আছে পানীয় বস্তু। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞ হবেনা? (৩৬:৭১-৭৩)। "তিনি ভূপৃষ্ঠে স্থাপন করেছেন অটল পর্বতমালা, উহাকে (পৃথিবীকে) করেছেন বরকতময়, উহাতে যাঞ্চাকারীদের জন্য সমভাবে (প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমাণ মতো) খাদ্য সঞ্চিত রেখেছেন (৪১:১০)।" "আমরা পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি, উহাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং উহাতে প্রত্যেক বস্তু উদ্গত করেছি সুষমভাবে এবং উহাতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি তোমাদের জন্য, আর তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও, তাদের জন্যও; আমার নিকট আছে প্রত্যেক বস্তুর খাজিনা (ভাণ্ডার) এবং আমি উহা পরিজ্ঞাত পরিমাণেই সরবরাহ করে থাকি, আমি বৃষ্টি-গর্ভ বায়ু প্রেরণ করি, অতঃপর আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করি, অনন্তর তোমাদেরকে তা পান করতে দিই; আর তোমরা উহার খাজাঞ্চী নও (১৫: ১৯-২২)"।

উপরের আয়াতগুলোতে দেখা গেল, প্রত্যেকের চাহিদা ও প্রয়োজন অনুপাতে সমভাবে আহার্য মওজুদ রেখেছেন আল্লাহ্তায়ালা। এ আহার্য মওজুদের এই চেইন (chain) বড়ই সুবিন্যস্ত এবং এটা প্রকৃতি-বিজ্ঞান ও জীব-বিজ্ঞানের সমৃদ্ধ একটা শাখা। আল-কুরআনে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ কোন কিছুই 'অনর্থক কিম্বা খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করেন নি এবং একশ্রেণীর মানুষ যেমনটা মনে করে, তেমন খেল-তামাশাও নয়। এই

মহাসৃষ্টি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিষারী পরিকল্পনামণ্ডিত বা ঃ eleological (১৫:৮৫,২১:১৬-১৭,৪৪:৩৮-৩৯,৪৭:৩৭)। যেহেতু কোন কিছুই তাঁর অনর্থক সৃষ্টি নয়, সেহেতু সেই সব কিছুর নিয়মানুগ প্রতিপালন ও তাঁর রবুবিয়াত নীতির আওতাভুক্ত। আহার্যের প্রয়োজনীয়তা সার্বজনীন। বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে মানবজাতির সকল সদস্য, মশা-মাছিসহ ভূ-পৃষ্ঠস্থ সকল কীট-পতঙ্গ, প্রাণী, জীব-জন্তু, বনজ প্রাণী, সমুদ্র গর্ভস্থ ঝিনুক থেকে শুরু করে সকল প্রকার প্রাণীরই দরকার বেঁচে থাকার জন্য আহার্য। এ জন্যে আল্লাহ্ বলেছেন, "তোমরা যাদের জীবিকাদাতা নও, তাদের জন্যও জীবিকা দিয়েছি (১৫:২০)। জীবিকার বিষয়টা আরো সম্প্রসারণ করে দেখলে দেখা যাবে যে; মৃত্তিকা, বালি, প্রস্তর প্রভৃতি গঠনের জন্যও 'আহার্যের অর্থাৎ উপাদানের' প্রয়োজন। এমন কি নিরেট প্রাকৃতিক বিষয়, 'শুষ্কতার' আহার্য 'আর্দ্রতা' এবং তেমনিভাবে বিপরীতক্রম। 'কৃষ্ণগহ্বরের আহার্য' আলো; আলোর আহার্য 'অন্ধকার'! এ এক বিচিত্র গণিত! আল্লাহ্ নিজেই যেনো 'রবুবিয়াতরূপী চাদর' হয়ে সবাইকে আলিঙ্গন করে আছেন!!

এ প্রসঙ্গে নবীজীর (দ.) একটা হাদিস অধ্যয়নীয়: "আল্লাহ্র উপর ভরসা রাখলে নিশ্চয়ই তিনি তোমাকে পালন করবেন– যেমন পাখীদের করেন; তারা সকালে ক্ষুধার্ত অবস্থায় বের হয়, আর ক্ষুধা মিটিয়ে আপন নীড়ে ফিরে"। এর পাশাপাশি তুল্য আয়াত ১৫:২০।

(খ). আল-কুরআনে মানব জীবন চক্র এবং প্রাণীসমূহের জীবিকা চক্র:

এখানে জীবন ও জীবিকা সম্পর্কে আল-কুরআনের পাটিগণিত খতিয়ে দেখা যাক। আল-কুরআনে গাণিতিক ও জ্যামিতিক সূত্র প্রয়োগের একাধিক দৃষ্টান্ত মিলে। ইবনুল আরাবীও (র.) তাঁর ওয়াহদাতুল অজুদ তত্ত্বে এই সূত্র প্রয়োগ করেছেন। আল-কুরআনে বর্ণিত মানব জীবন চক্র এবং পার্থিব জীবিকাচক্রের স্কেচ নিম্নরূপ–(সূরা মুমিনুন ২৩:১২-২২ আয়াত), যা গাণিতিক হিসাব-সিদ্ধ ঃ-

মানব জীবন চক্র: (সূরা মুমিনুন : ১২-১৬ আয়াত) "আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান থেকে; অতঃপর আমি উহাকে শুক্রবিন্দুরূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ু), পরে এই শুক্রবিন্দুকে আলাক-এ (জমাট রক্তে আটকানো বস্তুতে); অতঃপর আলাককে পরিণত করি পিণ্ডে এবং পিণ্ডকে পরিণত করি অস্থি-পিঞ্জরে, অতঃপর অস্থি-পিঞ্জরকে আবৃত করি মাংস দ্বারা; অবশেষে উহাকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে (রূহ্ দিয়ে)। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ কতোই না বরকতময়। এরপর অবশ্যই তোমাদের মউত হবে। অতঃপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমাদেরকে উত্থিত করা হবে।"

জীবিকা চক্রঃ (সূরা মুমিনুন : ১৭-২২ আয়াত) "আমি তো তোমাদের উর্ধ্বে সৃষ্টি করেছি সপ্তপথ বা 'তারায়েক' (লক্ষ্যণীয়, এখানে সপ্ত আকাশসমূহ বা ছামাওয়াত শব্দটা ব্যবহৃত হয়নি) এবং আমি সৃষ্টি বিষয়ে অসতর্ক নই এবং আমি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি উহা মৃত্তিকায় সংরক্ষণ করি; আমি উহাকে অপসারণ করতেও সক্ষম। অতঃপর আমি উহা দ্বারা তোমাদের জন্য খর্জ্জুর ও আঙ্গুরের বাগান সৃষ্টি করি। এতে তোমাদের জন্য আছে প্রচুর ফল। আর উহা থেকে তোমরা আহার করতে থাকো এবং সৃষ্টি করি এক বৃক্ষ যা জন্মায় সিনাই পর্বতে, এতে উৎপন্ন হয় তৈল এবং আহারকারীদের জন্য ব্যঞ্জন এবং তোমাদের জন্য অবশ্যই শিক্ষণীয় বিষয় আছে গবাদি পশুর (আন-আম) মধ্যেও, তোমাদেরকে আমি পান করাই উহাদের উদরে যা আছে তা থেকে এবং উহাতে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর উপকারিতা, তোমরা উহাদের কতককে খেয়েও থাকো এবং তোমরা উহাতে ও নৌযানে আরোহণও করে থাকো।"

অবশ্য এসব বিষয়ে প্রসঙ্গান্তরে আরো সংশ্লিষ্ট আয়াত রয়েছে।

(গ). সার্বজনীন বিচার-সাম্য বা আদলে মোত্লাক (universal justice and equity) : সুবিচার প্রাপ্তির সমঅধিকারঃ

রবুবিয়াত তথা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের অপর স্তম্ভ সার্বজনীন বিচার-সাম্য বা আদলে মোত্লাক। আল-কুরআনে বিচার-সাম্য তত্ত্বটা কেবল মানব-সমাজ কিম্বা প্রাণীজগতের ক্ষেত্রে নয়; উপরন্তু বস্তুজগৎ, মহাজগৎ, নক্ষত্রজগৎ তথা সর্বক্ষেত্রে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করা হয়েছে। নক্ষত্রজগতের ভারসাম্য তথা বিচারসাম্য সংক্রান্ত বহু আয়াত বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে বর্ণিত হয়েছে। কেবল একটি মাত্র সূরা থেকে উদাহরণ নেওয়া যাক: যথা, সূরা আর-রাহমান: 'চন্দ্র-সূর্য হিসাব মতো পরিক্রম করছে, নক্ষত্ররাজি ও গাছপালা তাঁরই সিজদারত বা অনুগত রয়েছে। তিনিই আসমানকে সুউচ্চ করেছেন এবং দাঁড়ি-পাল্লা স্থাপন করেছেন, যাতে তোমরা পরিমাপে কম-বেশী না করো, তোমরা ন্যায়-ওজন কায়েম করো এবং পরিমাপে কম করো না।... তিনি দুই সাগরকে পাশাপাশি প্রবাহিত করেছেন। কিন্তু উভয়ের মাঝে অনতিক্রম্য এক অন্তরাল রেখে দিয়েছেন...(৫৫: ৩-২০)। এ আয়াতগুলোতে মানব জীবনঘনিষ্ঠ অনেকগুলো বিষয় সংক্ষেপে সুনিপুণভাবে গ্রথিত হয়েছে। উদ্ধৃত আয়াতাংশে ব্যবহৃত 'হিসাব' ও মিজান' (যা গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত হয়) এবং 'পরিমাপ' শব্দের ব্যাপ্তি বস্তুজগৎ, প্রাণী জগৎ, জীবনোপকরণ জগৎ, নক্ষত্রজগৎ প্রভৃতি সব কিছুতে পরিব্যাপ্ত। পরিমিতি বা ভারসাম্যমূলক সৃজন ও জীবন ব্যবস্থার কথা ২৫:২ আয়াতসহ একাধিক আয়াতে বলা হয়েছে। ভারসাম্য, বিচার-সাম্য শব্দগুলো পদার্থ নির্বিশেষে অভিন্ন অর্থে প্রযোজ্য। শব্দের বিভিন্নতা কর্তার (subject) অস্তিত্ব বিষয়ক পার্থক্য নির্ণায়ক। অতএব,

বিচারসাম্য বা প্রয়োজনীয় ভারসাম্য সুরক্ষা করা আল-কুরআনে বর্ণিত আল্লাহ্‌র নীতি এবং **জৈব-অজৈব সব বস্তুর রয়েছে সুবিচার প্রাপ্তির সমঅধিকার**। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এ নীতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে সর্বাধিক।

বর্ণ-বিশ্বাস-ভাষা নির্বিশেষে মানব সমাজে বিচার-সাম্য (আদ্‌লে মোত্‌লক্‌) প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে আল-কুরআন অত্যন্ত সিরিয়াস : "তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন দ্বীন, যা নির্দেশ করেছিলেন নূহ্‌কে, আর যা আমি ওহী করেছি আপনাকে এবং যা নির্দেশ করেছিলাম ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে, এই বলে যে, আপনারা দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করুন এবং দলাদলি করে তাতে মতভেদ সৃষ্টি করবেন না। আপনি মুশরেকদেরকে যার প্রতি আহ্বান করছেন, তা তাদের নিকট ভীতিপ্রদ মনে হয়। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা দ্বীনের প্রতি আকৃষ্ট করেন এবং যে তাঁর অভিমুখী, তাকে দ্বীনের দিকে পরিচালিত করেন। ওদের কাছে জ্ঞান (এলম) আসার পর ওরা কেবল পারস্পরিক দ্বন্দ্ববশতঃ ঔদ্ধত্য ও অবজ্ঞাভরে নিজেদের মধ্যে মতভেদ ঘটায়। এক নির্ধারিত কাল পর্যন্ত অবকাশ সম্পর্কে আপনার রবের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকলে তাদের বিষয়ে ফায়সালা হয়ে যেতো। ওদের পরে যারা কিতাবের ওয়ারিস হয়েছে, তারা তো সে সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর সন্দেহে রয়েছে। সুতরাং, আপনি উহার দিকেই আহ্বান করুন এবং উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকুন এবং তাদের খেয়াল-খুশীর তাঁবেদারী করবেন না। বলুন 'আল্লাহ্‌ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আমি তাতে বিশ্বাস করি এবং তোমাদের মধ্যে ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আদিষ্ট হয়েছি। আল্লাহ্‌ আমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদেরও প্রতিপালক। আমাদের কাজ আমাদের, তোমাদের কাজ তোমাদের। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে হুজ্জত (বিসম্বাদ) নেই। আল্লাহ্‌ই আমাদেরকে একত্রিত করবেন এবং প্রত্যাবর্তন তাঁরই নিকট। আল্লাহ্‌কে স্বীকার করার পর যারা আল্লাহ্‌র সম্পর্কে হুজ্জত করে, তাদের হুজ্জত (তর্ক-বিতর্ক) তাদের রবের দৃষ্টিতে অসার এবং তারা তাঁর ক্রোধের পাত্র এবং তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আল্লাহ্‌ই অবতীর্ণ করেছেন সত্যসহ কিতাব এবং তুলাদণ্ড--- (সূরা কূরা ৪২:১৩-১৭)। এই সূরা মক্কায় অবতীর্ণ সূরা সমূহের মধ্যবর্তী গ্রুপঋণক্ত। তবে সূরা কূরা'র ১৫নং আয়াত-এর কিছুকাল পূর্বে মানুষের নিজ নিজ বিশ্বাস সম্পর্কিত অবস্থানের স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট রেখা টেনে মক্কায় অবতীর্ণ হয় পার্থিব ও সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সূরা 'কাফিরুন'। লক্ষ্যণীয় যে, সূরা কূরার উদ্ধৃতাংশ এবং সূরা কাফিরুনে বর্ণিত ধর্মবিশ্বাসগত মতবিভেদ সত্ত্বেও সম্প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কথা বলা হয়েছে। তবে বিশ্বাসজাত কর্মের নিকাশ বা ফায়সালা করার ভার আল্লাহ্‌ নিজের নিয়ন্ত্রণেই সংরক্ষিত রেখেছেন। 'বেলায়তে মোত্‌লাকা' গ্রন্থের 'বেলায়তে মোকাইয়াদা যুগ বিকাশ' শীর্ষক পরিচ্ছেদে এই সূরার ১৩-১৭ আয়াতগুচ্ছ থেকে ১৫নং আয়াতটা উদ্ধৃত করে

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা আল-কুরআনের নীতির ফলিত দিকের বিশ্বমানবিক মানচিত্র অঙ্কনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে আল্লাহ্ এবং নবীজীর (দ.) রহমত, উদারতা ও সহনশীলতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে।

এখানে একটা বিষয় গুরুত্বসহকারে প্রণিধানযোগ্য যে, শরিয়ত, মারিফাত, বেলায়তে মোকাইয়াদা ও মোত্লাকা, তৌহিদে আদ্বীয়ান, আদলে মোত্লাক বা বিচারসাম্য প্রভৃতি সকল বিষয়ের কেন্দ্রকিন্দু হিসেবে স্থাপিত আছেন নবীজী (দ.)। এই একক কেন্দ্রবিন্দুকে সব কিছুর চলিষ্ণুতার উৎস ও শক্তিমূল হিসেবে রেখে পৃথিবী ও বিশ্ব জগৎ সম্পর্কিত বৃত্তের বহুবিধ অন্তহীন ব্যাস অঙ্কিত। আল-কুরআনে এই তথ্য বিবৃত হয়েছে তিনটা বিশেষ আয়াতে : (১) আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমার দ্বীন মনোনীত করলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় বাধ্য হলে; তখন আল্লাহ্তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু (৫:৩); (২) আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত রূপেই প্রেরণ করেছি (২১:১০৭); (৩) যারা ঈমান আনে, সৎকর্ম করে এবং মুহাম্মদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই তাদের প্রতিপালক থেকে প্রেরিত সত্য; তিনি তাদের মন্দকর্মগুলো বিদূরিত করবেন এবং তাদের অবস্থা ভালো করবেন (৪৭:২)। অতএব, যুক্তিশাস্ত্রের নির্দেশনা এই যে, ইসলামী জীবন দর্শন ও জীবনাচার চর্চা এই পবিত্র মহৎ মোহাম্মদী মানদণ্ডেই নির্ণীত ও বিবেচিত হওয়া বাঞ্ছনীয় এবং এটাই নিরাপদ, মসৃণ ও কল্যাণকর। এ প্রসঙ্গে সূরা নূর-এর দুটো আয়াত উল্লেখ করা যেতে পারে, যেখানে বলা হয়েছে: "আল্লাহ্র আনুগত্য করো (২৪:৫৪)" এবং তোমরা সালাত কায়েম কর, যাকাত প্রদান কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়" (২৪:২৫৬)। অর্থাৎ **তৌহিদে বিশ্বাসের ফলপ্রসূতা রাসূলের আনুগত্য সাপেক্ষ**।

(ঘ) আদলে মোত্লাক বা সার্বজনীন বিচার-সাম্য মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভিত্তি:

আল-কুরআনের তথা ইসলাম ধর্মের পরম লক্ষ্য মানব জীবনের পার্থিব ও পরকালীন জীবনে সুশীতল শান্তি প্রতিষ্ঠাকে মন্জিলে মকসুদ হিসেবে চিহ্নিত করে মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত সার্বজনীন বিচার-সাম্যকে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর গঠনতন্ত্রের সূচনাতে নবীজীকে (দ.) 'আদর্শ জীবন যাত্রার আল-আমিন বা বিশ্বস্ত জিম্মাদার' হিসেবে বর্ণনা করে তাঁর একটি হাদিস উদ্ধৃত করেছেন, যাতে বলা হয়েছে, 'বিচার-সাম্য রক্ষা করুন, কেননা আপনাদের মধ্যে বিচার-সাম্য রক্ষা করতে আদিষ্ট হয়েছি।[১২] এ বিষয়টাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেবার

জাগতিক-সামাজিক পটভূমি হিসেবে স্বীয় অভিজ্ঞতার বর্ণনায় তিনি বলেন, "কার্যক্ষেত্রে দেখা যায়; বিচার-সাম্য, ধন-সঞ্চয় ও বণ্টনে বুঝ-ব্যবস্থা এবং সামাজিক মানের ব্যাপারে ধর্ম-প্রাধান্যতার বিভিন্ন মতবাদের গোঁড়ামীর দ্বারা এই "আদলে-মোত্লক বা বিচার-সাম্য অতীতে মোকাইইয়াদা যুগে নির্বিঘ্নে স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে নাই। যেহেতু বিশ্বের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পারিপার্শ্বিকতায় এই মানবীয় সত্য-সত্তা মানববোধ অস্ত্রবলের নিকট মাথা নত ছিল। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও জাতিগত কল্যাণকামী ইচ্ছা বা স্বাধীনতার মানবোধ পরিস্ফুটিত হইতে গৌন বা দেরী ছিল।"[১৩] নবীযুগে সর্বাত্মক ব্যষ্টিক কল্যাণ-চেতনার শুভ সূচনা ঘটলেও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক-সামাজিক-আর্থিক বৈরী পরিবেশের দরুন তার সুষ্ঠু বিকাশ ঘটতে পারেনি। এখানে উল্লেখ্য, নবীজী (দ.) ও তাঁর প্রত্যক্ষ সাহাবাদের চেতনার মানের তুলনায় সাধারণ মানুষের চেতনার স্তর তখন প্রত্যাশিত বিকাশ লাভ না করায় ইপ্সিত আদর্শ-জীবনের পরিবেশ রচনা ব্যাহত হয়। তবে সামাজিক বিবর্তনের প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তার বিকাশ প্রক্রিয়া চালু থাকে। হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) প্রজ্ঞা ও বিজ্ঞতা তদানীন্তন পটভূমিকায় (ঊনবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) মানব সমাজকে একটি সুশৃঙ্খল আচরণ প্রক্রিয়া উপহার দিতে সক্ষম হয়, যাকে বেলায়তে মোকাইইয়াদা পর্যায় বলে অভিহিত করেছেন অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.)। দীর্ঘ প্রায় দেড় সহস্রাব্দকাল ধরে দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনের পর খৃষ্টীয় ঊনবিংশ/বিংশ শতাব্দীতে বিশ্বমানব সমাজ সামন্ততন্ত্র-রাজতন্ত্র-ঔপনিবেশিক শোষণতন্ত্রের জীর্ণ খোলাস ঝেড়ে ফেলে নতুন রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। অছিয়ে গাউসুল আযম এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন এবং আল-কুরআন, হাদিস ও যথার্থ অধ্যাত্ম শিক্ষায় বিভূষিত থাকায় এই পরিবর্তনের পালা তাঁর সন্ধানী চোখে ধরা পড়ে। নিজের ও বিশ্ব-সমাজের দুর্দশার চিত্র তাঁকে বেদনাহত করে এবং পার্থিব-সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক-রুহানী তথা সামগ্রিকভাবে এর প্রতিকারে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রক্রিয়া নির্ধারণে সচেষ্ট হন। মানুষের মন প্রকৃতিগতভাবে অদৃশ্য আধ্যাত্মিকতামণ্ডিত বিধায় তিনি প্রাকৃতিভাবে প্রাপ্ত এক সমৃদ্ধ ঐতিহ্য অবলম্বন করে এই পরিবর্তনকে উদারভাবে প্রকাশের লক্ষ্যে 'বেলায়তে মোত্লাকা বা মুক্ত বেলায়ত' হিসেবে ব্যক্ত করেন; যা কার্যতঃ নবীজীর (দ.) মদীনা সাধারণতন্ত্রের দর্শন ও বাস্তবতার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। মোদ্দা কথায়, তিনি মদীনা সনদের দর্শন ও মর্মবাণীকে বিংশ শতকের প্রেক্ষাপটে নিজ সমাজ তথা বিশ্বের জীবন-প্রবাহে প্রতিস্থাপনের পরিকল্পনা করেছিলেন, যার প্রকাশ ঘটেছে 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে। তাঁর সময়ের দ্বন্দ্ব-বিক্ষুব্ধ বিশ্ব-সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর মনোবীণায় সুদূর প্রসারী কল্যাণ মিশনের ঝংকার তুলেছিল। তাঁর মতোই তৎকালীন

বিশ্বমানবতার বিজ্ঞ অংশ শেষ পর্যন্ত নবীজীর (দ.) কর্মপদ্ধতির মাঝে সমাধান সূত্র খুঁজতে ব্রতী হয়েছিলেন এবং বর্তমান (একবিংশ শতাব্দী) সময়ে সে আগ্রহ ও গবেষণা ক্রমাগত বাড়ছে সমস্যার জটিলতা ও ব্যাপকতার সাথে পাল্লা দিয়ে।

ঙ. মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত বা বেলায়তে মোত্লাকার তাত্ত্বিক সূত্র :

'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থের মূল্যায়নে সামাজিক অবিচার, শোষণ, রাজনৈতিক পীড়ন, ধর্ম গোঁড়াবাদ, নাস্তিক্যবাদ প্রভৃতি অনৈয়ায়িক ও অবাঞ্ছিত কর্ম 'সমগ্র জগতকে গ্রাস করার উপক্রম করেছে এবং বিরোধ বাড়াচ্ছে' বলে সতর্ক করা হয়েছে এবং এর প্রতিকারের সূত্র হিসেবে সূরা কূরা'র ১৫তম আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে সার্বজনীন বিচার-সাম্যকে শান্তির অন্যতম মৌলিক ভিত্তি হিসেবে নির্দেশ করা হয়েছে। এই আয়াত এ অধ্যায়ের 'খ' অংশে বিবৃত হয়েছে। বর্তমান আলোচ্য বিষয় খোলাসা করার জন্য এই আয়াতের ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা লাভ করা আবশ্যকীয়। এই আয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে শুরু থেকে অদ্যাবধি বিভিন্ন মহান তফসীরকারক বিভিন্নমুখী বিশ্লেষণাত্মক গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

আল-কুরআনের প্রতিটা শব্দ, আয়াত, আল্লাহ্র নির্দেশনানুগ নির্ধারিত রুকু ও সূরা বা অধ্যায় পৃথকভাবে স্থানিক, কালিক, সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে একাধিক বিশেষ তাৎপর্য বহন করার পাশাপাশি শাশ্বত বিশ্বজনীন তাৎপর্যও বহন করে। বলা বাহুল্য, সূরা কূরার ১৫নং আয়াতের যে অংশ বিশেষ 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'বেলায়তে মোত্লাকা' যুগের শাশ্বত সার্বজনীন ঐক্য ভিত্তিক কল্যাণময়তার লক্ষ্য নির্দেশ করার জন্য উদ্ধৃত করা হয়েছে, তা সুস্পষ্ট এবং এই পরিচ্ছেদের উপসংহার অনুচ্ছেদে পুরো বিষয়টাকে একটি সূত্রাকারে গ্রথিত করা হয়েছে, যাতে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, শান্তিপূর্ণ মানব সমাজ নিশ্চিত করতে হলে "পৃথিবীকে এই পৌত্তলিকতাবাদ, নাস্তিকতাবাদ ও ধর্ম গোঁড়াবাদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য এক বিরাট কার্যকরী রূহানী শক্তি ও তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন এক মহাকৌশল বা হিকমতের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সেই বিরাট শক্তির সূচনা হযরত আকদাসের জাতে বা বরকতে হইয়াছে এবং সেই মহাকৌশল বা হিকমতের নাম "বেলায়তে মোত্লাকা"[১৪]।

আল-কুরআনের বিশ্বজনীন সার্বজনীনতার বৈশিষ্ট্যের পটভূমিকায় এই আয়াত চয়িত হয়েছে। এবার ইতিহাসের আরো একটু গভীরে প্রবেশ করা যাক। আলোচ্য ১৫নং আয়াত সূরা কূরার দ্বিতীয় রুকুর অন্তর্ভুক্ত। ১০নং থেকে ১৯নং আয়াত সমবায়ে এই রুকু গঠিত। এই রুকুর ১৫নং আয়াতের গুরুত্ব সম্পর্কে হাফেজ ইবনে-কাসীর বলেন; দশটি বাক্যাংশ (phrase) সম্বলিত এই আয়াতে কর্মজগত সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। সমগ্র কুরআনে আয়াতুল কুরসীই এর একমাত্র নজীর; তাতেও আল্লাহ্ বিষয়ক দশটি বিধান বিবৃত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতের বিবৃত দশটি বিধান :

(১) যে কোন প্রতিকূলতার মুখে আপনি দাওয়াত অব্যাহত রাখুন, (২) আপনি নির্দেশিত ধর্মে অবিচল থাকুন, (৩) দাওয়াতের দায়িত্ব পালনে আপনি কোন বিরোধিতার পরোয়া করবেন না, (৪) আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ সকল কিতাবের প্রতি আপনার বিশ্বাস ঘোষণা করুন, (৫) আমি ন্যায়-বিচার করতে আদিষ্ট, (৬) আল্লাহ্ আমাদের সবার রব, (৭) কর্মফল প্রত্যেকের নিজেরই, (৮) সত্য স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাবার পরও তোমরা বিরোধিতা অব্যাহত রাখলে তর্ক-বিতর্ক অর্থহীন, (৯) কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ আমাদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং কর্মফল প্রদান করবেন, (১০) আমরা সকলেই তাঁর দিকে প্রত্যাবর্তন করবো।[১৫]

ইতিহাসের তথ্যমতে, এই আয়াত নাযিল হয় প্রতিপক্ষরা যখন নবীজীকে (দ.) উৎখাত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে অর্থাৎ ৬১৫/৬১৬ খ্রিস্টাব্দে। তবে এ আয়াত নাযিলের সূত্র আরো একটু অতীতের সাথে সংযুক্ত। ৬০৯/৬১০ খ্রিস্টাব্দে হেরা গুহায় প্রথম পাঁচ আয়াত সম্বলিত ওহী (৯৬:১-৫) নাযিল হবার পর নবীজীকে (দ.) ওহীর গুরুভার বহনে শারীরিক ও মানসিকভাবে ধাতস্থ ও সক্ষম করার বিজ্ঞানসম্মত প্রক্রিয়ায় বিদগ্ধ করার পর্যায় অন্তে (এই পর্যায়ের মেয়াদ সম্পর্কে বর্ণনাকারী/ঐতিহাসিকদের বিবরণের মধ্যে পার্থক্য দৃশ্যমান– যার বিস্তার প্রায় ছয় মাস থেকে প্রায় দু বছর পর্যন্ত। তবে 'ছয় মাস'ই ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ দেখা যায়) সূরা আদ্-দ্বোহা অবতীর্ণ হয়, যার শেষ আয়াতে (১১নং) 'রবের অনুগ্রহের' কথা প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়। এ পর্যায়ে তিনি প্রথমে গোপনে পরিবারের সদস্যদের মাঝে বাণী প্রচার করেন এবং এতে কিছু মজবুত বিশ্বাসীর আবির্ভাব ঘটে। প্রায় তিন বছর গোপন দাওয়াত চালানোর পর তাঁকে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে প্রকাশ্যে প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয় (২৬:২১৪)। তিনি বনি-হিশামের মধ্যে প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন একটা সাধারণ ভোজসভার মাধ্যমে। তবে এতে কর্মক্ষেত্রে প্রতিরোধ যেমন ক্রমাগত বাড়তে থাকে, তেমনি মজবুত বিশ্বাসী সাহাবার সংখ্যাও বাড়তে থাকে। এদিকে ক্রমবর্ধমান হারে তরুণ-যুবা-নারী-নির্যাতিত দাস, দরিদ্র সমর্থকদের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সন্ত্রস্ত প্রতিপক্ষরা নানা প্রলোভনে তাঁকে নিরস্ত রাখতে প্রয়াসী হয়। এ অবস্থায় সূরা ইখলাস নাযিলের (৬১৫/৬১৬ খৃঃ) মাধ্যমে প্রতিপক্ষদের সাথে পূর্ণ ভেদরেখা অঙ্কিত হয়। তারা তবুও দমেনি। বিভিন্ন আপোষমূলক প্রস্তাব দেয় তৌহিদ সম্পর্কে রফা করার মতলবে। এসব প্রস্তাবের অন্যতম ছিল যৌথভাবে শেয়ারে আল্লাহ্ ও বিপরীত ধর্মী উপাসনার প্রস্তাব। এর প্রেক্ষিতে সূরা কাফিরুন (নং ১০৯) নাযিল হয় ৬১৫/৬১৬ খৃস্টাব্দেই। এতে ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও ধর্ম লালনের স্বাধীনতার কথা ব্যক্ত হয়। কিন্তু এতেও তারা সন্তুষ্ট ও নিরস্ত না হয়ে জুলুমের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। জটিলতায় না গিয়ে অন্তত স্রেফ পার্থিব মানবিক অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবার জন্য

প্রতিপক্ষের প্রতি আহ্বান জানান নবীজী (দ.)। তিনি তখন ক্রমাগত আক্রান্ত ও নির্যাতিত হচ্ছিলেন। তাঁর উপর সরাসরি শারীরিক আক্রমণ করা হয় অত্যন্ত নৃশংসভাবে। তিনি তখনো আত্মরক্ষামূলক পদক্ষেপ নেবার নির্দেশপ্রাপ্ত হননি। ইতোমধ্যে হযরত ওমর (রা.) ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। সৎ, বিজ্ঞ, ধৈর্যধর ভ্রাতুষ্পুত্রকে নিশ্চিহ্ন করে দেবার জঘন্য নিষ্ঠুর উদ্যোগ দেখে তাঁর পিতৃব্য হযরত হামজা (রা.) ইসলাম কবুল করে পাশে এসে দাঁড়ান। এতে প্রতিপক্ষের রোষ, হিংস্রতা, প্রতিশোধস্পৃহা বহুগুণ বেড়ে যায়। এই প্রেক্ষিতে অত্যন্ত দুর্বলতর পক্ষ হিসেবে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সর্বশেষ প্রত্যাশা ব্যক্ত করার পাশাপাশি নবীজীকে (দ.) স্বীয় মিশনের প্রতি যে কোন পরিস্থিতিতে অবিচল ও নিষ্ঠাবান থাকার নির্দেশ দিয়ে সূরা কূরার ১৫নং (৪২:১৫) আয়াত নাজিল হয় এই পর্যায়ে অর্থাৎ ৬১৫/৬১৬ খৃঃ আবিসিনিয়ায় হিজরতের প্রাক্কালে। নিজেদের কর্মফলের বিচারের ভার পুনরুত্থান দিবসে আল্লাহ্‌র উপর অর্পণ করে পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের এই আবেদনও তাদের মনে কোন সাড়া জাগায়নি। উপরন্তু তারা নবীজী (দ.) এবং তাঁর দরিদ্র-নিরস্ত্র সাহাবাদের উপর অমানবিক কঠোর অবরোধ আরোপ করে, যা দু' থেকে প্রায় তিন বছর স্থায়ী হয়। এই অবরোধে নবীপত্নী মা খাদীজা (রা.), পিতৃব্য আবু তালেবসহ অনেকের অপূরণীয় শারীরিক, আর্থিক, মানসিক ক্ষতি সাধিত হয়। এ অবস্থায় নবীজীর (দ.) বিশ্বস্ত সর্বত্যাগী সাহাবাগণকে আফ্রিকার আবিসিনিয়ায় হিজরত করার পরামর্শ দেয়া হয়। আবিসিনিয়ার তৎকালীন নাজ্জাশী বা রাজা ঈসায়ী ধর্মের অনুসারী দূরদর্শী, জ্ঞানী, বিজ্ঞ, উদার শাসক ছিলেন। তিনি মুসলিম মুহাজেরদের আশ্রয় দেন, তবে সে জন্যে তাঁকেও এক পর্যায়ে স্বদেশে গোঁড়া মতাবলম্বীদের সমালোচনা ও প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়। ইতোমধ্যে মক্কায় ক্রমবর্ধমান গণ-অসন্তোষ ও ক্ষোভের মুখে প্রতিপক্ষ কোরায়েশরা তাদের অবরোধ প্রত্যাহার করার মতো পরিস্থিতির মুখে পড়ে। অবরোধ অব্যাহত রাখা তাদের পক্ষে সম্ভবও হচ্ছিলনা নবীজীর (দ.) প্রতি সাধারণ মানুষের বিচার-বুদ্ধিসঞ্জাত নীরব-গোপন সহযোগিতা ও সমর্থন বৃদ্ধির কারণে। তবে প্রতিপক্ষের অনমনীয়তার কারণ হিসেবে ঐতিহাসিকগণ ধর্মীয় বিশ্বাস ও সংস্কৃতিগত কারণের চেয়ে আর্থিক কারণকেই মুখ্য বলে অভিমত প্রকাশ করছেন। সামাজিক-আর্থিক অসমতা, বৈষম্য পরিহার এবং জুলুম-পীড়ন-শ্রম শোষণ (দাসপ্রথা), প্রতারণাসহ সকল প্রকার অন্যায় কাজ-কর্ম বিসর্জনের তাগিদ সূরা আদ্-দ্বোহা (সূরা ৯৩) দিয়েই শুরু হয়। তিনি নিজের পরিজন ও নিকট আত্মীয়দেরকে এই পার্থিব সুবিচার ও সাম্যের নীতি অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন এবং অনেকে তা অনুসরণ করতে থাকেন। কিন্তু এক শ্রেণীর ধনাঢ্য মক্কাবাসী তাতে অস্বীকৃতি জানায় এবং তাঁর বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ হয় এই মনোবভাব থেকে যে, মোহাম্মদ (দ.) তাদের

ব্যবসা, সম্পদ, আহরণের জন্য তাদের লুণ্ঠন, শঠামি প্রভৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ রচনা করে তাদের বৈষয়িক ক্ষতি করতে চান। এ পর্যায়ে তিনি তায়েফে প্রচারকার্য চালাতে গেলে তাঁকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করা হয়। উল্লেখ্য, কৃষির উপযুক্ত তায়েফের আবহাওয়া ছিল অপেক্ষাকৃত অনুকূল এবং ধনাঢ্য আরবরা সেখানেই গ্রীষ্ম অবকাশ যাপন করতো। 'আর্থিক শোষণ বন্ধ, সম্পদ বণ্টনে সমতা, স্রষ্টার সাথে মানুষের সরাসরি সম্পর্ক, প্রত্যেকের কর্মফল কোন প্রকার বিনিময়হীন ও অমোঘভাবে নিজেকেই বহন করতে হবে' প্রভৃতি নীতিমালা ও সামাজিক সূত্র প্রবর্তনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন সুবিধাভোগী ধনিক শ্রেণী, বিবিধ ধর্মীয় যাজক শ্রেণী তার উপর বিক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করে। নবীজী (দ.) তথা ইসলামের এই সুবিচারমূলক মানবিক মৌলিক নীতির বিরোধী একটা শক্তিশালী রাজনৈতিক-সামাজিক পক্ষ সেই তখন থেকেই বিদ্যমান ছিল এবং বর্তমান শতাব্দীতেও তাদের সশস্ত্র কূটশক্তিনির্ভর উপস্থিতি অব্যাহত; যা মানবিক শান্তি, কল্যাণ ও সুবিচারকে প্রতি পদে পদে বিপর্যস্ত করছে। নবীজীর (দ.) মিশনের ও নিঃস্বার্থ জীবন পরিক্রমার সমৃদ্ধ সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ বিভিন্ন ভাষায় রচনা করেছেন বিজ্ঞ গবেষকবৃন্দ।[১৬]

এই দ্বন্দ্বময় সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতিতে আবিসিনিয়ায় মোমিনদের হিজরতের প্রাক্কালে সূরা কূরার ১৫তম আয়াত নাযিল হয় প্রতিপক্ষ উগ্রপন্থীদের শুভবুদ্ধি উদ্রেক করার প্রত্যাশায়। কিন্তু তাতে কোন প্রকার ফলোদয় হয়নি। আল্লাহ্‌র নির্দেশ মোতাবেক সত্য, যুক্তি ও সহাবস্থান নীতির উপর নবীজী (দ.) স্বীয় অনঢ় অবস্থান ঐ সময়েই জ্যামিতিক ডায়াগ্রাম বা রেখাচিত্র আকারে সহজভাবে সাহাবীদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে মাসউদের (রা.) বরাত দিয়ে পরিবেশিত এক হাদিসে বলা হয়, "একদিন রসূলুল্লাহ্‌ (দ.) আমাদের সামনে একটি সরল রেখা টানলেন। অতঃপর এর ডানে ও বামে আরো কয়েকটা রেখা টেনে বললেন, ডান ও বামের এসব রেখা শয়তানের আবিষ্কৃত পথ। এর প্রত্যেকটিতে একটি করে শয়তান নিয়োজিত রয়েছে। সে মানুষকে সেই পথেই চলার উপদেশ দেয়। অতঃপর মধ্যবর্তী সরল রেখার দিকে ইশারা করে বললেন, ওয়া আন্না হাযা ছেরাতিম মুস্তাকিম ফাআত্তাবেয়ুহু : এটা আমার সরল পথ। তোমরা এরই অনুসরণ করো।"[১৭] এই দৃষ্টান্তে 'সরল পথ' বলে নবী-রসূলদের অভিন্ন ধর্মের পথই বুঝানো হয়েছে বলে বিজ্ঞ তফসীরকারকদের অভিমত; এই আয়াত ঐ সময়ে নবীজী (দ.) ও তাঁর প্রতিপক্ষের মধ্যে পৃথিবীতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সর্বশেষ ফর্মুলা। যা তারা মানেনি এবং অতঃপর আবিসিনিয়ার হিজরতের সূচনার মধ্যে দিয়ে দুটো বিপরীতমুখী স্রোতের পত্তন ঘটে।

'বেলায়তে মোত্লাকা' বিংশ শতাব্দীর সংঘাত-বিদ্বেষপূর্ণ পরিবেশে ঐ ফর্মূলার অন্তর্নিহিত সৎ উদ্দেশ্য বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেছে।

চ. তৌহিদে আদ্বীয়ান ও রবুবিয়াত (federation of faiths and universal right to survival) / ফলিত দৃষ্টান্তঃ

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সূরা কূরা'র ১৫নং আয়াত প্রতিপক্ষরা প্রত্যাখ্যান করলেও আল্লাহ্ এবং নবীজীর রহমতের শাশ্বত মিশনের যতি ঘটেনি। সুদীর্ঘ সংগ্রামাকীর্ণ অভিযাত্রায় স্বীয় জন্মভূমি ছেড়ে মরুদ্যানময় ইয়াসরিব (মদীনা) শহরে তিনি আল্লাহ্র নির্দেশিত মহান রবুবিয়াত আদর্শের পতাকা প্রোথিত করেন, যার অবিনশ্বর প্রকাশ ঘটে ঐতিহাসিক মদীনা সনদের মাধ্যমে ৬২৪ খৃস্টাব্দে। পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে তৎকালীন বাস্তবতার আলোকে বিভিন্ন দফায় বিভিন্ন ধারা সংযোজনের মাধ্যমে এই সনদ পূর্ণাঙ্গ রূপ পরিগ্রহ করে; যা পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে বরিত। দীর্ঘ সময় ধরে বহুবিধ ঝড়-ঝঞ্ঝা বিপত্তির পর সুসংগঠিত সামাজিক-রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নবীজীর (দ.) মিশনের প্রতিষ্ঠা লাভ এবং সুবিচারমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা কায়েমের মধ্যে অন্যতম যে শাশ্বত সত্য ফুটে উঠে, তা হলো রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্র 'রহমান' ও 'রহিম' ভূমিকা এবং 'রহমতুল্লিল আলামিন' হিসেবে নবীজীর (দ.) চিরন্তন কল্যাণকর ভূমিকার কোন ব্যত্যয় ঘটেনা। শান্তি, কল্যাণ ও প্রগতিই আল্লাহ্র বিধান ও নিয়ম, যাতে কোন ব্যত্যয় কিম্বা পরিবর্তন ঘটেনা [দ্রঃ আল-কুরআনঃ (৩৫:৪৩, ৪৮:২৩)]। এতে হস্তক্ষেপের কোন ক্ষমতা ও অধিকার পৃথিবীতে স্বল্পজীবী মানুষের নেই।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে ৬১৫/৬১৬ খৃঃ মক্কায় অবতীর্ণ সূরা কূরা'র ৪২:১৫ নং আয়াতের জের হিসেবে ৬২৪ খৃস্টাব্দে মদীনায় অবতীর্ণ ৪৭নং সূরা মোহাম্মদ-এর ১-৪ এবং ৩৩নং আয়াত এবং প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ হিজরতের প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর বা ৬২৩/৬২৪ খৃস্টাব্দে বিধিবদ্ধভাবে মদীনা সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনকালে অবতীর্ণ বহুমুখী আইনী বিধান (legislation) সম্বলিত সূরা বাক্বারা'র ১৭৭নং আয়াত অধ্যয়ন করে দেখা যাক। ঐতিহাসিক মদীনা সনদ প্রণীত হয় ঐ মুদ্দতেই। একটা সাংবিধানিক রাষ্ট্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বরূপ বিভিন্ন দিক কভার করে মদীনায় নাজিল হয় নীতিগত-প্রশাসনিক-সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ, আত্মরক্ষামূলক ন্যায়সম্মত প্রতিরোধের রূপরেখা, জাগতিক-ব্যবহারিক বাস্তবতাগুলোর অনিবার্যতা সম্পর্কে অবহিতিমূলক সূরা মোহাম্মদ (দ.) অর্থাৎ ৪৭নং সূরা নাজিল হয়, যাতে একাধারে নবীজীকে (দ.) উদ্দেশ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপনের পাশাপাশি সার্বজনীনভাবে অবস্থাভেদে প্রযোজ্য কিছু কিছু নীতিমালা বর্ণিত হয়। এতে দেখা যায়, তিনিই লাটিমের শীর্ষবিন্দু (top), তাঁর উপর ভর করেই ঘুরছে নীতি-পদ্ধতির লাটিম, আবার

সেই লাটিমকে ঘিরেই নিয়মবদ্ধভাবে আবর্তিত হচ্ছে সমাজ-গ্রহ-উপগ্রহসমূহ! আদ্‌লে মোতলাক বা বিচার-সাম্য, তৌহিদে আদ্বীয়ান বা বিশ্বাসসমূহের ডাল-পালা আঁকড়ে থাকা প্রাণীমণ্ডলী আবর্তিত হচ্ছে তাঁকে ঘিরেই, তিনিই নির্ভরযোগ্য অবলম্বন ও আশ্রয়!!

এই সূরার (৪৭নং) প্রথম আয়াতের পটভূমিকায় দ্বিতীয় আয়াতে ঈমান, সৎকর্ম এবং রবের পক্ষ থেকে মোহাম্মদের (দ.) প্রতি নাযিলকৃত সত্যের উপর ঈমান আনয়নকে একই সূত্র গ্রথিত করে মন্দ আর ভালোর মধ্যে ভেদ রেখা অঙ্কিত হয় (৪৭:১-২)। এই সূরার ৩৩নং আয়াতে বলা হলো: "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌র আনুগত্য করো, রসূলের আনুগত্য করো এবং নিজেদের আমল বা কর্মসমূহ বাতিল বা বিনষ্ট করো না।" 'মোহাম্মদী শীলমোহরই' হলো সঙ্গত কর্মের অনুমোদনসূচক চিহ্ন। এই সময়েই ন্যায়সঙ্গত আত্মরক্ষামূলক প্রতিরোধ অনুমোদন ও অন্যায্য প্রতিবন্ধকতার মোকাবেলার নীতি কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সম্বলিত ৪৭:৪নং আয়াত নাজিল হয়। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ৬১৫/৬১৬ খৃস্টাব্দে সমকালে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে ও শান্তি প্রতিষ্ঠার ফর্মুলা সম্বলিত সূরা কূরা'র ৪২:১৫ আয়াতের আহ্বান ও প্রত্যাশা অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হবার তিক্ত অভিজ্ঞতার এবং একটা সাংবিধানিক রাষ্ট্র পত্তনের পটভূমিতে অতীতে প্রতিপক্ষের সুবুদ্ধির অভাবজনিত উপেক্ষার দরূন অকার্যকর উদ্যোগের স্থলে বাস্তব প্রয়োজনের সাথে সঙ্গতি রেখে আত্মরক্ষামূলক কঠোর অবস্থানের অনুমোদন দেওয়া হয়। সূরা মোহাম্মদ (দ.)-এর বর্ণিত নীতি ও নির্দেশনাগুলো অবস্থাভেদে প্রয়োগের জন্য পূর্ববর্তীগুলো পাশাপাশি স্থাপন করা হয়। অর্থাৎ শান্তি ও সহাবস্থানের পূর্ব নীতিমালা খারিজ করা হয়নি। শান্তির পথ ও দর্শন পূর্ববৎ অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে।

আরো তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, এই আয়াতে (৪৭:৪) ব্যবহৃত 'লাকীতুমু' শব্দের বাংলা অর্থ মোটামুটিভাবে দাঁড়ায়–'মুখোমুখি অবস্থা', 'প্রতিপক্ষের সম্মুখে বিপদজনক পরিস্থিতির মোকাবেলা' (meet, face, confront the adversary)। 'কিতল্' অর্থাৎ যুদ্ধ কিম্বা 'জিহাদ' শব্দ এখানে ব্যবহৃত হয়নি। একটা নিগূঢ় তাৎপর্য এখানে প্রতিভাত যে, আল্লাহ্ তাঁর মনোনীত 'রহমতুল্লিল আলামিন'-কে এই স্নিগ্ধ প্রক্রিয়ায় শান্তি-সোপানের উচ্চতম মর্যাদায় অভিষিক্ত রেখেছেন। ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থায় (polity) এ দুটো আয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। নবীজীর (দ.) সব যুদ্ধ ছিল আত্মরক্ষামূলক ন্যায় যুদ্ধ। এসব যুদ্ধে তাঁকে নিশ্চিহ্ন করতে শত্রু পক্ষ সর্বোচ্চ মাত্রা হিংস্রতা ও প্রতারণা অবলম্বন করলেও তিনি তৎকালীন নিষ্ঠুর যুদ্ধ রীতি এবং যুদ্ধ নীতি-কৌশলের চেয়ে মানবিক মূল্যবোধকে সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছিলেন।

মদীনা সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তনকালে নাযিলকৃত সূরা বাক্বারার পূর্বোক্ত আয়াত (২:১৭৭) সামগ্রিক রাষ্ট্র-সমাজ-সরকার ব্যবস্থাপনার চিত্র স্পষ্টীকরণের তাগিদে উদ্ধৃতির দাবী রাখে। এই আয়াতে পুণ্যময়তার সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়: "পুণ্য (বের্‌রা) নেই তোমাদের পূর্ব ও পশ্চিম দিকে মুখ ফেরানোয়; কিন্তু পুণ্য রয়েছে আল্লাহ্, আখেরাত, ফেরেশ্‌তাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের প্রতি ঈমান আনয়নে, সম্পদের মোহমুক্ত হয়ে নিকটজন, এতিম, মিসকীন, মুসাফির, সর্বহারাগণকে এবং দাসত্ব বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য প্রদানে, সালাত কায়েমে, যাকাত বিতরণে, প্রতিশ্রুতি পূরণে, অভাবে-সংকটে, দুঃখ-ক্লেশে ও প্রতিকূলতায়, ধৈর্য ধারণে। এরাই তারা, যারা সত্যপরায়ণ ও ন্যায়পরায়ণ"।

হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর সমকালে বিদ্যমান সামাজিক-রাজনৈতিক জটিল সাংঘর্ষিক পরিস্থিতির আলোকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথ অনুসরণকে শ্রেয়তর জ্ঞান করেছিলেন, যা বাস্তবসম্মত এবং আল্লাহ্ ও নবীজীর বুনিয়াদী বাঞ্ছা ও সুন্নত।

এই মদীনা সনদ ও তৎভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র ও প্রশাসন ব্যবস্থা সর্বপ্রকার বাস্তবতার নিরিখে আজো কল্যাণময় দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যক্রমের ফলিত নমুনার সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থান করছে। নবীজী (দ.) প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রের নাম ছিল দৌলতুম মদীনা বা মদীনা রাষ্ট্র (State of Medina), যা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, বসবাসকারী, বিভিন্ন পেশার কর্মচাঞ্চল্য এবং একটি সুগঠিত প্রশাসন বা সরকার ব্যবস্থায় সমৃদ্ধ। তিনি তৎকালে আদম শুমারীসহ প্রয়োজনীয় বিভিন্ন শুমারী করিয়েছিলেন প্রশাসনিক প্রয়োজনে। এই ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী প্রত্যেক ব্যক্তি ও পরিবার এই রাষ্ট্রের সমমৌলিক অধিকারসম্পন্ন বৈধ নাগরিক হিসেবে স্বীকৃতি ও প্রতিষ্ঠা পান। সকল ধর্মাবলম্বী তথা মুসলিম, খ্রিস্টান, ইহুদী, নাস্তিক, পরকালে অবিশ্বাসী, আস্তিক, পরকালে বিশ্বাসী কিন্তু নবুয়তে অবিশ্বাসী, ভোগবাদী, সন্দেহবাদী, প্রতিমাপূজক, বহুঈশ্বরবাদী [বিভিন্ন বিশ্বাস (faith) লালনকারীদের যে শ্রেণীবিন্যাস (category) আল-কুরআনে করা হয়েছে, তা ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পরিবেশন করা হয়েছে] তথা সকল শ্রেণীর মানুষের প্রাথমিক মৌলিক প্রয়োজন 'রিযিকে'র (জীবিকা) গ্যারান্টি এই মদীনা সনদে লিপিবদ্ধ করা হয়। চলমান পর্বের 'রিযিক' অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আল-কুরআনের দৃঢ়োক্তি (assertion) বিন্যস্ত করা হয়েছে। তবু বিজ্ঞ পাঠকবর্গের তাৎক্ষণিক বোধগম্যতার সুবিধার্থে সংক্ষিপ্ত পুনরুল্লেখ করা হলো : (ক) মানুষসহ সব সৃষ্টির জন্য খাদ্য সামগ্রী মওজুদ (৪১:১০): (রেখে) তিনি পৃথিবীকে বরকতময় করেছেন এবং উহাতে সব সৃষ্টির জন্য প্রত্যেকের খাদ্যসামগ্রী সঞ্চিত রেখেছেন; (খ) কাফেরের জন্যও রিযিক: (২:১২৬) যে কেহ কুফরী করবে, তাকেও কিছুকালের জন্য জীবন উপভোগ করতে

দেবো, অতঃপর তাকে দোজখের আজাব ভোগ করতে বাধ্য করবো; (গ) সর্বজনীন রিযিকের আল্লাহ্ প্রদত্ত গ্যারান্টি: (আমি) আপনার রব এদেরকেও এবং ওদেরকেও বাঁচবার সামগ্রী দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছি; আপনার রবের (পার্থিব) দান (কাহারো জন্যে) বন্ধ নহে (১৭:২০); (ঘ) মানবেতর প্রাণীদের জন্যও রিযিক: উহাতে (পৃথিবীতে) তোমাদের জন্য বাঁচার উপকরণ এবং তোমরা যাদেরকে রিযিক দাওনা তাদের জন্যও জীবিকার ব্যবস্থা রেখেছি (১৫:২০)। এ আয়াতে দুটো পৃথক শব্দের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয় : মানুষের জন্য প্রয়োগকৃত শব্দ 'বাঁচার উপকরণ (মায়ায়িশা)' এবং মানবেতর প্রাণীদের জন্য ব্যবহৃত শব্দ 'বিরাযিকীন' (তোমরা যাদেরকে রিযিক দাওনা)। পার্থিব জীবনে সকল প্রাণীর জন্য জীবিকার উপকরণ যোগানোর এমন গ্যারান্টি আল-কুরআন এবং এর ফলিত প্রক্রিয়া মদীনা সনদ ব্যতীত অন্য কোথাও পাওয়া যায়না। অন্যান্য বহুবিধ বিষয়ের সমুদ্রে ডুব না দিয়ে মাত্র এই কয়েকটা ক্ষেত্রের বিবেচনায় 'মদীনা রাষ্ট্র' নৈতিক ও ব্যবহারিক উভয় অর্থে সত্যিই বিভিন্ন বিশ্বাসের জাগতিক সৎ-সহযোগিতার আমেলবদ্ধতা (federation of faiths)। তৎকালীন মদীনার বিভিন্ন বিশ্বাস ও ধর্মাচারে নিরত গোত্র ও জনগোষ্ঠীর ধর্মীয়, সামাজিক, বিচার-আচার ব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে অর্থাৎ গোত্রীয় ইউনিট তথা ফেডারেটিং ইউনিটগুলোকে নিজস্ব ব্যাপারাদির ক্ষেত্রে স্বায়ত্ত্বশাসন অর্পণ করে সার্বজনীন বিষয়াদি তথা প্রতিরক্ষা, আর্থিক বিষয়াদি বা ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্মুক্ততা, আন্তঃ যোগাযোগক্ষেত্র কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে রাখার নীতি অনুসৃত হয়েছিল মদীনা রাষ্ট্রে সেই ৬২৪ খৃস্টাব্দে। কাল বিবর্তনে বিভিন্ন পর্যায়ে পৃথিবী এই নীতির উত্তরোত্তর ফলপ্রসূ বিকাশই প্রত্যক্ষ করেছে। মদীনা রাষ্ট্র তৎকালীন সমাজ ও পরিবেশে একটি বহুজাতিক ও বহুত্ববাদী (Pluralistic) রাষ্ট্র-সমাজের সফল দৃষ্টান্তও বটে।

এছাড়া আরো অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক উপাদান এই সনদে রয়েছে যা এই প্রতীতির যথার্থতার ভিত্তি মজবুত করে। মদীনা সনদ ব্যাপক রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রবুবিয়াত নীতির প্রয়োগের প্রথম দৃষ্টান্তও বটে।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা বেলায়তে মোত্লাকা এই রাষ্ট্রতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক দর্শন ও আদর্শই লালন করে এবং সংঘাত বিক্ষুব্ধ এই একবিংশ শতাব্দীতে এই নীতি অনুসরণের মাধ্যমেই বিশ্বশান্তি, সমৃদ্ধি ও সামগ্রিক কল্যাণের সূত্র নিহিত বলে বিশ্বাস করে।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. The Story of Philosophy, Will Durant.

২. পৃ: ২৩, তৃতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ: ৬৬-৬৭ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, (বেলায়তে মোত্লাকা যুগ পরিবর্তিত)।

৩. মায়ারেফাত: আল্লাহ্র পরিচয় জ্ঞানকে মায়ারেফাত বলে। মূল ধাতু 'উরফুন', অর্থ জানা। কোন কিছুর প্রকৃতি ও সত্তা জ্ঞাত হওয়া, পরিচয় লাভ করার অর্থ মায়ারেফাত। এ প্রসঙ্গে এই হাদিসে কুদসী প্রণিধানযোগ্য: 'আমি যা প্রত্যক্ষ করেছি (আহ্ওয়ালী) তা হাকিকত এবং যা চিনেছি (ইরফানী), তা মায়ারেফাত।" এই হাদিস শরিফের অন্যতম তাৎপর্য এই যে, নবীজী (দ.) শরিয়ত ত্বরিকত, হাকিকত ও মায়ারেফাতের কৌটা। মায়ারেফাতের অন্তর্গত বিষয় হলো: (ক) আত্মদর্শন বা আত্মার পরিচয় (আলম-ই-আমর), (খ) আল্লাহ্ তত্ত্ব (জাত ও সিফত জ্ঞান), (গ) সৃষ্টি রহস্য অর্থাৎ মাখলুকাতের সম্যক পরিচয় জ্ঞান বা আউয়াল, আখের, যাহির, বাতেনের (চার আকসাম) কালিক জ্ঞান তথা সমগ্র বিশ্বের মূলসত্য প্রত্যক্ষণ তথা উলুহিয়াত (প্রভুত্ব), রবুবিয়াত (অজেয় যাতের অসীমত্ব, পালনতত্ত্ব) ও আবুদিয়াতের (আনুগত্য বা দাসত্ব) মর্ম উপলব্ধি। আহাদিয়াত, ওয়াহাদাত, ওয়াহেদিয়াতের স্বতঃসিদ্ধ (axiom) সূত্র ধরে সৃষ্টির স্রোতধারা, লাওহে মাহফুজে সংরক্ষিত আল-কুরআনের প্রকৃত স্বরূপ প্রভৃতি বাতেনী জ্ঞান; (ঘ) তকদীর রহস্য, (ঙ) পরকাল রহস্য আলম-ই-বরযখ, হাশর (সম্মিলন), কিয়ামত (পুনরুত্থান), বিচার, বেহেশ্ত-দোযখ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। নবীজীর (দ.) মিরাজ তাঁর 'পরম মায়ারেফাত অর্জনের অনুষ্ঠান' বটে। "Miraj is a unique experience of the holy Prophet Muhammed (sm) of going back to the very root of the creation for the time being during his life time". স্বীয় অস্তিত্বের শেকড় সন্ধানের সাধনায় নিয়োজিত নবীজী (দ.) এই মিরাজের মাধ্যমে উপনীত হন শেকড়ের উপান্তে। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য কুরআনের আয়াত "ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন"। এ আয়াতের বাস্তব গূঢ়ার্থ হলো: প্রত্যেক বস্তু তার মূলের দিকেই ফিরে যায়। নবীজীকে (দ.) আল্লাহ্ এই বাস্তবতাই প্রত্যক্ষ করিয়েছেন। প্রত্যেক প্রাণী, বৃক্ষ, বস্তু তথা সৃষ্টির উদ্ভবের প্রক্রিয়া তথা নিদর্শন নিবিষ্ট চিত্তে, অভ্রান্ত ও স্থির লক্ষ্য দৃষ্টিতে তিনি অবলোকন ও হৃদয়ঙ্গম করেন (৫৩:১৪-১৮)। তাঁর একটা মুনাজাত : প্রভু! 'বস্তুকে তার আপন স্বরূপে আমাকে দেখান।' প্রকৃতপ্রস্তাবে মায়ারেফাতের পরম স্তর এটাই বলে বিজ্ঞজনদের অভিমত। "Of course, it is only one of multi-dimensional experiences of the Prophet (sm) what he obtained in or during the Isra and Miraj" উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানুষ নিজের জন্মের উৎস সন্ধান এবং প্রত্যেক প্রাণ-সত্তা, বৃক্ষ, বস্তুর উদ্ভব বা সৃষ্টির প্রক্রিয়া অনুধাবনের যোগ্যতা অর্জন করতে পারলে সমকালেই প্রত্যক্ষ-প্রামাণ্য সাক্ষ্য-প্রমাণপুষ্ট মিরাজের ঐতিহাসিক বাস্তবতা কিঞ্চিৎ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব।

৪. নবম অধ্যায় এবং অধ্যায়ের ৬ষ্ঠ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৫. বেলায়তে মোত্লাকা: খাদেমুল ফোক্বারা মওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী : নবম পরিচ্ছেদ, ফজিলতে রব্বানী, পৃ: ১০৩।

৬. ইবিড দশম পরিচ্ছেদ, পৃ-১১৬, ১১৭।

৭. ইবিড দশম পরিচ্ছেদ পৃ: ১১৬, ১১৭।

৮. ইবিড দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, পৃ: ১৩১।

৯. এ প্রসঙ্গে গত শতাব্দীর বিশ্বনন্দিত পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের cosmological constant (মহাজাগতিক ধ্রুবক বা অপরিবর্তনীয়তা) তত্ত্ব স্মরণযোগ্য। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে নির্মিত এই পদার্থ বিজ্ঞানীয় তত্ত্বে তিনি বলেন, "এই মহাজগতের মূল চালিকা শক্তির কোনও বিনাশ নেই। এই শক্তি অবিনাশী। বিশ্বজগত যতোই ফুলে-ফেঁপে উঠে প্রসারিত হোক না কেন, সেই আদি, অনন্ত, চালিকা শক্তির ঘনত্ব (density) বহু আগেও যা ছিল, এখনো তাই আছে, পৃথিবীর মানুষের হিসাবে কোটি কোটি বছর পরেও তা একই থাকবে। যাকে আমরা আমাদের দৃশ্যতঃ মহাশূন্য বলে জানি, তা আসলে শূন্য নয়। সেখানেও উপস্থিত সেই অবিনাশী অদৃশ্য শক্তি, যা আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আমাদের চোখে প্রতিভাত 'শূন্য' প্রকৃত প্রস্তাবে খালি (vacant) নয়। ০৬-০৮-২০১৭ ইং প্রকাশিত আমেরিকার 'ফের্মিল্যাব' প্রণীত dark energy survey report-ও এই তত্ত্বকে সমর্থন করেছে। এই তত্ত্বের ত্রুটি আছে কিনা, তা নিরীক্ষা করতে গিয়ে তাঁরা এই উপসংহারে উপনীত হন। এই রিপোর্টের নাম 'dark energy survey year one result: cosmological constrain.s form galaxy clustering and weak lansing'. বৃটিশ পদার্থবিদ পল ডেভিস প্রণীত পুস্তক 'The mind of God /the scientific basis for rational world' প্রকাশিত হবার পর শব্দটা বহুল পরিচিত হয়। বলা হয় যে, আইনস্টাইন 'গড্-এর মন' পড়তে পেরেছিলেন। ২০১২ সালের দিকে 'প্ল্যাঙ্ক' উপগ্রহের উপর পরিচালিত এক জরীপে দেখা যায়, আইনস্টাইনের পূর্বাভাস সঠিক ছিল। আইনস্টাইনের চিন্তার ভুবন নির্মাণে তৌরাতে বর্ণিত ডেভিড বা হযরত দাউদের (আ.) বিভিন্ন উক্তি উপাদান হিসেবে কাজ করেছে বলে তাঁর বিভিন্ন লেখা থেকে প্রতীয়মান হয়। এখানে আল-কুরআনে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে বর্ণিত আসমান ও জমিনের 'নূর' বা আলোর প্রসঙ্গটি দর্শন-বিজ্ঞানের আলোচনার ভুবনে ঢুকে পড়ে। উল্লেখ করা অসঙ্গত হবে না যে, হযরত ইবনুল আরাবী (র.) তাঁর ওয়াহদাতুল ওজুদ থিওরী সপ্রমাণে গাণিতিক পদ্ধতিরই আশ্রয় গ্রহণ করেন। এদিকে পদার্থ বিজ্ঞান ও মহাকাশ বিজ্ঞান জানাচ্ছে যে, গ্যালাক্সিতে নতুন নতুন গ্রহ জন্ম নিচ্ছে। পৃথিবীতে যত বালুকণা আছে, আসমানে তার চেয়ে বেশী তারা-নক্ষত্র থাকার সম্ভাবনাই বেশী। আমাদের গ্যালাক্সী বা ছায়াপথে বিশ হাজার কোটির বেশী তারা থাকতে পারে বলে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী গ্যারি গিলমোর জানিয়েছেন মর্মে বিবিসি ২৯-০৭-২০১৮ ইং এক প্রতিবেদন প্রচার করে। অতএব, মানুষের ধারণাতীত মহাজগৎ ধারণার বাইরেই থেকে যাচ্ছে। বিজ্ঞানের সূত্রগুলো আল-কুরআনের শিক্ষার যথার্থতারই সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়াচ্ছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

১০. নবীজীর (দ.) প্রতি নাযিলকৃত সর্বশেষ আয়াতে 'আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন পূর্ণ করলাম (৫:৩)' বাক্যটা প্রয়োগ করা হয়েছে। 'আজ' শব্দটার ইঙ্গিত শুধু নবীজীর (দ.) জামানার প্রতিই নয়, বরং নবুয়তি ধারার সূচনা থেকে ক্রমবিবর্তিত অতীত এবং অনাগত ভবিষ্যতের প্রতিও, অর্থাৎ মানবজাতিকে সেই শুরু থেকে অনাগত ভবিষ্যৎ পর্যন্ত একই সূত্রে গ্রথিত করে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান মানব সমাজ ও পৃথিবী এবং মহাজগৎ হাজার হাজার বছর ধরে বিবর্তনের পথ ধরে এগুচ্ছে এবং উন্নততর অবস্থান্তর প্রাপ্ত হচ্ছে। আল-কুরআনেও অন্তহীন বিবর্তনশীলতার কথা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে (১৪:৪৮)। হাজার হাজার বছর ধরে ধাপে ধাপে মানুষের চেতনা ও জ্ঞানের বিকাশের সাথে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন নবীর কাছে পর্যায়ক্রমে (২:৮৭) প্রেরিত ওহীর পূর্ণাঙ্গতা ঘোষণা করা হয়েছে এই সর্বশেষ আয়াতে। এই আয়াত মানব-সমাজের কর্ম-বিধান প্রক্রিয়ার অতীত ভার্সানগুলোর প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করছে এবং শাশ্বত ভারসাম্যপূর্ণ নীতিমালার প্রতি মানব সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এখানে আরো লক্ষ্যণীয় যে, আল-কুরআনের অপরাপর আয়াতের মতো এই আয়াতের লক্ষ্যও গোটা

মানব সমাজ। আর নবীজীর বিদায়ী ভাষণের সর্বশেষ শব্দ দুটো : 'হে মানব জাতি! স্বস্তিতে থাকুন, 'হে মানব জাতি! স্বস্তিতে থাকুন' [আস্-সাকিনাত্ আইয়ুহান্নাস, আস্-সাকিনাত্ আইয়ুহান্নাস]। সহীহ্ বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ সূত্রে-আল্লামা কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মানসুরপুরীর (র.) 'রহমাতুল্লিল আলামিন', আল্লামা শিবলী নোমানীর (র.) সীরাতুন্নবী (দ.), আল্লামা সুলায়মান নদভী (র.) এবং বিগত শতাব্দীর শেষার্ধে প্রথিতযশা বিদ্বজনদের দ্বারা বাংলা ভাষায় রচিত সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থসমূহে দ্রষ্টব্য। আল-কুরআন ও নবীজীর (দ.) এই সর্বকালীন বিশ্বজনীনতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়, যা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের অন্যতম ভিত্তিভূমি।

১১. এই আয়াতের কিছু বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ : (ক) সকল প্রশংসা জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ্রই (আল-কুরআনুল করীম, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা), (খ) সকল প্রশংসা আল্লাহ্র প্রতি, যিনি মালিক সমস্ত জগদ্বাসীর (কানযুল ইমান ও খাযাইনুল ইরফান, অনুবাদঃ মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান, চট্টগ্রাম, ১৯৯৫ ইং), (গ) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা (কুরআনুল করীম, মুফতী মুহাম্মদ শফী, বঙ্গানুবাদঃ মওলানা মুহিউদ্দীন খান, ১৪১৩ হিজরী, মদীনা মোনাওয়ারা), (ঘ) সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্তায়ালার জন্য যিনি বিশ্বজগতের প্রতিপালক, (বঙ্গানুবাদঃ মওলানা মোস্তফিজুর রহমান; এম. এম. লালবাগ, ঢাকা); সন উল্লেখ নেই (৪) সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্তায়ালার জন্যে– তিনি সৃষ্টিকুলের মালিক (বঙ্গানুবাদ, হাফেজ মুনির উদ্দীন আহমদ, আল-কুরআন একাডেমী, লণ্ডন, ২০০৭), (চ) বিশ্ব-পালক পরমেশ্বরেরই সম্যক প্রশংসা। (অনুবাদঃ ভাই গিরিশ চন্দ্র সেন, ১৮৮১ ইং, শেরপুর, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ), (ছ) সকলি বিশ্বের স্বামী আল্লাহ্র মহিমা/করুনা কৃপার যাঁর নাই নাই সীমা/ বিচার দিনের বিভু! (কাজী নজরুল ইসলাম, কাব্য আমপারা, ১৯৩৩ ইং কলিকাতা); (জ) Praise be to God, The Cherisher and Sustainer of the world (trans: Abdullah Yusuf Ali; Lahore, 1934) (ঝ) Praise be to Allah, Lord of the Worlds (tran: Muhammed Marmaduke Pickthal, London, Newyork, Hydrabad. 1930) (ঞ) Praise belong to God. the Lord of all Being. (tran. A. J. Arberry. Newyork, USA, 1955) (ট) All types of perfect praise belong to Allah, alone (tran. Mohammad Zafarullah khan, Great Britain, 1970) (ঠ) (All) Praise is due to Allah, the Lord the Worlds (Tran. Maulavi Muhammed Ali, Woking, Surrey, England, (ড) All Praises and thanks be to Allah, the Lord of the Universe (Trans: Dr. Shehnaz Shaikh M.B.B.S. MD; Ms. Kausar Khatri, B. Com. B-Ed. New Delhi, 2007 এবং ১৪জন পিএইচডি, স্কলার, শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ কর্তৃক নিরীক্ষিত)।

জ্ঞানের আধুনিক কৌশল ও পদ্ধতির অগ্রগতির সাথে সাথে সমকালীন মক্কা ও মদীনায় কুরআনে ব্যবহৃত শব্দগুলোর অর্থ, ব্যঞ্জনা ও তাৎপর্য অনুসন্ধান এবং গবেষণাক্রমে ক্রমউন্নততর পরিভাষা নির্ণয়ের সাধনা অব্যাহত আছে। তবে এটাও বাস্তবতা যে, আল-কুরআনের এ ধরনের বহু আয়াত ও শব্দ সহস্রাধিক বছর ধরে বাংলা অঞ্চলের মানুষের নিত্যব্যবহার্য শব্দ হিসেবে বাংলা ভাষা ও বাগধারার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে।

১২. গঠনতন্ত্রঃ আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী (১৩৭৬ বাংলা, ১৯৬৯ ইংরেজী), পৃঃ

১৩. ইবিড, পৃঃ-১

১৪. সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী : বেলায়তে মোত্লাকা, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ

১৫. সূত্রঃ তফসীর মাআরেফুল কুরআনঃ মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শাফী (র.), বাংলা অনুবাদঃ মওলানা মুহিউদ্দীন খান।

১৬. (ক) সৈয়দ মুজতবা আলী, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা, বই ঘর, চট্টগ্রাম, ১৩৬৩ বাংলা, পৃঃ ৫৬ঃ "বিশেষ করে ইসলামই পার্থিব বস্তুর ভাগ-বাটোয়ারা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন। কুরআন শরিফ ধন-বণ্টন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করেন এবং সে বিষয়ে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেন। মহাপুরুষ মুহাম্মদের (দ.) সঙ্গে মক্কাবাসীর দ্বন্দ্ব হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ পার্থিব বস্তুর নবীন বণ্টন পদ্ধতি নিয়ে। 'সাইল' অর্থ ভিখারী নয়, সাইল বলতে আজকাল আমরা ইংরেজীতে 'হ্যাভ নট' (have-not) বলতে যা বুঝি তাই। 'সাইলকে বিমুখ করোনা' এই আদেশ মক্কার ধনপতিগণ গ্রহণ করতে কিছুতেই সম্মত হয়নি, অথচ এই নবীন পদ্ধতি দুঃস্থ, নিপীড়িত বিত্তহীনদের প্রাণে নতুন আশার বাণী এনে দিয়েছিল। ফলে দেখতে পাই, মহাপুরুষের প্রথম শিষ্যদের মধ্যে বিত্তহীন ও দাসের সংখ্যা বেশী।"

(খ) Karen Armstrong. Muhammed, Prophet for our time, 2007, London. chap. one.

১৭. সূত্রঃ মাযহারী; এই হাদিস শরিফ বিভিন্ন তফসিরে প্রাসঙ্গিকভাবে উদ্ধৃত হয়েছে।

একাদশ অধ্যায়

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের ধর্মসাম্য ও ধনসাম্য প্রসঙ্গ

'বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী' কার্যতঃ ইসলাম ধর্মের নীতি ও সূত্র অনুযায়ীই সর্বজনীন পার্থিব সমতাবাদ, অসাম্প্রদায়িকতাবাদ, বর্ণ-সাম্যবাদী আদর্শের আধার। এতে ধর্মবিশ্বাস নির্বিশেষে সকলের সমমর্যাদা ও অধিকার অলংঘ্যণীয় বিধায় এটাকে সহজ ভাষায় 'ধর্ম-সাম্য' (ধর্ম পালন ক্ষেত্রে সাম্য যা, মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস পদ্ধতিতে গঠিত শব্দ) হিসেবে বর্ণনা করা যায়। সকল বিশ্বাসের (faith) প্রতি, বিভিন্ন ধর্ম অনুসারীর প্রতি আল-কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী সহনশীল বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গী বাস্তবে ধর্ম-সাম্যেরই পরিচায়ক এবং তা কোন ক্রমেই ধর্ম বিশ্বাসগুলোর সংমিশ্রণ বা ককটেল নয়। কুরআনেই বলা হয়েছে; 'ধর্ম বিশ্বাস যার যার' (১০৯:৬)। এ বিষয়টা আরো খোলাসা করা হয়েছে এভাবে: "আর যদি তারা তোমাদেরকে আমার সাথে এমন কোন বস্তুকে শরীক করতে চাপ দেয়, যার সম্বন্ধে তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই, তবে কিছুতেই তোমরা তাদের কথা মানবেনা এবং পার্থিব ব্যাপারে তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করবে; আর যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ চিত্তে আমার অভিমুখী হয়, তোমরা তার পথের তাবেদারী করবে; অবশেষে তোমরা আমারই নিকট ফিরে আসবে, তখন আমি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবো (৩১:১৫) [তুল্য: ৪২:১৫]। উপরন্তু ধর্মে জবরদস্তি নেই বলে ঘোষণা করা হয়েছে (২:২৫৬]। বর্ণিত উক্ত চার আয়াতে পার্থিব বিষয়ে মুসলিম ও অন্যান্যদের মধ্যে জাগতিক সার্বিক সম্পর্কের মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে।

এই মূলনীতির রূপায়ন ঘটে বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী প্রসূত মদীনা সনদে, যার ফলিত সূত্র হলো: "ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মাচার যার যার; তবে রাষ্ট্র সম্মিলিতভাবে সবার। এর পাশাপাশি রাষ্ট্রের প্রশাসন হবে জনগণের সম্মতিপুষ্ট এবং জনগণের কল্যাণের জন্য।" পাশ্চাত্যের আধুনিক রাষ্ট্রদর্শন (জন লক, রুশো, ভল্টেয়ার প্রমুখ প্রসূত) যে ধরণের কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা দিয়েছে এবং আব্রাহাম লিঙ্কন ১৮৬৩ খৃঃ ১৯ নভেম্বর গ্যাটিসবার্গ বক্তৃতায় ইপ্সিত গণতান্ত্রিক সরকারের যে সূত্র তুলে ধরেছিলেন, তার প্রথম নীতিগত উদ্ভব ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ইতিহাস প্রত্যক্ষ করেছে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় দশক অর্থাৎ ৬২০ এর দশকে মদীনায়। একেবারে সাধারণ উম্মি বা গণমানুষদের নিয়ে গঠিত মদীনা রাষ্ট্র সকল অর্থেই হয়ে উঠেছিল 'ফেডারেশন অব

ফেইথস' বা ধর্ম-বিশ্বাসসমূহের ফেডারেশন, যেখানে সবাইকে অভিন্ন সমতলে স্থাপনপূর্বক সমমর্যাদাসম্পন্ন মানুষ হিসেবেই বিবেচনা করে অভিন্ন মানব-সমাজ গঠনের শিক্ষা দৃষ্টান্তসহকারে দেওয়া হয়েছে। পার্থিব ঋণবনের আস্তিক্যবাদ, নাস্তিক্যবাদ, পৌত্তলকিতাবাদ, সংশয়বাদ সব কিছু এখানে এই সনদের মহা-মানবিক-সাগরে একাকার। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ভাষায় 'মাইজভাণ্ডার শরিফ প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাসরূপী' মহাবৈশ্বিক মানবিক সাগরেরই হলোগ্রাম, 'মানুষ' ছাড়া অন্য পরিচয় অমুখ্য। পৃথিবীতে, প্রকৃতিতে, সম্পদরাজিতে সবার সম ও অভিন্ন অধিকার। বিচার-সাম্য (আদলে মোত্লাক) এই রাষ্ট্র-প্রকল্পের মানবিক, নৈতিক, সামাজিক ও প্রশাসনিক লক্ষ্য। পার্থিব কর্মফলের বিচার ও প্রতিফল পরকালে আল্লাহু রাব্বুল আলামিনের এক্তিয়ারে রেখে দেওয়া হয়েছে।

বহুত্ববাদিতার (pluralism) যে বাস্তব দৃষ্টান্ত মদীনা সনদের ভিত্তিতে গঠিত রাষ্ট্রে প্রদান করা হয়েছে, তার মূল উপাদান: (ক) সার্বজনীন রবুবিয়াত বা পালনবাদ, (খ) মানুষের পছন্দ বা নির্বাচনের (selection, choice) স্বাধীনতা এবং (গ) সে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখার গ্যারান্টি। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে যন্ত্র বিজ্ঞানের উন্নতিসঞ্জাত শিল্প বিপ্লবের আবহে পরিবর্তিত মানব-সমাজে যে প্রকার সরকার ব্যবস্থাগুলো গড়ে উঠে, সেগুলোকে সাধারণভাবে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক, সোশ্যালিস্ট, কমিউনিস্ট আদর্শে বিমণ্ডিত প্রশাসন পদ্ধতি বলা যায়। কিন্তু কালক্রমে বাস্তবায়ন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বুর্জোয়া গণতন্ত্র ধনিক গোষ্ঠীর ক্ষমতা ও বিত্ত পুঞ্জীভবনের সিন্ডিকেটে পর্যবসিত হয়েছে, সমাজতান্ত্রিক সরকারগুলো যান্ত্রিক ডিক্টেটরশীপে পরিণত হয়ে গেলো, যা শেষ পর্যন্ত ঠেকানো যায়নি। ব্যক্তি তথা শ্রমিকের আন্দোলন করার আইনগত অধিকারও রইলোনা, 'শ্রমিক শ্রেণীর শাসনের' কথা সরবে বলা হলেও এমনকি তাত্ত্বিকভাবে শ্রমিকতন্ত্রও (syndicalism)[১] প্রতিষ্ঠিত হলোনা; শেষ পর্যন্ত 'সর্বহারার এক-নায়কত্বের' (dictatorship of the proletariat) ব্যানারে নিষ্ঠুর রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ চেপে বসলো। দলীয়, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাধারীরা হয়ে বসলো সর্বময় অধিকর্তা, প্রবর্তিত হয় এক ধরনের এলিটবাদ, যেখানে প্রতিবাদের, অসন্তোষ প্রকাশের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের পুঁজিতন্ত্রের শোষণের চেয়েও নির্মম শোষণ চেপে বসলো এসব অধঃপতিত কথিত নামসর্বস্ব সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে লাগামহীন দুর্নীতি এখানে কদর্য অথচ মুখ্য বৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বহুত্ববাদ দূরে থাক, ন্যূনতম ব্যক্তি স্বাধীনতাও এখানে অনুপস্থিত। অনেক কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধঃপতনের পর সেখানে নতুনভাবে ভয়ংকর পুঁজিতন্ত্রী অক্টোপাশের ঘাঁই দেখা যাচ্ছে। অনেক কথিত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কঠোর নিষ্ঠুর 'বংশানুক্রমিক ডিক্টেটরশীপ' ছাড়া নতুন কোন নেতৃত্বেরও উদ্ভব ঘটাতে

পারেনি। বিংশ শতকের এসব কথিত সোশ্যালিস্ট ডিক্টেটরদের শাসনের নির্মমতা রাজতন্ত্রের নিষ্ঠুরতাকেও হার মানিয়ে দিয়েছে।

এদিকে যেসব দেশে ভোটের গণতন্ত্র প্রচলিত আছে, সেসব দেশেও সামাজিক সুবিচারমূলক সমতাবাদ অনুপস্থিত। আর্থিক ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বাস্তবে দৃশ্যমান নয়। দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী, আর্থিক অনটন-অভাবে ক্লিষ্ট মানুষ, কৃষি কাজে সংশ্লিষ্ট লোকেরা প্রতি মুহূর্ত কাটায় নিরুপায় অবস্থায়। তারা শুধু ভোট দিয়ে শাসক, প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে। কিন্তু তাদের জীবন-যাপনের সমস্যার কোন নির্ভরযোগ্য সমাধান তাদের নাগালের বাইরে। শুধুই ভোটের গণতন্ত্রের এই কায়দায় অর্থ-বিত্ত ও সামাজিক-কূটনীতির কৌশলে এক এক পর্যায়ে এক এক গ্রুপ রাষ্ট্র ও আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা করায়ত্ত করতে সক্ষম হয় এবং তারা সমাজে 'এলিট'[২] হিসেবে নিয়ন্ত্রণের সারেঙ-সুকানী হয়ে বসেন। পালাক্রমে এই নিয়ন্ত্রণের হাত-বদল হয়। এক পর্বের এলিট শ্রেণী অন্য এলিট শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রণচ্যুত করে নিজেরাই কাণ্ডারী হয়ে বসেন। ইটালীয় রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ ভিনফ্রেডো প্যারেটো (১৮৪৩-১৯২৩) এবং গায়টানো মস্কা এটাকে 'এলিট থিওরী' (elite theory), এলিটবাদ, বা নয়া অভিজাতবাদরূপে বিন্যস্ত করেছেন।[৩] এই থিওরী শুধুমাত্র ভোটবাজী সর্বস্ব গণতন্ত্রের ফাঁক-ফোকড় নির্দেশ করে।

এলিট থিওরী এশিয়ার বিভিন্ন দেশে শুধুমাত্র ভোট-নির্ভর কেতাবী গণতান্ত্রিক দেশেও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কার্যকর হতে দেখা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এক শ্রেণীর নেতা রাজনৈতিক আসনগুলোতে ঘুরে ফিরে নিজেদের ব্যক্তি ও পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখছে। এতে করে এক-একটি পারিবারিক-রাজনৈতিক এলিট গ্রুপ তৈরী হয়ে যাচ্ছে এবং বহু ক্ষেত্রে যোগ্যতা ও জনগণের বিকল্প নির্বাচন বা পছন্দের সুযোগ ক্ষীণ হয়ে আসছে। বহু পরস্পরবিরোধী বিতর্ক জর্জরিত এই 'এলিটবাদ' এখন গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, কমিউনিজম, ধর্মতন্ত্র তথা বিভিন্ন সমাজে, বিভিন্ন কালে পোশাক-বদলিয়ে সমাজের চাবুক হাতে নিয়ে বসে থাকে ও থাকছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেমন 'শ্রমদাস প্রথা' কার্যতঃ জগদ্দল পাথরের মতো সমাজে চেপে আছে, তেমনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও 'রাজনৈতিক দাস বা গোলামদারী' প্রথা আপতিত হয়েছে।

তবে মদীনা সনদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কিন্তু কোন অবস্থাতেই কোন বিশেষ সুবিধাজাত এলিট শ্রেণী সৃষ্টির সপক্ষে নয়। নবীজীর (র.) বিখ্যাত হাদিস : "কোন সীজারের অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়" (বুখারী)। এতে এই শাশ্বত বার্তাই নিহিত। মদীনা সনদের পর দীর্ঘ ১৩ শতাধিক বছর অতিবাহিত হয়েছে। রাজতন্ত্র-আমীরতন্ত্র মুসলিম সমাজে চেপে আছে। ইসলামের শাশ্বত লোকমুখী প্রশাসন পদ্ধতির সমকালীন চাহিদানুগ বিকাশের কোন উদ্যোগ খোলাফায়ে রাশেদার পর রাষ্ট্রীয়ভাবে নেয়া হয়নি। ব্যক্তিগত

পর্যায়ে যেসব মহান মনীষী সাধারণতান্ত্রিক-গণতান্ত্রিক-আর্থিক কল্যাণমুখী বহুত্ববাদী ব্যবস্থার কথা বলেছেন, তাঁদেরকে নানাভাবে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে।

মুসলিম সামাজিক, রাষ্ট্রিক ইতিহাসের এই অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্বলতা বিংশ শতাব্দীর ভারতের অনেক দূরদর্শী সমাজ-সাধকের ন্যায় অছিয়ে গাউসুল আযমেরও নজর এড়ায়নি। তাঁর এই বেদনা 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থের একাধিক অধ্যায়ে সমাজ-চিন্তনমূলক অনুচ্ছেদগুলোতে ব্যক্ত হয়েছে। একই সাথে তিনি আবেদন রেখেছেন, বিচার-সাম্যভিত্তিক সমতাবাদী, বহুত্ববাদী শান্তিপূর্ণ বিশ্বমানব-সমাজ বিনির্মাণের জন্য আল-কুরআন ও হাদিসের মূল শিক্ষানুগ রাষ্ট্রনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতিমালা প্রচার ও অনুশীলনের, যা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তেরও সামাজিক ভিত্তি।

মানব সমাজের অন্যতম অভিজ্ঞতা এই যে, আর্থিক ক্ষেত্রে সমতাবাদী, জীবিকা, রুজী-রোজগারের পথে বৈষম্যহীন সুযোগ এবং প্রয়োজনীয় অভাব মেটানোর ও নিশ্চিত সদুপায় ধর্ম-বৈষম্য বিলোপের সুযোগ সৃষ্টি করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পরিবেশের আবির্ভাব ঘটায়। ধন বৈষম্যের অনুপস্থিতি ধর্ম-সাম্যের সামাজিক আবহ রচনায় সহায়ক। অছিয়ে গাউসুল আযমের ভাষায়: (বেলায়তে মোত্লাকা) ধনতন্ত্র ও নাস্তিক্যবাদের মূল উৎপাটনকারী, ধনসাম্যে উৎসাহী বিশ্বশান্তির প্রতীক।[৪]

টীকা : তথ্য সূত্র

১. শ্রমিকতন্ত্র: রাজনৈতিক ক্ষমতা শ্রমিক সংগঠনগুলোর হাতে থাকবে এবং এই সংগঠনগুলোর সদস্যরা যেসব কল-কারখানায় কাজ করে, তাদের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা তাদের হাতেই থাকবে–এই মতবাদ।

২. Elite, ক্ষমতা, সুযোগ-সুবিধার কারণে সমাজে উৎকৃষ্ট হিসেবে বিবেচিত শ্রেণী।

৩. Elite and Society: T. B. Bottomore, USA.

৪. সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, বেলায়তে মোত্লাকা, দ্বাদশ পরিচ্ছেদ 'সুফি সভ্যতাই দিশারী' অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রাচীন ভারতে ধর্ম-চিত্র : একমেবাদ্বিতীয়ম্-পৌত্তলিকতাবাদ-নাস্তিক্যবাদ

[হিমালয়ান উপমহাদেশের পরস্পর সন্নিহিত দেশ ও ভূখণ্ড হিসেবে বাংলাদেশ ও ভারতের ধর্ম-দর্শন, আচার প্রভৃতি পরস্পরের পরিচিত। বৈদিক দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, আল-কুরআনের দর্শন ও বিধান এই অঞ্চলে নিজ নিজ পরিমণ্ডলে স্বকীয়ভাবে বিরাজমান। এ গ্রন্থে পরিবেশিত বিভিন্ন দর্শনের অবস্থানের সমীক্ষণবাদী পর্যবেক্ষণের প্রয়োজনে হাজার হাজার বছরের সমৃদ্ধ ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের উপর কিঞ্চিৎ আলোক সম্পাত করা হলো, মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে যা উপেক্ষণীয় নয়, বরং জ্ঞান ও দর্শন চর্চার আবশ্যকীয় অনুষঙ্গ।]

১. প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম দর্শন, ধর্মচার, ধর্মমত সংক্রান্ত যে সব তথ্য প্রামাণ্য গ্রন্থগুলোতে লিপিবদ্ধ হয়েছে; তাতে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ম্বাদ এবং কল্পিত সাকার পূজার দুটো ধারা এই অঞ্চলে গড়ে উঠে। একই সাথে চার্বাকীয়দের মতো নাস্তিক্যবাদী ধারাও সৃজিত হয় বিশেষ করে যাজক শ্রেণীর ধর্মাচারনামীয় বাড়াবাড়ির প্রতিক্রিয়া হিসেবে। তবে 'ধর্মাচারে' পৌত্তলিকতার বর্ণাঢ্য উপস্থিতি থাকলেও 'ধর্ম-দর্শনে' 'নিরাকার একমেবাদ্বিতীয়ম্বাদই' মূলধারা হিসেবে প্রকট হয়ে উঠে এবং তৎকালীন বাস্তব সামাজিক-আর্থিক পরিবেশ, চিন্তা-চেতনার স্তরের সাথে সঙ্গতি রেখে চমৎকার দর্শন গড়ে উঠে, যার মূল চেতনা নির্গুণ ব্রহ্মাশ্রিত একেশ্বরবাদ। অবশ্য ভারতীয় মিথলজিক্যাল দেব-দেবীদের সাথে গ্রীক/স্কান্ড্যানেভিয়ান মিথলজ্যিকাল গড-গডেসদের কাজ-কর্ম-নৈতিকতা, কামনা-বাসনা-হিংসা-দ্বেষ-ক্রোধের মতো সাধারণস্তরের মামুলী মানবিক আচরণের সামঞ্জস্য লক্ষ্যণীয়, যা মূলতঃ মানবিক চরিত্র বিশিষ্ট অবয়বে দেবত্ব (anthromorphism) আরোপ এবং তাকে পূজ্য বা উপাস্যে পরিণত করা। আরো একটা বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, সাধারণভাবে যাদেরকে 'ঋষি বা মুনি' হিসেবে ভূষিত করা হয়, তাঁরা কিন্তু মূলতঃ যুগন্ধর দার্শনিক ও বহু জ্ঞানে জ্ঞানী, বিদ্বজ্জন।

২. 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' প্রসঙ্গঃ

সামগ্রিক ভারতীয় দর্শন ঐতিহাসিকভাবে গ্রীক দর্শনের পূর্বসূরী হিসেবে প্রতিভাত হয়। ক্ষেত্র বিশেষে অনেক সূক্ষ্মতর বিষয়ে ভারতীয় দর্শনে অধিকতর শাণিত মেধার পরিচয়

মিলে। "মহান ভারতীয় দার্শনিক, ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ভারতরত্ন ড. সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ সম্পাদিত 'Indian Philosophy : Eastern and Western' গ্রন্থের সূচনায় ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী মওলানা আবুল কালাম আজাদ আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়েছেন যে, দর্শনের জন্ম গ্রীসে হয়নি। দর্শনের জন্ম হয়েছে ভারতবর্ষে। তিনি আরো বলেছেন, পাশ্চাত্যে দর্শন যখন হাঁটি হাঁটি পা পা করে, তখন ভারতে দর্শন কৈশোরে উপনীত হয়েছে" [প্রফেসর কাজী নুরুল ইসলাম, প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাক বিশ্ববিদ্যালয় মুখবন্ধ; ভারতীয় দর্শন ও নাস্তিক সম্প্রদায়; প্রফেসর মোঃ মাহবুবুর রহমান, ডিসেম্বর ২০১৪, ঢাকা]। অবশ্য প্রত্যক্ষ জাগতিক লোক হিতৈষণা ও প্রশান্তিমূলক পার্থিব জীবনবাদী দর্শনের উদ্ভব তখনো ঘটেনি বলে তাঁদের কাছে দৃশ্যমান পৃথিবীর চেয়ে অদৃশ্য তাত্ত্বিক বিষয়াদি ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ, যেমনটা পরবর্তীকালে এক শ্রেণীর খ্রিস্টীয় ও মুসলিম অতীন্দ্রিয়বাদীর মধ্যে দেখা যায়। তৎকালীন দর্শনশাস্ত্রে সামষ্টিক লোককল্যাণ ভাবনা ছিল গৌণ, যা ইতিহাসের প্রগতিশীল বিবর্তনের পথ ধরে যীশু, হযরত মোহাম্মদ (দ.), যন্ত্রশিল্প যুগে মার্কস প্রমুখের কল্যাণে সম্মুখভাগে আসে।

মহাভারত রচয়িতা বেদব্যাসের কৈফিয়ত: "ব্রাহ্মণ্য ধর্মে পরমেশ্বরের নানা প্রকার রূপ কল্পনা করা হইয়াছে বলিয়া যারা হিন্দুদিগকে পৌত্তলিক বলেন, তাঁহাদের অবগতির জন্য ব্যাসদেব পুরানাদি রচনা করার পর ভগবানের নিকট যে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল:-

"রূপং রূপ বিবর্জ্জিতস্য ভবতো
ধ্যানেন যৎ কল্পিতং,
স্তুত্যানির্ব্বচনীয়তাহখিলগুরো-
দূরীকৃতা যন্ময়া।
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকৃতং ভগবতো
যত্তীর্থ যাত্রাদিনা,
ক্ষন্তব্যং জগদীশ তদ্‌বিকলতা-
দোষত্রয়ং মৎকৃতম।"

বঙ্গানুবাদ: "তুমি রূপ বিবর্জিত, আমি ধ্যানে তোমার রূপ কল্পনা করিয়াছি; তুমি অখিল গুরু বাক্যের অতীত; আমি স্তব দ্বারা তোমার সেই অনির্ব্বচনীয়তা দূর করিয়াছি, তুমি সর্বব্যাপী। কিন্তু আমি তীর্থযাত্রাদি দ্বারা তোমার সেই সর্ব্বব্যাপিত্ব নিরাকৃত করিয়াছি; অতএব হে জগদীশ! তুমি আমার এই বিকলতা-দোষত্রয় ক্ষমা করো।"

ব্যাসদেব 'মহাভারত' গ্রন্থের রচয়িতা এবং তা পঞ্চম বেদ হিসেবে কথিত। প্রসিদ্ধি আছে যে, অষ্টাদশ পুরাণ তাঁরই রচিত। এছাড়া তিনি পাতঞ্জল দর্শনের উৎকৃষ্ট টীকা প্রণয়ন করেন। ফলতঃ তিনি যুদ্ধবিদ্যা, দর্শনশাস্ত্র জ্ঞান, নীতিশাস্ত্র পারদর্শিতা, ধর্মশাস্ত্রাভিজ্ঞতা, জ্যোতিষশাস্ত্র জ্ঞান, মানব-হৃদয় বিজ্ঞান, সব বিষয়ে এতো নৈপুণ্য প্রকাশ করে গেছেন যে, ঐসব গ্রন্থ এক ব্যক্তির রচিত বলে অনেকে বিশ্বাস করেন না। তাদের মতে ভিন্ন ভিন্ন লেখক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ব্যাসের ন্যায় পাণ্ডিত্যসম্পন্ন হয়ে ঐসব গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর মহাভারত রচনা সম্পর্কে প্রসিদ্ধি আছে যে, তিনি একজন উপযুক্ত লেখকের খোঁজ করলে ব্রহ্মা তাঁকে গণেশের সাহায্য নেবার পরামর্শ দেন। গণেশ ঠাকুর শর্ত দেন যে, একবার লেখা শুরু করলে শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর লেখনীর বিরতি ঘটবেনা। এতে রাজী হয়ে ব্যাসদেব বলেন যে, 'তবে আপনি আমার কথিত শ্লোকের অর্থ না বুঝে লিপিবদ্ধ করতে পারবেন না।' চুক্তির এ শর্তকে কাজে লাগিয়ে বেদব্যাস বিরতি সৃজনের লক্ষ্যে এক একটি দুর্বোধ্য শ্লোক বলতে থাকেন; যেগুলো দর্শনশাস্ত্রে 'ব্যাসকূট' নামে পরিচিত। ঐসব শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে গণেশের যে সময়ের প্রয়োজন হতো, তা বেদব্যাস নতুন শ্লোক নির্মাণে ব্যবহার করতেন। বেদব্যাসের জন্ম মহর্ষি পরাশরের ঔরশে ও মৎস্যগন্ধার গর্ভে। দ্বীপের উপর জন্ম বলে তাঁর নাম দ্বৈপায়ন ও গাত্রবর্ণ কালো বলে তিনি 'কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন' নামে অভিহিত। রাজা বিচিত্রবীর্য নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে ব্যাসদেব মায়ের নির্দেশে রাজমহিষী অম্বিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র, রাণী অম্বালিকার ক্ষেত্রে পাণ্ডু, অম্বিকার এক দাসী পত্নীর ক্ষেত্রে বিদুর-এই তিন পুত্রের জন্ম দেন। অর্জুন (সঞ্জয়) তাঁর বরে দিব্যচক্ষু লাভ করে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দৈনন্দিন ঘটনাবলী যথাযথভাবে বর্ণনা করতেন।[১]

(খ) ইহুদী, খ্রিস্টান, ইসলাম ধর্মে একক অদ্বিতীয় স্রষ্টার যে ধারণা দেওয়া হয়েছে, একইভাবে বহু বর্ণ-ভাষা-জাতি অধ্যুষিত ভারতীয় উপমহাদেশে দার্শনিকভাবে 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' বা 'একেশ্বরবাদী ত্ত্বই একমাত্র 'মূল ধর্মীয় তত্ত্ব' হিসেবে প্রতিভাত। "বর্তমানে 'হিন্দু' ধর্মের যে চর্চা হয়ে আসছে, তাতে এটাকে বহু ঈশ্বরবাদী বলে প্রতিভাত হলেও বস্তুত তা নয়। সনাতন হিন্দু ধর্মে কিন্তু এক ঈশ্বরের কথা বলা আছে। প্রাচীন ঋগবেদ, গীতা এবং উপনিষদ পাঠে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। আসলে বর্তমানে হিন্দু ধর্মে বহু দেব-দেবীর পূজা অর্চনা করা হয়ে থাকলেও তা কিন্তু বিভিন্ন ঈশ্বরের পূজা নয়। এখানে একেকটি দেব-দেবীকে ঈশ্বরের এক একটি রূপ হিসাবে পূজা করা হয়ে থাকে। তাই মূল হিন্দু ধর্মও কিন্তু একেশ্বরবাদী বা অদ্বৈতবাদী ধর্ম বিশ্বাসী।"[২]

৩. বহু ঈশ্বরবাদ/প্রতিমা পূজা (Polytheism) ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদিঃ

(ক) বহুত্ববাদঃ বহু ঈশ্বরবাদের (Polytheism) দার্শনিক স্কেচ অধ্যয়নের পূর্বে দর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় 'বহুত্ববাদের (Pluralism) উপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত প্রয়োজন। বহুত্ববাদ 'বিষয়টি রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়' প্রভৃতি বিবিধ অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতি, সামষ্টিকভাবে সামাজিক ক্রিয়াদির ব্যবস্থাপনা, বহু দেবদেবীর উপাসনা প্রভৃতি। দর্শনে 'বহুত্ববাদের' উপস্থিতি বহু প্রাচীন। গ্রীক দার্শনিক এমপিডিক্লিস, এনাক্সিগোরাস, ভারতীয় চার্বাক দার্শনিকদের মধ্যে বহুত্ববাদের চর্চার পরিচয় পাওয়া যায়। বহুত্ববাদ বলতে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকভাবে যা বুঝায়, তা হলো: এ বিশ্বজগৎ বহু স্ব-অস্বিত্বশীল ও স্বতন্ত্র ইউনিট, শক্তি, সত্তা, বাস্তব বা বস্তুগত উপাদানে পরিপূর্ণ এবং সেগুলোর সমন্বয়, আন্তঃক্রিয়া-বিক্রিয়া বা সহযোগিতার ফলস্বরূপ বিশ্বের উৎপত্তি ঘটেছে। (Pluralism assumes a Plurality of self-existent and independent units, forces, entities, realities or substances and affirms that the world is a product or result of their combination, in.eraction or co-operation.)।[৩]

এ বহুত্ববাদ মোটা দাগে দু'ভাগে বিভক্ত : (ক) জড়বাদী বহুত্ববাদ বা জড় পরমাণুবাদ (materialistic pluralism or atomism) (খ) আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদ বা চিৎপরমাণুবাদ (spiritualistic pluralism or monadism)। জড়বাদী বহুত্ববাদ অনুযায়ী, অন্ধ যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মহাকূন্যে বিশৃঙ্খল অবস্থায় ভাসমান জড়কণাগুলো আকস্মিকভাবে জড়ো হয়ে এ জগৎ সৃষ্টি করে। তারা জগৎ সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্যমূলকতা বা পরিণতিতে বিশ্বাস করেন না। তাই এটা নিরীশ্বরবাদী মতবাদ।

এছাড়া রয়েছে প্রয়োগবাদী বহুত্ববাদ (pragmatic pluralism) ও নব্য-বাস্তববাদী বহুত্ববাদ (neo-realistic pluralism)। প্রয়োগবাদী বহুত্ববাদের প্রবক্তা উইলিয়াম জেমস এ মতবাদ দাঁড় করান হেগেলের পরম সত্তা তত্ত্বের পাল্টা হিসেবে। হেগেলের মতে, বিশ্বজগৎ পরম সত্তার বহিঃপ্রকাশ মাত্র। এর বিপরীতে জেমস বলেন, বিশ্ব জগৎ যদি পরমসত্তা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহলে তা এক আবদ্ধ জগতে (block universe) পর্যবসিত হবে; নতুনত্ব, বৈচিত্র ও স্বাধীনতা বলতে কিছু থাকবে না। তিনি জগতকে শুধু স্রষ্টা নিরপেক্ষ নয়, বরং ব্যক্তি নিরপেক্ষ হিসেবেও প্রত্যক্ষ করার সোপারেশ করেন। কিন্তু তাঁর এ ব্যাখ্যা বিশ্ব জগতকে বিশৃঙ্খল, অগোছালো বস্তুপুঞ্জ হিসেবে চিত্রিত করে, যা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত উদ্দেশ্যমূলক বা পরিণতিমূলক তত্ত্বের (teleology) সাথে সাংঘর্ষিক। দ্বিমত পোষণকারী দার্শনিকরা এটাকে গ্রহণযোগ্য মতবাদ বলে মানেন না।

নব্যবস্তুবাদী বহুত্ববাদ অনুযায়ী পরিদৃশ্যমান এ জগতের মূল উপাদান অর্থাৎ আদিসত্তা মন বা জড়বস্তু নয়; বরং নিরপেক্ষ পদার্থগুলোই (neutral entities) আদিসত্তা। এগুলো একদিকে যেমন পদার্থিক (physical) বলে প্রতিভাত হয়, অন্যদিকে তেমনি মানসিক (mental) বলে প্রতীয়মান হয়। তাঁদের মতে এ বিশ্বজগৎ কোন 'অবাস্তব ও অলীক কল্পনামূলক পরম স্রষ্টার' প্রকাশ নয়। বস্তুতঃ বহু বস্তুর সমন্বয়েই এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি অর্থাৎ জ্ঞাতসত্তা অনেক। তবে এ তত্ত্ব জাগতিক বস্তুনিচয়ের শৃংখলাপূর্ণ সমষ্টির বাস্তবতার সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বলে গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি পায়নি।

দর্শনের সুবিশাল অন্তহীন গবেষণাগার দার্শনিকদের বিভিন্ন তত্ত্বের পারস্পরিক বৈসাদৃশ্য চিহ্নিত করণ, সমালোচনা এবং গ্রহণ-বর্জনের 'দ্বন্দ্বে' পরিপূর্ণ। এতে যুক্তিমত্তা ও অন্বেষার সূক্ষ্ম সৃজনশীলতার উদ্ভাবন ঘটলেও সৃষ্টিজগৎ ও মানবমণ্ডলীর পূর্ণাঙ্গ জীবন-চক্রের সন্ধান দুর্লভ, যা দিয়েছে আল-কুরআন। আল-কুরআনের মতে, দেহ আর আত্মা মিলে এক অখণ্ড সত্তা এবং আধ্যাত্মিক অধরা বিষয়ের পাশাপাশি জীবনের তুচ্ছ বৈষয়িক বিষয়াদিও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। পার্থিব জীবন উচ্চতর জীবনের পথে একটি স্তর মাত্র। তবে চূড়ান্ত লক্ষ্য আধ্যাত্মিক প্রকৃতির। মানুষের কল্যাণমূলক সামাজিক অবস্থা, পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক তার আধ্যাত্মিক পূর্ণতার সাথে সম্পর্কিত ও পরিপূরক।

(খ) আধ্যাত্মিক বহুত্ববাদ দুপ্রকার: (১) চিৎপরমাণুবাদ (monadism) এবং (২) বহু ঈশ্বরবাদ (polytheism): চিৎপরমাণুবাদ মতে, প্রতিটি বস্তু নিশ্ছিদ্র স্বতন্ত্র চিৎপরমাণু এবং গড্ হচ্ছেন শ্রেষ্ঠতম চিৎপরমাণু, যিনি এগুলো মধ্যে পূর্ব প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্খলা স্থাপন করে দিয়েছেন। লাইবনিযের মতবাদ গ্রীক পরমাণুবাদ ও কার্টেযীয় (cartesian) মতবাদের সমন্বয় প্রয়াস। এর প্রকৃতি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, গাণিতিক বিন্দু এবং জড় বিন্দু বা পরমাণুর মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। গাণিতিক বিন্দুর কোন বিস্তৃতি নেই। আর জড় বিন্দুর বিস্তৃতি আছে। কিন্তু চিৎপরমাণুগুলো নিশ্ছিদ্র। এ তত্ত্বে জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকৃত এবং অসংখ্য, নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র ও স্বনির্ভর চিৎপরমাণুগুলোর দ্বারা সুসংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জগৎ গঠনের প্রক্রিয়ার যথার্থ সমাধান দিতে ব্যর্থতার দরুন সন্তোষজনক মতবাদ হিসেবে গ্রহণীয় নয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ সব ধারণার অসম্পূর্ণতা কোন স্থির সমাধান পেশ করতে দার্শনিকভাবেই অক্ষম।

(গ) বহুঈশ্বরবাদ বা Polytheism: হাজার হাজার বছর ধরে মানব সমাজের এক উল্লেখযোগ্য অংশের বিশ্বাস, ধর্মাচার ও জীবন পদ্ধতিতে প্রভাব বিস্তার করে আসছে বিধায় এর দার্শনিক, ধর্মীয় ও সামাজিক প্রেক্ষিত উপেক্ষণীয় নয়। এটা সহজবোধ্য ও সহজে ধারণাযোগ্য তত্ত্ব হিসেবে মানব সমাজের একাংশের কাছে গৃহীত হয়েছে।

অনেকের মতে বহুত্ববাদের উপর ভিত্তি করে দর্শনশাস্ত্রে বহুঈশ্বরবাদ মতবাদ গড়ে উঠে। বহু ঈশ্বরবাদ বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তির অন্তরালে বিভিন্ন দেব-দেবীর ভূমিকা রয়েছে, যারা ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব পালন করে। প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক, রোমান এবং ভারতীয়দের কারো কারো মধ্যে এ ধরণের বিশ্বাস লক্ষ্যণীয়। তবে বহুঈশ্বরবাদ একটি 'আচার ধর্মীয় মতবাদ'। এ মতবাদের সমর্থনে যুক্তির পরিবর্তে অন্ধ-বিশ্বাস (dogma) ও আবেগকেই বেশী মূল্য দেওয়া হয়েছে। যৌক্তিকভাবে এ মতবাদ সমর্থিত হয়নি। এর সংজ্ঞা-বিবরণ 'ঞ' অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে।

(ঘ) বহু দেব-দেবী সম্পর্কে চার্বাকবাদঃ

প্রাচীন ভারতীয় নাস্তিক্যবাদী দার্শনিক সম্প্রদায় চার্বাক দার্শনিকরা ঈশ্বরবাদ, বহু দেব-দেবীবাদ, মূর্তিপূজা কোনটাই মানেন না। তাঁদের মতে, ঈশ্বর বলে কোন স্রষ্টা বা পরম সত্তার কোন অস্তিত্ব নেই। ঈশ্বর হচ্ছে, স্বার্থবাদী ধূর্ত ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মনগড়া এক সৃষ্টি। সহজ সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে দেব-দেবীর কিছু ভেল্কিবাজীর কথা শুনিয়ে তাদের বোকা বানিয়ে তাদের পূজা-অর্চনা করার জন্য প্ররোচিত করে তাদের কাছ থেকে অর্থ হাতিয়ে নেয়ার জন্য পুরোহিতরা তাদের মনগড়া দেব-দেবীর অবতারণা করেন। চার্বাকগণ দেব-দেবী তথা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানেন না[৪]।

(ঙ) দার্শনিক বৃহস্পতির অভিমতঃ দর্শনশাস্ত্রের অনুমান (perception), উপাধি (condition), অন্যনিরপেক্ষতা (unconditional), আলোক, 'ব্যাপ্তি জ্ঞান' প্রভৃতি সূক্ষ্ম নৈয়ায়িক বিষয়াদির আলোকে বৃহস্পতি বলেন, "স্বর্গ, অপবর্গ বা পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্ব নেই। বর্ণ-শ্রমাদির কোনও ক্রিয়াও ফলদায়ক হয় না। অগ্নি হোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড ও ভস্মলেপন বুদ্ধি-পৌরুষহীন দিগেরই ধাতু নির্মিত জীবিকা। যদি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞে নিহত পশু স্বর্গে গমন করে, তবে যজমান কেন নিজ পিতাকে সেই যজ্ঞে নিহত করেনা? যারা মারা গেছে, শ্রাদ্ধে যদি তাদেরও তৃপ্তি জন্মায়, তাহলে নিভে যাওয়া প্রদীপের শিখাও তৈল প্রভৃতি স্নেহ জাতীয় পদার্থ দ্বারা সংবর্ধিত হবে। পর্যটকদের পাথেয় সঙ্গে রাখার কোন প্রয়োজন নেই। ঘরে শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠান করলেই পথিমধ্যে ভোজন তৃপ্তি আস্বাদন করা যাবে। যদি ভূতলস্থ দানে স্বর্গস্থিত ব্যক্তি তৃপ্তি পায়, তাহলে প্রাসাদবাসী ব্যক্তিবর্গের তৃপ্তির নিমিত্ত ভূতলে অন্ন দিলেই তো হয়ে যায়। যতো দিন জীবিত থাকো, সুখে জীবন যাত্রা নির্বাহ করো। ঋণ করে হলেও ঘৃত ভক্ষণ করো। ভস্মীভূত দেহের পুনরাগমন কোথা হতে সম্ভব হবে! যদি দেহ থেকে নির্গত হয়ে কেউ পরলোকে গমন করতে পারে, তা হলে বন্ধুস্নেহে আকুল হয়ে সে আবার ফিরে আসতে পারবে না কেন? সুতরাং, মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে প্রেতকর্ম অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণদিগের জীবনোপায় মাত্র। অন্য কিছু নহে[৫.ক]।"

(চ) দার্শনিক মাধবাচার্যের অভিমতঃ তিন শ্রেণীর ব্যক্তি বেদের কর্তা– ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর। জর্ভরী, তুর্কুরী প্রভৃতি পণ্ডিতদের বচন বলে স্মরণীয় হয়েছে। অশ্বমেধে যজমান পত্নী অশ্বের শিশ্ন ধারণ করবেন–এরূপ বিধান কীর্তিত হয়েছে। ভণ্ডগণ এরূপ কতো কি ধারণ করার কথা বলেছেন। এরূপ যজ্ঞাদিতে মাংস ভক্ষণের বিধান করেছেন নিশাচরগণ। দার্শনিক মাধবাচার্য এভাবে চার্বাক মতের বিবরণ দিয়ে বলেন, বহু প্রাণীর প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য চার্বাকমত আশ্রয়নীয়।

(ছ) দার্শনিক হরিভদ্র সুরির 'ষড়দর্শন সমুদ্বয়' গ্রন্থে চার্বাক মতের বিবরণঃ হরিভদ্রের মতে বৌদ্ধ, নৈয়ায়িক, সাংখ্য, জৈন, বৈশেষিক, জৈমিনীয়–এগুলোই ষড়দর্শন। তবে কোন কোন দার্শনিক নৈয়ায়িক মতের সাথে বৈশেষিক মতের পার্থক্য স্বীকার করেন না বিধায় 'লোকায়ত' মত দ্বারা ষষ্ঠ দর্শন সংখ্যা পূরণ করা হয়। তবে উত্তরকালে দর্শনের বদরিকাবৃক্ষ বহু শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে পরিবর্তিত উন্নততর পরিবেশ পরিস্থিতিতে উত্তরোত্তর নবতর ফসল উৎপাদন করে চলেছে। লোকায়তদের বরাত দিয়ে হরিভদ্র সুধি বলেন, "দেবগণের অস্তিত্ব নেই। নিবৃত্তি বলে কিছু নেই, ধর্ম-অধর্ম বলে কিছু নেই, পুণ্য ও পাপের ফলাফল বলে কিছু নেই। যতোদূর ইন্দ্রিয়গোচর হয়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ততদূর পর্যন্তই, তার বাইরে নেই। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। ভদ্রে! এই বৃকপদ দেখ, ইহা যেরূপ কৃত্রিম ও মিথ্যা। বহুশ্রুতগণ অনুমানাদির সাহায্যে স্বর্গ, নরক, ঈশ্বর, জন্মান্তরাদি যে সকল প্রত্যক্ষাগোচর অলৌকিক বিষয়ের কথা বলে থাকেন, তাহাও সেইরূপ কৃত্রিম ও মিথ্যা। হে জাতশোভনে! পান কর। ভোজন কর। হে বরযাত্রি! যা অতীত হয়ে গেছে, তা তোমার নয়। হে ভীরু! যে চলে গেছে, সে আর ফিরে আসে না। এই কলেবর সমুদয় মাত্র। পৃথ্বী, জল, তেজ ও বায়ু এই ভূত-চতুষ্টয়ই চৈতন্যভূমি। এদের প্রমাণ কেবল প্রত্যক্ষজ। পৃথ্বী প্রভৃতি সংহতিতেই দেহাদি সম্ভব। যেরূপ গুড়তন্ডুল প্রভৃতি সুরঙ্গ থেকে মদশক্তি উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ভূতচতুষ্টয় সম্বন্ধ থেকে সচেতনত্ব উৎপন্ন হয়।"

কিন্তু এ মতবাদ অপূর্ণাঙ্গ একারণেই যে, জীবন-প্রাণজাত সচেতনতা বলতে যা বুঝায়, তা দৃশ্যাতীত, অথচ বাস্তব সত্য। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সীমা-পরিসীমা এখনো মানব দৃষ্টি ও জ্ঞানের বাইরে। এমনকি আমাদের সৌরজগৎ সম্পর্কেও পূর্ণ তথ্য জ্ঞাত হওয়া গেছে বলে দাবী করা যায় না। ন্যায়শাস্ত্রের নেটওয়ার্কে নির্মিত দর্শনশাস্ত্রের ক্যানভাস 'সচেতনতার' পূর্ণাঙ্গ পরিচয় চিত্রিত করতে পারেনি। চার্বাক দর্শনও অসম্পূর্ণতায় আকীর্ণ এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন-চিত্র অঙ্কণে ব্যর্থ। তবে তাঁদের বহু পরে মানব সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতিজাত জ্ঞান এই অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে যৌক্তিকভাবে সমর্থ হয়েছে। চেতনার মূল হিসেবে 'রুহ্' নামক জিনিসকে সাব্যস্ত করেছে আল-কুরআন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অসীমতার যে 'সীমা' কুরআন দিয়েছে, বিজ্ঞান দিনে দিনে সেই

'অসীমতার সীমা' খুঁজছে হন্যে হয়ে। অষ্টাদশ, উনবিংশ, বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য দার্শনিকরা এই চেতনার সন্ধান করতে গিয়ে আস্তিক্যবাদ তথা একক স্রষ্টাবাদ অর্থাৎ তৌহিদের চৌহদ্দিতেই নিজেদেরকে স্থাপন করেছেন নিজেদেরই যুক্তিযানে সওয়ার হয়ে। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এই যুক্তিমত্তাকেই অভ্যর্থনা জানায়।

(জ) ভারতীয় দর্শনে ভাববাদ বনাম বস্তুতন্ত্রবাদঃ ভাববাদ ও বস্তুতন্ত্রবাদের বিতন্ডায় প্রাচীন ভারতীয় দর্শন আকীর্ণ। ভাববাদীদের মতে সকলি মায়া, মিথ্যা। বস্তুতন্ত্রবাদী বৃহস্পতির অনুসারী চার্বাকগণ পরিদৃশ্যমান জগতকেই একান্ত সত্য বলে স্বীকার করেন। মানব জীবনের পূর্ণাঙ্গ নক্শা তখনো চিত্রিত হয়ে উঠেনি। মানব জীবনকে নিজের স্বার্থসিদ্ধিকারী পশুর জীবনের সমপর্যায়ে স্থাপন করে তার মূল্য বিচারের প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। বলা হয়, "মানুষ 'স্ব' ভিন্ন 'পরকে' আত্মস্থ করে নৈসর্গিক উপায়ে চর্বণ করে উদরসাৎ করে স্বাধীনতা অর্জন করে।" তার নিকট 'স্ব' বা 'অহং' এর মতো প্রিয় কিছু নেই। তাই এই 'স্ব'- কে, অহং- কে 'মেত্ত' বা মৈত্রীভাবের দ্বারা ক্রমে ক্রমে পরের সাথে, বস্তুবিশ্বের সাথে, পরিদৃশ্যমান জগতের সাথে মিশিয়ে দিতে পারলে, সমস্ত 'পর' এভাবে আত্মস্থ হয়ে গেলে "স্ব" তার নিজেকে, সন্তান-সন্ততিকে, আপন দল- দেশকে অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বে প্রসার লাভ করলে 'মনুষ্যত্বের পূর্ণ শক্তির বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়। এটা ঋষির অমৃতত্ব লাভ, দেবীসুক্তে 'অহং' এর ব্যাপ্তি বা বিকাশ, গীতার 'অহং-এর কৃৎস্নজগৎ বিষ্টম্ভন, শ্রীকৃষ্ণের 'বিশ্বরূপ, চণ্ডীর সর্বত্র বিস্তার, বুদ্ধের ব্রহ্মবিহার, 'সুশিক্ষিততর' চার্বাকদের স্বাধীনতা লাভের কৃত্রিম বা অনৈসর্গিক পথ, বস্তুতন্ত্রবাদী বৃহস্পতির 'মহতোমহীয়ান' আদর্শরূপে অভিহিত।[৫.খ]

মানব সভ্যতার ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী ধাপগুলোতে এসব অন্বেষার ফসল দৃশ্যমান হয়। মোজেস (মূসা আ.), ডেভিড (দাউদ আ.), যীশুর (ঈসা আ.) ধাপ অতিক্রম করে আল-কুরআন মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলীকে তার জ্ঞানের অধীন বলে ঘোষণা করেছে। ভারতীয় দর্শনের 'স্ব' বা 'অহং' কিভাবে 'বিশ্বরূপে' পর্যবসিত হয়, তা ইবনুল আরাবী (র.) তাঁর ওয়াহদাতুল ওজুদ দর্শনে গাণিতিক ও নৈয়ায়িক পদ্ধতিতে প্রকাশ করেছেন। আল-কুরআনে বার বার বলা হয়েছে : এই সৃষ্টি বা জগৎ ক্রীড়াচ্ছলে অস্তিত্বে আসেনি, এর একটা উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য আছে, এটা পূর্ব পরিকল্পিত (teleological) এক অন্তহীন প্রক্রিয়া। আল-কুরআন পূর্বেকার দার্শনিক অস্বচ্ছতাকে অপসৃত করে মহাজগৎ সম্পর্কে স্বচ্ছ চিত্র উপস্থাপন করেছে, যার সাথে পাশ্চাত্য দর্শনের শীর্ষ অভিমতের বহু সাদৃশ্য দৃশ্যমান। 'ইসলাম' নামক শব্দের মোড়কে আল-কুরআনে মহাসৃষ্টি-জগৎ, জীবন-মানবসহ সকলের একটা সমন্বিত-পূর্ণাঙ্গ প্রকল্প

উপস্থাপন করে সৃষ্টি ও জীবনের অর্থ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয় করে দিয়েছে। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের পদচারণা এই পথেই।

(ঝ) বৃহস্পতির বস্তুতন্ত্রবাদ ও কার্ল মার্কসের বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদঃ দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী মহোদয়ের মতে, ভারতীয় দার্শনিকদের মধ্যে প্রায় সকলেই বস্তুজগতকে মিথ্যা বা মায়া বলে উপেক্ষা করেছেন এবং একই স্থানে বৃহস্পতিও উপেক্ষিত হয়ে থাকায় ভারত 'দৈন্যপীড়িত ও নির্জীব' বলে আক্ষেপ করেছেন। মোদ্দা কথায়, মানবের পার্থিব চাহিদা ও বাঁচার খোরাকের বিষয়টা সর্বদা গৌন ছিল। প্রাচীন দর্শন এই জাগতিকতাকে মুখ্য বিষয়ের তালিকায় স্থান দেয়নি। হযরত মূসা (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত ঈসা (আ.) ধাপে ধাপে এসব বিষয়কে অগ্রাধিকার দিলেও স্বার্থকেন্দ্রিক যাজকতন্ত্র বার বার এ পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। চার্বাক দার্শনিকদের জমানায়ও যাজকীয় উপদ্রবের তিক্ত অভিজ্ঞতার বিবরণ পাওয়া যাচ্ছে। আল-কুরআনে যাজকতন্ত্র, মানুষের মাঝে দেবত্ব আরোপ (anthromorphism), শোষণ-পীড়নের উৎস নির্মূলপূর্বক সামাজিক তথা বিশ্বসাম্য ও শান্তি (যা ভারতীয় প্রাচীন দর্শনেরও উদ্দিষ্ট), সুবিচার ও সমতাবাদী বিশ্ব নির্মাণের যে ফর্মুলা পেশ করা হয়েছে, তাও 'অহংবাদী রাজতন্ত্র', যাজকতন্ত্রের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে থাকে। আল-কুরআনে বর্ণিত সামাজিক সুবিচার বা আদলে মোত্লাকার নীতি বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে গোটা বিশ্বজুড়ে শোষণ-পীড়নের প্রাবল্য দেখা যায়। যন্ত্রশিল্পের আবিষ্কারে এই শোষণ প্রক্রিয়া আরো নিবিড় ও সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে থাকে। এ অবস্থা উনবিংশ শতাব্দীতে এমন প্রকট হয়ে উঠে যে, সমকালীন অগ্রসর শিক্ষা ও চিন্তায় পুষ্ট দার্শনিক, সমাজবিজ্ঞানী কার্ল মার্কসের আবির্ভাব অনিবার্য হয়ে উঠে। যে সামাজিক প্রেক্ষাপটে হাজার হাজার বছর পূর্বে বস্তুতন্ত্রবাদী বৃহস্পতির আবির্ভাব ঘটে, বহু যুগান্তর পরে প্রায় একই খাসিয়তের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিজ্ঞান সমৃদ্ধ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশ মার্কসের আবির্ভাব ঘটায়। মার্কসকে এক অর্থে উনবিংশ শতাব্দীর 'বৃহস্পতি' বলে অভিহিত করলে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না।

তবে আল-কুরআন অতীতের সকল অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে যে ভারসাম্যমূলক সামাজিক-বিশ্ব তৈরীর প্রস্তাবনা পেশ করেছে, তা এখনো অবাস্তবায়িত। বিংশ শতকে পুঁজিবাদী গণতন্ত্র, জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সমাজতন্ত্রের সূত্র ও প্রয়োগের সাফল্য-ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত আল-কুরআনে বর্ণিত বিচারসাম্যমূলক 'ফর্মুলাতেই' ভারসাম্য রক্ষাকারী ব্যবস্থার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আল-কুরআনে মানুষের ইহকাল বা পার্থিব জীবনই পরকালীন জীবন বা আখেরাতের জীবিকা বা সম্বল আহরণের একমাত্র ক্ষেত্র হিসেবে পার্থিব জীবনে সর্বোচ্চ

মাত্রার গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত বা বেলায়তে মোত্লাকা এই সমতাবাদী, ভারসাম্যমূলক সামাজিক-রাজনৈতিক জীবন ব্যবস্থার প্রত্যাশী।

(ঞ) বহু-ঈশ্বরবাদ (polytheism): সংজ্ঞা ও সমীক্ষণবাদী (critical) মূল্যায়ন: এই অধ্যায়ের ৩(গ) অনুচ্ছেদে বহু ঈশ্বরবাদী সংস্কৃতির পশ্চাতে অদ্বৈতবাদী বিশ্বাসের পরোক্ষ উপস্থিতির সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে বিষয়টা আরো খোলাসা করার জন্য সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও দার্শনিকদের সমীক্ষণবাদী মূল্যায়ন লিপিবদ্ধ করা হলো।

সংজ্ঞা: বহু ঈশ্বরবাদ আস্তিক্যবাদী মতবাদ। এই মতবাদে ঈশ্বরকে সংখ্যায় একটা দুই না ধরে বহু বলে বিশ্বাস করা হয়। "By polytheism is meant the theory which assumes the existence of a plurality of spiritual or divine beings (called gods) controlling the various processes and departments of the world-e.g., the sun, the moon, the stars, seas, rivers, & c. As examples of polytheism we may take the religious systems of the ancient Egyptians, Greeks, Romans and Scandinavins. Polytheism not only recognises many divine beings, but also regards them as finite beings limited and resisted by each other. Some polytheistic systems represent the gods as self-existent, eternal and immortal. But usually the gods are looked upon as derived beings--as either born of parents or derived in some way out of some impersonal substance, chaos or nature.

But Polytheism as explained above is more mythological than philosophical. It is too anthropomorphic and can arise at a time when the personifying tendency of human mind is very strong and unrestrained by reason.

Further, like other forms of pluralism, polytheism fails to satisfy the legitimate demands of reason and to explain the unity and harmony of the world-system. A polytheistic world would be wholly a world of strife and discord. "The more thoroughly the universe is studied and examined, the more apparent does it become that it is a single self-consistent whole--a vast unity in which nothing is isolated or independent. The very notion, therefore, of separate and independent deities, and still more, of course, of discordant and hostile deities, ruling over different

departments of nature, is opposed to the strivings and findings of reason."[৬]

বহু-ঈশ্বরবাদের ব্যাখ্যা: প্রাকৃতিক শক্তির আড়ালে একাধিক দেব-দেবীর অস্তিত্বে বিশ্বাসের উপর ভর করে বহু-ঈশ্বরবাদ মতবাদের উদ্ভব ঘটে। তাদের মতে, বিভিন্ন দেব-দেবী প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের কর্তা। এই কারণে সূর্যদেবতা, সমুদ্র দেবতা, মেঘ দেবতা, বিদ্যাদেবী প্রভৃতি হিসেবে কল্পনা করে তাদের পূজা-অর্চনা করা হয়। এসব দেব-দেবীকে অমর তবে খণ্ডিত ও সসীম বলে মনে করা হয়। গ্রীস, মিশর, ভারতবর্ষ, রোম, স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলে এ মতবাদ প্রচলিত। বহু ঈশ্বরবাদ শুধু যে বহু দিব্য সত্তায় বিশ্বাস করে, তা নয়; উপরন্তু সেগুলোকে সসীম এবং পরস্পরের প্রতিপক্ষ ও প্রতিরোধ ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করা হয়। সাধারণতঃ দেব-দেবীদেরকে পিতৃ-মাতৃজাত কিম্বা কোনক্রমে নৈর্ব্যক্তিক বস্তু, বিভ্রান্তি প্রপঞ্চ অথবা প্রকৃতিজাত বলে ধারণা করা হয়।

তবে আল-কুরআনে প্রকৃতির সব উপাদান আল্লাহ্‌র সৃষ্টি এবং তাঁর তথা প্রকৃতির অপরিবর্তনীয় নিয়ম-বিধানের অধীন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা বিজ্ঞান সমর্থিত।

বহু-ঈশ্বরবাদের প্রকার ভেদ: বহু-ঈশ্বরবাদ দুই প্রকার: (ক) বিশুদ্ধ বহু ঈশ্বরবাদ: এই তত্ত্বমতে প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রণকারী দেব-দেবীরা কোন একক ঈশ্বরের প্রকাশ নয়, কোন বিশেষ একক ঈশ্বরের মুখাপেক্ষী কিম্বা তার কাছে দায়বদ্ধ নয়। প্রাচীন গ্রীকধর্ম ও সাধারণ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের সিংহভাগই বিশুদ্ধ বহু ঈশ্বরবাদের অনুসারী, (খ) ঐক্য বিধায়ক বহু-ঈশ্বরবাদ: এ তত্ত্ব মতে প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগের নিয়ন্ত্রকরূপে কল্পিত দেব-দেবীদের 'ঈশ্বর' হিসেবে স্বতন্ত্র কোন সত্তা নেই; তারা সবাই একই ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপমাত্র! এই বহু ঈশ্বরবাদকে বলা হয় 'ঐক্যবিধায়ক বহু-ঈশ্বরবাদ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী প্রকৃতির বিভিন্ন বিভাগ পরিচালনায় দেব-দেবীগণ এক ঈশ্বরের উপর নির্ভরশীল ও দায়বদ্ধ। তারা সবাই এক ঈশ্বরের দ্বারা নিয়োজিত হয়ে এক এক বিভাগের দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। বৈদিক ধর্ম 'ঐক্য বিধায়ক বহু-ঈশ্বরবাদী ধর্ম'। সনাতন হিন্দু ধর্ম তথা বৈদিক ধর্ম কিন্তু একটি একেশ্বরবাদী ধর্ম। আদি ঋগবেদ, পুরান ও উপনিষদে এর প্রমাণ মিলে। পরবর্তীতে কিছু স্বার্থান্বেষী পুরোহিত, কথিত পণ্ডিত, শাস্ত্রকারদের অপব্যাখ্যাজাত বিধানের ফলশ্রুতিতে এই ধর্ম একটি বিশুদ্ধ বহুত্ববাদে পর্যবসিত হয়। বস্তুতঃ মূল হিন্দু ধর্মে বিভিন্নদেব-দেবীকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর হিসাবে নয়, এক ঈশ্বরের বিভিন্ন রূপ হিসেবে কল্পনা করে পূজা করা হতো।"

দার্শনিক সমীক্ষণবাদী মূল্যায়ন: দার্শনিকরা যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই করে অভিমত প্রকাশ করেন যে: (১) বিভিন্ন দেব-দেবীর পৃথক পৃথক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ধারণা

বিশ্বজগতের নিয়মতান্ত্রিক ঐক্য ও শৃঙ্খলার নীতির বৈজ্ঞানিকভাবে পরিপন্থী, (২) এটা প্রাচীন লৌকিক বা পুরানিক মতবাদ, যার ভিত্তি অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার, যা যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়নি, (৩) এই তত্ত্বে দেব-দেবীদের উপর আরোপিত গুণ-দোষাবলী নিরেট মানবীয় গুণ-দোষের অনুরূপ। এই মতবাদে ঈশ্বরকে মানুষের স্তরে নামিয়ে খাটো করা হয়েছে, (৪) ঈশ্বর সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন বলে বিশ্বাস করা হয়। অথচ এর বিপরীতে প্রকৃতি-নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা দেব-দেবীর উপর অর্পণ করে ঈশ্বরের ক্ষমতা সীমিত করা হয়, যা নিরেট স্ববিরোধী ও ঈশ্বরের মর্যাদাহানিকর, (৫) এই মতবাদ যৌক্তিক বিচার-বুদ্ধি বিবর্জিত একটি নির্বিচারবাদী (dogmatic) মতবাদ। এতে মানসিক আবেগ বা একদেশ-দর্শী ঝোঁকের প্রাধান্য। নির্বিচারবাদ (dogmatism) যেহেতু দর্শনশাস্ত্রে গ্রহণযোগ্য মতবাদ নয়, সেহেতু নির্বিচারবাদী মতবাদ হিসেবে বহু ঈশ্বরবাদ ও দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার সন্তোষ অর্জন করতে পারেনি।[৭]

শঙ্করাচার্যের অমূর্ত একত্ববাদ ও রামানুজের মূর্ত একত্ববাদঃ

ভারতীয় দর্শনের অদ্বৈতবাদী প্রবক্তা শঙ্করাচার্যের মতে 'ঈশ্বর পরম ব্রহ্ম এবং তিনি 'এক'। তাঁর মতে কেবলমাত্র একক পরম ব্রহ্মই সত্য, 'বহুত্ব' মিথ্যা ও অলীক কল্পনা। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা মায়া, তবে জগৎ মিথ্যা মায়া হলেও জগতের আশ্রয় একক ব্রহ্ম। তাঁর এ মতবাদ আধুনিক দর্শনের পরিভাষায় 'অমূর্ত একত্ববাদ' (abstract monism)। অন্যপক্ষে, অপর প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক রামানুজের মতে, এই জগত মিথ্যা মায়া বা অলীক কিছু নয়। এর বাস্তব অস্তিত্ব বিদ্যমান এবং তা এক পরম একক সত্তার পূর্ণ প্রকাশ। আধুনিক দার্শনিক পরিভাষায় এ মতবাদ মূর্ত একত্ববাদ (concrete monism)।[৮] বেদান্ত দর্শনের অদ্বৈতবাদ 'জ্ঞাননির্ভর'[৯]। তাসাওউফীয় আবেগঘন ঐতিহ্য এতে নেই।

ইতিহাসের সাক্ষ্য, শুদ্ধ দর্শন সর্বদাই তৌহিদের মধ্যেই নিজের জিজ্ঞাসাগুলোর জবাবের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছে। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এই তৌহিদেরই পতাকা বহন করে এবং বহুমাত্রিক বিশ্বে একক তৌহিদেরই সুপরিকল্পিত গাণিতিক প্রকাশই লক্ষ্য করে।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. (ক) সুবল চন্দ্র মিত্র, সরল বাংলা অভিধান, ১৯২৮ কলিকাতা, (খ) মহাভারতের বঙ্গানুবাদ, রাজ সংস্করণ, কালী প্রসন্ন সিংহ, ১৭৮১ শকাব্দ, প্রথম তুলি-কলম সংস্করণ, ১৩৯৪ বাংলা, ১৯৮৭ ইং।

২. দর্শনের মূল সমস্যাবলী, প্রফেসর মোঃ মাহবুবুর রহমান ১৪১৬ বাংলা, ঢাকা। অধ্যায় : ঈশ্বর বিষয়ক সমস্যা।

৩. Outlines of General Philosophy: Prof. P.B. Chatterjee; eleventh edition; 1956, Cal cutta.

৪. ভারতীয় দর্শন পরিচিতি, মোঃ মাহবুবুর রহমান, ১৪১০ বাংলা, পৃ-১১১।

৫.ক, ৫.খ, নিবন্ধের (ঙ), (চ), (ছ), (জ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত তথ্যাবলীর উৎস: চার্বাক দর্শন: দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী; ১৯৫৯, কলিকাতা; লোকায়ত দর্শন: দেবী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ১৯৫৬ কলিকাতা; দর্শনের ভূমিকা, নীরদ বরণ চক্রবর্তী, কলিকাতা। ভারতীয় দর্শন পরিচিতি, মোঃ মাহবুবুর রহমান, ঢাকা।

৬. Prof. P.B.Chatterjee: Outlines of General Philosophy, 1956, Calcutta: ch. xx1.2. pluralism; polytheism, p-254.

৭. দর্শনের মূল সমস্যাবলী : প্রফেসর মাহবুবুর রহমান, পঞ্চদশ অধ্যায়, ঈশ্বর বিষয়ক সমস্যা।

৮. "যথাযথভাবে বলতে গেলে, আর্যদের ধর্ম বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী। ভারতবর্ষের সর্বাধিক জনপ্রিয় দর্শন বেদান্ত 'ঈশ্বরের এককত্ব' (oneness of the deity) শিক্ষা দেয়। বেদান্ত সূত্রের প্রণেতা ও সুবিখ্যাত ভাষ্যকার শ্রী শঙ্করাচার্য নিঃশর্ত অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি তৎকালে প্রচলিত বুদ্ধ-পরবর্তী প্রতিমা পূজা প্রথাকে সহ্য করেছিলেন, যা তাঁর ভাষায় প্রতীকবাদ (symbolism)। অবশ্য একথা ভাবা যথাযথ নয় যে, ভারতে বহু-ঈশ্বরবাদ নেই। বেদান্ত দর্শনের একেশ্বরবাদিতা থেকে সর্বেশ্বরবাদ (pantheism) এবং অদ্বৈতবাদের (monism) উদ্ভব ঘটে। সর্বেশ্বরবাদ থেকে উদ্ভব ঘটে প্রতীকবাদ এবং অতঃপর প্রতীকবাদ ক্রমান্বয়ে পূর্ণাঙ্গ বহু-ঈশ্বরবাদে পর্যবসিত হয়। অন্যদিকে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রগতির প্রতিপালন ক্ষেত্র ইউরোপ সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে এমনভাবে চলে যায় যে, একেবারে গড্ ও ধর্মকেই অস্বীকার করে বসে। বিশুদ্ধ খ্রিস্ট ধর্মের তৌহিদবাদ থেকে যাজকরা ত্রিত্ববাদী ধর্মের উদ্ভব ঘটায় এবং উদ্ভট গোঁড়ামী (dogma) ও ধর্মীয় আচারাদি প্রবর্তন করে। রাজা বা রাষ্ট্রের সহায়তায় গীর্জার যাজকরা তাদের আনুগত্য করার জন্য সাধারণ মানুষকে বাধ্য করে সংগঠিত জবরদস্তি ও সহিংসতামূলকভাবে এবং ভিত্তিহীন অভিযোগ এনে গীর্জা থেকে বহিষ্কারের মতো নিবর্তনমূলক পন্থায়। এ অবস্থায় বিজ্ঞান ও দর্শনের চেতনা ও শক্তি যখন গীর্জাকে অবদমিত করতে সমর্থ হয়, তখন ইউরোপের বুদ্ধিমন্ত জ্ঞানী-গুণীরা সমকালীন গীর্জা-ধর্মের মধ্যে সারবত্তা না দেখে নাস্তিক্যবাদী বস্তুবাদ (Nihilistic Materialism) তত্ত্বের পত্তন ঘটান। এভাবে উভয় মেরুর কাজ-কর্মে ধর্মের প্রতি বিরাগ, বিকর্ষণ ও বীতশ্রদ্ধার সঞ্চার ঘটে।" (Abul Hashim: The Creed of Islam: Ch. 11, Spiritual Revolution: Negation of Gods অনুচ্ছেদ-এর তৃতীয় উপ-অনুচ্ছেদের বঙ্গানুবাদ)।

৯. ইতিহাস ও ঐতিহাসিক: অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮১ ইং, পৃ: ৮৩।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আল-কুরআনে বিভিন্ন দার্শনিক ধারণা ও ধর্ম-বিশ্বাস লালনকারীদের পরিচিতি

১. পটভূমি: বিজ্ঞান বলছে যে, সৃষ্টিজগতের অর্থাৎ প্রকৃতির বিভিন্ন অংশ 'পৃথক পৃথক স্বভাব' ধারণ করে এবং সেই কারণে প্রাণ-সৃষ্টির ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত। সৃষ্টির জন্য প্রথম শর্ত হলো সমন্বয়। তাই স্বতন্ত্র ও পৃথক জাগতিক সত্তার 'স্বভাবগুলো' যে-সত্তার মাঝে সামগ্রিকভাবে একীভূত ও বিমূর্ত এবং সৃষ্টি-শক্তি সম্পন্ন; তার আবির্ভাব নৈয়ায়িক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকভাবেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু যে সব লোকের দৃষ্টি ও চিন্তা কেবল জাগতিক বিষয়ের মধ্যে সীমিত হয়ে পড়ে, তাদের পক্ষে সীমাবদ্ধ 'বস্তু পূজা' ব্যতীত যুক্তিসিদ্ধ মহৎ কিছুর সন্ধান লাভ সম্ভব হয়নি। সুনির্দিষ্ট ধ্রুব লক্ষ্য চিহ্নিত করতে ব্যর্থ মানস তাই প্রস্তর-পূজক, মেঘ-অগ্নি-নক্ষত্রপূজক প্রভৃতি ধারায় বিভক্ত হয়ে অজ্ঞানতার মরুপথে হারিয়ে গেছে।

নবীজীর (দ.) হাদিস: 'জীবন সংগ্রাম আল্লাহ্‌র প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ্ যা বিধান করেছেন, শুধু কঠোর চেষ্টা দ্বারাই তা লাভ করা যায়।' মানুষকে পৃথিবীতে খলিফা বা প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করার সময় পার্থিব জীবনের কঠোরতা, তিক্ততা সম্পর্কে যে ধারণা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে আল-কুরআনে ব্যক্ত হয়েছে, নবীজীর (দ.) উপরোক্ত হাদিস তারই তফসীরাংশ। কঠোর সংগ্রাম তথা জীবন সংগ্রামের ক্ষেত্রে প্রয়োজন অপরিসীম ধৈর্য, সাহস, বিচারবুদ্ধিসমৃদ্ধ কর্মক্ষমতা। আল-কুরআনে ধৈর্য্যশীলদেরকে 'সাহসী' হিসেবেও মূল্যায়ন করা হয়েছে। মানবজাতির যে অংশ ধৈর্য্য ও বিচারবুদ্ধিসহকারে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার মোকাবেলা করেছেন ও জয়ী হয়েছেন, কুরআনে বর্ণিত মুত্তাকীর তালিকায় তাঁরাও অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু মানব জাতির যে অংশটা অধৈর্য্য হয়ে নিজেদেরকে অসহায় ভেবে প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের ক্রিয়া থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য তাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং সেগুলোর ক্রোধ, প্রতাপ শান্ত করার উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্ট, সংশয়িত, লক্ষ্যহীনপন্থা বা আরাধনা-অর্চনার পথ ধরেছে; তাদের পথ ধরেই পরস্পর-বিরোধী, যুক্তি-বিবর্জিত এমন বহু অনৈক্যমূলক পন্থা রচিত হয়েছে, যে সব পন্থায় তাদের নিজেদের অগ্র-পদবিক্ষেপের পথও অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। দার্শনিক, সমাজ বিজ্ঞানী এবং প্রকৃত ধর্মবেত্তারাও এ প্রশ্নে সহমত। আত্মবিশ্বাস তথা মহান স্রষ্টার উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের ফলাফলে সংশয়, প্রকৃতির বিধিবদ্ধ আচরণের মোকাবেলায় সাহস ও বুদ্ধির অভাবজনিত ভীতি,

দুর্বলচিত্ততা, পরিশ্রম ও সংগ্রামের পরিবর্তে অদৃশ্য সূত্র থেকে সহজে ফায়দা প্রাপ্তির জন্য অস্থিরতা প্রভৃতি মানসিক তাড়নায় মানবজাতির একাংশ কল্পিত দেব-দেবীর উপাসনাকে আশ্রয় করে। মানব সমাজের বিবর্তনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমৃদ্ধ গ্রন্থাবলীতে এসব অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। এর ইঙ্গিত আল-কুরআনের ৩৬:৭৪ আয়াতেও রয়েছে; যার প্রতিধ্বনি বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনেও পাওয়া যায়।

২. সমাজতাত্ত্বিকদের মতে, "অজ্ঞতা ও ভীতি থেকেই মানুষ যে দেব-দেবীর সৃষ্টি করেছে, তা সত্য।" বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনও একই ধারণা পোষণ করে বলেন, "আদিম মানুষের মনে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ সৃষ্টির পশ্চাতে মূল তাগিদ ছিল ভয়। ক্ষুধা, বন্য জন্তু, মারী, মৃত্যু প্রভৃতির ভীতি থেকে আত্মরক্ষার উপায় সে খুঁজতে থাকে। বিভিন্ন ঘটনার কারণ সম্পর্কিত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতাহেতু সে এমন এক শক্তির কল্পনা করে নেয়, যার ইচ্ছা ও কর্ম তাদেরকে এসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন করে।" এই ধারণা থেকে সে পূজা-অর্চনার আশ্রয় গ্রহণ করে এবং একেবারে প্রত্যক্ষ সাহায্য পাবার প্রত্যাশায় কাল্পনিক চিত্র অবলম্বন করে সেই কল্পনাকে প্রতিমায় রূপ দেয়। আইনস্টাইন এটাকে বলেন, "ভীতিমূলক ধর্ম"। তাঁর মতে, পরজীবী যাজক-পুরোহিতরা সুকৌশলে এসব লোকের জাগতিক ও ধর্মীয় আচারের নেতৃত্ব সৃষ্টি করে নিজেদের স্বার্থে। প্রাচীন ভারতের দার্শনিক বৃহস্পতিও পোষণ করেছিলেন একই অভিমত। সময়ের সাথে সাথে মানব-সচেতনতা বাড়তে থাকে অভিজ্ঞতার স্পর্শে। অস্তিত্ব রক্ষার জন্য তার মধ্যে জাগে সামাজিক ঐক্যবোধ। সমাজ-জীবনে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সৃষ্টি হতে থাকে নৈতিক নীতিমালা। এসব নীতিমালা হাজার হাজার বছর ধরে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রূপ গ্রহণ করে ইসলাম ধর্মে। ভীতি ও অন্ধ বিশ্বাসমূলক ধর্মকে অপসারিত করে 'ইসলাম' প্রতিষ্ঠা করে নৈতিকতা, কর্ম, সামাজিক ঐক্য-ভিত্তিক এক জীবন বিধান, যা বিজ্ঞানসম্মতভাবে মানুষের আবির্ভাব, জন্ম, কর্ম-প্রবাহ, মৃত্যু ও তৎপরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে একটা সুবিন্যস্ত বৃত্ত উপহার দেয় মানব সমাজকে। ইসলামী দর্শনে দেহ আর আত্মা মিলে এক অখণ্ড সত্তা।

৩. মানব সমাজের বিবর্তনের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় ইতোমধ্যে বিশ্বসৃষ্টি, মানব-সৃষ্টি প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে বিভিন্ন ধরনের ধারণা ও বিশ্বাস বিভিন্ন মানুষের মাঝে আশ্রয় গ্রহণ করে। ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনের আগে থেকেই এসব তাত্ত্বিক-দার্শনিক মতবাদ ও ধারার সৃষ্টি হয়। সে সব ধারা না বিলুপ্ত হয়েছে, না সংমিশ্রিত হয়ে একাকার হয়েছে। বরং বিচ্ছিন্নভাবে এখনো অব্যাহত। অবশ্য আল-কুরআন এই মতভিন্নতার ব্যাপারে একটা বক্তব্য দিয়েছে, যাতে মানুষের চিন্তা, বিশ্বাস ও কর্ম নির্বাচনের স্বাধীনতার স্বীকৃতি রয়েছেঃ (ক) "যদি আপনার রব ইচ্ছা করতেন, তবে দুনিয়ার সব মানুষই

একযোগে ঈমান আনতো (১০:৯৯)।" (খ) আল্লাহ্ যদি চাইতেন, তবে তিনি তোমাদেরকে একই উম্মত করে দিতেন (১৬:৯৩)" (গ) "আমি তোমাদের প্রত্যেকের জন্য নির্দিষ্ট শরিয়ত ও পথ ঠিক করে দিয়েছি এবং আল্লাহ্ যদি ইচ্ছা করতেন, তবে তোমাদের সকলকে একই উম্মত করে দিতেন (৫:৪৮)।" এ ধরনের আরো আয়াত রয়েছে, সেগুলোতে মানুষকে স্বীয় বিবেচনামত বিশ্বাস, চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। তবে সেগুলোর যথার্থতার চূড়ান্ত মূল্যায়নের ভার আল্লাহ্ নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন। এসব আয়াতে অন্যান্য অনেক বিষয়ের মধ্যে বহুত্ববাদ, বহুমাত্রিকতা, ব্যক্তি-স্বাধীনতার দর্শনও নিহিত, যা বাস্তবসম্মত।

আল-কুরআনে বিভিন্ন দার্শনিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস লালনকারীদের সম্পর্কে দৃষ্টান্ত সমেত (illustration) যে বিবরণ পেশ করা হয়েছে, সেগুলোতে প্রাচীন এমনকি আধুনিক দর্শনগত বিভিন্নতার সম্যক চিত্র অঙ্কিত রয়েছে। সেগুলো হলো: (১) তৌহিদবাদী আস্তিক, (২) নাস্তিক, (৩) আস্তিক, তবে পরকালে অবিশ্বাসী, (৪) পরকালে বিশ্বাসী, কিন্তু নবুয়তে অবিশ্বাসী। এতদসংক্রান্ত কিছু আয়াত নিম্নে বর্ণিত হলো:

১. তৌহিদবাদী আস্তিক: (ক) 'যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডল কে সৃষ্টি করেছেন এবং চন্দ্র ও সূর্যকে কে নিয়োজিত করেছেন? তারা নিশ্চয় বলবে–আল্লাহ্; (খ) পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে (কেহ) আল্লাহ্, পরকাল, ফেরেশ্তাগণ, কিতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনয়নে, অর্থ সম্পদের মোহগ্রস্ত না হয়ে তা নিকটজন, এতিম, মিসকীন, মুসাফির, সর্বহারাগণকে এবং দাসত্বের বোঝা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে প্রদানে, সালাত কায়েমে, যাকাত বিতরণে, প্রতিশ্রুতি পূরণে, অভাবে-সঙ্কটে, প্রতিকূলতায় ধৈর্য ধারণে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ ও মুত্তাকী' (২:১৭৭)।

(২) নাস্তিক: (ক) তারা বলে; 'আমার এই দুনিয়ার জীবনই একমাত্র জীবন এবং আমরা পুনরুত্থিত হবোনা' (৬:২৯)। (খ) তারা বলে, 'হায়াত তো শুধু আমাদের এই দুনিয়ার হায়াত, আমাদের হায়াত ও মউত তো এইখানেই হবে। কাল-প্রবাহ ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করে না'। বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞান নেই। ওরা তো কেবল মনগড়া কথা বলে (৪৫:২৪)। (গ) কাফেররা বলেই থাকে, আমাদের প্রথম মৃত্যুই শেষ অবস্থা এবং আমরা আর পুনরুত্থিত হবো না। অতএব, তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তবে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উঠিয়ে আনো (৪৪:৩৪-৩৬)। "এবং বলেছে, আমরা যখন হাড্ডিসার ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তখনো কি আমাদেরকে নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত করা হবে? (১৭:৯৮)।" "আমাদেরতো আর মৃত্যু হবে না, প্রথম মৃত্যুর পর এবং আমাদেরকে শাস্তিও দেওয়া হবে না (৩৭:৫৮-৫৯)।" "আমরা

মরে মাটিতে পরিণত হলেও (পুনরুত্থিত হবো)? এটা তো আমাদের যুক্তি-তর্ক ও বিবেক বুদ্ধির বাইরে! (৫০:৩)।"

এসব ধারণার বিপরীতে আল কুরআন জানাচ্ছে: "কাফেররা দাবি করে যে, তারা কখনো পুনরুত্থিত হবেনা। আপনি বলে দিন, 'নিশ্চয়ই হবে, আমার রবের কসম! তোমাদেরকে নিশ্চয় পুনরুত্থিত করা হবে; অনন্তর তোমাদের আমলগুলো জানিয়ে দেওয়া হবে, আর এটা আল্লাহ্‌র পক্ষে অতি সহজ (৬৪:৭)।" "আমি তো জানি, মৃত্তিকা ওদের (মৃত দেহের) কতটুকু ক্ষয় করে। আর আমার নিকট একখানা কিতাব রয়েছে। যাতে সব কিছু সংরক্ষিত রয়েছে (৫০:৪)"। "তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনিই হায়াত দান করেন, তিনিই মউত ঘটান, তিনিই তোমাদের রব এবং তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও রব (৪৪:৮)।" "নিশ্চয়ই আমি হায়াত দান করি এবং মউত ঘটাই, আর আমিই সকলের চূড়ান্ত ওয়ারিশ থেকে যাবো (১৫:২৩):। আল-কুরআনে প্রাসঙ্গিকভাবে সাওয়াল-জওয়াবমূলক আরো আয়াত রয়েছে, সেগুলো মানুষের জ্ঞান, চিন্তা ও ধারণা শক্তিকে আরো শাণিত করে।

(৩) চার্বাকীয় সুখবাদ (hedonism) এবং প্রবৃত্তি পূজা: এই মতবাদীদের সার কথা হলো, "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ, (when you live, live happily), ঋণং কৃত্তা ঘৃতং পিবেৎ, অর্থাৎ জীবনকে সুখে সুখে উপভোগ করো, ধার-কর্জ করে হলেও ঘি খাও। গ্রীক দার্শনিক এপিক্যুরাসের (Epicurus) [৩৪১-২৭০ খৃ: পূ] দর্শনেও এই মতবাদের প্রতিধ্বনি মিলে। তবে তাঁর সুখবাদী নীতিবাদ কোন সামাজিক তত্ত্ব নয়; এই তত্ত্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক। সুখবাদকে প্রেয়োবাদও বলা হয়। এই দার্শনিকদের মতে, মানুষের পক্ষে মৃত্যু কোনও অমঙ্গল নয়–মৃতের পক্ষেও নয়, জীবিতের পক্ষেও নয়। মৃতের কোনও অনুভূতি থাকেনা। জীবিতের নিকট মৃত্যু উপস্থিত হয় না। সুতরাং, মৃত বা জীবিত, কোনও অবস্থায়ই মানুষ মৃত্যুর সত্তা উপলব্ধি করতে পারেনা। তাই মৃত্যু মানুষের পরম অকল্যাণও হতে পারেনা। অতএব, বৃথা মৃত্যুভয়ে ভীত না হয়ে জীবনকে নিঃশেষে উপভোগ করাই বুদ্ধিমান মানুষের কর্তব্য।[১]

এই শ্রেণী সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে: "আপনি কি তার (এমন ব্যক্তির) প্রতি লক্ষ্য করেন নি, যে স্বীয় প্রবৃত্তিকে নিজের উপাস্য সাব্যস্ত করেছে (৪৫:২৩)"। "এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের রব! আমাদেরকে যা কিছু দেবে, এই পৃথিবীতেই দাও' (২:২০০)"। কুরআন ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বার্থবাদী উপভোগে বিশ্বাসী নয়। বিশ্বাসী সামষ্টিক কল্যাণময়তায়। একবিংশ শতকে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী বিবিধ পুঁজিবাদী সমাজের উপজাত তীব্র ভোগপ্রবণতা কার্যতঃ আত্মঘাতী প্রবৃত্তিপূজার মত্ত বহিঃপ্রকাশ বললে অত্যুক্তি হয়না।

৪. আস্তিক, তবে আখেরাতে অবিশ্বাসী: যারা সৃষ্টিকর্তা বা সৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন কোন 'বস্তুতে' বিশ্বাসী, কিন্তু আখেরাতে বিশ্বাসী নয়, তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে: "তারা বলে, আমরা পচা-গলা হাড়ে পরিণত হওয়ার পরও কি আবার পূর্ব অবস্থায় ফিরে আসবো? তাহলে তো এ প্রত্যাবর্তন বড়ই ক্ষতিকর হবে! (৭৯:১০-১২)।" "সে আমার সম্বন্ধে (মানবীয়) দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে গিয়ে বলে, কে জীবিত করবে এই হাড়গুলোকে, যখন সেগুলো পচে গলে যাবে?" (৩৬:৭৭-৭৮)। এ প্রশ্নের জবাবে কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, "আপনি বলে দিন, এইগুলিকে তিনিই পুনরুজ্জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি সর্বপ্রকার সৃষ্টি সম্পর্কে সম্যক অবগত (৩৬:৭৯)।" এই মর্মে আরো আয়াত আছে কুরআনে।

৫. আখেরাতে বিশ্বাসী, কিন্তু নবুয়তে অবিশ্বাসী: পরকালে বিশ্বাস করলেও নবুয়তে অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে আল-কুরআনে বলা হয়েছে: তারা বলে, "তোমরা তো আমাদের মতো মানুষ ছাড়া আর কিছু নও, দয়াময় আল্লাহ্ কিছুই নাজেল করেন নি। তোমরা শুধু মিথ্যা কথাই বলছো (৩৬:১৫)"। "সে তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ ব্যতীত আর কিছুই নহে; নিশ্চয় সে তোমাদের উপর নেতৃত্ব করতে চায়। আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে ফেরেশ্তাই নাযিল করতেন, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের নিকট কখনো এরূপ কথা শুনিনি (২৩:২৪)। যখন তাদের রসূলগণ তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শনসহকারে আগমন করতেন, তখন তারা বলতো, সে কী! মানুষ কিভাবে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করবে! (৬৪:৬)।" বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে এ ধরনের আরো আয়াত রয়েছে।

৬. অজ্ঞেয়বাদী বা সন্দেহবাদী (মুরতাব): "তোমরা... শুধু তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের সাব্যস্ত করে নেয়া কতগুলো নামেরই উপাসনা করছো, এগুলোর কোন প্রমাণ আল্লাহ্ নাযেল করেননি (১২:৪০)। "তারা তো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তির তাঁবেদারী করছে। (৫৩:২৪)।" "বরং আখেরাত সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অধিকন্তু তারা এ ব্যাপারে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে, এমনকি তারা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অন্ধ।...যখন আমরা ও আমাদের পূর্ব পুরুষরা মাটি হয়ে যাবো, তখন কি আমাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করে বের করা হবে? এ বিষয়ে তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে ওয়াদা দিয়ে আসা হচ্ছে। এটা তো পূর্ববর্তীদের রূপকথা ছাড়া আর কিছু নয় (২৭:৬৬-৬৮)। "সত্যের পরিবর্তে অনুমানের কোন মূল্য নেই। তারা শুধু অনুমানেরই অনুসরণ করে" (৫৩:২৮)।

৭. প্রকৃতিপূজা, মূর্তিপূজা, বহু দেব-দেবীপূজা: "দিন, রাত্রি, সূর্য ও চন্দ্র আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের অন্যতম; তোমরা সূর্য ও চন্দ্রকে সেজদা করোনা, বরং এগুলোর স্রষ্টা

আল্লাহ্‌কেই সেজদা করো (৪১:৩৭)। "তোমরা কি ভেবে দেখেছ লাত ও উয্‌যা সম্পর্কে এবং তৃতীয় আরেকটা মূর্তি মানাত সম্পর্কে? তোমাদের জন্য কি পুত্র সন্তান এবং আল্লাহ্‌র জন্য বুঝি কন্যা সন্তান? এটা তো খুবই অসঙ্গত বণ্টন! আসলে এগুলো তো শুধুমাত্র নাম, যা তোমরা ও তোমাদের পূর্ব পুরুষেরা রেখেছ, আল্লাহ্‌ তো ওদের সমর্থনে কোন দলিল পেশ করেন নি, তারা তো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তির তাঁবেদারী করছে, অথচ তাদের কাছে তাদের রবের পক্ষ থেকে হেদায়েত এসেছে (৫৩:১৯-২৩)।" "তাহারা সাহায্য পাবার আশায় আল্লাহ্‌র পরিবর্তে অন্য উপাস্যদের গ্রহণ করেছে, অথচ উহারা তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না (৩৬:৭৪-৭৫)।"

আল-কুরআনে এভাবে মানুষের বিভিন্ন স্তরগত শ্রেণী বিভাগ করা আছে। উপরে বর্ণিত শ্রেণী বিন্যাস মানুষের অন্তর্গত বিশ্বাস-ভিত্তিক; জাগতিক অর্থ-বিত্ত-শ্রেণীভিত্তিক নয়, সেগুলো অন্য প্রসঙ্গে বর্ণিত। তবে এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, জাগতিক ভিত্তিতে মানুষ হিসেবে আল-কুরআন সবার জন্য সমঅধিকারেরই বিধান দিয়ে রেখেছে। অন্তর্গত বিশ্বাসের ব্যাপারে আল-কুরআনের নির্দেশনা: "তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে যাদের উপাসনা করে, তোমরা তাদেরকে গালি দিওনা, কেননা তারা অজ্ঞতাবশতঃ সীমালংঘন করে আল্লাহ্‌কেও গালি দেবে। এভাবে আমি প্রত্যেক উম্মাহ্‌র (জাতির) দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপ সুশোভন করেছি। অবশেষে তাদের রবের সমীপে তাদেরকে ফিরে যেতে হবে; তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন (৬:১০৮)।

৮. সম্পদ, বিত্ত, অর্থ পূজা: এই পূজা সমতাবাদী আদর্শ ও ন্যায়-নীতির পরিপন্থী। মানব রুহের অব্যাহত গতিশীলতাসঞ্জাত পরজীবন সম্পর্কে বেখেয়াল, মদমত্ত এক শ্রেণীর মানুষ পার্থিব অর্থ-বিত্ত-সম্পদ অর্জনের জন্য উম্মাদ হয়ে অর্থপূজায় লিপ্ত। আল-কুরআন এই প্রবণতাও সমর্থন করে না। দু'একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক: যেমন : 'নিশ্চিত ধ্বংস এমন ব্যক্তির জন্য, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে; যে (লোভের বশবর্তী হয়ে) ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহা বার বার গণনা করে। সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে, কখনো না, সে নিশ্চয় হোতামায় নিক্ষিপ্ত হবে (১০৪:১-৪)। প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে (পরকাল থেকে) ভুলিয়ে রাখে, যতক্ষণ না তোমরা কবরে গিয়ে উপস্থিত হও (১০২: ১-২)।

আল-কুরআনের এসব আয়াত ছাড়াও বিভিন্ন প্রেক্ষিতে আরো আয়াত রয়েছে। যেগুলো আধুনিক পরিভাষায় শোষণ, শোষক-পুঁজি, ঠগ-পুঁজি প্রভৃতি মন্দ-প্রবৃত্তি ও ব্যবস্থাকে সরাসরি নাকচ করে। কুরআনের বণ্টন নীতির সূত্র বর্ণিত হয়েছে ৫৯:৭ আয়াতে। এতে ব্যয় খাতগুলো বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে, অর্থ-সম্পদ "যাতে কেবল তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যে আবর্তিত না হয়।" কুরআনে বর্ণিত এতিম, মিস্‌কিন,

মুসাফির, মোহাজির, দুর্দশাগ্রস্ত, অভাবী মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত প্রভৃতি আর্থিক শ্রেণী বিন্যাস সম্পর্কে সর্বাধুনিক অর্থনৈতিক সূত্রের আলোকে নিবিড় দৃষ্টি রাখতে হবে, যাতে এই অর্থনৈতিক শ্রেণীগুলোকে যে কোন সমাজে, পরিবেশে সহজে চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীও অতি ধন-সম্পদ সঞ্চয় পছন্দ করতেন না। কারণ, তা কুরআনের সম্পদ-নীতির পরিপন্থী।[২]

৯. রাজশক্তি, ক্ষমতার প্রতীক স্বরূপ ব্যক্তিপূজা, ব্যক্তির দেবতায়নঃ এগুলোও সমতাবাদী নীতি, সমমানবিক অধিকার এবং সৃষ্ট জীব হিসেবে প্রত্যেকের নিজ নিজ কল্যাণমূলক ভূমিকা পালনের অবারিত সুযোগের নীতির পরিপন্থী। হযরত ইব্রাহিমের (আ.) আমলে নমরুদ, হযরত মুসার (আ.) আমলে ফেরাউনের খোদায়ী দাবির স্বৈরতান্ত্রিক নীতি এবং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ন্যায্যতা স্বীকৃত। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়; সূরা নিসার ৭৫নং এবং সূরা বনী ইস্রাইলের ১৬নং আয়াত, যথাক্রমে "তোমাদের কী হলো যে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে যুদ্ধ করছোনা, সেই দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে"---(৪:৭৫) এবং "দুষ্কর্ম করতে থাকলে তাদের প্রতি দণ্ডাদেশ ন্যায়সঙ্গত হয়ে যায় (১৭:১৬)।" এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে আরো আয়াত রয়েছে। অতএব, ক্ষমতা মদমত্ত স্বৈরতান্ত্রিক রাজশক্তি, ক্ষমতার প্রতীক স্বরূপ ব্যক্তিপূজা কিম্বা ব্যক্তির দেবতায়ন আল-কুরআনের আদর্শ ও শিক্ষাসম্মত নয়।

এই হলো তৌহিদে অবিশ্বাসীদের প্রতি এবং অর্থ ও রাজ-রাষ্ট্র শক্তির পূজারীদের প্রতি আল-কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থান; পার্থিব মানবিক আবেদন, চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতাসহকারে বহুত্ববাদী সহাবস্থানের লক্ষ্য সম্বলিত রবুবিয়াত বা পালনবাদী নীতিই সেখানে প্রধান। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত সর্বাংশে এই সার্বজনীন পালনবাদী দর্শন ও নীতিই ধারণ ও লালন করে; যা পূর্বোক্ত অধ্যায়গুলোতে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হয়েছে।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. চার্বাক দর্শন, সুখবাদ, দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রী, কলিকাতা ১৯৫৯ইং।

২. বেলায়তে মোত্‌লাকা : সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী, সুফি সভ্যতা দিশারী অধ্যায়।

চতুর্দশ অধ্যায়

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে বহুত্ববাদী (Pluralist) সমাজ-রাষ্ট্র ব্যবস্থার ধারণা

১. সর্বজনস্বীকৃত বাস্তবতা এই যে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ভাষায়: 'সকল জাতির মিলন কেন্দ্র। প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস'। এই মহান দরবারে জাত-পাত-বিশ্বাস-নির্বিশেষে সবাই আসেন। এমনকি দৃশ্যতঃ নাস্তিক্যবাদীরাও। কেন আসেন, সেটা তাঁরাই ভালো জানেন। তাঁরা কী একটা বিশেষ আকর্ষণে বা টানে যে আসেন, তাঁদের 'আগমনই' তার প্রমাণ। এর সামাজিক বাস্তবতা এই যে, মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ মত-পথ-ধর্ম-ভাষা-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সব মানুষের মিলনভূমি, যা চরিত্রগত ও বৈশিষ্ট্যগতভাবে অসাম্প্রদায়িক, সহনশীল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানবাদী তথা সাদামাটা অর্থে ধর্মীয় সহাবস্থান তথা ধর্ম-ও ধর্ম-বিশ্বাস নির্বিশেষে নিরেট মানবিক-নফসানী ধর্ম-সাম্য ধারণ ও সংরক্ষণ করে।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের মূল ভিত্তি যেহেতু তৌহিদ বা একমেবাদ্বিতীয়ম, তাই দার্শনিক, যৌক্তিক কিম্বা গাণিতিক কোন সমীক্ষণেই এতে কোন বিভাজন থাকতে পারে না। এখানে বিভাজনের অবকাশ নেই। সকলেই এক ও অভিন্ন, সমান। আস্তিক, নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী সবার অবস্থান একই সমতলে। এটাই তৌহিদের জাগতিক গণিত এবং এই গাণিতিক ও নৈয়ায়িক নিকাশ অনুযায়ী মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত, তথা নবীজীর (দ.) ইসলাম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় বিবেচনায় বৈষম্যাতীত অসাম্প্রদায়িকতা, পৃথিবীতে বহুত্ববাদী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহনশীলতার অদ্বিতীয় নিদর্শন, যার প্রাথমিক বাস্তব সাক্ষ্য বহন করছে ঐতিহাসিক মদীনা সনদ; যা মানবিক বহুত্ববাদী সামাজিক সহনশীলতা, সহাবস্থান ও অসাম্প্রদায়িকতার নিখুঁত, সরল ও আন্তরিকতাপূর্ণ দলিল।

আগেই বলা হয়েছে, অতি সাধারণভাবে পর্যবেক্ষণ করলেও দেখা যায় যে, মাইজভাণ্ডার শরিফ চত্বরে ধর্ম-বর্ণ-বিশ্বাস নির্বিশেষে সকলের সম্মিলিতভাবে পাশাপাশি অবস্থান সামাজিক অভিন্নতা ও সাম্যের রোজকার সাক্ষী হিসেবে বিরাজ করছে।

আল-কুরআন, নবীজীর (দ.) 'ইসলাম' প্রচলিত সাধারণ অর্থে 'ধর্মের বাহন' হিসেবে অভিহিত হলেও কার্যতঃ ধর্ম হিসেবেই অসাম্প্রদায়িকতা, সহনশীলতা ও সমতাবাদী মানবিক অধিকার সম্পন্ন সহাবস্থানের সামাজিক, নৈতিক এমনকি রাজনৈতিক-ধর্ম বা

ism বা তন্ত্র হিসেবে আপনা থেকেই উদ্ভাসিত, প্রতিষ্ঠিত ও গতিশীলভাবে কার্যকর। বেলায়তে মোত্লাকা তথা মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত দৃঢ়তাসহকারে এই অসাম্প্রদায়িকতা, ধর্মীয় সহাবস্থান তথা ধর্মবিশ্বাসগত পার্থক্য স্বীকারপূর্বক সামাজিক সাম্য ও পার্থিব সম-অধিকারের কথা বলে।

সাদামাটাভাবে প্রত্যেক মুসলমান নর-নারী অপরাপর সব মানুষকে 'আল্লাহ্র বান্দা' হিসেবে দেখার ও সম্মান করার শিক্ষাই জন্মগতভাবে ও পারিবারিক পরিবেশগতভাবেই অর্জন করেন। ধর্মীয় বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতা সাধারণ মুসলিম সমাজে অনুপস্থিত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, আমাদের বাংলাদেশ অঞ্চলসমেত বিভিন্ন স্থানে মাঝে মাঝে কিছু কিছু অনভিপ্রেত ঘটনার উদ্ভব দেখা যায়, তা স্রেফ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও পার্থিব স্বার্থের দ্বন্দ্ব, যার সাথে 'ধর্মের আদর্শের' কোন সম্পর্ক নেই। বরং, তা দূরবর্তী অন্য কোন স্থানের অবাঞ্ছিত ঘটনাবলীর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এবং বাইরে থেকে বদমতলবে চাপিয়ে দেওয়া। ইসলাম যেখানেই গিয়েছে, সেখানে তৌহিদ-অস্বীকৃতি-জ্ঞাপক বিষয়াদি ব্যতীত স্থানীয় নির্দোষ লোকাচার, সংস্কৃতি, ভাষা, সঙ্গীত, শিল্পকলা, পোশাক-আসাক-খানাপিনা প্রভৃতি মানবিক অনুষঙ্গগুলোকে আত্মস্থ ও নিজের করে নিয়েছে। মানব সমাজের প্রাকৃতিক বহুত্ববাদিতা ইসলামী জীবন দর্শনের রক্ত কণিকার মতোই অন্তর্গত। এগুলো বহু শতাব্দী ধরে আজ পর্যন্ত ইসলামী বিশ্ববীক্ষা, বৈশ্বিক সংস্কৃতির মর্যাদাপূর্ণ অংশ হিসেবে বিরাজ করছে, এক মহাবাগানে বহুবিধ ফুলের উপস্থিতি ও সুবাসের মতো। অবশ্য মুসলিমরা নিজেদের বিশ্বাসগত তৌহিদী দর্শন আমাদের স্বদেশ অঞ্চল তথা ভারতবর্ষসমেত কোথাও চাপিয়ে দেয়নি এবং অপরাপর ধর্মাবলম্বীদের নিজ নিজ ধর্মাচার পালনে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার অবকাশ রাখেনি। বিভিন্ন স্থানে অতীতে ইসলাম গ্রহণের বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, সমকালে ধর্মের-মোড়কে সামাজিক বৈষম্য, পীড়ন, শোষণ, অনাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার উদ্দেশ্যে, উৎপীড়িতরা ইসলামের সার্বজনীন সমতাবাদী সামিয়ানা তলে আশ্রয় নিয়ে জীবন রক্ষা করেছেন। যাজকীয় শোষণ, পীড়ন, অনাচারের বিরুদ্ধে ইসলাম সদা সোচ্চার এবং এই গুরুভার ঐতিহ্য বহন করেন বেলায়তে মোত্লাকার পতাকাবাহী অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীও (ক.)।

২. অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বিশ্লেষণে 'মুসলিম বিশ্বাসে সদা সক্রিয় অসাম্প্রদায়িকতার স্বরূপ':

'বেলায়তে মোত্লাকা' আল-কুরআন ও নবীজীর (দ.) শাশ্বত শিক্ষা অবলম্বনে সাম্প্রদায়িকতাবাদ, বর্ণবাদ, ধনবৈষম্যবাদ বিমুক্ত একটি শান্তিপূর্ণ সমতাবাদী মানব সমাজ প্রত্যাশা করে। সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন উঠে, সাধারণ অর্থে দৃশ্যতঃ 'ইসলাম' একটি 'ধর্ম' হিসেবে বিবেচিত। তাহলে একটি 'ধর্মীয়তন্ত্র' বা 'বিশেষ ধর্মবাদীরা' কিভাবে

ধর্মতঃ অসাম্প্রদায়িক হতে পারেন? ইতিহাস, দর্শন ও বাস্তব অবস্থার আলোকে এর যুক্তিসিদ্ধ বিশ্লেষণ দিয়েছেন হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে। মুসলিম দর্শনে নবুয়ত ও বেলায়ত অভিন্ন উৎস থেকে উৎসারিত দুটো কল্যাণমুখী ধারা। নবুয়তের ব্যাপ্তির সীমাবদ্ধতা আছে এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী হযরত মুহাম্মদের (দ.) মধ্য দিয়ে এ ধারার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। তবে তাঁর নবুয়তকে বলা হয় 'নবুয়তে আম্মা' যা সর্বজনীন বিশ্বমানবতার প্রতি প্রেরিত। অন্যপক্ষে বেলায়ত বা আল্লাহ্র নৈকট্য লাভের পদ্ধতি সীমাবদ্ধতামুক্ত। তাসাওউফ দর্শনে 'বেলায়তকে নবুয়তের প্রাণ' বলা হয়। 'মোহাম্মদ ও আহমদ' নবীজীর (দ.) দু'টো তাৎপর্যপূর্ণ নাম। এই দু'নামের ব্যানারে মানবজীবনের দু'টো, তবে পরস্পর সংশ্লিষ্ট বাস্তব সত্তার প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। তাঁর মধ্যে তানজীহ্' (সূক্ষ্ম) এবং তশ্বীহ (ব্যাপক, massive)-এর ইপ্সিত সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটেছে। নবুয়ত ও বেলায়তের সমন্বিত পরম ও চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর মধ্যে। 'নবুয়ত' হলো বিশেষ নিয়মবদ্ধ সুশৃঙ্খল প্রকাশ্য বিধানের ধারা, যা 'শরিয়ত' নামে চিহ্নিত। আর বেলায়ত হলো 'সীমাহীন, সার্বিক, কিন্তু সুশৃঙ্খল সূক্ষ্ম সামষ্টিক ও সার্বজনীন কল্যাণকর্ম প্রক্রিয়া'। এর দু'টো শাখা; একটা বেলায়তে মোকাইয়াদা, অপরটা বেলায়তে মোত্লাকা। প্রথমটা প্রকাশ্য শরিয়ত সংশ্লিষ্ট এবং ইসলামী বিধান ধর্মের বিষয়, যা মুসলিমদের অবশ্য পালনীয়। এটাকে বলা হয় "বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী"। অপরটার ক্ষেত্র সার্বজনীন; সমগ্র মানবমণ্ডলী তথা সৃষ্টজগৎ এর অন্তর্ভুক্ত, যা "বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী" রূপে চিহ্নিত। স্থূল বিশ্লেষণে, নবীজীর (দ.) মক্কা জীবনে বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী'র বিকাশ ঘটে এবং মদীনায় রাষ্ট্র পত্তন ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে 'বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদীর' বিস্তার ঘটে; যেখানে সকল মানুষের জাগতিক সমানাধিকার বর্তায়, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের ভাষায় যাকে Federation of Faiths বলা যায়, মদীনা সনদ যার অকাট্য দলিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম সিকিতে তৎকালীন ভারতের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার সমাধানসূত্র হিসেবে খেলাফত আন্দোলনের নেতা মওলানা মোহাম্মদ আলী "ফেডারেশন অব ফেইথ"-এর তত্ত্ব পেশ করেন যা অরণ্যে রোদনে পর্যবসিত হয়। তবে অন্যপক্ষ তৎকালে এমনকি প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সাদামাটা ধারণাও গ্রহণ করেননি।[১]

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, নবী জীবনেই যুগপৎ নবুয়ত এবং বেলায়তের যথাক্রমে মোকাইয়াদা ও মোত্লাকা উভয় রূপের সমাহার, সমন্বয় ও বাস্তবায়ন ঘটেছে। এই সূত্র ধরে সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণমূলে হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) নবীজীর "বেলায়তী মুদ্রার 'মোকাইয়াদা' পিঠের নমুনা হিসেবে হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী এবং 'মোত্লাকা' পিঠের নমুনা

হিসেবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌কে (ক.) স্থাপন করে সপ্রমাণ করেছেন যে, "বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী"-র ইসলাম সর্বজনীন গ্রহণযোগ্য ধর্ম বা জীবন-বিধান এবং হযরত মোহাম্মদ (দ.) বিশ্ব-মানবতার নির্ভরযোগ্য প্রতীক"। অতএব, ধর্মের প্রচলিত কোন সাধারণ সংজ্ঞায় 'ইসলামকে' আবদ্ধ করা যায় না এবং মৌলিক চরিত্র ও চেতনাগতভাবে তা সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন এবং তত্ত্বে ও প্রয়োগে অসাম্প্রদায়িক। অবরুদ্ধ জেরুসালেমের সমস্যা সমাধানে হযরত ওমর ফারুকের (রা.) সামগ্রিক পদক্ষেপ এর অন্যতম ঐতিহাসিক প্রমাণ। এখানে নবীজীর (দ.) 'বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদী' নীতিই কার্যকর, যার অন্তহীন সামিয়ানা তলে সকলেরই সমান ও নিরাপদ অবস্থানের নিশ্চয়তা বিধিবদ্ধ। এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, হযরত ঈসা (আ.) থেকে শুরু করে অতীতে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ধর্ম, সদুপদেশ প্রচারক নবী-রসূল, সন্ত, সাধু, অবতার, দার্শনিকদের বহুল আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা স্ব-যুগে খণ্ডিত কিম্বা তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় কিছু আচার-বিধি, সৎগুণাবলীর নির্দেশনা, পরহিতের উপদেশ, ক্ষেত্র বিশেষে জুলুমের প্রতিরোধ করেন। তবে দুনিয়া-আখেরাতসহ সমগ্র মানবজীবনের পরিধির সব বিষয়-পরিব্যাপ্ত করে সুস্পষ্ট নিয়ম-কানুন, মূল্যবোধ, প্রশাসন, সুবিচার, সম্পদ অর্জন ও বণ্টনের সমতা বিশেষ করে দরিদ্রজনরাসহ সর্বজনীন মৌলিক মানব অধিকারের বিশদ ফর্দ ও প্রয়োগ বিধি 'ইসলাম'র মোড়কে নবীজী হযরত মোহাম্মদের (দ.) হাত দিয়েই পূর্ণাঙ্গভাবে সর্বপ্রথম প্রণীত হয়।

নবীজীর (দ.) ইসলামের এই সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ফরাসী চিন্তাবিদ রেনাল 'ইসলামকে সব মানুষেরই ধর্ম' বলে অভিহিত করেছেন। বাঙালি বামপন্থী বুদ্ধিজীবী গোপাল হালদার তাঁর বিখ্যাত 'সংস্কৃতির রূপান্তর' গ্রন্থে বলেছেন: "ইসলামে তত্ত্ব কথার ও গোঁজামিলের স্থান নাই...ইসলাম পেশাগত বা জাতিগত ধর্ম নয়, তাহা সকল মানুষের একমাত্র ধর্ম হইবার স্পর্ধা রাখে।" ইসলাম ধর্মের তাত্ত্বিক-ব্যবহারিক প্রকৃতি জরিপ করে প্রখ্যাত জার্মান দার্শনিক পল ডিউজেন (জন্ম ১৮৪৫ইং) বলেন, "ইসলাম আদতেই কোন ধর্ম নয়। কারণ, তা খুব বেশী পার্থিব জগৎ ঘেঁষা এবং জীবন ও জগতের বাস্তবতা সমর্থন করে, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি ও বাসনাগুলোকে পবিত্র বলে মনে করে।... অন্যপক্ষে সত্যিকার ধর্ম বা দর্শন মানুষকে অবশ্যই এসব থেকে দূরে রাখে।" বলা বাহুল্য, তাঁর এই অকপট মন্তব্যের মধ্যেই ইসলাম ধর্মের বহুমুখী বাস্তব রূপ পরিস্ফুট!

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের দার্শনিক প্রেক্ষাপটে একেবারে সাদা-মাটাভাবে বলতে গেলে, বেলায়তে মোকাইয়াদায়ে মোহাম্মদী ব্যষ্টিক (micro) দৃষ্টিকোণে আচারগতভাবে ইসলাম ধর্মাবলম্বী মুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; অবশ্য এখানেও অন্য ধর্মাবলম্বীদের

সকল জাগতিক অধিকার সুরক্ষিত। আর বেলায়তে মোত্লাকায়ে আহমদী বৈশিষ্ট্যগতভাবে সামষ্টিক (macro) অর্থাৎ মুসলিমসহ ধর্মমত ও বিশ্বাস নির্বিশেষে সব মানুষের কল্যাণের জন্য। এই বেলায়তে মোত্লাকার প্রাথমিক ফলিত রূপ মদীনা সনদ যা একটি বহুত্ববাদী (pluralistic) মানব সমাজের বিশ্বজনীন রূপরেখা (universal pluralistic human society)।

এখনো বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র, দেশ ও স্থানে ধর্মীয় আচারগত উম্মাদনার তাপপ্রবাহ মানব সমাজকে দগ্ধ করছে। বিশেষ করে শিল্পোন্নত আধুনিক পুঁজিবাদী কোন কোন দেশের এই পশ্চাদপদ মানসিকতার প্রকোপ প্রকাশ পাচ্ছে। তবে মহাবিশ্বের গতি-প্রকৃতি এই প্রত্যয় যোগায় যে, বিজ্ঞান-দর্শনের আরো বিকাশের ফলশ্রুতিতে মানসিকভাবে ও বাস্তবে মানবমণ্ডলী পরস্পরের আরো নিকটবর্তী হবে, সবাই মিলে এক পরিবারের মতো হবে, এমনকি মানবতাবাদী এক-বিশ্ব নির্মাণও সম্ভাব্যতার বাইরে নয়। হতে পারে দার্শনিক লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেলের পরিকল্পিত একক বিশ্ব-সরকারের ধারণার বাস্তবায়ন। হতে পারে ফেডারেশন অব হিউম্যানিটি। নবীজী (দ.) তো বলেই রেখেছেন : "সমগ্র সৃষ্ট জগৎ আল্লাহ্র পরিবার।" এই পরিবার তথা 'ফেডারেশন অব হিউম্যানিটি'-র ধারণা কার্যক্ষেত্রে কীভাবে ফলিত হবে, 'মদীনা সনদ' সেই ছকটাই এঁকে দিয়েছে।

(ঘ) মদীনা সনদ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদঃ

৫৩টি অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট মদীনা সনদের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তা স্বাক্ষরিত হয় সংশ্লিষ্ট গোত্র তথা ফেডারেটিং ইউনিটগুলোর নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা এবং নবীজী (দ.) তা প্রত্যয়ন করেন কোন সমর-ক্ষমতার প্রতিভূ হিসেবে নয়; সর্বস্বীকৃত, জননেতা বা অভিভাবক, সততা ও বিশ্বস্ততার মূর্ত রূপ কল্যাণকামী একজন 'পরিপূর্ণ মানুষ' রূপে। অন্যদিকে ১২১৫ সালের ৬৩ অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট ম্যাগনা কার্টা স্বাক্ষরিত হয় রাজা ও সামন্ত প্রভুদের মধ্যে। মদীনা সনদে স্বীকৃত ছিল মানুষের ইপ্সিত জাগতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অধিকার। ম্যাগনা কার্টার পথ ধরে 'পিটিশন অব রাইটস' (১৬২৮), 'বিল অব রাইটস' (১৬৮৮), 'হেবিয়াস কর্পাস আইন' (১৬৭৯) প্রভৃতি প্রণীত হতে সময় লাগে কয়েক শতাব্দী। তবে এগুলোতে জনগণের নিম্নতম বাঁচার অধিকারের গ্যারান্টি অস্পষ্ট। জাতিসংঘের সর্বজনীন মানবাধিকার সনদের ৩০টি অনুচ্ছেদের ১৯টিতে (৩–২১) নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার; ৬টিতে (২২–২৭), অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অধিকার এবং ২টিতে দায়িত্বের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, সদস্য দেশগুলোর প্রভাবশালী রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্সে আর্থিক সমতাবাদ দূরে থাক, অভাবমুক্ত সমাজের ন্যূনতম প্রত্যাশা, এমনকি বর্ণ বৈষম্যবাদও এখনো পুরোপুরি নির্মূল হয়নি;

অন্যদিকে শত বিচ্যুতি সত্ত্বেও মুসলিম নাগরিক প্রধান রাষ্ট্রগুলো অন্ততঃ বর্ণবাদী বিষাক্ত ছোবল থেকে এখনো মুক্ত।

মদীনা সনদের ১১টি অনুচ্ছেদে (১১-১৭, ১৯, ২০, ২২, ২৩) মুসলিমদের প্রতি আহ্বান রয়েছে পরস্পর সহনশীল, অঙ্গীকার রক্ষা, জালেমদের বিরুদ্ধে মজলুমকে সাহায্য, সপক্ষীয় ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সহায়তা প্রদান, প্রতিহিংসাপরায়ণতা ত্যাগ ও অন্যের রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে। এছাড়া ২৫-৩৬ এবং ৫১ অনুচ্ছেদে মদীনা রাষ্ট্রে বসবাসকারী ইহুদী, খৃস্টান ও অন্যান্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাতে সব হঠকারিতা চক্রান্ত পরিত্যাগ করে পারস্পরিক সহযোগিতা ও রাষ্ট্রের কল্যাণে দায়িত্বশীল হবার কথা বলা হয়েছে। ৩৭ ও ৩৮নং অনুচ্ছেদে রয়েছে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্কের নীতিমালা। এছাড়া নজরানের খ্রিস্টান সম্প্রদায় মদীনা সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হতে চাইলে যে সব নিয়ম, অধিকার ও কর্তব্য সংবিধানভুক্ত করা হয়, তার সমমর্যাদার কোন সনদ পরবর্তীকালে এখনো পর্যন্ত কোথাও সম্পন্ন হয়নি [দ্রঃ জে. ডেভেনপোর্ট, স্যার উইলিয়াম ম্যুর, ডব্লু. মন্টগোমারী ওয়াটের গ্রন্থাদি]। উল্লেখ্য, নাগরিকদের জীবন-জীবিকা ও নিরাপত্তার অধিকার কুরআন প্রদত্ত রবুবিয়াতের অলঙ্ঘণীয় বিধানেরও অন্তর্ভুক্ত। 'প্রাকৃতিক অবস্থায় মানুষ যেসব অধিকার উপভোগ করেছিল, কোন রাষ্ট্র-ব্যবস্থাই তা রদ কিম্বা কেড়ে নিতে পারেনা'– আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানবেত্তা জন লক, ভলতেয়ার, রুশো, মন্তেস্কু প্রমুখের এই সূত্র বহু বছর আগেই মদীনা সনদে দায়েমী-কায়েমী করা হয়।

মদীনা সনদ মানুষের চিরন্তন অধিকারের প্রথম দলিল। ভূমিকায় এটাকে 'কিতাব' বলে বর্ণনা করা হয়; আধুনিক অর্থে তা 'সংবিধান'। ২৩,৪০,৪৬,৫১ অনুচ্ছেদে এটাকে 'সহীফা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়, যার আধুনিক অর্থও সংবিধান। অতএব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে বিশ্বের সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান বলা হলেও প্রকৃত প্রস্তাবে 'মদীনা সাধারণতন্ত্রের গঠনতন্ত্রই' প্রথম লিখিত সংবিধান। এই সংবিধান সমন্বয়ধর্মী এবং অন্যায্য, আক্রমণাত্মক সহিংসতার বিরোধী।

(ঙ) 'আমাদের কালেরই নবী মোহাম্মদ (দ.)':

পাশ্চাত্যে বিভ্রান্তিপূর্ণ অনুবাদ, অর্থবিভ্রাট প্রভৃতি অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির দরুন কুরআন ও নবীজী (দ.) সম্পর্কে অসত্য বিকৃত ধারণার প্রসার ঘটলেও বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিশেষ করে থিওলজিক্যাল বিষয়াদি ছাড়াও রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক যথার্থ গবেষণা হচ্ছে। কায়েতানী, মন্টগোমারী ওয়াট, আলফ্রেড গিয়োম, ক্যারেন আর্মস্ট্রং প্রমুখ বিশেষজ্ঞরা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে ইসলামের নীতিতে শাশ্বত আধুনিকতা, প্রতিনিধিত্বশীল জনগণতন্ত্র, আর্থিক-সামাজিক সমতাবাদ, অভাবমুক্ত নিরাপদ মানব জীবন ও সমাজ, বিশ্বমানবিকতা, বহুত্ববাদ,

পারস্পরিক সহনশীলতা, শ্রদ্ধা ও কল্যাণপূর্ণ সহাবস্থান প্রভৃতির সূত্র ও দিগদর্শন আবিষ্কার করে নতুনভাবে মানুষের 'ধর্ম' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সংঘাত, সমস্যা, পীড়ন, শোষণ জর্জরিত বিগত শতাব্দীর বিশৃঙ্খলা-সহিংসতার প্রতিকারের পথ অন্বেষণে নেমে খুঁজে পেয়েছেন, "কুরআনের সমতাবাদী চেতনা", "শান্তিবাদী-সহনশীল-সৌহার্দ্যবাদী নবী মোহাম্মদকে (দ.)"– যার নীতির কার্যকর প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল "মানবজাতির ভবিষ্যৎ"। 'ইসলাম ইন মডার্ন হিস্টোরী' গ্রন্থে ব্যক্ত উইলফ্রেড ক্যান্টওয়েল স্মিথের অভিমতের সাথে সহমত পোষণ করে ক্যারেন আর্মস্টং বলেন : "মুসলমানদেরকে যেমন পাশ্চাত্যের ঐতিহ্য ও প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জানতে হবে, তেমনি পাশ্চাত্যকেও এই মানসিক সমস্যার ঊর্ধ্বে উঠতে হবে যে, তারা সমমর্যাদার মানুষের সাথেই পৃথিবীতে বসবাস করছে, যারা তাদের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়।" গত শতাব্দীর শেষ দশক থেকে সূচিত সংঘাত, অসহিষ্ণুতা, হিংস্র রক্তপাতে বিক্ষত বিশ্ব পরিবেশ থেকে মানব প্রজাতিকে রক্ষা করার জন্য বহু পাশ্চাত্য মনীষী পাশ্চাত্য সভ্যতাকে বুদ্ধিবৃত্তিক ও সামাজিকভাবে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে এবং চার্চকে ধর্মতাত্ত্বিকভাবে মানবজাতির অন্যান্য সদস্যদের সাথে মৌলিক শ্রদ্ধাসহকারে আচরণ করার পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যথায় তাঁরা গত শতাব্দীর মতো একুশ শতকেও বৈশ্বিক বাস্তবতা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হবেন। এ প্রেক্ষিতে ক্যারেন আর্মস্ট্রং তাঁর Muhammed Prophet for Our Time গ্রন্থের উপসংহারে বলেন: The brief history of the twenty-first century shows that neither side has mastered these lessons. If we are to avoid catastrophe, the Muslim and Western worlds must learn not merely to tolerate but to appreciate one another. A good place to start is with the figure of Muhammed: a complex man, who resists facile, ideologically-driven categorization, who sometimes did thing that were difficult or impossible for us to accept, but who had profound genius and founded a religion and cultural tradition that was not based on the sword but whose name- 'Islam'-signified peace and reconciliation. এখানে অস্তিত্ববাদী দার্শনিকদের উৎকণ্ঠার প্রসঙ্গটাও এসে পড়ে। তাঁদের মতে আধুনিক পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থায়, পুঁজিবাদের চরম উন্নতি ঘটে ঊনবিংশ শতকে। তার বিকাশের সকল সম্ভাবনা ঊনবিংশ শতকের শেষ পাদে নিঃশেষিত হয়ে যায়। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শুরু হয় তীব্র ক্ষয়ের যুগ। এখন সেখানে কেবল ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সংঘাত কিম্বা শ্রেণীর হাতে শ্রেণীর শোষণের আশঙ্কা নয়; বরং এখন মানব জীবনের প্রতি মুহূর্তের আশঙ্কা জাতিতে জাতিতে বৈরীর, ধ্বংসযজ্ঞের, শঠতা ও মিথ্যাচারের বেসাতি। উপরন্তু যে মানুষ এই আশ্চর্য সভ্যতা সৃষ্টি করেছে, সেই মানুষের

হাতেই তার নিশ্চিতভাবে বিলুপ্তির আশঙ্কার এক অযৌক্তিক, অসঙ্গত ও ভীতিজনক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, এর প্রারম্ভিক প্রকাশ হিসেবে সংঘটিত হয়েছে প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মানুষের পূর্বেকার ধ্যান-ধারণা, ন্যায়-নীতি ও শৃঙ্খলা ভেঙ্গে গেছে। এই বিপর্যস্ত অবস্থা থেকে মানুষের জন্য মুক্তি আর এগিয়ে যাবার পথ আবিষ্কার করতে উৎকণ্ঠিত মানবতাবাদী মানস। বলা বাহুল্য, নবীজী (দ.) বহু পূর্বেই মদীনা সনদের মাধ্যমে সে পথের দিশা দেখিয়ে গেছেন, যা অস্তিত্ববাদী দর্শনের (existentialism) বর্তমান উৎকণ্ঠাও দূর করতে পারে। এই পথ ধরে অস্তিত্ববান হতে পারে দার্শনিক লর্ড বার্ট্রান্ড রাসেলের যুদ্ধমুক্ত পৃথিবী এবং মানবতাবাদী 'বিশ্ব সরকার'-এর ধারণা। হতে পারে মহান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের ভাবনার 'মরণাস্ত্রমুক্ত বিশ্ব পুঁজিবাদী, একচ্ছত্রাধিপতি প্লুটোক্র্যাটদের অক্টোপাসমুক্ত, সমতাবাদী চেতনা ও কর্মসূচীমণ্ডিত এক-বিশ্বের (One-World) পত্তন, যা বেলায়তে মোত্লাকা তথা ইসলামেরও মূল সামাজিক দর্শন ও লক্ষ্য।

ষষ্ঠ শতাব্দীর দাস ও সামন্ত অর্থনীতি ভারাক্রান্ত বিশৃঙ্খল আরব ভূমি তথা বিশ্বের সাথে এই একবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান, মারণাস্ত্র, শিল্প অর্থনীতির উন্নত কিন্তু উগ্র প্লুটোক্র্যাট, বিশৃঙ্খল বিশ্বের গুণগত পার্থক্য তেমন নেই। এই জটিল সমস্যার সুশৃঙ্খল সমাধানের সূচনা বিন্দু কি? ক্যারেন আর্মস্ট্রং ইতিহাস ঘেঁটে সেই সূচনা-বিন্দু স্থির করে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন : মুহাম্মদ (দ.) আমাদের কালের নবী (Muhammed : Prophet for Our Time)। তিনিই সমতামণ্ডিত বহুত্ববাদী প্রত্যাশিত আগামী বিশ্বেরও দিশা। তিনি শাশ্বত এবং সকল অর্থেই আমাদের কালেরও নবী। তিনি সাধারণ মানুষের নবী বা Prophet of the Masses (নবীউল উম্মি)।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. (ক) মওলানা মোহাম্মদ আলী: "মাই লাইফ"; (খ) রাজমোহন গান্ধী : আন্ডারস্ট্যান্ডিং মুসলিম মাইন্ড।

[বিশেষ নোট: মদীনা সনদের বিশদ বিবরণ এবং নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে নজীবীর (দ.) ঐতিহাসিক চুক্তিনামা চতুর্থ ভাগে দেওয়া হয়েছে]।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পালনবাদী সমাজবাদ : মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী রাষ্ট্র-ব্যবস্থা

১. 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থের নবম পরিচ্ছেদে 'সুনেতৃত্ব ও ধর্মসাম্য' অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: "এমন কোন দেশ, জাতি, সমাজ বা পরিবার নাই, যাহারা তাহাদের মধ্য হইতে একজনকে নেতা বা শাসক হিসাবে মানে না। যেই দেশ, জাতি বা সমাজে উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব আছে, তাহারা উন্নত নহে। পক্ষান্তরে, যাহারা উপযুক্ত নেতৃত্বের অধীন, তাহারা উন্নত ও সম্মানিত। উপযুক্ত নেতৃত্বই প্রচ্ছন্ন খেলাফতে রব্বানী বা খোদায়ী প্রতিনিধিত্ব নামে অভিহিত।" এ বর্ণনার মধ্যে আল-কুরআন তথা নবীজীর (দ.) ইসলামী জীবন ও সমাজ দর্শনের আলোকে 'খেলাফতে রব্বানী বা উপযুক্ত নেতৃত্ব ও কল্যাণমণ্ডিত প্রশাসনের একটা ধারণা নিহিত রয়েছে। খেলাফতে রব্বানীর ভিত্তি রাব্বুল আলামিন আল্লাহ্র রবুবিয়াত বা পালনবাদী সত্তা। নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রসঙ্গেও একই সাথে বলা হয়েছে; "এই জগতে তিনিই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহার ব্যক্তিত্ব হাসেল আছে। এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকেই 'খেলাফতে উলুহিয়াত' বলা হয় এবং এই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ব্যক্তিই নেতৃত্বের উপযোগী, যেহেতু তাহারা উত্তেজনা পরিহারী ধর্মসাম্য উন্নয়নকারী। ইনিই খোদা অনুসন্ধিৎসু মানবের দিশারী। এ প্রসঙ্গে সূরা 'ফাতাহ্'র ৪৮:১৬-১৭ আয়াতের মর্মবাণীর অনুসরণে বলা হয়েছে, "সু-নেতৃত্বশীল সংগ্রামশীল মানবজাতির ভবিষ্যৎ অতি উত্তম।"

২. সমাজ-ভাবনার মারিফাতী পটভূমিকা:

উপরের অনুচ্ছেদে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সমাজে উত্তেজনা পরিহার তথা 'শান্তি' এবং 'ধর্ম-সাম্য' উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। সমাজে ধর্ম তথা মতবাদ, আদর্শ নির্বিশেষে সকলের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানপূর্বক শান্তি প্রতিষ্ঠাই সার্বিক কল্যাণের পূর্বশর্ত, যা নবীদের যুগ থেকে এই একবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত সকল রাষ্ট্র ও সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকদের সমাজ-সংহতিমূলক দর্শনের প্রথম কথা।

বেলায়তে মোত্লাকা বা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সমাজ-ভাবনায় সুনির্দিষ্টভাবে দুটো মৌলিক স্তম্ভের বিবরণ বিবৃত হয়েছে, (ক) তৌহিদের জ্ঞান, (খ) রবুবিয়াতের জ্ঞান। দার্শনিক সুফি হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর (র.) ভাষায়: "তৌহিদী জ্ঞান বস্তুতঃ আল্লাহ্র আবুদিয়াত বা আনুগত্যের জ্ঞান। সব কাজে হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এর পায়রবি করাও আবুদিয়াতের অন্তর্ভুক্ত। আর রবুবিয়াতের জ্ঞান বা খোদাতত্ত্বের জ্ঞান

দুনিয়ার শান্তি-সুখ-সমতার উদ্দেশ্যের মধ্যে গণ্য।" ইমাম গাজ্জালী (র.) মানুষের নিজের প্রতি কর্তব্যজ্ঞানকে সমাজ ভাবনার তৃতীয় অনুষঙ্গ হিসেবে স্থির করে (ক) আত্মদোষ সংশোধন এবং (খ) আত্মসৌষ্ঠব সম্পাদন অপরিহার্য বলে উল্লেখ করেছেন; কারণ প্রকৃত মানব নির্মাণ ব্যতীত সুন্দর সমাজ নির্মাণ সম্ভবপর নয়।[১] মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে এই তিন বিষয়ই সমগুরুত্বসম্পন্ন উপজীব্য। তৌহিদে আত্মসমর্পণ স্বচ্ছ বিশ্বাস ও অন্তরের বিষয়, যা দর্শনযোগ্য বা ইন্দ্রিয়জ অনুভবযোগ্য নয়। আরো সহজভাবে বলা যায়, "আল্লাহ্"–এই অনির্বচনীয় নামের কোন সংজ্ঞা নেই, তা সংজ্ঞাতীতই রয়ে গেছে। দার্শনিকরা বলেন, আল্লাহ্ সম্পর্কে কোন সার্বিক ধারণা করা যায় না। তাই তাঁকে জানতে মুসলিম সুফি, দরবেশ, দার্শনিকরা তাঁর সিফত এবং বিশ্ব-প্রকৃতিতে এসব সিফতের প্রকাশ, ক্রিয়া ও অবিরাম গতিময়তার সম্যক ধারণা লাভের উপর গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন কুরআন অবতীর্ণ হবার সময় থেকেই। তবে স্মরণ রাখতে হবে যে, আল্লাহ্র গুণাবলী মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আল্লাহ্র গুণাবলী ও তাঁর সৃষ্টজীবের গুণাবলীর পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয়, গুণগত ও প্রকৃতিগতও। তাঁর গুণাবলী তাঁর সৃষ্টজীবের গুণাবলী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তাঁর অস্তিত্ব সৃষ্টজীবের অস্তিত্বের অনুরূপ নয়। তিনি সকল গুণের আধার। তবে তা বোধাতীত। (এ বিষয়ে আশারিয়া দার্শনিক তত্ত্ব এবং প্রায় একইভাবে আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের লিবনিয, কান্ট, স্পিনোজা প্রমুখের প্রখ্যাত দার্শনিক তত্ত্বে বিশদ বর্ণিত হয়েছে)। 'আল্লাহ্'–শব্দটা আল্লাহ্র ইসমে জাত বা সারসত্তা (The Essence)। 'আহাদ' শব্দটাও 'ইসমে জাত'-এর সাথে সংযুক্ত।

আল্লাহ্র করুণাসিক্ত ক্রিয়ার মহত্তম দৃশ্যমান প্রকাশ তাঁর 'রব্' সিফতজাত ক্রিয়ার মধ্যে। আল-কুরআনে আল্লাহ্র ১৩৩টি গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। এগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম ও প্রধান হলো: রব্ অর্থাৎ রাব্বুল আলামিন। এই 'রব্' শব্দটার অর্থ হলো সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, বিবর্তনকর্তা (Creator, Sustainer, Evolver: Vide; Arabic-English Lexicon, by Lane; England)। আল-কুরআনে এই 'রব' সিফাতটার আট শতাধিকবার উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্র সিফাতগুলো কেবলমাত্র কল্পিত ধারণা বা abstract mental idea নয়, এগুলোর বাস্তব রূপ ও ক্রিয়া পৃথিবী তথা মহাজগতে বিদ্যমান ও দৃশ্যমান এবং তাই এই ধারণাত্মক গুণগুলো নিতান্তই বাস্তব অর্থাৎ বস্তুনিষ্ঠ, কর্মনিষ্ঠ গুণবাচক বা objective attributes। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহিঃপ্রকাশের (manifestation) বা রূপায়ণের ইজেল এই সর্বজনীন পালনবাদ, যেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে মানুষ প্রাকৃতিক সুবিচার বা আদলের ছায়াতলে থেকে পার্থিব জগতে সমতামূলক অধিকারের নিশ্চয়তা পাবে; যার সরল অর্থ "অভাবমুক্ত জীবন" যাপনের উপযোগী জীবিকার সংস্থান।

রবুবিয়াত বা পালনবাদী দর্শনের উদ্ভবঃ

মানব সমাজের প্রগতিশীল বিবর্তনে রবুবিয়াত বা পালনবাদের নীতির আবির্ভাবও তাৎপর্যমণ্ডিত। হযরত ইব্রাহিমের (আ.) ক্বলবে আল্লাহ্‌র সম্পর্কে যে প্রতীতি উদ্ভাসিত হয়েছিল তা স্রষ্টার মৌলিক শাশ্বত চিরন্তনতা ও সর্বশক্তিমত্তা (absoluteness, infinitude and omnipotence beyond limitations of space and time)। সময়ান্তরে এর সাথে যুক্ত হলো, হযরত মূসার (আ.) কাছে উদ্ভাসিত প্রতীতিঃ পৃথিবীতে জুলুমের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ এবং ন্যায়-বিচার কায়েম। দাসপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর বিদ্রোহ ও প্রতিরোধ ইতিহাসের পালা পরিবর্তনকারী অধ্যায়। তাঁর বিধানে দেখা যায়; দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ, জীবনের বদলে জীবন নিয়ে সমতার পাল্লার 'কাঁটা' স্থির করা। হযরত ঈসা (আ.) এই দুই ধরনের প্রতীতির সাথে যোগ করলেন কোমলতামণ্ডিত ভালোবাসা–একগালে চড় মারলে অন্য গাল পেতে দেবার তত্ত্ব। তবে তিনি ধর্ম কিম্বা উপাসনালয়কে অর্থ আহরণ, ব্যবসা-প্রতিপত্তির হাতিয়ার কিম্বা অবলম্বন হিসেবে ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন এবং এ জন্যে তাঁকে কূল-যন্ত্রণা পোহাতে হয়। সব শেষে হযরত মুহাম্মদের (দ.) স্তরে এসে ঐ তিন পদের সাথে যুক্ত হলো সর্বজনীন পালনবাদ ও বিচার-সাম্যের নীতি। জুলুম-অসাম্য-অবিচার এই পৃথিবীতে থাকতে পারবে না। পৃথিবী মানুষ ও সব সৃষ্ট জীবের জন্যে। মানুষই সমগ্র সৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু, আশরাফুল মাখলুকাত। পৃথিবীতে মানুষ নিজের কর্মের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক সীমারেখা অনুযায়ী স্বাধীন। ভালো-মন্দ নির্বাচনের বিচার-বুদ্ধি, বিবেক তাকে দেওয়া হয়েছে প্রকৃতিগতভাবে। তার কর্মের মূল্যায়ন হবে আখেরাতে, বিচার-দিবসে। আখেরাতের একটা ভেদ হলো, রুহের অব্যাহত অস্তিত্ববানতা, অপর তাৎপর্য হলো একটা নির্দিষ্ট জবাবদিহিতামূলক মন্‌জিল বা গন্তব্যস্থল; যা মানুষকে পৃথিবীতে ভালো কিছু কর্মসূচীর প্রতি দায়বদ্ধ রাখবে। মানব জীবন অতীব অর্থপূর্ণ এবং এর একটা পার্থিব ও রুহানী ছক উপহার দিলেন হযরত মুহাম্মদ (দ.)। হযরত ইব্রাহিম (আ.) তথা তাঁরও উৎস-পুরুষ হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত দার্শনিক-জাগতিক ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিক পালনবাদী প্রগতিশীল বিবর্তনশীলতা দর্শনীয়। রবুবিয়াত বা পালনবাদী নীতির মধ্যে রয়েছে প্রকৃতির কাছে অসহায়, ক্ষুধিত, বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের মুক্তির সনদ, যা জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটা মানুষ তথা জীবের প্রাথমিক মৌলিক চাহিদা। বেলায়তে মোত্‌লাকার গ্রন্থকার অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) এসব মানবিক বিষয়কে সমন্বিত করে বর্তমান জমানার সমস্যাবলীর সমাধানসূত্র হিসেবে পেশ করেছেন হযরত আকদাসের (ক.) জীবন ও কর্ম থেকে তিল তিল করে আহরিত শিক্ষামূলক উপাদানের সমাহার ঘটিয়ে; যাতে পালনবাদী নীতিই বাজ্ময়।

৩. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সামাজিক ভিত্তি পালনবাদী সমাজবাদ বা রবুবিয়াতঃ

এ পর্যায়ে 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে বর্ণিত 'কুরআন ভিত্তিক ধর্ম ব্যবস্থা' এবং মোহাম্মদ মোস্তফার (দ.) জীবন ও কর্মকে 'মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্ব মানবতার প্রতীক' হিসেবে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আদর্শিক ভিত্তিরূপে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা ও বাস্তবতার উপর আলোকপাত করা দরকার আধুনিক সমাজ-চিন্তার আলোকে।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.), অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিংশ শতাব্দীর মানুষ, যখন বাংলাদেশসহ সমগ্র হিমালয়ান উপমহাদেশ তথা গোটা এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা প্রচণ্ড ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী শোষণে জর্জরিত। তাঁরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন এর ভয়াবহতা। দেখেছেন এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, বিদ্রোহ ও সংগ্রাম। অছিয়ে গাউসুল আযম নিজেও ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক প্রতিবাদ ও সংগ্রামের একজন সৈনিক। সমীক্ষণবাদী (critical) বিশ্লেষণে প্রতিভাত হয় যে, হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.), অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) পৃথিবীতে ভারসাম্যপূর্ণ, বিচারসাম্যবাদী, সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত মদীনা-সনদে চিত্রিত একটি শান্তিপূর্ণ কল্যাণময় মানব সমাজেরই প্রবক্তা ও নিজ নিজ পরিমণ্ডলে এই সমাজ বিনির্মাণের সাধক ছিলেন।

৪. পালনবাদের আধ্যাত্মিক প্রাকৃতিক-বৈজ্ঞানিক-রাজনৈতিক-সামাজিক তাৎপর্যঃ

(ক) মানুষের পার্থিব জীবনের কর্তব্য-কর্মকে মোটা দাগে দু'ভাগে ভাগ করা হয়, (ক) হক্কুল্লাহ্, (খ) হক্কুল ইবাদ। হক্কুল্লাহ্'র মূল কথা হলো, আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো বন্দেগী না করা এবং তাঁর প্রদত্ত নিয়ম-কানুন বিশ্বস্ততাসহকারে পালন করা। অপরটা হলো হক্কুল ইবাদ বা বান্দার অধিকার মিটিয়ে দেওয়া। উল্লেখ্য, হক্কুল ইবাদ পূরণ করা চূড়ান্ত পর্যায়ে হক্কুল্লাহ্ আদায় করারই নামান্তর। কারণ, আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদেরকে প্রকৃতিসম্মতভাবে তৃপ্ত দেখতে চান। তিনি তৃপ্তির আলোয় ঝলমলে দেখতে চান তাঁর সৃষ্টজগৎ বা মাখলুকাতকে। আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরায় হক্কুল্লাহ্র পাশাপাশি হক্কুল ইবাদ আদায়ের এবং সৎ মানুষ হবার জোর তাগিদ রয়েছে, যা এ গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে বিবৃত হয়েছে।

পালনবাদের দার্শনিক-আধ্যাত্মিক ভিত্তি হলো 'হক্কুল ইবাদ'। হযরত আকদাসের জীবনী-গ্রন্থে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণভাবে তাঁর জীবন-দর্শনের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে পৃথিবীতে হক্কুল ইবাদ "স্বত্ব সাব্যস্তে মানব স্বত্ব রক্ষণাবেক্ষণের" প্রতি তাঁর দায়িত্বশীলতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে: "...যেইখানে নিষ্ঠুর কোন আচরণ নাই।

আছে শুধু স্বত্ব ও সত্যের তথ্য আবিষ্কার, আছে শুধু হক ও না-হকের স্বার্থপূর্ণ মহা সমস্যার সমাধান[২]।"

অতএব, হযরত আকদাস (ক.) সমীক্ষণমূলকভাবেই 'মানব স্বত্ব বা হক্কুল ইবাদ' তথা আল্লাহ্‌র পালনবাদকে, স্বীয় জীবনের পার্থিব আদর্শ, ভিত্তি ও লক্ষ্য হিসেবে নিয়েছেন, যা অনুভবযোগ্যভাবেই এখনো অব্যাহত।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবন-দর্শনের শব্দচিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে অছিয়ে গাউসুল আযম সংক্ষেপে উপরোক্ত সংজ্ঞামূলক যে সহজ বাক্যটা লিপিবদ্ধ করেছেন, পালনবাদী দর্শন ও আদর্শের ভিতর ও বাহির তাতে সম্যক ফুটে উঠেছে এবং আধুনিক বিশ্লেষণে তা কল্যাণমূলক রাষ্ট্রনৈতিক আদর্শ ও সমাজতত্ত্বের সার কথা। এই পালনবাদী রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে বিভিন্ন দার্শনিক মনীষী ও রাজনীতিবিদের সংক্ষিপ্ত কিছু অভিমত লিপিবদ্ধ করা গেল, যাতে দেখা যাবে যে, পালনবাদ ভিত্তিক প্রশাসনিক কর্মসূচি 'মদিনা সনদ' জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে যেন প্রাকৃতিকভাবেই বিশ্বের বিভিন্ন সমাজে কার্যকর হয়ে চলেছে, কল্যাণমূলক প্রশাসন ও অর্থব্যবস্থা (welfare state and economics) যার শেষ কথা।

(খ) শিক্ষক-দার্শনিক আজাদ সুবহানী

শিক্ষক-দার্শনিক আজাদ সুবহানীর মতে নফ্‌সানিয়াত ধনতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মূল থেকে অঙ্কুরিত হয়ে জীবিকার অসাম্য এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলারূপে প্রকাশিত হয়। এটা বিষবৎ দ্রুত সমগ্র জাতিতে সংক্রমিত হয়ে যায়; ফলে সেই জাতি বুদ্ধিবৃত্তি খুইয়ে বসে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, এই বিষের একটি মাত্র প্রতিষেধকই রয়েছে– তা হলো রব্বানিয়াত; রবুবিয়াতের সুধায় যা প্রস্তুত হয়[৩]। হযরত আকদাসের আত্মোপলব্ধি ও প্রত্যয়ের সাথে এই সূত্রের কী গভীর সামঞ্জস্য!!

(গ) দার্শনিক-রাজনীতিক আবুল হাশিম

মনীষী আবুল হাশিম কলেমা তাইয়েবাকে রবুবিয়াতের 'শিকড়' হিসেবে দেখেছেন এবং বিশ্বপ্রকৃতি, মানব সমাজের শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতি, জীবজগৎ, বস্তুজগতে তথা সর্বত্র এর বহুমুখী বিকাশ ও বিস্তার লক্ষ্য করেছেন। তাঁর দর্শন মতে: "কলেমার আল্লাহ্ এক। তিনি কোন বিশেষ পরিবার, গোষ্ঠী অথবা জাতির সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, বিবর্তনকর্তা অর্থাৎ 'রব্' নহেন, বরং সমগ্র বিশ্ব জগতের এবং নবী হযরত মোহাম্মদ (দ.) সমগ্র মাখলুকাতের জন্য রহমত-স্বরূপ। মানবজাতি অভিন্ন এবং আল্লাহ্‌র পরিবার। রব হিসেবে অভিন্ন নীতিতে সকলের প্রতিপালন করেন বিধায় তাঁর এই নীতি রবুবিয়াত বা 'পালনবাদ' নামে অভিহিত"। এই নীতিকে অবলম্বন করে সমতাবাদী সামাজিক-অর্থনৈতিক-বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। অর্থনীতিই যেহেতু রাজনীতি ও সামাজিক সম্পর্কের ঘনীভূত প্রতিফলন ও নিয়ামক, সেহেতু

কলেমার অর্থাৎ রবুবিয়াতের অর্থনীতি সম্পর্কে তাঁর ধারণার সংক্ষিপ্তসার পরিবেশন করা হলো: Economy of the Kalima is not based on hatred of any class or individual and for its implementation in the affairs of man force and violence is not necessary, for it is in perfect harmony with nature and is conducive to the welfare of all... The Kalima successfully made the Arabs conscious of the evils of man's ownership of material wealth, its unrestricted possession and hoarding and the virtues of just and equitable distribution of wealth, and thus a socialist order of human existence was created in Medina spontaneously without force and violence:.. So socialism of the Kalima is founded.. on man's natural instinct of self-preservation and self-development and on his knowledge of preservation and development of life acquired from the knowledge of the laws of Nature's economy."

এই সূত্রের সমর্থনে তিনি উদ্ধৃতি দেন আল-কুরআনের 'সূরা হাশরের প্রসিদ্ধ আয়াত: '(ধন-সম্পদ) যেন তোমাদের বিত্তবানদের মধ্যেই আবর্তিত হতে না থাকে (৫৯:৭)' এবং সূরা হুমাযার আয়াত: 'যে ধন-সম্পদ জমা করে এবং উহা বার বার গণনা করে, সে মনে করে যে, তার ধন-সম্পদ তাকে অমর করে রাখবে। কখনো না। সে নিশ্চয়ই হোতামায় নিক্ষিপ্ত হবে (১০৪: ২-৪)'। এতদসংশ্লিষ্ট আরো আয়াতের তিনি উদ্ধৃতি দেন, যেগুলোতে সুষম বণ্টন, পরামর্শমূলক গণতান্ত্রিক প্রশাসন প্রভৃতি মানব-ইপ্সিত বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে একটা বিষয় পরিষ্কার হলো যে, রবুবিয়াতের অর্থনীতি প্রকৃতির অর্থনীতি।[৪] উল্লেখ্য, 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থেও অর্থনীতি সংক্রান্ত বিষয়ে আয়াতাদি উদ্ধৃত হয়েছে।

(ঘ) মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী

আজন্ম পার্থিব বিনিময়–বিমুখ, নিরলস শিক্ষাব্রতী, মহান প্রগতিবাদী দার্শনিক-রাজনীতিবিদ মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী গোটা বিংশ শতাব্দীতে দ্রুত বিবর্তনশীল ও পরিবর্তনশীল সামন্তবাদ, উপনিবেশবাদ, শিল্প-বিপ্লবোত্তর শোষক পুঁজিবাদ, ব্যালটের গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ, আধিপত্যবাদ, কর্পোরেট শোষণবাদ প্রভৃতি রকমারী শোষণ প্রক্রিয়ার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে জাতি-বর্ণ-ধর্ম-ভাষা নির্বিশেষে মানব-মুক্তির অন্যতম মূল্য সূত্র হিসেবে চয়ন করে গেছেন পালনবাদী তথা রবুবিয়াত নীতিসম্মত সমাজ-রাষ্ট্র-বিশ্বব্যবস্থাকে। তিনি রবুবিয়াতের বা পালনবাদের সামগ্রিক নীতি অত্যন্ত সহজ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন: "পালনবাদী রাষ্ট্রে থাকিবে স্রষ্টার পালনবাদ; মানুষের শাসনবাদ নহে।... জাতি, ধর্ম, নির্বিশেষে কোন দেশের প্রশাসনিক,

বাণিজ্যিক, শিক্ষাগত, ধর্মীয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে বান্দার হক্ব বুঝাইয়া দেওয়াই হইল হুকুমতে রব্বানীয়ার প্রথম শর্ত। তজ্জন্য সামাজিক সাম্য, অর্থনৈতিক প্রয়োজনভিত্তিক বণ্টন, তামাদ্দুনিক উৎকর্ষ ইত্যাদি অপরিহার্য। মোট কথা, সকল ক্ষেত্রে বান্দার স্বাভাবিক সামঞ্জস্যপূর্ণ হক্ব বুঝাইয়া দাও–তাহার অধিকারের আমানত বিন্দুমাত্র খেয়ানত করিওনা। ... যে কেউ প্রশ্ন করিতে পারেন, হুকুমতে রব্বানীয়া কিভাবে অমুসলমানদেরকে আপন করিয়া লইবে? যাহারা রবুবিয়াতের মর্ম বুঝেন না, তাহাদের পক্ষে এই প্রশ্ন করা খুবই স্বাভাবিক। রবুবিয়াত কোন ধর্মের কথা নহে। উহা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের একটি স্বতঃসিদ্ধ বিধান। তাই হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান-সকল মানুষের জন্য হুকুমতে রব্বানীয়া অর্থাৎ যে দেশে রবুবিয়াতের আদর্শ রাষ্ট্রীয় ভিত্তিতে কায়েম হইয়াছে, কল্যাণকর বৈ কিছু নয়। মুসলমানদের জন্য যিনি রব বা পালনকর্তা, বিবর্তনকারী প্রভু; হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান সবার জন্য তিনিই একই বিধানে আলো-হাওয়া, ফল, পানি, খাদ্য, বস্ত্র সবই যোগাইতেছেন।...ইহার সাথে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের কোন সম্পর্ক নাই। তাই সকল ধর্মাবলম্বী উহার উপকারিতা ভোগ করিতে পারিবে। নিজ নিজ ধর্মীয় দর্শনের ভিত্তিতে প্রতিটি মানুষের উন্নতি ঘটিবে[৫]।" অর্থাৎ জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের হক্ব বুঝিয়ে দেওয়াই পালনবাদের প্রথম কথা।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা বেলায়তে মোত্লাকা তৌহিদ ও নবীজী হযরত মোহাম্মদের (দ.) রিসালাত-নবুয়তের বহুত্ববাদী শিক্ষার ভিত্তিতে যে শান্তিময় মানব সমাজ বিনির্মাণের প্রত্যাশা করে, সেখানে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের সমতাবাদী, নিরাপদ অভিন্ন অবস্থানের সম্ভাব্যতা সম্পর্কিত সব জিজ্ঞাসার যৌক্তিক জবাব ও সমাধান এই সূত্রের মধ্যে নিহিত এবং পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত।

(ঙ) মওলানা আবুল কালাম আজাদ

বিংশ শতাব্দীর ভারতের শীর্ষস্থানীয় বিদগ্ধ নেতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় রাজনীতিবিদ, বিখ্যাত মুফাস্সেরে কুরআন, ঐতিহাসিক, ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম-এর মতো অতুল গ্রন্থের লেখক মওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর সুবিখ্যাত "উম্মুল কুরআন" গ্রন্থে বলেন: 'রবুবিয়াত হলো এই যে, পৃথিবীতে জীবন ধারণের সব প্রয়োজনীয় বস্তু মওজুদ থাকার সঙ্গে সঙ্গে তার যথাযথ বণ্টন-ব্যবস্থা রয়েছে। নির্ধারিত সময়ে সবাইকে নির্দিষ্ট পরিমাণে যথোপযোগী বস্তু সরবরাহ করা হচ্ছে। যেই জীবনে যে-বয়সে যা যতটুকু দরকার, তা সুশৃঙ্খলভাবে যথাসময়ে পৌঁছানো হচ্ছে। এভাবে নিয়মিত ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবজগতের এই বিরাট কারখানা পরিচালিত হচ্ছে।... কুরআন আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কে যে চিত্র অঙ্কন করেছে, তা হলো রবুবিয়াত, রহমত ও আদালত। সূরা ফাতিহায় হাম্দ-এর পর ধারাবাহিকভাবে এসব গুণের উল্লেখ করা হয়েছে।... 'রব' শব্দটি ইব্রানী, সুরিয়ানী, আরবী, প্রাচীন মিশরী ও কালদানী ভাষায় সৃজনকর্তা,

পালনকর্তা, বিবর্তনকর্তা, শিক্ষক ও প্রভু অর্থে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক রাগেব ইস্পাহানী 'রবুবিয়াত' শব্দের অর্থ সম্পর্কে লিখেন: 'কোন কিছু এরূপ ভাবে স্তরে স্তরে প্রতিপালন করা যেন তা বিভিন্ন অবস্থায় যথোপযোগী প্রয়োজন মিটিয়ে সর্বোতভাবে লালিত-পালিত হয়ে চরম পরিণতিতে পৌঁছাতে পারে।' এই রবুবিয়াত 'দয়া-দাক্ষিণ্য' নয়, তা করা হয়, নিঃস্বার্থ ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে এবং নিঃশর্ত স্নেহ-ভালোবাসার অন্তর্গত তাগিদে। তিনি বাস্তব দৃষ্টান্তসহকারে ব্যাখ্যা করেন যে, রবুবিয়াত নীতি মানুষসহ প্রাণী জগতের সর্বক্ষেত্রে বিজ্ঞান বা অন্তর্জাত জ্ঞানরূপে সতত ক্রিয়াশীল[৬]।

লক্ষ্যণীয় যে, রবুবিয়াতের অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি একেবারে শব্দমূল বা বুৎপত্তিগত অর্থেই প্রচলিত অর্থনীতি, সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির সঙ্কীর্ণ বৃত্তের অনেক বাইরে অন্তহীন কল্যাণময়তার দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এই রবুবিয়াত, খেলাফতে রব্বানী ভিত্তিক সমাজই প্রত্যাশা ও সাধনা করে।

(চ) জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ

রবুবিয়াতের বা পালনবাদের ভিত্তিতে মদীনা সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে দাস ও সামন্ত যুগে পৃথিবী 'রাজা', 'সম্রাট', 'অস্ত্রশক্তি নির্ভর স্বৈরশাসক' [যাদের উপর 'ঈশ্বরত্ব' আরোপ করা হতো, কিম্বা যারা ঈশ্বরের প্রতিভূত্ব এমনকি 'ঈশ্বরত্ব' দাবী করতো] ব্যতীত সকলের সম্মিলিত সম্মতিভিত্তিক, বৈষয়িক সম্পদবিহীন অস্ত্রবলবিহীন নেতৃত্বের গণতান্ত্রিক সরকার ও প্রশাসন ব্যবস্থা দেখেনি। দেশ ও সাম্রাজ্য বলতে যা বুঝাতো, তা একই সাথে 'ক্রীতদাস', 'কৃষি দাসে' ভর্তি 'রাজন্যদাস প্রথা' তথা আধুনিক পরিভাষায় 'রাজনৈতিক দাস প্রথারই' নামান্তর মাত্র। সেই অচলায়তনের যুগে সংশ্লিষ্ট জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ও সমর্থিত সাধারণতান্ত্রিক প্রশাসনের যে 'জমজম' সৃষ্টি হয়েছিল, সেই জমজমের আব বা পানি আইল বেঁধে ঘিরে রাখার জিনিস ছিল না। মানব-সমাজে ফল্গুধারার মতো তা ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষকে সচল করে তোলে, যার ফলশ্রুতিতে জনগণের প্রতিপক্ষ হিসেবে দণ্ডায়মান 'স্বৈরী সাম্রাজ্যতন্ত্রের অচলায়তন' হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়ে। জনগণের সমর্থন চলে যায় সাম্য ও সুবিচারের পতাকাবাহীদের দিকে। এরপরও 'রাজতন্ত্র' কষ্টে-সৃষ্টে নিজের আসন অক্ষুণ্ন রাখে। সামন্ততন্ত্রের পর বণিকতন্ত্র, অতঃপর যন্ত্রশিল্পজাত পুঁজিতন্ত্রের শোষণমূলক আবির্ভাবে মানুষের চেতনায় প্রচণ্ড ধাক্কা লাগে। তবে পুঁজিতন্ত্র নিজের স্বার্থে জনগণের স্বার্থে ক্ষেত্র বিশেষে রফা করতে বাধ্য হয় এবং এক পর্যায়ে ভোটাভুটির মাধ্যমে শাসক নির্বাচনের রীতি প্রবর্তনের মধ্যে মদীনা সাধারণতন্ত্রের চেতনার 'আবে জমজম' মানব সমাজে খণ্ডিতভাবে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ লভে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী-গণতান্ত্রিক মিত্রজোটের সাথে দুর্বলতরদের লুণ্ঠনের প্রশ্নে তাদের বৈরী শক্তির দ্বন্দ্বের দরুন প্রথম

বিশ্বযুদ্ধ এবং মাত্র সিকি শতাব্দী পর আবার পুঁজিবাদী-উপনিবেশবাদী-সাম্রাজ্যবাদী গণতান্ত্রিক মিত্র ও নব উদ্ভুত সমাজতান্ত্রিক জোটের সাথে ফ্যাসীবাদী-একনায়কতন্ত্রবাদী যুদ্ধবাজ শক্তির অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বে সংঘটিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া সবাই হতবল হয়ে পড়ে। নিজেদের আর্থিক অবস্থান পুনর্গঠনের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টি ও বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্বব্যাংক প্রভৃতি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দেওয়া হয় বিশেষ করে মার্কিন বিনিয়োগরূপী সহায়তায় এবং ভোটাভুটির গণতন্ত্রই তাদের একমাত্র প্রশাসনিক অবলম্বন হয়ে পড়ে। নিজেদের নিরাপত্তার জন্য ১৯৪৫ সনের ২৪ অক্টোবর জাতিসংঘের (united nations organization) ছত্রছায়া সৃষ্টি করা হয়। এর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সনের ১০ জুলাই গঠিত হয়েছিল লীগ অব নেশনস। অবশ্য, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই সংস্থার সদস্যপদ গ্রহণ করেনি। এ সংস্থার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। (ক) যুদ্ধ পরিহার, (খ) শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণ, (গ) শান্তিপূর্ণভাবে বিবাদ মীমাংসা, (ঘ) আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি। এরও আগে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সমরাস্ত্রের বাড়াবাড়ির দরুন গোটা ইউরোপে নিরাপত্তাহীনতার পরিবেশ সৃষ্টি হওয়ায় রাশিয়ার জার নিকোলাস ১৮৯৯ সনে অস্ত্র হ্রাসের উদ্দেশ্যে 'হেগ'-এ সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯০৭ সনে একই স্থানেই দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু অস্ত্রবাজীর প্রতিযোগিতা থামেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯১৪ সনেই ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন প্রতিযোগিতারূপে। ইতিহাস বলছে যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিক থেকেই দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীর প্রয়াসের পর জাতিসংঘ গঠিত হয়। প্রত্যেকটি প্রয়াসের লক্ষ্য ছিল শান্তি, কল্যাণ, সহযোগিতা ও উন্নয়ন। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সনের ১০ ডিসেম্বর প্রণয়ন করে সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ, যার প্রথম দফা হলো : "সকল মানুষ স্বাধীনতা এবং সমান মর্যাদা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে থাকে। তারা বিচার শক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা ভূষিত এবং সেই হেতু একে অন্যের প্রতি ভ্রাতৃত্বের মনোভাব নিয়ে বসবাস করবে" [এই প্রথম দফার প্রথম বাক্য যেন দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের (র.) একটা বাণীর হুবহু পুনরুল্লেখ এবং দ্বিতীয় বাক্যটা অন্য এক বাণীরই প্রতিধ্বনি]।

জাতিসংঘ সনদের দ্বিতীয় দফার প্রথম অনুচ্ছেদঃ "জাতি, বর্ণ, নারী, পুরুষ, ভাষা, ধর্ম, রাজনৈতিক বা অন্যবিধ মতামত, জাতীয় বা সামাজিক পরিচয়, সম্পত্তি, বংশ বা সামাজিক পদ-মর্যাদা নির্বিশেষে প্রত্যেকে এই অধিকার ও স্বাধীনতাসমূহ ভোগ করবে"।

এই পথ ধরে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সমাজ-কল্যাণ সংজ্ঞায় বলা হয় "রাজনৈতিক বিশ্বাস, সামাজিক ও আর্থিক পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটা

মানুষ সম্ভাব্য সর্বোচ্চ জীবনমানের অধিকারী। প্রত্যেকটা লোকের কল্যাণের মধ্যেই রয়েছে জগতে শান্তি ও নিরাপত্তার মূলমন্ত্র"।

আধুনিক এসব বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত ও ঘোষণাপত্রে যে মদীনা সনদের মর্মবাণীই বাজ্ময়, তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা। আরো লক্ষ্যণীয় যে, হিল্‌ফুল ফুজুল, মদীনা সনদ, লীগ অব নেশন্স এবং জাতিসংঘ গঠনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট অভিন্ন; ভিন্নতা শুধু স্থান-কাল-পাত্র ও পরিসরের। তবে জাতিসংঘের আবেদনের মতো মদীনা সনদের আবেদনও শাশ্বত এবং গুণগত দিক দিয়ে ব্যাপকতর। মদীনা সনদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল অস্ত্র প্রতিযোগিতা, সংঘাত ও বিদ্বেষের অবসান ঘটিয়ে একটি শান্তিপূর্ণ, সৃজনশীল, কল্যাণময় বহুত্ববাদী সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পত্তন করা। জাতিসংঘ, লীগ অব নেশনস্ প্রতিষ্ঠার পটভূমিও মুখ্যতঃ অস্ত্রবাজী, যুদ্ধ বন্ধ করে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব পত্তন–যা এখনো অলীক স্বপ্ন হয়ে রয়েছে।

মদীনা সনদ প্রকৃতির আলো-বাতাসের মতোই কিভাবে মানব সমাজের জীবন-প্রবাহকে ব্যাপ্ত করে চলেছে, নীচে তার দু'একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো। জ্ঞাতসারে কিম্বা অজ্ঞাতসারে বিভিন্ন মানব সমাজ এই বিশ্বজনীন মহান সনদের আলোর আওতার অন্তর্ভুক্ত হয়ে চলছে এবং এ প্রক্রিয়া দিনে দিনে আরো ব্যাপক ও কল্যাণকর হচ্ছেঃ-

(ক) ১৯৫৭ সনের ২৮ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রাজধানী ওয়াশিংটনে প্রথম মসজিদ উদ্বোধনকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডয়েট আইজেন হাওয়ার বলেছিলেন, "রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে কোন সম্পর্ক থাকবে না, তবে সকল ধর্মমত বা পথের নিরাপত্তা দেওয়ার মৌলিক আদর্শের উপর রাষ্ট্রের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।" ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখেনা যে, মদীনা সনদ ও রবুবিয়াতের দর্শন ও চেতনা এই বাক্যে বাজ্ময়!

(খ) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর সংবিধানের তৃতীয় ভাগে মৌলিক অধিকার অধ্যায়ে অনুচ্ছেদ ২৭: সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। ২৮ অনুচ্ছেদ: (১) কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না, অনুচ্ছেদ ২৯: প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ-লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে [উল্লেখ্য, নবীজী (দ.) পররাষ্ট্র বিষয়ে এমন যোগ্য লোককে দায়িত্বে নিয়োগ করেছিলেন, যিনি তখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি। পরে আদর্শ ও নীতিতে মুগ্ধ হয়ে তিনি স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করেন]।

এভাবে দেখা যাবে, যতোই দিন যাচ্ছে; ততোই মদীনা সনদ ও রবুবিয়াতের মূল চেতনা ও দর্শন বিভিন্ন অঞ্চলের মানব সমাজ-রাষ্ট্র-নীতি ও দর্শনে আলো-বাতাসের মতোই প্রাকৃতিকভাবে স্থান করে নিচ্ছে।

৫. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের শেকড় সন্ধানেঃ

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের উৎস সন্ধানে অবতীর্ণ হয়ে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর নিজ সমাজ ও কালের সমস্যা সমাধানের উপায় ও কর্মসূচি খুঁজতে গিয়ে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) রূহানী ঐতিহ্যের পথ ধরে অগ্রসর হন। অন্তরের সংবেদনশীল চেতনার তাগিদে তিনি প্রথমে তাঁর দাদাজান হযরত আকদাসকে অধ্যয়ন করেন। এর জের হিসেবে বিশ্বমানবিক ধর্ম ইসলামের ভিত্তি আল-কুরআন, হাদিস, আল-গাজ্জালী (র.), হযরত ইবনুল আরাবী (র.) সহ বরেণ্য মুসলিম দার্শনিক, মহান সুফি সাধক, প্রতিবেশী হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করেন এবং তুলনামূলক ও সমীক্ষণমূলক (critical) সমাজ-চিত্র অঙ্কন করেন, যাতে মানবতার সকল সদস্যকে একই সমতলে স্থাপন করা যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি হযরত আকদাসের শিক্ষা ও নীতির উপর ভিত্তি করে (যার ফোকাস 'জীবনী ও কেরামত' এবং 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে চিত্রিত) সর্বজনীন রবুবিয়াত ও মদীনা সনদের দর্শন ও প্রয়োগ প্রক্রিয়ার সূত্র ধারণ করেন। তিনি এটাকে 'মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের' ফ্রেমে সাজিয়ে বিংশ শতাব্দীর আধুনিক মানুষদের কাছে নতুনভাবে উপস্থাপন করেন। একথা বলা অত্যুক্তি হবেনা যে, বাংলাদেশসহ এশিয়ার এই অঞ্চলে তিনি আধুনিক বয়ান ও ভাষ্যে বিস্মৃতপ্রায় রবুবিয়াত ও মদীনা সনদের দর্শনকে সর্বজনবোধ্য করে বিবিধ ধর্ম, আদর্শের সর্বস্তরের মানুষের কাছে পেশ করেছেন, যাতে তাঁরা এ দর্শনের শিক্ষাকে নিজেদের কল্যাণে প্রয়োগ করতে পারেন এবং বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে পবিত্র প্রোজ্জ্বল, শান্তিপূর্ণ, মানবতাবাদী একটা সমাজ গঠনের তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মজবুত অবলম্বন পান।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. ইমাম গাজ্জালী : কিমিয়ায়ে সাআদাত, প্রথম খণ্ড, সূচনা।

২. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, নবম পরিচ্ছেদ, কর্মজীবন: সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী।

৩. তাযকিয়ায়ে মুহম্মদীয়া (বিপ্লবী নবী) পঞ্চম অধ্যায় নবম অনুচ্ছেদ; আল্লামা আজাদ সুবহানী।
আল্লামা আজাদ সুবহানীর পুরো নাম, আব্দুল কাদির আজাদ সুবহানী। তিনি গত শতব্দীর প্রথমার্ধের মানবতাবাদী রাজনৈতিক দর্শন রবুবিয়াত বা পালনবাদের অন্যতম মৌলিক তাত্ত্বিক দার্শনিক ও প্রচারক। বিখ্যাত এই বাগ্মী, দার্শনিক ও চিন্তাবিদ 'ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক' হিসেবে ভারতবর্ষ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে রবুবিয়াতসমেত মানুষের সামগ্রিক জীবন-দর্শনের উপর সারগর্ভ বক্তৃতা দিয়ে সফর করতেন। ১৯৩৫ খৃঃ ভারতের আমরুহায় তৎকালীন ভারতের শীর্ষ স্থানীয় ১৭জন শিক্ষাবিদ-আলেম-গণমুখী রাজনীতিবিদের বিখ্যাত সম্মিলনে তিনিও হাজির ছিলেন। ঐ সম্মিলনে মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, সাংবাদিক-রাজনীতিবিদ-কবি হাসরত মোহানী, রাশিয়া প্রবাসী স্বাধীন ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মওলানা ওবায়দুল্লাহ্ সিন্ধীও অংশ নিয়েছিলেন। ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের ফলশ্রুতিতে উপমহাদেশের রাজনৈতিক চিত্রপটে পরিবর্তন আসায় বিশুদ্ধ লোকমুখী আর্থ-সামাজিক-আদর্শ নতুন বিরূপ আবহাওয়ার সম্মুখীন হয়। তবে আজাদ সুবহানী আমৃত্যু তাঁর মিশনে বিশ্বস্ত থেকে দাওয়াত চালিয়ে যান। তাঁর জন্ম ভারতের মধ্যপ্রদেশের বালিয়া জেলার সিকান্দরপুর গ্রামে। তিনি শিক্ষাগ্রহণ করেন জৌনপুর মাদ্‌রাসায়। তিনি খিলাফত আন্দোলনেও যুক্ত হন এবং সে জন্যে তাঁকে বৃটিশ-রাজের কারাবরণ করতে হয়। তাঁর প্রত্যেকটি পুস্তকই মহৎ। সেগুলো হচ্ছে : (১) তাযকিয়ায়ে মুহম্মদী (বঙ্গানুবাদ: বিপ্লবী নবী), (২) তাফসিরে রব্বানীকা মুকাদ্দামা, (৩) আল্-কুল্লিয়াত, (৪) আল-ফালাসাফাতুর রব্বানীয়া, (৫) আদবিয়াতে রব্বানী (৬) দ্বীনিয়াতে রব্বানী।
তাঁর দর্শন মতে, ইসলাম একটা তথাকথিত ধর্ম নয়, বরং একটা সুচিন্তিত সুপরিকল্পিত (teleological) সামগ্রিক বিপ্লব, একটা নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক আন্দোলন; যার উদ্দেশ্য পৃথিবী থেকে "শাসনবাদের উচ্ছেদ ও সার্বজনীন পালনবাদের প্রতিষ্ঠা।"

৪. Abul Hashim, The Creed of Islam or the Revolutionary Character of Kalima, Dacca, 1970.

৫. মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী : (ক) রবুবিয়াতের ভূমিকা, (খ) পালনবাদ কি ও কেন? ১৯৭৪ইং সন্তোষ, টাঙ্গাইল।

৬. উম্মুল কুরআন: মওলানা আবুল কালাম আজাদ (বঙ্গানুবাদ: আখতার ফারুক, ঢাকা, ১৯৭৪ইং)।

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

হানাফী ফিকাহ্‌র আলোকে মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত

'ফিকাহ্'র গদী তোমাদের জন্য আমি কষে বেঁধে দিয়েছি এবং এর মুখে তোমাদের জন্য লাগামও সংযুক্ত করে দিয়েছি। তোমাদের ইচ্ছা মতো তোমরা তাতে আরোহণ করতে পারো। আমি এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছি যে, লোকেরা তোমাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে এবং সে মতে চলবে।"[১]

১. সৎ কাজে প্রতিযোগিতায় স্বাধীন চিন্তাশক্তির প্রয়োগ সম্পর্কে আল-কুরআন: "প্রত্যেকের একটা লক্ষ্য রয়েছে, যেদিকে সে এগোয়; অতএব তোমরা সৎ কাজে প্রতিযোগিতা করো" (২:১৪৮)। আল-কুরআনের উপরোক্ত আয়াতে স্বাধীন চিন্তাশক্তি ও তদনুযায়ী কর্মশক্তিসম্পন্ন হিসেবে সৃষ্ট মানুষের প্রত্যেকের বিভিন্নতার প্রতি যেমন অঙ্গুলি নির্দেশ করা হয়েছে, তেমনি তার নিজস্ব লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্য পানে এগুবার প্রবণতার কথা ব্যক্ত করা হয়েছে এবং একই সাথে 'সৎ কাজে প্রতিযোগিতা'র প্রতি প্রত্যেক মানুষকে উৎসাহিত করা হয়েছে। এই সৎ কাজের জ্ঞানের উৎস সম্পর্কেও বলা হয়েছে: "আমি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদেরকে আমার আয়াতগুলো পাঠ করে শুনাচ্ছেন, তোমাদেরকে পবিত্র করছেন এবং কিতাব ও হিকমত (জ্ঞান-বিজ্ঞান) শিক্ষা দিচ্ছেন এবং এমন বিষয়াদি শিখাচ্ছেন, যা তোমরা পূর্বে জানতে না" (২:১৫১)। আরো দ্রষ্টব্য: "আমি আপনার প্রতি এই কিতাব নাজিল করলাম মুসলমানদের জন্য সকল বিষয়ে স্পষ্টতাজ্ঞাপক পথনির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ; নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়-বিচার (আদল), অপরের কল্যাণ (এহসান), নিকটবর্গকে দান করতে এবং অনৈতিকতা, মন্দ ও জুলুম করতে নিষেধ করছেন, তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যাতে তাতে মনঃসংযোগ করো। তোমরা আল্লাহ্‌র নামে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করিও যখন পরস্পর অঙ্গীকার কর এবং আল্লাহ্‌কে জামিন করে কসম করার পর তা ভঙ্গ করো না। আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে অবগত (১৬: ৮৯-৯১)"।

২. ফিকাহ্: পৃথিবীসহ এই মহাজগৎ মহৎ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যে সুপরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট বলে আল কুরআন-হাদিস এবং প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর বহু প্রথিতযশা দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের অভিমতে বলা হচ্ছে। পৃথিবীটা মানুষ ও অপরাপর জীবের জন্য সৃষ্ট এবং তা প্রতি মুহূর্তে বিবর্তনশীল। মানুষ উন্নততর সমাজবদ্ধ এবং

নিয়মবদ্ধভাবে চিন্তা ও কার্য করার ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাণী বিধায় তার ব্যক্তি ও সমাজ জীবন সুনির্দিষ্ট যুক্তিসিদ্ধ প্রণালীবদ্ধ। তবে তাকে এই প্রণালীর মধ্যে থেকে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী কর্মপন্থা বা কর্মসূচী স্থির করতে হয় এবং এই প্রক্রিয়ার জন্য প্রয়োজন বুদ্ধিমত্তা, প্রজ্ঞা বা আকল, যা আল্লাহ্‌র আদিসৃষ্টি হিসেবে গণ্য। এই বুদ্ধিমত্তার প্রায়োগিক আরবী প্রতিশব্দ 'ফিকাহ্' এবং ইসলামী ব্যবহারশাস্ত্র (jurisprudence) সামগ্রিকভাবে 'ফিকাহ্' বলে অভিহিত। ফিকাহ্ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও বুদ্ধিবৃত্তিক ব্যবহারিক বিষয়, যার উপর ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণ নির্ভরশীল এবং এর শেকড় (ক) ইজতিহাদ, (খ) কিয়াস, (গ) ইজমা, (ঘ) হাদিস হয়ে (ঙ) আল-কুরআনে প্রোথিত। এই পাঁচটা বিষয় নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন ও সমীক্ষণপূর্বক আইনের কোন পয়েন্টে সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বাধীনভাবে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের প্রয়োজন বিধায় এই নামকরণ করা হয়েছে। শরিয়তে বিধান বা কানুন-বিজ্ঞানের নাম 'ফিকাহ্'।

মুসলিম তথা ইসলামী ফিকাহ্ বা ব্যবহারশাস্ত্র প্রয়োজন মতো পরিশীলিত, যুক্তি ও বাস্তবতা নির্ভর, যার সূত্রসমূহ সর্বকালে, সর্বযুগে, সর্বক্ষেত্রে অবস্থানুসারে প্রযোজ্য হয়ে আসছে এবং হতে থাকবে। মুসলিম দর্শনবেত্তাদের মতে, সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে উদ্ভূত নতুন নতুন সমস্যার যথার্থ সমাধানের প্রয়োজনে কুরআন-হাদিসের 'জীবন-নীতির' বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়োগ পদ্ধতি 'ফিকাহ্' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। 'শরিয়ত ও ফিকাহ্'র মধ্যে পার্থক্য হলো: শরিয়ত কুরআন ও হাদিসপ্রসূত অপরিবর্তনীয় মৌল বিধান। আর ফিকাহ্'র ক্ষেত্র শরিয়তের তুলনায় সংকীর্ণতর এবং এর দ্বারা 'আইনগত কার্যক্রম' (legal acts) বুঝায়। শরিয়তের পথ আল্লাহ্-রসূল নির্ধারিত। আর ফিকাহ্ শরিয়তের সাথে সমন্বয়ধর্মী পথ, যা মুসলিম আলেম, ওলী-দরবেশ, বিদ্বান-বোদ্ধাদের বিভিন্ন কালিক সমীক্ষণবাদী গবেষণালব্ধ ফল।

৩. বিবর্তন: আল-কুরআন ও হাদিসের মূলনীতির সাথে সঙ্গতি রেখে স্থান-কাল-পাত্র-পরিবেশ ভেদে প্রয়োজন অনুযায়ী আইন-কানুন নির্মাণে সুন্নী মুসলিমদের চারটি মজহাবের উদ্ভব ঘটে: (ক) হানাফী, (খ) মালিকী, (গ) শাফেয়ী এবং (ঘ) হাম্বলী। সকল মুসলিম এই চার মজহাবের প্রতি সমানভাবে শ্রদ্ধাশীল। কুরআন-হাদিসের মূল নীতির ব্যাখ্যা ও প্রয়োগ প্রক্রিয়া সম্পর্কে অভিমতের ব্যাপারে 'কিঞ্চিৎ' পার্থক্য ব্যতীত ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে তাঁদের অভিমত অভিন্ন। তবে হযরত আবু হানিফার (র.) [৬৯১-৭৬৭ খৃঃ] হাতে ইজমা পদ্ধতি পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হয় এবং এসব উৎসকে বিমল যুক্তিসিদ্ধ করতে যথাক্রমে ইসতিহসান (equity) এবং উরফ বা দেশাচার প্রথা (customs, usage and culture) পরিবেশ-পরিস্থিতি সমীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়। তিনি পূর্ব বর্ণিত আইনী উৎসসমূহের আলোকে স্বাধীন বিচার-শক্তি প্রয়োগের পক্ষপাতী এবং সেজন্যে 'আহ্‌লুর রায়' দলের মুখপাত্র হিসেবে কথিত। তিনি

যুক্তি, বিতর্ক, কিয়াস (সাদৃশ্যমূলক যুক্তিপদ্ধতি), ইসতিদলাল (inference), ইজতিহাদ প্রভৃতি যুক্তিশাস্ত্রের সকল মানদণ্ডের সার্থক প্রয়োগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর পদ্ধতি ও নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে মুসলিম সাংবিধানিক আইন। সার্বজনীন বিশ্বজনীন আইন বিনির্মাণে তাঁর সিদ্ধান্ত ও দৃষ্টান্ত, অন্যতম প্রধান অবলম্বন হিসেবে বিশ্বে গৃহীত ও স্বীকৃত। বস্তুতঃ তিনি এখনো ব্যবহারশাস্ত্রের সক্রিয় প্রতীক হয়ে আছেন।

উল্লেখ্য, ফিকাহ্ প্রক্রিয়ার চির আধুনিক চির সচল প্রক্রিয়ার প্রবর্তন ঘটে দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর ফারুকের (র.) খিলাফতকালে তাঁর হাত দিয়ে। পরবর্তী আইন বিশারদগণ তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই বিজ্ঞানকে নিত্য সৃজনশীলতার অফুরান উৎসে পরিণত করেছেন। ইমাম গাজ্জালী (র.) 'ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্বীন' গ্রন্থে ইমাম আযম আবু হানিফাকে (র.) ফিকাহ্ শাস্ত্রের 'যুগস্রষ্টা ইমাম' রূপে বর্ণনা করেন।

৪. ফিকাহ্ এবং তাসাওউফের মধ্যকার সম্পর্ক: এখানে ফিকাহ্র সাথে তাসাওউফের শিক্ষার সম্পর্কের উপর ঈষৎ আলোকপাত করা দরকার। ফিকাহ্র গ্রন্থগুলো সাধারণতঃ আত্-তাহারাত বা শুদ্ধিকরণ বিষয় নিয়ে পাঠ শুরু করে। ইবাদত-বন্দেগীতে নিষ্ঠা ও মনোনিবেশের জন্য খুশু (গভীর নিমগ্নতা) হাসিল করতে হয়। মনের শুদ্ধতা, পবিত্রতা, আন্তরিকতা ব্যতীত সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়, যা বিচার বা আদলের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। তাসাওউফ সাধনা মানুষের ক্বলব বা অন্তর পরিচ্ছন্ন করে এবং ফিকাহ্র রায় (ruling) উপলব্ধি করার উপযোগী মানসিক সু-বৃত্তির বিকাশ ঘটায়। তাসাওউফ ক্বলব পরিশোধনের বিজ্ঞান এবং ফিকাহ্ কর্ম পরিশোধনের বিজ্ঞান। অতএব, ফিকাহ্র রায়ের প্রতি কারো অঙ্গীকারবদ্ধতা তার আধ্যাত্মিক বা রুহানী বিকাশের স্তরের সাথে সংশ্লিষ্ট। আবার এসব বিষয় আল্লাহ্র উপর ঈমান এবং তাঁর অনুশাসনের প্রতি আনুগত্যের সাথে সম্পৃক্ত।

একটি প্রাচীন প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, 'তাসাওউফ বাদ দিয়ে শুধু ফিকাহ্ অধ্যয়ন করলে দুর্নীতিগ্রস্ততা গ্রাস করে। অন্যপক্ষে, ফিকাহ্ বাদ দিয়ে শুধু তাসাওউফ অধ্যয়নে ধর্মদ্রোহী (heretic) হয়ে পড়ার আশংকা থাকে।' অতএব, বিচারের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য ফিকাহ্ ও তাসাওউফ দুটোই অধ্যয়ন করা জরুরী। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আইনবিদ বা ফকীহ্, বিদ্বজ্জন এবং সুফিজনের লক্ষ্য অভিন্ন। আল্লাহ্কে জ্ঞানের মাধ্যমে পাওয়া যায় এবং এই পথের পথিকদের ইমাম খোদ 'আক্ল (in.ellect) এবং শরিয়ত'। তাসাওউফ ও ফিকাহ্ বিজ্ঞান পরস্পর সম্পূরক এবং সমাজ জীবনে কল্যাণকর ও সার্থক হতে প্রয়াসী প্রত্যেক মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য, মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত এমনটাই কামনা করে।

৫. হানাফী ফিকাহ্ এবং মাইজভাণ্ডারী বেলায়তঃ বিশ্বের সমগ্র সুন্নি জামাত হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী, হাম্বলী এই চার মজহাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তও সুন্নি জামাতের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চার মজহাবের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে প্রধানতঃ হানাফী মজহাব অর্থাৎ ইমাম আযম আবু হানিফার (র.) প্রদর্শিত ও অনুসৃত পথ ধরেই চলে। বেলায়তে মোত্লাকা এবং সামগ্রিকভাবে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ দর্শন, তত্ত্ব ও আচরণে হানাফী ফিকাহ্ অনুসরণ করে। এই অধ্যায়ের সূচনায় ১নং অনুচ্ছেদে আল-কুরআনের যেসব আয়াত উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলোর অন্তর্নিহিত শিক্ষা তো বটেই, অধিকন্তু কুরআন-হাদিসের মহৎ উদার, কল্যাণময়ী সকল শিক্ষা ও নির্দেশের ফসলে হানাফী ফিকাহ্র ভাণ্ডার ভরপুর।

'সহনশীলতা ও সমন্বয়' যুগপৎ প্রাণী জগৎ ও পদার্থ জগতের অস্তিত্বশীলতা ও কল্যাণময় বিকাশের চালিকা শক্তি। ইসলাম কল্যাণময় সহনশীলতা ও সৃজনশীল সহাবস্থানের ধর্ম। কুরআন-হাদিসের শিক্ষা ও নির্দেশনাকে অবলম্বন করে মুসলিম আইন-বিজ্ঞানের মনীষীরা যে ফিকাহ্ শাস্ত্র বয়ন করেছেন, তার মূল দর্শন হলো সর্বাধিক মাত্রায় লোককল্যাণ–তা ব্যক্তি, সামাজিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক যে ক্ষেত্রেই হোক না কেন! নবীজী বলেছেন: "সমগ্র মখলুক আল্লাহ্র পরিবার, তিনিই আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয়, যিনি আল্লাহ্র সৃষ্ট প্রাণীগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেন"। ফিকাহ্ বিজ্ঞানের সকল তন্ত্রীতে প্রতিধ্বনিত এই বাণীর অনুরণন সর্বক্ষণ শ্রুত হয় মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের উদার আসমানে।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত বা 'বেলায়তে মোত্লাকা' আদলে মোত্লক (বিচার-সাম্য), ওয়াহদাতুল ওজুদ ভিত্তিক তৌহিদে আদ্বীয়ান, ধন-বণ্টনে বৈষম্যের অবসান, অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিতে সমগ্র সমাজ তথা বিশ্বকে দেখা, জুলুম, পীড়নের অবসানের রুহানী প্রয়োজনীয়তাকে পরিচ্ছন্ন সামাজিক আচরণের ফ্রেমে আবদ্ধ করতে চায় হানাফী ফিকাহ্র আলোকে। মহান চার ইমাম কিয়াস (analogical reasoning), ইসতিহসান (equity), ইসতিসলাহ (public welfare বা জনকল্যাণ) এবং ইসতিদলাল (inference) পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজের সঠিক আইনী চাহিদা পূরণে প্রয়াসী ছিলেন। তাঁদের এই পদ্ধতি হাজার বছর ধরে কেবল মুসলিম সমাজেই নয়, বিশ্বের ক্রমোন্নতিশীল সভ্য সমাজে অনুসৃত হয়ে আসছে এবং মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ব্যবহারশাস্ত্রকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) ইলমে ফিকাহ্-র সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী ছিলেন। তেমনিভাবে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীও (ক.) অন্যান্য বিষয়ের সাথে ইলমে ফিকাহ্য়ও বিশেষ ব্যুৎপত্তিশীল ছিলেন। অতএব, মইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা-সিলসিলা-বেলায়তের দুনিয়াবী ও রুহানী কর্মসূচী প্রণয়ন ও

প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাঁরা সর্বাংশে ইলমে ফিকাহ্'র পা-বন্দী করেন এবং আল-কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসতিহসান ও ইসতিসলাহকে (ন্যায়পরায়ণতা ও জনকল্যাণ) সামগ্রিক কর্মসূচীর সামিয়ানা হিসেবে স্থির করেন, যা হানাফী মজহাবের প্রধান লক্ষ্যরূপে বিশ্বে স্বীকৃত। লক্ষ্যণীয়, অছিয়ে গাউসুল আযম তাঁর নির্মিত সংগঠন "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর" গঠনতন্ত্রের সূচনাতেই 'আদলে মোত্লক' বা বিচারসাম্য প্রতিষ্ঠাকে প্রধান লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেছেন, যার গুরু দায়িত্ব সূরা কূরার ১৫নং আয়াতমূলে নবীজীর (দ.) উপর অর্পণ করা হয়। অতএব, ঐতিহাসিক, শরিয়ত, মারিফত, ফিকাহ্সহ বিভিন্ন ইলম বা শাস্ত্রের মানদণ্ডে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-কর্মসূচী-তত্ত্বও গতিশীল হানাফী ফিকাহ্র সাথে সর্বাংশে সঙ্গতিপূর্ণ, যার মূল কথা অছিয়ে গাউসুল আযমের ভাষায় "ন্যায়নীতি, সাম্য ও দয়াগুণ" [বেলায়তে মোত্লাকা প্রথম অধ্যায় : নবুয়তে ইব্রাহিমী অনুচ্ছেদ]।

উপসংহার: মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সর্বজনীন বিচারসাম্যসমেত সকল প্রকার জাহেরী-বাতেনী কর্ম পরিকল্পনা সূরা আদ্-দ্বোহা দিয়ে সূচিত কুরআনী কল্যাণময়তার নেটওয়ার্ক। হানাফী মজহাবের বাস্তবতাভিত্তিক যুক্তিমত্তা, নমনীয়তা, উদারতা, সহজে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা, গতিশীলতা পূর্ণাঙ্গরূপে ধারণ করেছে মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত। কুরআন-হাদিসের শিক্ষা বহির্ভূত জাগতিক কট্টরতা হানাফী মজহাব ও তদনুসারে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে পরিহার্য। ইমামে আযম (র.) থেকে শুরু করে হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা বাবা (র.), হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) সকলেই শরিয়তী। মানবকল্যাণেই তাঁরা শরিয়তের প্রয়োগ করেছেন এবং সমকালে এই কল্যাণের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন ইলমে ফিকাহ্'র আলোকে, যে ইলমে ফিকাহ্ মানব-সমাজ তথা পৃথিবীর গতিশীলতায় কোন প্রকার বন্ধ্যাত্ব সৃষ্টি হতে দেয় না এবং যা বর্তমান যুগের শক্তিশালী মূল্য-বিচার তত্ত্ব (values) সমীক্ষণবাদের (critical theory) পূর্বসূরী হিসেবে বিবেচিত। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত সর্বাংশে ফিকাহ্সম্মত এবং ইমামে আযম আবু হানিফার (র.) প্রদর্শিত পথে তা উপলব্ধি করা সহজে সম্ভব। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) স্বয়ং ছিলেন উচ্চ স্তরের ফকীহ্, একজন নিষ্ঠাবান শরিয়তি ধার্মিক ও ধর্মবেত্তা, একই সাথে মারিফাত জ্ঞান-সমৃদ্ধ। অতএব, তাঁর ত্বরিকা, তাঁর নীতি, তাঁর নির্ণীত বেলায়তপন্থা বিশেষ করে হানাফী ফিকাহ্সম্মত।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. কুফার জামে মসজিদে স্বীয় সহস্রাধিক ছাত্র সমাবেশে, যাদের মধ্যে ৪০জন ছিলেন ইজতিহাদ করার ক্ষমতা সম্পন্ন; ইমাম আযমের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণের অংশ বিশেষ। সূত্র: ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক জীবন, মানজির আহসান গিলানী।

হানাফী ফিকাহ্সহ এ নিবন্ধের সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তথ্যের উৎস:

(ক) ইমাম আবু হানিফার রাজনৈতিক জীবন: মূল; মানজির আহসান গিলানী, বঙ্গানুবাদ: আবদুল জলিল, ইসলামীক ফাউন্ডেশন, ৩য় সংস্করণ ১৯৮৭ ইং, (খ) চার ইমামের জীবনী: মওলানা লুৎফুর রহমান বিএ-অনার্স (আরবী), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১১ইং, (গ) মুসলিম মনীষা, আবদুল মওদুদ, কলিকাতা, ১৯৫৫ইং।

বিশেষ নোট: (ক) ব্যবহারশাস্ত্রকে (jurisprudence) ব্যক্তি-মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ মাত্রার কল্যাণধর্মীরূপে বিকশিত করার ক্ষেত্রে তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী যে মহান মানুষটার নাম মানব সভ্যতার ইতিহাস আইনশাস্ত্রবিদদের তালিকায় প্রথম সারিতে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রেখেছে, তিনি ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (র.)। জন্মগতভাবে বিস্ময়কর বিশ্লেষণী বিচারশক্তি ও যুক্তিমত্তা সম্পন্ন এই অকুতোভয় মনীষীর প্রকৃতিদত্ত এই গুণ ও সম্পদ আরো শাণিত হয়ে উঠে আল-কুরআন ও হাদিসের মহৎ উদার শিক্ষায়। সেই সামন্ত রাজতান্ত্রিক জমানায় দাসপ্রথা ও পশুপালন নির্ভর অর্থনীতি কন্টকিত আবহে সুবিচার ভিত্তিক নৈতিক সমাজ গঠনের সুদূর প্রসারী লক্ষ্যে তিনি জীবনবাজী সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের দোর্দন্ড প্রতাপে যন্ত্রণাদায়ক অবক্ষয়ে জর্জরিত কুফা নগরীতে তাঁর জন্ম। প্রচণ্ড প্রতাপশালী রাজতন্ত্রের সামনে বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও যখন 'টু' শব্দটা করার সাহস করতেন না, সেই ভয়াল সময়ে ইমাম আবু হানিফা ছিলেন জালেম বাদশাহদের সামনে জীবন্ত প্রতিবাদ। 'অত্যাচারী-স্বৈরাচারী শাসকদের সামনে হক-কথা' বলেই তিনি ক্ষান্ত হননি, উপরন্তু তাদের সাথে সম্পর্কহীনতা ও অসহযোগের পথই তিনি অনুসরণ করেন। উমাইয়া ও আব্বাসীয় বাদশাহীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও জিহাদে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অংশ নিয়ে তিনি সুবিচারকামী মানবতাকে যে আলোকিত পথের সন্ধান দেন, সেই আলো পরবর্তী সকল যুগকে ইনসাফের পথে এগুবার প্রেরণা ও সাহস যুগিয়েছে এবং এখনো যোগাচ্ছে। তবে নিজ জীবনে তিনি ঐ দুই বংশতান্ত্রিক শাসনদণ্ডের অত্যাচার থেকে শারীরিকভাবেও রক্ষা পান নি।

'অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে ন্যায় বিচারের হক-কথা বলাই সর্বোত্তম জেহাদ' (আবু দাউদ, তিরমিযি) – এই মহান হাদিসের বাস্তব দৃষ্টান্ত ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সমগ্র

জীবন। খেলাফত যুগের পর রাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারের যুগে বিপর্যস্ত আইন ও সুবিচার প্রক্রিয়াকে প্রতিকূল সমাজে পুনর্গঠন ও অমরত্ব দানের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অপরিসীম ও এখনো সক্রিয়। মুসলিম ফিকাহ্ বা আইনশাস্ত্রের বিকাশ ও বিধি-বিধান প্রণয়ন এবং বিচার বিভাগের তৎকালে সম্ভাব্য সংস্কার সাধন করে তিনি বস্তুতঃ অনাগত যুগের চাহিদা মিটিয়েছেন। তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলশ্রুতিতে বিচার বিভাগ শাসনকর্তাদের স্বেচ্ছাচারিতা থেকে ঐ সময়েই বহুলাংশে মুক্তি পেয়েছিল। মুসলিম আইন শাস্ত্রের বিধিবদ্ধ প্রণয়নে তিনিই উদ্গাতা ও স্রষ্টা। বর্তমান বিশ্বে আইনের ভুবনের সকল স্তরে শিরায় শিরায় বিভিন্ন রূপে তাঁর উদার অথচ যুক্তিনিষ্ঠ নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্পন্দন অনুভূত হয়। ন্যায়বিচার ও মানবিক ন্যায্য অধিকারের যেখানেই সঙ্কট দেখা দেয়, সেখানেই অবলম্বন হিসেবে মওজুদ থাকেন এই মহান আইনবেত্তা।

(খ) ইমাম হযরত আবু হানিফার (র.) প্রখর বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী ব্যবহারশাস্ত্রের পথ ধরে মানব জীবনের প্রাত্যহিকতার প্রতিটা শিরা-উপশিরা শাশ্বতভাবে প্রতিভাত হয়েছে। একটা মাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাক : পার্থিব ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক তৎপরতা মুখ্য বিষয়, আল-কুরআনেও যার প্রতি পর্যাপ্ত দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। বিংশ শতকের অর্থনীতি বিশারদ চার্লস সি. এডামস 'সামাজিক অর্থনীতি' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 'সরবরাহ ও চাহিদাসূত্র (কানুন আল-আরজ ওয়াল তলব), একচেটিয়াবাদ (monopoly), উদ্যোক্তার (enterpreneur) সঙ্গত মুনাফার প্রতিযোগিতার অধিকার, সাধারণ মানুষের দুর্দশা সৃষ্টিকারী একচেটিয়া ব্যবসার সামাজিক ক্ষতিকারক উপসর্গসমূহ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও জটিল মানবিক বিষয়াদি সম্পর্কে ইমাম আবু হানিফার (র.) ব্যক্ত অভিমতের শাশ্বত বাস্তবতার যথার্থতা সমর্থন করেছেন। এই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত থেকে হযরত আবু হানিফার (র.) চিন্তা-কর্ম-আইন-জ্ঞান সাধনার ব্যাপকতা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ধারণা করা যায়।

দ্বিতীয় ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

১. একটা দর্শনের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অবয়ব নির্মাণ দুরূহ ও সূক্ষ্ম এক জ্ঞান-কর্ম। অতীতের জ্ঞানের বিভিন্ন জমিতে উৎপন্ন ফসলের সমীক্ষণবাদী (critical) সমন্বয় ও সংশ্লেষণে সমকালীন চিন্তা ও কর্ম প্রক্রিয়া বিষয়ক জিজ্ঞাসার সমাধান পেশ করার উদ্দেশ্যে দার্শনিক স্বীয় দর্শন-প্রকল্প নির্মাণ ও প্রকাশ করেন। আল-কুরআনের বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন আয়াতের প্রেক্ষিত ও করণীয় বা সমাধান নির্দেশ করতে সমীক্ষণবাদের সূত্রের প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়। অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) সমকালীন জীবন-জিজ্ঞাসা ও তাসাওউফের নীতির প্রয়োগ প্রক্রিয়া নির্ণয়ে আল-কুরআন, হাদিস, চার মজহাবের ইমামদের শিক্ষার পাশাপাশি বরেণ্য সূফি দার্শনিকদের তালিম থেকে বিজ্ঞজনোচিতভাবে উপাদান সংগ্রহ করে নবতর আঙ্গিকে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে সন্নিবেশিত করেছেন। 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থ তাঁর এই সাধনার দার্শনিক ফসল ধারণ করছে। তেমন কয়েকজন মহান দার্শনিক ওলী-আল্লাহ্র সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও দর্শন মাইজভাণ্ডারী অনুসারীদের হাতে তুলে দেবার উদ্দেশ্যে এই অংশে বিবৃত হলো। 'বেলায়তে মোত্লাকা' অধ্যয়ন ও 'মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত' অনুশীলনে তাঁদের জীবন এবং সাধনা-সঞ্জাত গ্রন্থাবলী যথার্থ দিশা ও আলোর ভাণ্ডাররূপে বিরাজ করছে, যদ্বারা এই বেলায়তের বহুমাত্রিকতা, স্নিগ্ধ পবিত্র বাস্তববাদী উদারতার সর্বব্যাপিতা অবলোকন ও মূল্যায়ন সহজতর হয়। এই মহান দার্শনিকদের বিবরণ কালানুক্রমিকভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

ইসলামী তথা সাত্ত্বিক জীবন দর্শন ও তাসাওউফ দর্শনের বিস্ময়কর সমন্বয়পূর্বক মুসলিম দর্শন ও সাধারণ দর্শনের অবিনাশী জংশন হিসেবে বরিত ইমাম গাজ্জালী (র.) এবং 'তাসাওউফ দর্শনের' স্থপতি শায়খুল আকবর ইবনুল আরাবীর (র.) দর্শন সম্পর্কিত তথ্য বিশদভাবে পরিবেশিত হয়েছে এই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর চাহিদা মেটানোর প্রয়োজনে। এই উভয় দার্শনিক স্বগোত্রীয়দের হাতেই সর্বাধিক নিগৃহীত এবং স্থান থেকে স্থানান্তরে বিতাড়িত হয়েছিলেন তাঁদের কুরআন-হাদিস ভিত্তিক যুক্তিসিদ্ধ বাতেনী চেতনাসমৃদ্ধ অধ্যাত্ম ও সমাজ-দর্শন বিষয়ক রচনাবলীর জন্য। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরাই দর্শনশাস্ত্র ও তাসাওউফের অনির্বাণ বাতিঘর হিসেবে বিরাজ করছেন। তাঁদের দুজনের দর্শন দুটো পৃথক দর্শন-মণ্ডলে যুক্তিনিষ্ঠ পূর্ণাঙ্গতা ধারণ করে।

২. শুধু হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.), হযরত ইবনুল আরাবী (র.) নন, অনেক প্রথিতযশা আউলিয়া, দরবেশ, ঐতিহাসিক, দার্শনিক, কবি, সমাজ-বিজ্ঞানী তাঁদের স্বকালে স্বদেশে সমকালীন স্বৈর রাজা-বাদশাহ্-শাসকদের রোষানলে পড়ে অশেষ

নিগ্রহ এমনকি মৃত্যুর শিকার হয়েছেন। ইতিহাসে নিন্দিত এসব জঘন্য অপকর্মে শাসকবর্গের সহযোগী হিসেবে দেখা গেছে এক শ্রেণির দরবারী আলেম তথা সরকারি অনুগ্রহপুষ্ট বুদ্ধিজীবীদের। ইমামে আযম হযরত আবু হানিফা (র.), হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) থেকে শুরু করে সমাজ-বিজ্ঞানের আদিগুরু ইবনে খালদুন, ভারতবর্ষের হযরত খাজা নিজামউদ্দিন আউলিয়া (র.), হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী সরহিন্দীসহ (র.) অনেক অগ্রবর্তী চিন্তা-নায়ক শাসকমহলের নিগ্রহের শিকার হয়েছেন। কারণ, ঐসব মহান ব্যক্তিরা রাজকীয় শোষণ, স্বৈর-একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ করতেন এবং চাইতেন আল-কুরআন ও হাদিসের মূলনীতি ও শিক্ষা অনুসারে আদলে-মোতলক বা সর্বজনীন সাম্য, সুবিচারমূলক বিশ্বসমাজ ও কল্যাণমুখী প্রশাসন ব্যবস্থা, যা শক্তি-অস্ত্র-চক্রান্তমূলক ব্যক্তিগত ক্ষমতা নির্ভর নয়, বরং নিতান্তই বিচারসাম্যমূলক শান্তি-সম্প্রীতি মণ্ডিত। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত ও জীবনবোধের মুখ্য অন্বিষ্টও তা-ই এবং অছিয়ে গাউসুল আযম খাদেমুল ফোক্বারা হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর জীবন-সাধনা, অধ্যাত্ম-সাধনা ও রচনায় এই বিষয়ের প্রতিই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৩. পূর্বোক্ত মহান আউলিয়া-দার্শনিকদের এই সামাজিক সংগ্রামের ইতিবৃত্ত অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে লোকচক্ষুর অন্তরালে। খোলাফায়ে রাশেদার পর সমকালীন মুসলিম জাহানসহ সমগ্র বিশ্বে সামন্ত-রাজতান্ত্রিক প্রশাসন পরিমণ্ডলে ঘটমান অবিচার-জুলুমের প্রতিকার মানুষের আদালতে না পেয়ে নিরীহ দরিদ্র নাগরিকগণ ধর্ণা দিতেন মহান ওলী-আল্লাহ্দের দরবারে। হযরত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্তি (র.), এমনকি হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.)সহ সকল ওলী-আল্লাহ্কে জালেম রাজ শক্তির বিপক্ষে মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল উম্মি জনগণের হয়েই। সইতে হয়েছিল এমনকি রাজনৈতিক প্রকৃতির নির্যাতন। অনেকের ঘটে প্রাণপাত। তাদের এই প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, আত্মত্যাগ যথার্থ সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষিত হয়নি। বিদ্যমান তথ্য বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, তাঁদের এই ভূমিকা নিরেট নিঃস্বার্থ সামাজিক ভূমিকা, যা আল-কুরআনী জীবনবাদের আধ্যাত্মিক মুদ্রার অপরিহার্য অনুসরণীয় অপর পিঠ। অথচ ইসলামের রুহানী ও জিসমানী বিভা এই মহান ব্যক্তিদের মাধ্যমেই প্রতিভাত। তাঁরা কর্মময় লোকসমাজ বিবর্জিত, বিচ্ছিন্ন, আত্মসর্বস্ব ব্যক্তি নন। তাঁরা আল-কোরআনে পরিকল্পিত সমাজ বিনির্মাণেরও নিঃস্বার্থ সৈনিক, সত্যিকার নায়েবে-রাসূল। হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তেমনই এক পরীক্ষিত নায়েবে-রসূল, যিনি আদলে মোত্লক বা সার্বজনীন বিচার-সাম্যপূর্ণ এক সমাজ কামনা করেন; যিনি

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত, ত্বরিকা ও মাইজভাণ্ডার শরিফকে আল-কোরআন ও হাদিসের মূলনীতিপুষ্ট শাশ্বত প্রগতিশীলতার দরবারে রূপায়িত করতে চান।

যুগে যুগে সমকালীন বাস্তবতার আলোকে ইতিহাস পুনঃপুনঃ মূল্যায়িত হয় এবং নবতর ধারণা ও চেতনা প্রকাশ লাভ করে। মহান আউলিয়া-দার্শনিকদের জীবন, ইতিহাস ও সাধনার ফসল বর্তমান যুগ জিজ্ঞাসা ও বিকশিত চেতনার আলোকে মূল্যায়িত হবার তাগিদ দিচ্ছে আমাদের সমাজ তথা সমগ্র বিশ্ব। পরবর্তী নিবন্ধগুলোতে এ বার্তাই বিধৃত।

এ ভাগে আলোচিত অন্যান্য মনীষীদের দার্শনিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক পরিচিতি যথাসম্ভব সমকালীন বাস্তবানুগভাবে পরিবেশনের চেষ্টা করা হয়েছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

হযরত শায়খ সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী হাজবিরী-দাতা গঞ্জেবখ্‌শ (র.)

[হিজরী ৪০০-হিজরী ৪৬৫]

"সকল সাধনার মধ্যে কষ্টকর সাধনা হলো শরীয়তের নির্দেশ পালন করা। যে কোন অবস্থায় এবং প্রতিটি কাজে ও কথায় নির্দোষ পন্থা অবলম্বন করা।"

১. পরিচিতি, জন্ম ও শিক্ষা:

"গান্‌জ বখ্‌শ ফেইযে আ'লাম মায্‌হারে নূরে খোদ',
ন'ক্বেস'ন্‌দ র' পীরে ক'মেল, ক'মেলন র' রাহ্‌নাম'
বঙ্গানুবাদ:
গঞ্জে বখ্‌শ্‌ জগতের আত্মিক প্রেরণা ও খোদার নূরের প্রকাশ,
(তিনি) অসমর্থদের পীরে কামেল, আর কামেলদের পথ প্রদর্শক।

–খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.)

এই দ্বিপদী শেয়রটা গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.) লিখেছিলেন হযরত দাতা গঞ্জে বখ্‌শ (র.)-এর মাজার শরিফের দরোজায়, যা এখনো বিদ্যমান এবং পরম শ্রদ্ধাসহকারে পঠিত হয়।

খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.) তাঁর মাজারে চল্লিশ দিন অবস্থান করে ইবাদত-বন্দেগীতে মশগুল থেকে সাধনা করেন। তাঁর মাজার শরিফ নির্মাণ করেন সুলতান নাসির উদ্দিন মাসউদের পুত্র জহীরুদ্দৌলাহ্‌। মোঘল সম্রাট আকবর (১৫৪২-১৬০৫) তৈরী করে দেন তাঁর খানকা শরিফ। দাতা গঞ্জেবখ্‌শ হযরত ইমাম হাসানের (রা.) অধস্তন পুরুষ। তাঁর পিতার নাম সাঈয়েদ উসমান জানাবী (র.)। তিনি গযনী শহরের নিকটবর্তী হাজবীর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শরিয়ত শিক্ষা ও মারিফাতের তালিম হয় মশহুর ওলামা ও মাশায়েখদের কাছে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন শায়খ আবুল আব্বাস আশকানী (র.), শায়খ আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনুল মিসবাহ সাঈদলানী (র.), শায়খ আবুল কাসেম আবদুল করিম ইবনে হাওয়ায়িন আল-কুশাইরী (র.), শায়খ আবুল কাসেম ইবনে আলী ইবনে আবদুল্লাহ্‌ আল-গুরগানী (র.), আবু আবদুল্লাহ্‌ মুহাম্মদ ইবনে আলী আল-মারাফ দাস্তানী বুস্তামী (র.), আবু সাঈদ ফাজলুল্লাহ্‌ ইবনে মুহাম্মদ মুহাইনী (র.) এবং আবু আহমদ মুজাফ্‌ফর ইবনে আহমদ ইবনে হামদাল (র.)। তাঁর

ইলমে মারিফাতের মুর্শীদ ছিলেন তফসীর, হাদিস ও তাসাওউফ-দর্শন বিশেষজ্ঞ শায়খ আবু ফজল মুহাম্মদ ইবনে হাসান খাত্তাল (র.) যিনি তাসাওউফে হযরত হাযরামীর (র.) মুরীদ এবং হযরত জুনায়েদ বাগদাদীর (র.) অনুসারী ছিলেন। শরিয়তী ও রুহানী জ্ঞান অর্জনের জন্য তিনি সিরিয়া, ইরাক, পারস্য, কোহিস্তান, আজারবাইজান, তিবরিস্তান, খুজিস্তান, কিরমান, খোরাসান, তুর্কীস্তানসহ বিভিন্ন দেশ, ভ্রমণ করে বিভিন্ন তালিম হাসিল করেন। ইতিহাস বলে, শুধু খোরাসানেই তিনশত মাশায়েখের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে।

২. রচনাবলী: হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ (র.) রচিত গ্রন্থাবলী: (১) কাশ্ফুল মাহজুব, (২) মিনহাজুদ্দিন, (৩) আর-আইয়াতু লিহুকুকিল্লাহু, (৪) কিতাবুল ফানা ওয়া বাকা, (৫) আস্রারুল খারক ওয়াল মুনাত, (৬) বাহারুল কুলুব, (৭) কিতাবুল বয়ান লিআহলিল আয়ান।

৩. সাধনা: হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শের (র.) শিক্ষা-সাধনা ছিল বড়ই কঠোর। নিজের কঠিন রিয়াজত দ্বারা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মারিফাতের অন্তহীন পথে অভিযাত্রা বড়ই আয়াসসাধ্য এবং তা মামুলী মানবিক পন্থা ও আচরণে সম্ভবপর নয়। মানুষের যে অন্তহীন সম্ভাবনার কথা আল-কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে, তা তিনি সম্যক অনুধাবন ও আত্মস্থ করেই যুক্তিসিদ্ধ উপসংহারে এসেছিলেন যে, এক সঙ্গে সব কাজ সকল মানুষ কিম্বা প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। প্রত্যেক প্রাণী, কীট, পতঙ্গ, পশু, প্রাণী, বৃক্ষজগৎ, বস্তুজগৎ–সবার পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট ভূমিকা রয়েছে মহাজগতে। মানুষ বহুমুখী সৃজনশীল প্রাণী হলেও সে বহুবিধ সীমাবদ্ধতায় আকীর্ণ। উপরন্তু সচেতন, সক্রিয় চিন্তক এবং আশরাফুল মাখলুকাত হিসেবে মহান রাব্বুল আলামিনের নিকট তার জবাবদিহিতা বাধ্যতামূলক। এ অবস্থায় একজন 'প্রকৃত মানুষ' হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলাই মানব সন্তানের প্রথম কাজ ও কর্ম-সাধনা।

এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য প্রয়োজন বিদ্যার্জন। তবে পুস্তকাদির অকূল সমুদ্রে অবগাহন করে কোন কিনারা পাওয়া কঠিন। তাই তিনি সংক্ষেপে সহজবোধ্য ভাষায় মূল বিষয়াদি সাধারণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। দৈনন্দিন জীবনের আচরণ-বিধি থেকে শুরু করে আত্মা ও উদ্দেশ্যের পরিশুদ্ধতা অর্জনের সহজ পাঠ তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ কাশ্ফুল মাহজুব। এই বই প্রত্যেক পাঠকের কাছে 'সাক্ষাৎ শিক্ষক' হিসেবেই যেন বিদ্যমান। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলেই ব্যবহারিক জীবনে সততা, পবিত্রতা, মানবিকতা বজায় রাখার সহজ কলা (art) এ বই থেকে শিখে নিতে পারেন। এ পুস্তকে উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থির, পার্থিব জীবনের কঠোরতার মধ্যে সহজপথ চিহ্নিতকরণ, জ্ঞান অর্জন, শরিয়ত, মারিফাত, জীবনাচারে দরিদ্রতা ও ধনের যথার্থ মূল্যায়ন, তাসাওউফ, ঈমান, সালাত, রোজা, হজ, যাকাত, আদব, সত্যের সংগ্রাম,

শুদ্ধ সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয় এবং হযরত যুননুন মিশরী, আবু বকর শিবলী, আবু আলী রুদবারী, জুনায়েদ বাগদাদী প্রমুখের তালিমসহ নবীজীর (দ.) পরিবারের আদর্শ স্থানীয় কিছু মেছাল পেশ করা হয়েছে।

কাশ্‌ফুল মাহজুব পুস্তকে তিনি দ্বীন বা ধর্মকে সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা, নোংরামী, প্রবঞ্চনা, তেজারতির ঊর্ধ্বে পবিত্র আলোকবর্তিকার মতো রক্ষা করার তালিম দিয়েছেন। তিনি বলেন, "পেশাদার ও পথভ্রষ্ট সুফির আধিক্যের কারণে সত্য পথের অনুসন্ধানকারীদের সঠিক পথ নির্ধারণ কঠিন হয়ে পড়ে। আমাদের যুগে ইলমে হাকিকত, বিশেষ করে আমাদের দেশে এর চর্চা কম হওয়ায় অধিকাংশ মানুষ স্বীয় নফসের অনুসরণ করে থাকে এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকে। সুতরাং, আলিম, আরিফ ও পথভ্রষ্ট লোকদেরকে আল্লাহ্‌র পথের সন্ধান দেবার জন্য এ রচনা কাজে অগ্রসর হয়েছি। অবশ্য, এই বিরাট কাজ শুরু করার পূর্বে ইস্তেখারা করেছি এবং আমার অন্তর থেকে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বস্তুগত স্বার্থ তথা দুনিয়ার সর্বপ্রকার উদ্দেশ্যকে মিটিয়ে দিয়েছি।"

তাঁর শিক্ষা ও তাসাওউফ সাধনার চুম্বক: "ইলম হাসিলের সাথে সাথে পরিশুদ্ধতা ও বিনয়ের সাথে আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন ও হিদায়াত লাভের আশা করতে হবে। যে কোন আলিম, সুফি কিম্বা দরবেশ হোক না কেন, শরিয়তের ইলম সবার জন্য অতীব প্রয়োজন। শরিয়তের ইলম ব্যতীত কাউকে আলিম, সুফি বা দরবেশ বলা যাবে না এবং ইলম ব্যতীত এগুলো কেউ দাবীও করতে পারবে না।"

উল্লেখ্য, শরিয়ত রূঢ় পার্থিব জগৎ এবং অদৃশ্য রুহের জগতের মেল-বন্ধনরূপী কৌটা, যা কোন প্রকার বাস্তবতাকে অস্বীকার করে না। শরিয়তের শিক্ষা, তালিম ও অনুশীলন বনি আদমকে মানুষ বা ইনসান করে তোলে। এই লক্ষ্যের আলোকে হযরত দাতা গঞ্জে বখশের (র.) "কাশ্‌ফুল মাহজুব" গ্রন্থকে 'কিভাবে যথার্থ মানুষ হওয়া যায়' (how to be a good man), তার সহজ পাঠ বলা যায়। খাজা বাবার (র.) ভাষায় সত্যিই তিনি 'অসমর্থদের পথ প্রদর্শক।' তিনি সমাজে ভালো লোক নির্মাণের বনেদী কুম্ভকার।

হযরত দাতা গঞ্জেবখ্‌শ (র.) পাশ্চাত্য দার্শনিক সমাজেও সুপরিচিত ও সমাদৃত। তাসাওউফ-দর্শনের অকূল সাগরে জ্ঞানের ক্ষুদ্র ডিঙ্গি নিয়ে পাড়ি দিতে যাওয়া ব্যাকুল আগ্রহী ও দুঃসাহসী নাবিকরা দিশার মশাল হিসেবে কাশ্‌ফুল মাহজুব-কে বৈঠা হিসেবে অবলম্বন করেন, যেমন করেছিলেন বিংশ শতাব্দীর প্রথম সিকিতে প্রফেসর ড. এইচ. টি. গেইডনার; হযরত ইমাম গাজ্জালীর (র.) মিশকাত-আল আনওয়ার-এর ঠিকানা খুঁজতে গিয়ে। [আরো বিবরণ ১০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অষ্টাদশ অধ্যায়

হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম হযরত আবু হামেদ মোহাম্মদ আল-গাজ্জালী (র.)

(১০৫৮-১১১১খৃঃ)

"পরস্পর বিরোধী মতবাদ কিভাবে অভ্রান্ত হতে পারে?"

[পূর্ববর্তী দার্শনিক, সুফি ও তাসাওউফপন্থীরা খণ্ডিত বিষয়ে চমৎকার পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, কিন্তু আল-গাজ্জালী দর্শনের 'সমগ্রকে' 'মনখুল' (চালুনী দ্বারা চালীত) ভাবে এমন সুবিন্যস্ত করেছেন, যে তা অতীত, সমকালীন এমনকি চলমান-বর্তমান দর্শনবিদ্যার জংশনে পরিণত হয়েছে। শরিয়ত-মারিফাত অর্থাৎ জাহের-বাতেনের সমীকরণ তিনি এমনভাবে সমাধা করেছেন, যাতে তাসাওউফের বৈজ্ঞানিক চিত্রপাঠ সহজতর হয়। তাসাওউফের সর্বোচ্চ শিখরে প্রাপণীয় এলহামের সংশয়াতীত যথার্থতা নির্ণীত হয়েছে তাঁর দর্শনে। বেলায়তে মোত্লাকা'য় চিত্রিত মানুষের বহির্জগত ও অন্তর্জগতের বিশ্লেষণের দর্পণে বিম্বিত গাজ্জালী দর্শনের আলোর ছটা। তাঁর নির্মিত তত্ত্ব ও যুক্তি মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের ভাণ্ডারে গৃহীত ও স্বীকৃত এবং সঙ্গতভাবে এই বেলায়তের দীর্ঘ শেকড়ের সুদৃঢ়তার নির্দেশক।]

১. ইমাম গাজ্জালীর (র.) যুগঃ

খোলাফায়ে রাশেদার জমানার পর আল-কুরআনের নৈতিক বৈষয়িক-সামাজিক-রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নির্দেশনাগুলোর ফলিত রূপরেখা প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন মেধাবী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পবিত্র আত্মা মুসলিমরা। এ পর্যায়ে প্রথম কাতারে পাওয়া যায় মহান চার ইমামকে : ইমামে আযম আবু হানিফা (৬৯৯-৭৬৯ খ্রি.), ইমাম মালেক (৭১৩-৭৯৫ খ্রি.), ইমাম শাফেয়ী (৭৬৯-৮১৯ খ্রি.) এবং ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (৭৮০-৮৫৫ খ্রি.)। মুসলিম সিভিল ও কমন আইনের উসুল বা নীতিমালা প্রণয়নে তাঁদের বিচার-বিশ্লেষণ এবং সূত্রাদি পরবর্তীকালে মানবজাতির উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রভাবিত করেছে। ইমাম মালেকের 'মুয়াত্তা' প্রথম হাদিস সঙ্কলন, যাতে আদল বা সুবিচার, মুসলিম আচার-ধর্ম, কমন আইনের সূত্র লিপিবদ্ধ করা হয়। ইমাম হাম্বলের মুসনাদে রয়েছে প্রায় ত্রিশ হাজার হাদিসের সংগ্রহ। তাঁদের প্রত্যেকের অবদান অসাধারণ এবং চারজন মিলে এক পূর্ণাঙ্গ শরিয়তি প্রয়োগবিধির অখণ্ড বহুমাত্রিক গ্রন্থ। যুক্তিবাদ (rationalism), ঐতিহ্যবাদ (traditionalism), ইজমা ইসতিদলাল (যৌক্তিক উপসংহার, logically agreed conclusion) ও

বিশুদ্ধ বনেদীয়ানার (conventionalism) উজ্জ্বল সহাবস্থান ঘটেছে এই চারজনের মধ্যে, যা মানব জাতির ব্যবহারিক জীবনে কোন-না-কোনভাবে, কোথাও-না-কোথাও পথের দিশা দিচ্ছে।

চার ইমামের যুগের (অষ্টম শতাব্দী) পর আসে মহান সিহাহ্ সিত্তাহ্ হাদিস বেত্তাদের যুগ (নবম শতাব্দী) ঃ ইমাম বুখারী (৮১০-৮৬৯ খ্রি.), ইমাম মুসলিম (৮১৭-৮৭৪ খ্রি.), আবু দাউদ (জন্ম ৮১৮ খ্রি.), ইবনে মাজাহ্ (৮২৪-৮৮৬ খ্রি.), তিরমিজি (৮৩১-৮৯২ খ্রি.), নাসাঈ (৮৩১-৯১৫ খ্রি.)। তাঁরা একাধারে পরিশ্রমী ইতিহাসবিদ এবং মৌলিক ফকীহ তথা ব্যবহারশাস্ত্রবিদ বা JURIST ছিলেন। এর পর আসে ইমাম গাজ্জালীর (র.) যুগ (১০৫৮-১১১১ খ্রি.)।

এ সময়টা ছিল ঐতিহাসিক ক্রুসেডগুলোর কাল, যেগুলোকে সভ্যতার উপর প্রচণ্ড চাপ বলে ধারণা করা হয়। ক্রুসেডের দীর্ঘ ঘটনা প্রবাহের ফলশ্রুতিতে জন্ম নেয় ব্যাংকিং ভিত্তিক লুটেরা পুঁজিবাদ ও রেনেসাঁ। এর রাজনৈতিক-সামাজিক-ধর্মীয় ফলশ্রুতিস্বরূপ রোমান সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ সব ক'টি সামন্ততন্ত্রী রাজ্যগুলোর মধ্যে এক খ্রিস্টীয়-ধর্মীয় বন্ধন সৃষ্টি হয়ে 'খ্রিস্টান রাজ্যের' রাষ্ট্রীয়-ধর্মীয় ধারণা উঠে, যা পোপ 'দ্বিতীয় আরবানে'র ক্লারমন্টের বক্তৃতায় বিস্ফোরিত হয় ১০৯৫ খ্রি. নভেম্বর মাসে। পতন সূচিত হয় মুসলিম রাজশক্তির এবং এই সময়টাতে বিভিন্ন আন্তঃযোগাযোগ এবং মুসলিম রাষ্ট্রশক্তির মৌলিক আদর্শচ্যুতিজনিত কারণে দর্শন-শিক্ষা-সংস্কৃতি-অর্থনীতিতে এন্তার অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয়ে জট পাকিয়ে যায়। তীক্ষ্ণধী গাজ্জালীর দৃষ্টিতে এসব গোঁজামিল ধরা পড়ে। তিনি মুসলিম সমাজ তথা মানব সমাজের সহজ ও যথার্থ পথ-নির্দেশের সাধনায় ব্রতী হন। তিনি তাঁর রচনাবলীতে তৎকালীন যাবতীয় বিভ্রান্তি নিরসনে সচেষ্ট হন। উপরন্তু মানবজীবনের আটপৌরে পারিবারিক-সামাজিক-ধর্মাচার দর্শন-শিক্ষা-দর্শন-অর্থনৈতিক দর্শন-রাষ্ট্র প্রশাসন দর্শন-প্রকৃতি বিজ্ঞান-মনোবিজ্ঞান-অপরাধ বিজ্ঞান-তাসাওউফ বিজ্ঞান প্রভৃতি জটিল বিষয়কে সাদামাটা সুবিন্যস্তভাবে গ্রথিত করেন (বিশেষ করে ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন ও কিমিয়ায়ে সাআদাত গ্রন্থে)। অতএব, ইমাম গাজ্জালীর যুগ কেবল মুসলিম কিম্বা ইসলামের ইতিহাসে নয়, বিশ্ব সংস্কৃতি-দর্শনের ইতিহাসেও একটি অমলিন মাইল ফলক।

২. অভিপ্রায় মানব জ্ঞানের নিশ্চিত অবলম্বনঃ

মাত্র ৫৩ বছরের সংক্ষিপ্ত পার্থিব জীবনে গভীর জীবনবাদী জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন সাধনার অনবদ্য ফসলে যুক্তিমত্তার ভুবন ভরিয়ে রেখে যিনি এখনো দর্শনের অন্তহীন সড়কে সক্রিয় দিশারী হিসেবে সজীব, তিনি হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.)। জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে সার্থক সমীক্ষণবাদী (critical) চাষীরূপে তিনি এখনো 'বিস্ময়ের বস্তু'। দর্শনশাস্ত্র– তা ইসলামী, মুসলিম, গ্রীক, ভারতীয়, তাসাওউফ, ধর্মীয়, সাধারণ দর্শন যা-ই হোক না

কেন, এই ভুবনের সকল স্তরে ও মণ্ডলে তিনি এক অপরিহার্য অনুষঙ্গ। জ্ঞান তথা সৃষ্টির উৎস সন্ধানে মানুষের মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, মন ও ক্বলব সেই প্রাচীনকাল থেকেই নিয়োজিত। এই ধারার পথিক হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) স্বীয় মস্তিষ্ক, বুদ্ধি, ও ক্বলবযোগে দর্শনের যে চৌহদ্দি রচনা করেছেন, সেই চৌহদ্দিতেই সঞ্চরমাণ অবস্থায় পাওয়া গেছে, ফরাসী দার্শনিক ও গণিত শাস্ত্রবিদ বিজ্ঞানী রেনে দেকার্ত (১৫৯৬-১৬৫০ খ্রি.), বৃটিশ ভাববাদী দার্শনিক ব্রাডলে (১৮৪৬-১৯২৪ খ্রি.), জার্মান দার্শনিক ও বিজ্ঞানী ইমানুয়েল কান্ট (১৭২৪-১৮০৪ খ্রি.), বৃটিশ ভাববাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৬৬ খ্রি.) প্রমুখ বিখ্যাত দার্শনিকদেরকে। ইউরোপীয় আধুনিক দর্শনের জনক দেকার্ত যেখানে 'চিন্তার মধ্যে মানব জ্ঞানের নিশ্চয়তা' খুঁজে পেয়েছিলেন বলে ধারণা করেছিলেন, সেখানে গাজ্জালী 'অভিপ্রায়ের' মধ্যেই মানব জ্ঞানের নিশ্চিত অবলম্বন খুঁজে পেয়েছিলেন। "আমি আছি, কারণ আমি চিন্তা করি' (Cogito ergo sum) দেকার্তের এই নীতির স্থলে গাজ্জালীর ঘোষণা: "আমি আছি, কারণ আমি অভিপ্রায় করি।" (volo ergo sum)। জগতের উদ্ভব ও বিকাশের ব্যাখ্যায় গাজ্জালীর সূত্রই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তাঁর এই সূত্রে আল-কুরআনের সূরা ইয়াসিনের ৮২নং আয়াতে ব্যবহৃত 'অভিপ্রায়' (ইরাদা) শব্দের উপস্থিতি লক্ষ্যণীয়। আল্লাহ্‌র 'অভিপ্রায়' এবং 'অভিপ্রায়' অনুসারেই (আমর বা command) জগৎ অস্তিত্বশীল।

৩. নৈতিক শিক্ষা জ্ঞান সাধনার প্রধান ভিত্তি:

গাজ্জালীর (র.) দর্শন-চিন্তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, শিক্ষা ও জ্ঞান সাধনার সর্বপ্রধান ভিত্তি হিসেবে নীতি-শিক্ষাকে (ethics) অবলম্বন করা। সমসাময়িক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পার্থিব জ্ঞান ও সম্পদের ক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতির সাথে ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার সংযোগ না হলে তা সুরক্ষা অসম্ভব। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্বীন (ধর্মীয় বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন বা Revival of Religious sciences) অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নৈতিক-ধর্মীয় সূত্রগুলোর (ethico-theological doctrines) যৌক্তিক আলোচনায় সমৃদ্ধ। অবশ্য পূর্ব উল্লেখিত তিনজন ইউরোপীয় দার্শনিক এবং তাঁদের সমগোত্রীয়রাও মানুষের বাস্তব জীবনে নৈতিক সূত্র অনুসরণের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

৪. অন্ধ-অনুকরণের কানাগলি ছেড়ে সমীক্ষণের দিগন্তবিহীন ময়দানে:

গ্রীক দার্শনিকগণ এবং তাঁদের ধারাবাহিকতায় বিংশ শতকীয় ইউরোপীয় দার্শনিকবৃন্দ নিজ নিজ দর্শন সাধনার কোন না কোন পর্যায়ে অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism), সংশয়বাদ (scepticism) প্রভৃতি দার্শনিক প্রপঞ্চ বা দিক-ভ্রান্তির শিকার হয়েছিলেন। আল-কুরআনে নিরেট বাস্তব দৃষ্টান্তসহকারে জ্ঞান ও সৃষ্টির উৎস সম্পর্কে কোন প্রকার সংশয়ের অবকাশ না রাখা সত্ত্বেও আল-গাজ্জালীর (র.) জ্ঞানতৃষা তাঁকে

এই ঘূর্ণাবর্তে নিক্ষেপ করে। তবে তিনি তা কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হন প্রবল ইচ্ছাশক্তিপুষ্ট জ্ঞান সাধনার জোরে। ১৮/২০ বছর বয়ঃক্রমকালে তিনি তাকলীদ (অন্ধ অনুকরণ, নির্বিচারবাদিতা বা dogmatic) অপেক্ষা তানকীদ (সমীক্ষণ বা critical) এবং মুক্ত বুদ্ধি ও অবাধ চিন্তার প্রতি আকর্ষিত হন। তাঁর এ সময়কার একটা সূত্র: "যে বিশ্লেষণ করে না, সে বিচার করে না। যে বিচার করে না, সে উপলব্ধি করে না। যে উপলব্ধি করে না, সে অন্ধকারে ও ভুলের মধ্যেই হাতড়ে মরে।" জ্ঞান আহরণ সম্পর্কে তাঁর ফর্মূলা: স্কলারদের উচিৎ সব রকম বিদ্যার অনুশীলন করা। যথার্থ স্কলারদের নিকট কোনও বিদ্যাই ক্ষতিকর নয়। মানুষ যে বিষয়ে অজ্ঞ, সে তারই বিরুদ্ধবাদী হয়। প্রকৃত গবেষকের কাজ হচ্ছে আল-ইসকাল বা অজানার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়া।"

দর্শনের বিভিন্ন শাখা সম্পর্কে তাঁর সমীক্ষণমূলক ও তুলনামূলক অধ্যয়নপর্ব সম্পন্ন হয় বিশ বছর বয়সের মধ্যেই। তাঁর নিজের ভাষায়: "বিশ বছর বয়সের মধ্যে প্রচলিত সব মতবাদ ও বিশ্বাস সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে বিরত থাকি নি। বাতেনী, অজ্ঞেয়বাদীদের গুপ্ত রহস্য উদ্ঘাটন না করে ছাড়ি নি, কোনও জাহেরীর বা বাহ্যজ্ঞানীর ক্রিয়াকলাপ আমার অজ্ঞাত থাকেনি, কোনও দার্শনিকের মতবাদ অজানিত রাখিনি, কোনও মুতাকাল্লিম বা তর্কবাগীশ ধর্মতাত্ত্বিকের তর্কের ও তত্ত্বের রহস্যভেদ না করে ক্ষান্ত হইনি, কোনও সুফির মর্মবাদ, কোনও দরবেশের তত্ত্বকথা কিম্বা কোনও যিন্দীক বা নাস্তিকের নাস্তিকতার ধরন আমার অজ্ঞাত থাকেনি। যৌবনের প্রারম্ভ থেকেই আমার অনুসন্ধিৎসা এরূপ প্রবল ছিল। আমার এ স্বভাব আল্লাহ্ আমার অজ্ঞাতে দান করেছিলেন।"

গাজ্জালীর জ্ঞানের প্রসারতা ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-বিচার শক্তিতে বিমুগ্ধ বিদ্বৎসমাজ। তৎকালীন সেলজুক সুলতান মালিক শাহের প্রধানমন্ত্রী, মানব কল্যাণকামী রাজনীতিবিদ নিজাম-উল-মূলক তাঁকে বাগদাদের বিখ্যাত নিজামিয়া মাদ্রাসার প্রধান অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। তখন তাঁর বয়স ৩৪। সম্মান, ঐশ্বর্য, প্রতিপত্তি বাড়ার পাশাপাশি বাড়তে থাকে তাঁর 'সত্যের স্বরূপ অন্বেষা'। জীবনের এই সোনালী সময়ে ১০৯৬ খ্রি. ৪০ বছর বয়সে তিনি সব ছেড়ে জ্ঞান ও সৃষ্টির উৎস সন্ধানে সাধনার সমুদ্রে ডুব দেন। তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তন ঐতিহাসিকদের নিকট এখনো বিস্ময়। প্রচলিত ধর্ম-দর্শনের স্বরূপ ও ব্যবস্থায় অতৃপ্ত গাজ্জালী যুক্তিবাদের (reason) ভিত্তিতে পার্থিব জীবন, ধর্মীয় কাঠামো গঠন করতে প্রয়াসী হন। কিন্তু যুক্তিবাদ তাঁকে অভ্রান্ত, অবিনশ্বর, নিত্য সৃজনশীল ও নিত্য মঙ্গলময় সত্তার যথার্থ হদিস দিতে পারে নি। 'পরম সত্যের সন্ধানে' তন্ময় হয়ে প্রায় দু'মাস তিনি 'সংশয়বাদের উৎসবিহীনতার তত্ত্ব অনস্তিত্ববাদের' আবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকেন। প্রচণ্ড তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব, স্বীয় অভিজ্ঞতার

অনমনীয় অভিযান ও রকমারী প্রপঞ্চের সাথে সংগ্রাম শেষে তিনি আপন ক্বলবেই "নূরে ইলাহীর" (divine illumination) অস্তিত্বের সন্ধান লাভ করেন এবং এরপর থেকে কেবল দর্শন জগৎ নয়, মানবজাতিকে চিন্তা, দর্শন ও দুনিয়াবী জীবন-আচরণের উপযোগী নীতিগত উপকরণের আঞ্জাম দিয়ে যান বিপুল অভিজ্ঞতাপ্রসুত মহামূল্যবান পুস্তকাদির তশতরীতে। তাঁর এই অনুপম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কিয়দংশ বর্ণিত হয়েছে বিখ্যাত মিশকাতুল আনওয়ার (The Niche for Lights বা আলোর কুলুঙ্গি) গ্রন্থে।[১] তিনি দর্শন, যুক্তিজাল, চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা, মেধাজাত বিশ্লেষণ, ক্বলবজাত অর্জনের তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ মহাসমুদ্র পেরিয়ে তাঁর ইপ্সিত সত্যের আলোর মালভূমিতে পৌঁছলেন। তাঁর ভাষায়: "অবশেষে আল্লাহ্ই প্রসন্ন হয়ে আমার মানসিক ব্যাধি দূর করলেন। আমার মনের সমতা ও চিত্তের প্রশান্তি ফিরে এলো, আমার বিবেক মৌলিক নীতির সকল কঠোরতা নিয়ে আমায় গ্রাস করলো। আমার মুক্তি হলো যুক্তির সূক্ষ্ম তর্কজালে নয়, আল্লাহ্র অমল জ্যোতিই আমার অন্তর্জগত উদ্ভাসিত করে দিলো– যে নূরানীর ছোঁয়া মাত্রেই সব জ্ঞানের দুয়ার খুলে যায়, সব পর্দা অপসৃত হয়।" তাঁর এই স্থির উপলব্ধি ঘটে একদিন আসরের ওয়াক্তে। তাঁর এসব অভিজ্ঞতার বিস্তারিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন "মোনকেজুম মিনাদ্দালাল" পুস্তকে। তাঁর ভাষায় : "প্রথম হইতেই প্রত্যেক জিনিসকে যাচাই করিয়া দেখা আমার অভ্যাস ছিল। তজ্জন্য মজহাবের উপর আমার অটল বিশ্বাস আস্তে আস্তে শিথিল হইয়া গেল। বাল্যকাল হইতে শ্রবণ করিতে করিতে যে বিশ্বাস অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল, তাহা আস্তে আস্তে চলিয়া যাইতে লাগিল। আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলাম এবং ভাবিলাম যে, এই প্রকারের অন্ধ বিশ্বাস ইহুদী ও খ্রিস্টানও করিয়া থাকে। প্রকৃত বিদ্যার ভিতর কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যথা; ইহা ধ্রুব সত্য যে, দশ তিন হইতে বেশী। যদি কোন ব্যক্তি বলে যে, তিন দশ হইতে বেশি এবং উহা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সে বলে – আমি আমার যষ্ঠিকে সর্পে পরিণত করিতে পারি (সে তাহার যষ্ঠিকে সর্পে পরিণত করিয়া তাহা দেখাইয়া দেয়), তখন আমি বলিব যে, ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যষ্ঠিকে সর্পে পরিণত করা বড় কঠিন একটি ব্যাপার; কিন্তু তবুও তিন হইতে দশ বেশী–এই বিশ্বাস ত থাকিয়াই যাইবে। তখন আমি চিন্তা করিতে লাগিলাম–এই প্রকার বিশ্বাস কোন্ সীমা পর্যন্ত যাইতে পারে। জানিলাম যে, ইহা ইন্দ্রিয়লব্ধ ও প্রাথমিক জ্ঞান। যখন জ্ঞান বৃদ্ধি পাইল, তখন ইন্দ্রিয়লব্ধ মতবাদের ভিতর আমার সন্দেহ হইতে লাগিল, উপলব্ধি পরিশেষে কোন বিষয়েই আর একীন রহিল না। এই অবস্থায় আমি দুই মাস কাটাইলাম। কিন্তু ইহার পর এই অবস্থা মন হইতে অপসারিত হইতে লাগিল। এখনও বিভিন্ন মজহাব সম্বন্ধে যে সন্দেহ মনে উদিত হইয়াছিল, তাহা রহিয়া গেল। তখন ছিল চারটি প্রধান দল- কালামপন্থী, বাতেনী, দার্শনিক ও সুফিদের দল। আমি এক একটি দলের মতামতের

যাচাই ও অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। এলমে কালামের যত কেতাব ছিল, তাহা পড়িলাম, কিন্তু তবু মনে শান্তি আসিল না। দর্শনশাস্ত্রের ভিতর যাহা বিশ্বাস করার বিষয় ছিল, তাহার সহিত মজহাবের কোন সম্পর্ক নাই। যে অংশের মজহাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল, অর্থাৎ আত্মার গুণাবলী, তাহাও বিশ্বাসের ভিত্তির উপর নহে। যে দল সমসাময়িক ইমামের উপর অন্ধ বিশ্বাস করিত, তাহাদের নাম বাতেনী দল। সমসাময়িক ইমামের মতামতের উপর কিরূপে সম্পূর্ণ একীন আনা সম্ভব হয়?"[২] [বিশদ ব্যাখ্যার জন্য ৫নং অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]

৫. জাহেরী সত্যের মাত্রা নির্ধারণে দার্শনিকদের অসঙ্গতি বা তহাফুত-আল-ফলাসিফাহ্:

সত্যসন্ধানীদের চিন্তাধারা বিশ্লেষণপূর্বক এগুলোতে সত্যের মাত্রা নির্ধারণকল্পে তিনি তৎকালীন সত্যসন্ধানীগণকে চার শ্রেণীতে ভাগ করে তুলনামূলক সমীক্ষণে প্রবৃত্ত হন: **(ক)** স্কলাসটিক ধর্মতত্ত্ববিদ (scholastic theologians) বা কালামপন্থী **(খ)** তালিমিয়া (talimites) বা বাতেনী, **(গ)** দার্শনিক (philosophers), **(ঘ)** সুফি (sufis)।

কালামপন্থীরা তাঁর জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিতে পারেননি। কারণ, তাঁরা 'সত্য' লাভের কোন গঠনমূলক মতবাদ (doctorine) প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হন নি। তাঁদের (আশারীয়দের) যুক্তি শৈলী সীমাবদ্ধ থাকে কেবল মুতাজিলাপন্থীদের যুক্তিজাল খণ্ডনে। তাঁরা কোন অস্তিমূলক (positive) মতবাদ দিতে পারেননি। তাঁদের চিন্তাপদ্ধতি সত্য নিরূপণের ক্ষেত্রে অকার্যকর। (খ) তালিমীয়রা (বাতেনীয়া, ইসমাইলিয়া প্রভৃতি) সম্প্রদায়ের মূলনীতি হলো 'অভ্রান্ত' ইমামের প্রতি বিশ্বাস। গাজ্জালীর মতে, তালিমীয়া মতবাদ কতিপয় মামুলী সূত্র ও রীতির সমষ্টি মাত্র। 'অভ্রান্ত' ইমাম চিহ্নিত করার কিম্বা খুঁজে বের করার পন্থা সম্পর্কে তাঁরা নীরব। অতএব, সেটা নির্বিচারবাদী গোঁড়ামীর (dogma) নামান্তর মাত্র। (গ) তিনি তৎকালীন দার্শনিক চিন্তাধারাসমূহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। দার্শনিকরা বুদ্ধি-যুক্তির সাহায্যে সব কিছু ব্যাখ্যা প্রদানে প্রয়াসী হলেও, তাঁরা একথা উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন যে, এর মাধ্যমে পরম সত্তার জ্ঞান লাভ করা যায় না। চিন্তার মৌলিক ধারণা ও বিধি-সূত্রগুলো সম্পর্কে পর্যাপ্ত অধ্যয়নের অভাবই তাঁদের অসঙ্গতি ও সীমাবদ্ধতার কারণ। তাঁর এই বিভাজন আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পূর্বসূরী। ক্ষেত্রবিশেষে গ্রীক দর্শনের কোন কোন অংশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। জড়বাদ নির্বিচারবাদী (dogmatic) মতবাদ এবং অতিবর্তী খোদাবাদ (deism) বিশ্বজগতের আধ্যাত্মিক মূল্য স্বীকার করে না বিধায় এগুলোতে তাঁর জিজ্ঞাসার সদুত্তর পান নি।

খোদাবাদী দার্শনিকদের মতবাদসমূহ তিনি দ্বান্দ্বিক ও সমীক্ষণবাদী পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করেন এবং এসব মতবাদের কোন কোন স্তরে যুক্তি প্রণালীর অস্পষ্টতা, আড়ষ্টতা ও অনিবার্যতার অভাব নির্দেশপূর্বক খণ্ডন করেছেন। তিনি তাঁদের বহু মতবাদ সরাসরি ভ্রমাত্মক এবং ভিত্তিহীন প্রমাণ করেন : যেমন, জগতের (cosmos) নিত্যতা, খোদা থেকে বুদ্ধিবৃত্তিগুলো ও ঐশী মণ্ডলগুলোর নির্গমন (emanation) এবং মণ্ডলসমূহের 'বিশেষ' সম্পর্কে অবগতি ও গতির উদ্দেশ্যমুখীনতা, খোদার সর্বজ্ঞতা, কার্য-কারণের আলোকে অলৌকিকতার অস্বীকৃতি, দৈহিক পুনরুত্থানের অস্বীকৃতি। তিনি এ ধারার দার্শনিকদের 'জগতের নিত্যতা' সম্পর্কিত মতবাদকে স্ববিরোধী (self contradictory) প্রতিপন্ন করেন এবং বলেন, দেশ ও কাল (space and time) উভয়ই অসীম। উভয়ই বস্তুর সম্বন্ধ (relation of things)। এ স্তর পর্যন্ত গাজ্জালী ও কান্টের মধ্যে সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু গাজ্জালী আরো অগ্রসর হয়ে বলেন, দেশ ও কাল খোদার সৃষ্টি; তাঁর সৃষ্ট অন্যান্য বস্তুর মতোই। দেশ-কাল-বস্তুর সম্বন্ধ এবং তাদের ও মানুষের মধ্যকার সম্বন্ধও আল্লাহ্‌র সৃষ্ট। আধুনিক দর্শনের প্রসিদ্ধ চিন্তাবিদ হিউমের সাতশত বছর পূর্বে তিনি 'কার্য-কারণ সম্পর্ককে ঘটনার পারম্পর্য' বলে নির্দেশ করেন এবং বলেন, জগতের একমাত্র কারণ আল্লাহ্‌র অভিপ্রায়। এই মাখলুকাত আল্লাহ্‌র 'অভিপ্রায়েরই' বহিঃপ্রকাশ এবং শূন্যতা থেকে সৃষ্ট। তা এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তর নয়, যদি তা-ই হতো তা হলে জগতে নতুন-সৃষ্টির দুয়ার বন্ধ হয়ে যেতো। জগতের বিবর্তনের পথে নতুন গুণের সৃষ্টি হচ্ছে এবং নতুন গুণের আবির্ভাবের সঙ্গে পুরাতন গুণের বিলয় ঘটছে। অতএব, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ঘটনার মধ্যে কোন অবিচ্ছেদ্য কার্য-কারণ সম্পর্ক নেই। তবে এ ঘটনাবলী বিশৃঙ্খল নয় এবং এগুলোর মধ্যে যে একানুবর্তিতা বিদ্যমান, তাহাই 'কার্যকারণ সম্পর্ক'। এই সম্পর্ককে ক্রমাগত পাশ্চাদদিকে ঠেলতে থাকলে শেষ পর্যন্ত একটা আদিকারণ 'স্বীকার করতে বাধ্য হতে হয়' এবং–তা থেকেই সব কিছুর উদ্ভব। তবে এই আদি 'কারণ' জগতের অন্যসব কিছু থেকে স্বতন্ত্র। অন্যান্য দার্শনিকদের মতে, এই কারণের গুণ বা বিশেষত্ব হলো 'চিন্তা'। খোদা 'চিন্তার' মাধ্যমে সমগ্র সৃষ্টি অবলোকন করেন এবং তাঁর 'চিন্তা' কোন ইচ্ছা বা অভিপ্রায়ের দ্বারা বিঘ্নিত কিম্বা পরিপুষ্ট নয়। কিন্তু গাজ্জালী এই মতবাদের বিরোধিতা করে বলেন, আল্লাহ্‌র গুণ বা বিশেষত্ব নিহিত রয়েছে অভিপ্রায়ে, চিন্তায় নয়। তিনি অভিপ্রায় করেন বা ইচ্ছা করেন বলেই বিভিন্ন বস্তুর জ্ঞান তাঁর আছে এবং জগৎ তাঁর অভিপ্রায়ের বহিঃপ্রকাশ। Dr. Boer বলেন, In place of the assertion of the Philosophers that God wills the World, because He thinks of it as the best. Gazzali substitutes the statement, 'God has cognizance of

the world because he wills it and in his willing it. (History of Philosophy in Islam. P-163)

দার্শনিকদের অসঙ্গতি নিরূপণে তাঁর সূত্র ও পদ্ধতি সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণের (critical analysis) কার্যকারিতাকে সমৃদ্ধতর করেছে। তিনি তাঁর বিন্যাসকৃত তিন শ্রেণীর দার্শনিকদের অসঙ্গতির হেতু চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেন যে, তাঁরা চিন্তা প্রক্রিয়ার মৌলিক ধারণা ও বিধি সম্বন্ধে পর্যাপ্ত অধ্যয়ন ও বীক্ষণ সম্পন্ন করেন নি। তাঁদের উপরোক্ত সীমাবদ্ধতা, অসঙ্গতি খণ্ডন করার পূর্বে তিনি তাঁদের দর্শন পুংখানুপুংখভাবে অধ্যয়ন ও সমীক্ষণ করেন এবং এই উদ্দেশ্যে দর্শন-বিজ্ঞানকে (philosophical sciences) ছয় ভাগে বিভক্ত করেন; (ক) গণিত, (খ) যুক্তিবিদ্যা, (গ) পদার্থবিদ্যা, (ঘ) অধিবিদ্যা, (ঙ) রাজনৈতিক-অর্থনীতি ও (চ) নীতিবিদ্যা। তিনি বিজ্ঞানের এসব শাখার একটিকেও বিশদ সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে নাকচ করার বিরোধী। কোন অভিমত নাকচ কিম্বা গ্রহণ করার পূর্বে অবশ্যই সতর্ক-যথার্থ জ্ঞান লাভে গণিতের প্রয়োগ ভ্রান্তিপূর্ণ। গণিত নিজস্ব অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে নিশ্চিত সত্যে উপনীত হতে সক্ষম হবে। কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলে তা অকার্যকর হতে বাধ্য। সকল বিষয় যুক্তিবিদ্যার সহানুমানের (syllogism) মতো নির্ভুল ও সন্দেহাতীতভাবে গ্রহণীয় নয়। এই সূত্র তিনি প্রয়োগ করেছেন বাতেনী পরমসত্তার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও।

আল্লাহ্ 'সমগ্র ও অনু' তথা সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞঃ

খোদা কেবল বিশ্বলৌকিকতা (universal) সম্পর্কে অবহিত, বিশেষ বস্তু বা বিষয় সম্পর্কে অবহিত নহেন–দার্শনিকদের এই প্রত্যয়ের সাথে দ্বিমত পোষণ করে গাজ্জালী বলেন, যেহেতু খোদার অভিপ্রায় অনুযায়ী সব কিছু সৃজিত, সেহেতু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকা সম্পর্কেও তিনি অবহিত। তিনি অনন্ত, অসীম। তাঁর জ্ঞানও অসীম এবং সে জন্য তাঁর কাছে সব বিষয়ই সুস্পষ্ট। 'খোদার সত্তার ঐক্য' নির্দেশ করে যে, তিনি 'ইচ্ছাময় সত্তা'; 'চিন্তক' (thinking) সত্তা নন। কারণ, চিন্তার ক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-এর জটিল সম্পর্ক বর্তমান এবং এ সম্পর্ক একটা অন্তহীন প্রক্রিয়া। জ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যায়; জ্ঞেয় বস্তু বিভিন্ন প্রকার এবং জ্ঞাতার সাথে এগুলোর বিবিধ প্রকার যোগসূত্র বা সম্পর্কের মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্য বিধানের জন্য প্রয়োজন ঐচ্ছিক ক্রিয়া। গাজ্জালীর মতে, মানুষ আত্মচৈতন্যে স্বীয় ঐচ্ছিক ক্রিয়া সম্পর্কে সরাসরি অবহিত হয়। ঐশী জ্ঞানের ঐক্য বা অভিন্নতা এক শাশ্বত ঐচ্ছিক সত্তা বা শক্তির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে। যেহেতু আল্লাহ্র অভিপ্রায়েই মাখলুকাতের সৃজন, সেহেতু তিনি এ সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত। তিনি 'জানেন' বলেই 'ইচ্ছা' করেন না। বরং বিপরীতক্রমে 'ইচ্ছাময়তাই' তাঁর বৈশিষ্ট্য ও তাঁর সত্তার মূল। তাঁর ইচ্ছাক্রমে সব কিছু সৃষ্ট বিধায়

সমুদয় সৃষ্টি সম্পর্কে তিনি জ্ঞাত এবং একারণে প্রকৃতিগত ঐক্যে কোন ব্যাঘাত ঘটে না। এদিকে প্রকৃতির মধ্যে সমগ্র সৃষ্টির জন্য একটা প্রযত্ন বিদ্যমান (there is a providence in nature) এবং ঐশী প্রযত্ন (divine providence) প্রত্যেক ঘটনাকে (event) আবশ্যকীয় ঘটনায় (necessary event) পর্যবসিত করে। কিন্তু গাজ্জালীর মতে, এই পূর্ব-জ্ঞান (fore-knowledge) স্মরণকালজ (memory) জ্ঞান থেকে পৃথকীকরণীয় নয় অর্থাৎ আল্লাহ্‌র জ্ঞান কালোত্তীর্ণ বা কাল বিভাজনের উর্ধ্বে। বিশ্লেষকদের মতে; শাশ্বত, সর্বশক্তিমান সৃজনী অভিপ্রায়কে প্রমাণসিদ্ধ করতে গাজ্জালী জগতের ক্ষণস্থায়ী বৈশিষ্ট্য এবং মানবিক ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অপ্রয়োজনীয় সাব্যস্ত করে বলেন, প্রচ্ছায়া ও প্রতিচ্ছবির (shadow and image) এই জগৎ আল্লাহ্‌র সর্বব্যাপিতায় বিলুপ্ত হয়ে যায়।[৩] তাঁর এসব সূত্র আল-কুরআনের কোন না কোন আয়াতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ; যেমন, সূরা ইয়াসিন, আয়াত ৮২ : 'তিনি যখন কিছু একটা করতে ইচ্ছা করেন, তখন শুধু বলেন, 'হও'। অতঃপর তা সাথে সাথে হয়ে যায়।'

প্রকৃতির কার্যকারণ তত্ত্ব বনাম কালিক সম্পর্ক (causality of nature vs. relation of time):

আল-গাজ্জালী তাঁর পূর্ববর্তীদের প্রণীত কার্যকারণতত্ত্ব খণ্ডন করে সেটাকে কালিকসম্পর্কে রূপান্তরিত করেন। তাঁর মতে কার্যকারণ সম্পর্ক হলো ঘটনার পারম্পর্য। প্রকৃতিতে একটা ঘটনার পর নিয়মিতভাবে আরেকটি ঘটনা ঘটে। কিন্তু পরবর্তী ঘটনা কিভাবে পূর্ববর্তী ঘটনা থেকে নিঃসৃত হয়, তা প্রহেলিকাময়। প্রকৃতির 'বস্তুগুলোর' ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাত। এছাড়া ঘটনার রূপান্তর বা একটি ঘটনা অন্য ঘটনায় পরিবর্তন অর্থাৎ একটা থেকে অন্যতে শক্তি বা স্পৃহার (force or energy) সঞ্চালন আমাদের দৃশ্যাতীত। একটি ঘটনা (fact) অন্য ঘটনায় রূপান্তরিত হতে পারে না। এমনকি ঐশী ইচ্ছাও একটি নির্দিষ্ট বস্তুকে অন্য একটি বস্তুতে পরিবর্তন করতে পারে না। আল্লাহ্‌ কোন বস্তুকে হয় সৃষ্টি করেন, কিম্বা ধ্বংস করেন।

মানুষের রুহ্‌ই স্বাধীন সৃজনাত্মক কার্যকারক (free causality):

শুধু মানুষের রুহ্‌ বা আত্মাই কার্যকারক বা কার্য ও কারণের সম্বন্ধ। আমরা অনুভব করি যে, আমাদের আত্মা স্বাধীন সৃজনশীল কার্যকারক (free creative agent)। রুহের কার্যাবলী অবাধ ইচ্ছাশক্তি থেকে উৎসারিত হয়। রুহ সক্রিয় ইচ্ছাশক্তি সম্পর্কে সচেতন। রুহের সৃজনাত্মক কর্মশীলতার সচেতনতা আমাদেরকে সৃজনশীল ঐশী শক্তির (divine agent) ধারণার দিকে এগিয়ে নেয়। অর্থাৎ 'আল্লাহু আছেন'-এই প্রতীতিটা আমাদের রুহের অন্তর্গত বস্তু। মানুষের রুহ্‌ স্রষ্টার প্রতিবিম্ব (image)। তবে আল্লাহু ও প্রকৃতির মধ্যে কোন প্রকার সাদৃশ্য নেই।

দৈহিক পুনরুত্থান প্রসঙ্গ (physical resurrection):

অন্যান্য দার্শনিকদের মতে, শুধু আত্মা অবিনশ্বর, দেহ ধ্বংসশীল; কাজেই দৈহিক পুনরুত্থান অসম্ভব। কিন্তু আল-গাজ্জালী এই অভিমতের বিরোধিতা করে যুক্তি দেনঃ "আত্মার ন্যায় দেহও অবিনশ্বর, অমর। জন্মকালে দেহের সাথে আত্মার সংযোগ ও মিলন যদি সম্ভব হয়, তা হলে মরণের পরেও নতুন দেহের সাথে আত্মার মিলন অসম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি দেন: "আমরা যখন হাড্ডিসার ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবো, তখনও কি আমাদেরকে নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত করা হবে? (১৭:৯৮)"। বলুন: "এগুলোকে তিনিই পুনরুজ্জীবিত করবেন, যিনি প্রথমবার সেগুলোকে সৃষ্টি করেছেন (৩৬:৯৭)।" প্রারম্ভের দ্বারাই উহার পুনরুজ্জীবনের প্রমাণ পাওয়া যায়। আল্লাহ্ বলেন : 'তোমাদের সৃজন ও পুনরুত্থান এক (অভিন্ন) নফ্স বৈ কিছু নয়' [মা' খালকুকুম ওয়া লা' বাআচুকুম ইল্লা কানফ্সিন ওয়াহেদাতিন (৩১:২৮)]। পুনরুজ্জীবন মানব জীবনের দ্বিতীয় স্তর। প্রথম প্রারম্ভের ন্যায় তা সম্ভব।"[৪]

আল-কুরআনে একাধিকবার ইরশাদ হয়েছে, স্রষ্টার পক্ষে প্রথম সৃষ্টি অপেক্ষা দ্বিতীয় সৃষ্টি সহজতর, সন্দেহ নেই। অবশ্য দার্শনিকদের মতে, এ বিষয়টা দার্শনিক বিতর্কযোগ্য খণ্ডিত বিষয় নয়।

তাসাওউফ: আল-গাজ্জালীর বিন্যাস অনুযায়ী, সত্য সন্ধানীদের চতুর্থ শ্রেণী হলো তাসাওউফ। তাসাওউফ ইসলাম ধর্মের মারিফাত বা বাতেনী (গূঢ়) দিকের ধারক, যেমন শরিয়ত সামাজিক বিধি-বিধানের নির্দেশক। তাসাওউফ দর্শন মতে খোদা নৈর্ব্যক্তিক ও অজ্ঞেয় সত্তা নহেন। প্রজ্ঞা বা কাশ্ফের মাধ্যমে যে পরম শক্তির (absolute thought) পরিচয় পাওয়া যায়, তা মানুষের ক্বলবের আবেদন বা খোরাক চরিতার্থ করতে সক্ষম। তাসাওউফ স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যকার এই কূন্যতা বা ব্যবধান মুছে দিয়েছে। স্বজ্ঞা বা কাশ্ফই পরমসত্তাকে উপলব্ধি করার একমাত্র উপায়। তাসাওউফের জ্ঞানতত্ত্ব বুদ্ধিবাদীদের জ্ঞানতত্ত্ব থেকে আলাদা।

দ্বীনের ভিত্তি ওহী:

আল-গাজ্জালীর জ্ঞানতত্ত্ব অনুযায়ী দ্বীন বা ধর্মের ভিত্তি 'ওহীর' উপর প্রতিষ্ঠিত। কুরআনে বিবৃত ওহী সর্বদা গ্রহণীয়, এতে কোন সংশয় কিম্বা বিরোধ (contradiction) নেই। প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞান্বিত জ্ঞান-দর্শন আমাদের চিন্তার ভ্রান্তি নিরসনে সহায়ক হয়। দর্শন সাধারণ-জ্ঞান এবং সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তা-প্রণালী ও তার ফসল ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কাজেই দর্শনলব্ধ জ্ঞান ও প্রজ্ঞান্বিত জ্ঞান একই স্তরের নয় এবং একই মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। তাসাওউফপন্থীদের সাথে তিনি সহমত পোষণ করেন যে, ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত জ্ঞান কাশ্ফ বা অতীন্দ্রিয় অনুভূতির

মাধ্যমে পরীক্ষিত হতে পারে এবং এই কাশ্‌ফের মাধ্যমে মানুষ খোদার সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে, তাঁর নূরে নূরান্বিত হতে পারে।

তবে আল-গাজ্জালী কোনক্রমেই দর্শন ও বিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন না। তিনি পার্থিব বাস্তব জীবনে দর্শন ও বিজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা যৌক্তিকতা সহকারে স্বীকার করেন, যার বিশদ বিবরণ ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্বীন গ্রন্থে বিভিন্ন অধ্যায়ে বিশ্লেষিত হয়েছে। তবে তিনি দর্শন ও বিজ্ঞানের সীমাও নির্ণয় করে দিয়েছেন। তাঁর মতে, যে 'পরম সত্যের জ্ঞান' লাভের জন্য মানব-মন চিরন্তন তৃষিত, যে 'পরম সত্তার সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় মানব চিত্ত 'বিশ্বাসের' অনির্বাণ মশাল নিয়ে সন্তর্পণে পথ চলছে, দর্শন ও বিজ্ঞানজাত জ্ঞান যে চাহিদা মিটাতে এখনো অসমর্থ।'

আল-গাজ্জালীর উপসংহার এই যে, পরিদৃশ্যমান জগতের অন্তরালে বিরাজমান 'অসীম সত্তাকে মাখলুকাত বা সৃষ্ট বস্তুর সাথে সাদৃশ্যের' অঙ্কের হিসেবে অবহিত হওয়া যায় না। আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয় লব্ধ জ্ঞান এবং এমনকি প্রজ্ঞার অন্তর্নিহিত ধারণার মাধ্যমে ঐশী রহস্যের আবরণ ভেদ করা যায় না। পরম সত্তা–আল্লাহ্‌ সংবেদন (sensation) এবং প্রজ্ঞার (wisdom) সীমানার বাইরে। এই দুয়ের সীমানা ছাড়িয়ে অনন্ত স্তরে তাঁর অবস্থান। একমাত্র কাশ্‌ফ বা সমাহিত অথচ সচেতন অতীন্দ্রিয় অনুভূতি (in.uition) তাঁকে অনুভব করতে পারে। এটা ক্বলবের শক্তি। কঠিন অনুশীলন বা রিয়াজতের মাধ্যমে ক্বলবের শক্তি অসীমে পরিব্যাপ্ত হয় এবং পরম সত্তার উপলব্ধি লাভে সমর্থ হয়। এ অবস্থায় মানুষের ক্বলব, রুহ্‌, অনন্তলোকে উন্নীত হয়ে অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অন্তরায়ের (barrier) ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত হয় এবং পরম মহান সত্তার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়। আল-গাজ্জালীর পরম ও চরম সত্য-অন্বেষার সূচনা ও উপসংহারের এই হলো রূপরেখা।

৬. বাতেনী সাধকদের অনুশীলন নির্দেশিকা এবং 'ডেঞ্জার-জোন':

যুক্তি-দর্শন-কুরআন-হাদিস অধ্যয়নের সমুদ্র পার হয়ে আল-গাজ্জালী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুক্তি ও তত্ত্ব আলোচনার মাধ্যমে সত্য লাভ সম্ভব নয়। তিনি তাসাওউফ শাস্ত্রের দিকে মনোনিবেশ করেন এবং আল-হারিস, আল মুহাসিবী, আবু ইয়াজিদ আল বুস্তামী, মনসুর হাল্লাজ, আল-শিবলী, জুনায়েদ বাগদাদী প্রমুখ তাসাওউফ দার্শনিকের রচনাবলী গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এই মর্মে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেন, "আমি স্পষ্টতঃ দেখেছি যে, তাসাওউফ সাধকদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান, তা কোন গ্রন্থ পাঠে আয়ত্ত করা যেতে পারে না। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, তন্ময়তা এবং রুহানী-বাতেনী উরুজ বা ঊর্ধ্বারোহনের মাধ্যমেই তা অর্জন করা যেতে পারে।" এই সূত্র ধরে তিনি বাতেনী অনুশীলনে ব্যাপৃত হন এবং এর ফলশ্রুতিতে তাঁর নিজের পার্থিব, জাগতিক, প্রাতিষ্ঠানিক, দ্বান্দ্বিক অভিজ্ঞতার আলোকে বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ

ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্বীন বিরচিত হয়। তাঁর পরম দার্শনিক সিদ্ধান্ত: ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার অতীত ওহী বা প্রত্যাদেশই প্রকৃত নির্মল জ্ঞানের উৎস। এই স্তরে মানব-আত্মার সকল বন্ধন লুপ্ত হয় এবং ঐশী আলোক বা নূর তাঁর সমস্ত পর্দা সরিয়ে দেয়। নবী-রসূল এবং তাঁদের ওয়ারিশ বাতেনী সাধকেরাই এই স্তরের অধিবাসী। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতাতীত এই বাতেনী ইলম 'মুখ্য ও গৌন' দু'প্রকার হতে পারে: ওহী ও ইলহাম। ওহীর প্রকাশ ঘটেছে সরাসরি নবী-রাসূলদের মাধ্যমে। আর ইলহাম বা প্রেরণা প্রকাশ পায় পবিত্রাত্মা সুফি-দরবেশদের মাধ্যমে [টীকা ৫ এবং ৭ দ্রষ্টব্য]। আল-গাজ্জালীর মতে, 'হাল' বা তন্ময়তা এক ধরনের প্রত্যাদেশ বা ওহী বিশেষ। 'নূরের' সাগরে মিশে যাওয়া আওলিয়াগণই এই পর্যায়ে উপনীত হন। তাঁর এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে প্রফেসর ম্যাকডোনাল্ড স্বীয় "মুসলিম থিওলজী" গ্রন্থে বলেন: "তিনি (গাজ্জালী) জ্ঞাত হলেন যে, বাতেনী পথের অভিযাত্রীরাই একমাত্র সত্য ও ঐশী জ্ঞানের পথে বিচরণশীল। বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান তাঁদের নীতি বা মতবাদের উপর ক্রিয়াশীল নয়। তাঁরা যে 'নূরে' বিচরণ করেন, তা 'ওহীর নূরের' সাথে অভিন্ন। নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (দ.)ও ছিলেন একজন বাতেনী সাধক (হানিফ)। এই জগতে মানুষকে আলোর পথে পরিচালিত করার অন্য কোন আলোক নেই। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য সব কিছু থেকে ক্বলবকে সম্পূর্ণ মুক্ত করা ও রাখাই তাঁদের (বাতেনী সাধকদের) পথ। সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র ধ্যানে ক্বলব-নফ্স, হৃদয়-মন নিবেদন করাই এই পথের প্রারম্ভ এবং তাঁর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পিত হওয়াই এই পথের শেষ।" প্রফেসর সায়েদুর রহমান গাজ্জালী দর্শনের শিলালিপি রচনা করেছেন এভাবে: To sum up Gazzali rejected metaphysics and opposed the influence of all philosophical system in his theology. The basis of knowledge must be revelation, which one should accept and correlate. Beyond a certain poin. one must not enquire in the why and how of things. If he does so he will enter in.o metaphysics, the danger-zone where he loses touch with vital realties and begins to fight with words. Gazzali was a mystic and held that the soul in a state of ecstasy can have a direct vision of realities.[৫] পরম সত্যের সন্ধানে পার্থিব সকল প্রকার আশা-আকাঙ্ক্ষা-প্রাপ্তির উর্ধ্বে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন আল-গাজ্জালী এবং এই উপলব্ধি তাঁর জন্য ও তাঁর ক্ষেত্রে সঙ্গত।

৭. দর্শনের ভুবনে তাঁর প্রভাব:

তিনি যে যুক্তি বিচার-বুদ্ধি, দর্শনশাস্ত্র বিরোধী ছিলেন না, তা ইতোপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। বরং দর্শন শাস্ত্রের এই উপাদানগুলোর যথার্থ প্রয়োগ ও সদ্ব্যবহার করেই তিনি

তাঁর ইপ্সিত পরম সত্যের উপলব্ধি অর্জনে সক্ষম হন। তাঁর দর্শন পরবর্তীকালে মুসলিম দর্শনসহ অপরাপর দর্শনকে প্রভাবিত করেছে। প্রফেসর ডি.বি. ম্যাক-ডোনাল্ড-এর মতে:

(ক) আল-গাজ্জালী মানুষকে ধর্মতত্ত্বে নিষ্প্রাণ শব্দ ও বাকসর্বস্ব যুক্তিজাল ও জল্পনা (scholastic speculation) থেকে উদ্ধার করে আল-কুরআন ও হাদিসের অব্যাহত অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণপূর্বক প্রাণবন্ত, ফলপ্রসূ ও বাস্তবতাভিত্তিক অনুশীলনের দিকে ফিরিয়ে আনেন। মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধর্মান্ধতার অপসারণের সময়ে ইউরোপে যা ঘটেছিল, আল-গাজ্জালীর নেতৃত্বে সমকালীন মুসলিম সমাজেও তাই ঘটেছিল। তিনি ধর্মতত্ত্ববিদ ছিলেন সত্য, কিন্তু কুরআন ও হাদিসের আলোকে ধর্মতত্ত্বের বিকাশ ঘটানোই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

(খ) তাঁর নৈতিক শিক্ষা ও উপদেশাবলীতে তিনি ভীতির পুনঃপ্রবর্তন করেন এবং তাঁর 'মানকিজ মিন জালাল' গ্রন্থে ও অন্যত্র মানব মনে আল্লাহ্ভীতি উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁর নিজের ভাষায়, তাঁর যুগ আশাবাদ প্রচার কিম্বা কোমল বিষয় প্রচারের উপযোগী ছিল না। তাঁর মতে, দোজখের আজাবের বর্ণনা মানুষকে নৈতিকতানিষ্ঠ করে তুলতে পারে। দোজখের ভয় মানুষকে সংহত, নিয়ন্ত্রিত, পবিত্র, সৃজনশীল জীবন যাপনে উদ্বুদ্ধ করার প্রধান চালিকা শক্তি।

(গ) তাঁর দর্শনের প্রভাবেই তাসাওউফ ইসলামে সুদৃঢ় ও সুবিন্যস্ত ভিত্তি লাভ করেছে। তিনি দেখিয়েছেন যে, তাসাওউফ ইসলামের বাতেনী দিক ও মূলধারার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ।

(ঘ) দর্শন জগতে তাঁর অন্যতম ব্যবহারিক অবদান হলো, দর্শনকে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় ও তাঁদের নাগালের মধ্যে আনেন। শব্দ ও ভাষার মারপ্যাঁচ থেকে দর্শনকে মুক্ত করে সাধারণের বোধগম্য সহজ ভাষায় মাঠে ছেড়ে দেন তিনি এবং দার্শনিকের জটিল মতবাদ, যুক্তিপদ্ধতি, অন্তর্গত দুর্বলতা ও অনুপপত্তিকে সহজ, সুস্পষ্ট ও বোধগম্য করার উদ্দশ্যে 'তাহাফাতুল ফালাসিকা' (দার্শনিকদের অসঙ্গতি) গ্রন্থ রচনা করেন। এ বিষয়ে ৪নং অনুচ্ছেদে আলোকপাত করা হয়েছে।

আত্মার স্বরূপ:

পরম সত্য ও সত্তার সম্যক উপলব্ধি মানব জীবন-সাধনার চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং এজন্যে দরকার স্বীয় আত্মার পরিচয়-জ্ঞান। আবার এ জন্যে প্রয়োজন আত্মাকে প্রবৃত্তির ঘেরাটোপ থেকে মুক্ত করা। নৈতিকতা মানব সমাজকে বাস্তবতার ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে সুস্থির নিয়মতান্ত্রিক পথে ও গতিতে চালাবার মাস্তুল। নৈতিক বাধ্য-বাধকতা বোধ, জীবনে ঔচিত্য-অনৌচিত্য নির্ণয়ের জন্য নিছক 'চিন্তা শক্তি' যথেষ্ট নয়। মানব সভ্যতার বিকাশের অভিজ্ঞতা এই শিক্ষা দিয়েছে যে, আধ্যাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে

বিশেষ 'হাল' বা সচেতন তন্ময় অবস্থাতেই ন্যায়-অন্যায়, ভালো-মন্দ, ঔচিত্য-অনৌচিত্যের স্বরূপ ও প্রভেদ সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়া যায়। মানব চিন্তাশক্তি রহস্যের জাল ভেদ করতে পারে না, কিঞ্চিৎ স্পর্শ করতে পারে মাত্র।

আল-গাজ্জালীর মতে সকল মানুষের আত্মিক বিকাশের স্তর অভিন্ন নয়। এর বিভিন্ন ধাপ রয়েছে। আত্মার স্বরূপ নির্ণয়ে তিনি সমগ্র অস্তিত্বকে (existence) তিনটি ভাগে (অর্থাৎ আলম, মোকাইম/ লোক/ সৃষ্টিস্তর) বিভক্ত করেন। সেগুলো হলো : (ক) আলম-ই-মূলক (পার্থিব জগৎ), (খ) আলম-ই-মালাকুত (ঐশী জগৎ) এবং (গ) আলম-ই-জবরুত (মধ্যবর্তী জগৎ)। আলম-ই-মূলক আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পরিদৃশ্যমান জগৎ এবং চিরন্তন পরিবর্তনশীল নিয়মের অধীন। আলম-ই-মালাকুত চিরন্তন ঐশী জ্যোতির্ময় অপরিবর্তনীয় জগৎ, যা জাগতিক বস্তুর মতো পরিবর্তন বা বিকৃতির নিয়মের অধীন নয়। লাওহে মাহফুজ, আরশ, কুরসি, লৌহ, কলম প্রভৃতি সুরক্ষিত বস্তুগুলো এ জগতের অন্তর্ভুক্ত। এ স্তরে উপনীত হতে পারলে সালিক সাধক অপবিত্রতা, অবৈধ চিন্তা ও কাজ থেকে মুক্ত অবস্থায় আল্লাহ্‌র জিকির-মোরাকাবা, মোশাহেদায় নিমগ্ন হন। বিশ্ব জগতের সব জিনিস এখানে সূক্ষ্ম আকারে (form) বিরাজ করে। ফেরেশ্‌তা এবং মানবাত্মার ভূমিষ্ঠ হবার পূর্ববর্তী ও মৃত্যু পরবর্তী অবস্থান এ জগতে। আলম-ই-আরওয়া ও আলম-ই-মিসাল থেকে এ স্তরের উদ্ভব। ফেরেশ্‌তারা সূক্ষ্মদেহী নিষ্কলংক চরিত্র ও পবিত্রতার প্রতীক। আলম-ই-জাবারুত উপরোক্ত উভয় জগতের মধ্যবর্তী স্তর। এটা ঐশী বাস্তব (reality) জগতের অন্তর্ভুক্ত। এটাকে সিফাত-ই-তাফসিলীও বলা হয়। এ স্তরে আল্লাহ্‌র সিফাত পৃথক পৃথক ও বিস্তৃতভাবে প্রকাশ পায়। এই আলমে উপনীত হলে রবুবিয়াত, আবুদিয়াতের প্রকৃত হাকীকত, উলুহিয়াত (হাহুত, লাহুত) উপলব্ধি করা যায়। **তবে এ স্তরের অনুভূতি প্রকাশ করা সাধকের পক্ষে সম্ভব কিম্বা বৈধ নয়।** আলম-ই-হাহুত, লাহুত ও জাবারুত মূলতঃ অসৃষ্ট, অনাদি, কাদিম এবং ওয়াজিবুল ওজুদের মোকাইম। এটা সম্পূর্ণরূপে অধ্যাত্মিক জগৎ। আল-গাজ্জালীর এই ত্রিবিধ আলম বা জগৎ স্থান কিম্বা কালের বিবেচনায় স্বতন্ত্র নয়। একই সত্তার বিভিন্ন স্তর। অবভাষিক (appearance) জগতের কোন দ্রব্যের সাথে এগুলোর কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর এই মতবাদ সর্বখোদাবাদের (pantheism) তাত্ত্বিক যৌক্তিকতাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে। দার্শনিক-যৌক্তিক বিচারে সর্বখোদাবাদ ধর্ম ও নীতিরমূলে কুঠারাঘাত করে। কারণ, এই তত্ত্বে জীবের চেতনা ও স্রষ্টার চেতনাকে এক করে ফেলা হয়েছে। অস্বীকার করা হয়েছে জীবাত্মার বাস্তব সত্তাকে, বহুত্ব ও বিভেদের অস্তিত্বকে। অথচ বহুত্ব ছাড়া এককত্ব মূল্যহীন, বিভেদের অবর্তমানে ঐক্য অর্থহীন, জগৎ বা সসীম সত্তা না থাকলে অসীমের মূল্যায়ন সম্ভব নয়। সামগ্রিক বিচারে সর্বখোদাবাদ শূন্যগর্ভ মতবাদ।

৮. বেলায়তে মোত্লাকার উসুলে সাবয়া এবং ইমাম গাজ্জালীর যথার্থ মানুষ গঠন প্রণালী:

উসুলে সাবয়া সম্পর্কে ইতোপূর্বে পঞ্চম অধ্যায়ে বিশদ আলোকপাত করা হয়েছে। এই সপ্তকর্ম পদ্ধতি ইমাম গাজ্জালীর 'যথার্থ মানুষ গঠন প্রণালী'র বিশ শতকীয় সংস্করণও বটে। মুসলিম জীবন-দর্শনবেত্তারা মানুষের পার্থিব কর্তব্য ও অধিকারগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করেছিলেন: হক্কুল্লাহ্ ও হক্কুল ইবাদ (দ্রঃ হযরত জুনায়েদ বাগদাদী)। ইমাম গাজ্জালী তাঁর 'যথার্থ মানুষ গঠন প্রণালীতে' আরো একটা বিষয় সংযোজন করেন এবং তা হলো: 'মানুষের নিজের প্রতি কর্তব্য'। তাঁর ভাষায়: মানুষের কর্ম ও কর্তব্য-কার্য ত্রিবিধ: যথা: (১) আল্লাহ্র প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান বা ইবাদত, (২) মানবজাতি তথা সৃষ্ট জীব তথা সৃষ্টির প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান, সামাজিক আচার-ব্যবহার, (৩) মানুষের নিজের প্রতি কর্তব্যানুষ্ঠান, যা আবার দু'ভাগে বিভক্ত: (ক) আত্ম-দোষ সংশোধন, (খ) আত্ম-সৌষ্ঠব সম্পাদন।

ইমাম গাজ্জালী প্রণীত 'যথার্থ মানুষ গঠন প্রণালী' যেন 'উসুলে সাবয়ার' বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। উল্লেখ্য, প্রত্যেক ত্বরিকার ওলী-বুজুর্গদের নিজেদের অনুসারীদের শোধন ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী তালিম নির্ণীত রয়েছে। উসুলে সাবয়া এই আবশ্যকীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বটে।

৯. মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শন চিন্তার পুনর্গঠন:

ইমাম গাজ্জালীর অতুলনীয় অবদান মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও মুসলিম-দর্শন চিন্তার পুনর্গঠনপূর্বক সুস্পষ্ট পরিচিতি-ফলক নির্মাণ, যা সমীক্ষণবাদ ও স্বজ্ঞা বা কাশ্ফের কাঠামোতে সংস্থাপিত। অপরাপর অনেক মুসলিম মনীষার মতো স্বগোত্রীয়দের ঈর্ষা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতার শিকার ইমাম গাজ্জালীর বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ শাসক অর্থাৎ সুলতানসহ বিভিন্ন পর্যায়ে অহেতুক নালিশ করে তাঁকে অপদস্থ করার অপচেষ্টা চালানো হয়। মৌলিক জ্ঞান অন্বেষণের দুর্গম পথ পরিহারকারী এক শ্রেণীর তৎকালীন দরবারী, বাজারী, অর্থ-ফিকিরী-আচারী ধর্মবাজদের দলবদ্ধ মজলিসী আক্রমণ-অভিযানের জবাবে গাজ্জালী যা বলেন, তাই তাঁর দর্শনের কলেমা বা মূলমন্ত্র হয়ে আছে। তাদের চরম প্রশ্ন ছিল: আপনি কোন মজহাবের অনুবর্তী? তাঁর ঐতিহাসিক চূড়ান্ত উত্তরটা ছিল: **যুক্তি-দর্শন ক্ষেত্রে জ্ঞানের। আর অনুসরণীয় বিষয়ে কুরআনের।** আমি কোনো ইমামের নির্বিচার (dogmatic) অনুকরণকারী নই।" তবে ইমাম আযম আবু হানিফার (র.) ভক্ত-অনুসারী তৎকালীন সেলজুক সুলতানের দরবারে অনেকটা জবাবদিহিতামূলক এক আয়োজনে তাঁকে তলব করা হলে তিনি বলেন: "আমি তাঁকে (ইমামে আজমকে) ফিকাহ্ শাস্ত্রের যুগস্রষ্টা ইমাম বলে স্বীকার করি। তাঁর সম্বন্ধে আমার মূল্যায়ন আমি ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন কিতাবে প্রকাশ করেছি। তাঁর প্রতি কোন

প্রকার আক্রমণমূলক উক্তির অভিযোগ সর্বৈব মিথ্যা।" এই অনুষ্ঠানে তিনি তৎকালীন শাসনকালে বিশৃঙ্খলা, অত্যাচার, অনাচার, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক দুরবস্থার সমালোচনা করে বলেন, "দুঃখ-কষ্টের ফলে নাগরিকদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম, অথচ সেদিকে আপনার ভ্রূক্ষেপ নেই। ... একটি সত্য কথা বললেও বহু লোক তার শত্রু হয়ে যায়।"

উল্লেখ্য, ইমাম গাজ্জালী (র.) প্রথম দিকে শাফেয়ী মজহাব অবলম্বী ছিলেন। তিনি দার্শনিক ক্ষেত্রে আশারিয়া মতবাদী ছিলেন; তবে এই মতবাদের সীমাবদ্ধতা ভেঙ্গে তিনি অন্যান্য সকল চিন্তা-গোষ্ঠীর ভাবনাগুলোর যুক্তিসিদ্ধ উত্তম দিকগুলোর সমন্বয় সাধন করে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ প্রকাশ করেন, যে কারণে তাঁকে একাধারে মুতাকাল্লিম (যুক্তিবাদী তর্কবিদ), দার্শনিক ও সুফি বলা হয়। তিনি ধর্মীয় চিন্তা, দর্শন ও সমাজ ব্যবস্থাপনা ক্ষেত্রে তৎকালে ইসলামী চিন্তাধারার (school of thought) পুনর্গঠন সাধন করেন। এই অমলিন ও ক্রিয়াশীল অবদানের জন্য পরবর্তীকালের মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে বহু দার্শনিক, ধর্মবেত্তা, সুফি, আলিম তাঁকে মুসলিম জাহানের পঞ্চম ইমাম হিসেবে অভিহিত করেন।

১০. ইমাম গাজ্জালীর ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং বেলায়তে মোত্লাকায় এর অবস্থান:

ধর্মের অবলম্বন নিরঙ্কুশ বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাস-সংশ্লিষ্ট আবেগ। দর্শনের অবলম্বন যুক্তিমত্তা, যা আবেগ বিবর্জিত ও সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণ নির্ভর। ধর্মতত্ত্বের দুটো রূপ: প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব (natural theology) এবং প্রত্যাদিষ্ট বা ওহীজ ধর্মতত্ত্ব (revealed theology)। প্রাকৃতিক ধর্মতত্ত্ব বহির্জগত ও মানবাত্মার প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখে পরম সত্তার অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্পর্কে গবেষণা করে। এই ধর্মতত্ত্ব বিচারবাদী ধর্মতত্ত্ব (rational theology) নামেও অভিহিত। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও মুসলিম দর্শনের পার্থক্য নির্ণয়েও এই সূত্র প্রযোজ্য। **মুসলিম দর্শন যুক্তির চুলচেরা হিসাব করে চলে। আবেগের প্রবেশাধিকার সেখানে নেই। কিন্তু মুসলিম ধর্মতত্ত্ব নিরঙ্কুশ বিশ্বাসের (ঈমান) নিষ্কম্প প্রভায় ভাস্বর। তবে সেখানেও যুক্তি বিচার-বিশ্লেষণ এক বিশেষ অভিব্যক্তি নিয়ে বাঙ্ময়।**

মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ইসলাম ধর্মের মূলনীতিগুলো স্বীকার করে নিয়ে বিশ্বাসীদের জীবনে এসব নীতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। ইসলামের মৌলিক নীতি ও আদেশ-নিষেধগুলো বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীপুষ্ট যুক্তির সোহাগা দিয়ে পরীক্ষণযোগ্য। তবে ধর্মের মূলনীতিগুলো কবুল করে নেবার পরেই বিচার-বিশ্লেষণের প্রশ্ন আসে; এর আগে নয়। অন্যদিকে অন্যান্য দর্শনের মতো মুসলিম দর্শনের ক্ষেত্রে বিচার-বিশ্লেষণ স্বাধীন ও স্বনিয়ন্ত্রিত।

মুসলিম ধর্ম তত্ত্বের উৎস ওহী (revelation), আর মুসলিম দর্শনের ভিত্তি বিচারবুদ্ধি, যুক্তিমত্তা (reason):

ধর্মতত্ত্ব ওহীতে বিশ্বাসী, আর দর্শন (কতিপয় ব্যতিক্রম ছাড়া) যুক্তির অভ্রান্ত, অকাট্য শক্তিতে আস্থাশীল। তবে উল্লিখিত ব্যতিক্রমগুলোতেও যথার্থ যুক্তির প্রাধান্য লক্ষ্যণীয়। মুসলিম ধর্মতত্ত্ব 'ওহী' ও 'ইলহাম'–এর উপর প্রতিষ্ঠিত। 'ওহী' পবিত্র মহান নবীদের মাধ্যমে প্রকাশিত। আর 'ইলহাম' ওলী-আল্লাহ্, ধ্যানী-সাধকদের মোরাকাবা-মোশাহেদার মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা। 'ওহী' মুখ্য প্রত্যাদেশ (major revelation) এবং 'ইলহাম' গৌণ প্রত্যাদেশ (minor revelation) হিসেবে চিহ্নিত। অতএব; মুসলিম ধর্মতত্ত্বের, জ্ঞানের উৎস 'ওহী' ও ইলহাম, (revelation and in.uition, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা বা স্বজ্ঞা বা বোধি)। সহজ ভাষায়, নবী-রসূলগণ 'ওহী'র মাধ্যমে এবং ওলী-আল্লাহ্গণ 'ইলহামের' মাধ্যমে পরম সত্তা বা হক্ব-এর সাথে সংযুক্ত থেকে পরম সত্য বা ইলমে লাদুন্নী অর্জন করেন। তবে মুসলিম দর্শনে সাধারণতঃ যুক্তি ও বিচার শক্তিরই প্রাধান্য, যা মুসলিম ধর্মতত্ত্বকে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দান করেছে। আল-গাজ্জালী যুক্তি, বিচার-বুদ্ধির সীমাবদ্ধতার বাইরে কাশ্ফকে প্রকৃত জ্ঞানের যথার্থ উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব সৃষ্টিবাদে বিশ্বাস করে। কুরআনে বর্ণিত সৃষ্টির তত্ত্ব, যাহা পরম সত্তার ঐহিক প্রকাশকে সৃষ্টির মূলীভূত প্রেরণা, উপাদান ও গতি বলে স্বীকার করে এবং নবতর সৃষ্টির সম্ভাবনার কারণ হিসেবে গণ্য করে–এ বিষয়টাও মুসলিম দর্শন ও ধর্মতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। কুরআনের সৃষ্টিতত্ত্বে সৃষ্টি ও ক্রমবিকাশের অবিচ্ছেদ্য যোগসূত্র বর্তমান। মহান রাব্বুল আলামিনের এক পরম উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করছে সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। **মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও দর্শনে উদ্দেশ্যবিহীন যান্ত্রিকতা কিম্বা অযৌক্তিক নির্বিচারবাদী জড়ত্বের স্থান নেই।** মুসলিম চিন্তাধারায় সৃষ্টিতত্ত্ব স্রষ্টার পরম উদ্দেশ্যের পোষকতা করছে এবং সৃষ্টি নিয়ে তাদের স্রষ্টার মহান উদ্দেশ্যকে সার্থক করে চলেছে বিরামহীন প্রক্রিয়ায়।

মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও মুসলিম র্দশন উভয়ই নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। উভয়ের লক্ষ্য পরম সত্যে উপনীত হওয়া। তবে দু'টোর পথের একটু ভিন্নতা বিদ্যমান। **ধর্মতত্ত্ব ওহী ও কাশফের সাহায্য এবং দর্শন যুক্তি ও বিচার বুদ্ধির সাহায্যে পরম সত্যের অন্বেষণ করে।** এই দু'টোরই উৎস কুরআন ও হাদিস এবং এই দুই 'পবিত্র প্রতিষ্ঠানের' শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে জীবনের সমস্যাবলী আলোচনা করেই জীবনের মূল্য নির্ধারণ করে এবং সে মূল্যকে চির অমলিন ও সচল রাখার সাধনা করে। হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) এই উভয় ধারণার সমন্বিত সৃজনশীল পুনর্গঠন করেছেন, যা পরীক্ষিত ও কালোত্তীর্ণ। বেলায়তে মোত্লাকায়ও এই উভয় ধারার সমন্বয় ঘটেছে এবং এ কারণে আল-

গাজ্জালীর দর্শন এই বেলায়তে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অধিষ্ঠিত। বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্বীন গ্রন্থ থেকে মূল্যবান নৈতিকতা সংক্রান্ত উদ্ধৃতি বিদ্যমান।

১১. আল-গাজ্জালীর সংক্ষিপ্ত জীবনী ও রচনাকীর্তি:

ক. বিস্ময়কর মেধা, অসামান্য স্মৃতিশক্তি, সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি, সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি, দর্শনের জাহেরী-বাতেনী উভয় ভুবনে যথার্থ যুক্তিসিদ্ধ গতিসূত্র নির্ণয়ে সফল দার্শনিক ইমাম গাজ্জালীর (র.) জন্ম এক নিম্নবিত্ত দরিদ্র অথচ তাসাওউফীয় পরিবারে। তাঁর প্রকৃত নাম আবু হামেদ মোহাম্মদ ইবনে-মোহাম্মদ ইবনে মোহাম্মদ তাউস-আহমদ আলতুসী আল শাদী আল নিশাপুরী।[৬] পণ্ডিতদের মতে তাঁর জন্মপল্লী 'গাযালা' থেকে তাঁর 'নিসবা' বা উপাধি গৃহীত। কারো কারো মতে, তাঁর পিতৃপুরুষ গায্যাল বা পশম বয়ন ও বিক্রয়ের ব্যবসা করতেন বলে তিনি গায্যালী উপনাম ধারণ করেন। অন্যমতে তাঁর প্রকৃত নাম আবু হামিদ মুহম্মদ ইবনে মুহম্মদ আল গাজ্জালী। তিনি আল-গাজ্জালী নামেই বিশ্বে পরিচিত।[৭]

অতি শৈশবে তিনি পিতাকে হারান। তাঁর পিতা আর্থিক দীনতার দরুন নিজে শিক্ষা লাভ করতে পারেননি বলে সারা জীবন অব্যক্ত বেদনায় জর্জরিত ছিলেন। তবে চরম দরিদ্রতার মধ্যেও সন্তানদের শিক্ষার জন্য যৎসামান্য অর্থ সঞ্চয় করেন এবং অপরিণত বয়সে মৃত্যুর সময় সে অর্থ এক বিশ্বস্ত বন্ধুর হাতে দিয়ে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে বলেন। তাঁর পিতা একজন ধর্মভীরু ও সুফি স্বভাবের লোক ছিলেন এবং তাঁর মুনাজাত ছিল তাঁর সন্তানেরাও যেন জ্ঞানী ও সুফি হয়। তাঁর দুই পুত্র সন্তানের মধ্যে প্রথম জন আবু হামেদ মোহাম্মদ (ইমাম গাজ্জালী) এবং কনিষ্ঠজন মাযদ্-আল দীন আবুল-ফুতুহ্ আহমদ। তাঁরা উভয়েই বিপুল জ্ঞানের অধিকারী হন এবং যথাক্রমে ইমাম মোহাম্মদ গাজ্জালীও ইমাম আহমদ গাজ্জালী নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁদের কয়েকজন বোনও ছিল।

গাজ্জালীর পিতৃবন্ধুর আর্থিক অবস্থাও সচ্ছল ছিল না এবং তাঁর গৃহে রেখে ভরণ-পোষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করা তাঁর সাধ্যাতীত হয়ে পড়ে। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত সামান্য অর্থও নিঃশেষ হয়ে যায়। এ অবস্থায় তরুণ দুই ভাইকে কাছে বসিয়ে পরামর্শ ও সম্মতিক্রমে সরকারী অবৈতনিক শিক্ষালয়ে ভর্তি করে দেন। এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সামন্তযুগে ধনী ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাঁদের গৃহে কিম্বা মসজিদে বেসরকারীভাবে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। মশহুর জ্ঞানী, বিদ্বান, প্রবীণ শিক্ষাবিদরা সংসার ত্যাগপূর্বক নির্জন বাস অবলম্বন না করে এসব প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে শিক্ষা দান করতেন। মুসলিম জ্ঞান ও শিক্ষার জগতে এভাবে পৃথিবী কাঁপানো বহু জ্ঞানীর জন্ম হয়েছে।

গাজ্জালী তৎকালীন মহাজ্ঞানী শিক্ষক আবু হামেদ আস্‌ফারায়েনী, আবু মোহাম্মদ যোবেনী, বিখ্যাত ফিকাহ্‌ শাস্ত্রবিদ আহমদ ইবনে মোহাম্মদ রাযকানী, শেখ আহমদ আত-তুসীর নিকট কুরআন-হাদিস, শরিয়ত, ফিকাহ্‌ প্রভৃতি শিক্ষা করেন। কুরআন হিফজ শেষে তিনি মাতৃভাষা ফার্সীর পাশাপাশি আরবী ভাষাও শিক্ষা করেন। তিনি জন্মভূমি ছেড়ে জোরজান শহরে গিয়ে মহাত্মা ইমাম আবু নসর ইসমাইলের তত্ত্বাবধানে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে শিক্ষকগণ তাঁদের শিক্ষার বিষয়বস্তু মৌখিকভাবে শুধু বিবৃত করতেন না, ছাত্রদের লিখে নেওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। এসব নোটকে 'তালীকাত' বলা হতো, যা পুনরায় শিক্ষককে শুনিয়ে প্রয়োজনে সংশোধন করে নিতে হতো। জারজান শহরে পাঠ সমাপনান্তে নোটের বোঝা সঙ্গে করে নিজ জন্মভূমিতে ফেরার পথে দস্যুদল কর্তৃক তাঁদের কাফেলা আক্রান্ত হয়। দস্যুদল সব সামগ্রীর সাথে তাঁর নোটও লুট করেছিল। তিনি কাতর কণ্ঠে তাঁর নোটগুলো ফেরত চাইলে দস্যু সর্দার ব্যঙ্গ করে বলে: 'তোমার লেখা পড়া তো বেশ! সব বিদ্যা এই কাগজের ভিতর? মনের ভিতরে কিছু নেই?" এই বলে সে নোটগুলো ফিরিয়ে দেয়। এই ঘটনা তাঁর মনে এমন দাগ কাটে যে, তিনি তিন বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমে পুরো নোটগুলো মুখস্ত করে ফেলেন। ইমাম গাজ্জালীর জ্ঞানস্পৃহার সামান্য নজীর এখানে বিধৃত।

অতঃপর তিনি কিছু কাল আবু হামিদ ইউসুফ আল-নাস্‌সাজের নিকট তাসাওউফ তত্ত্ব সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। এরপর তিনি নিশাপুরস্থ (খোরাসান) নিজামিয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হন। মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ, বরেণ্য শিক্ষক আবুল মা আলী ইমামুল হারামাইন এর নিকট ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, ন্যায়শাস্ত্র, যুক্তিবিদ্যা, প্রকৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন এবং তাঁর সহযোগী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। ইমামুল হারামাইনের ইন্তিকালের পর ১০৯১ খৃঃ মাত্র ৩৩ বছর বয়সে এ মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু মাত্র বছর চারেক পর তিনি এই মর্যাদাপূর্ণ চাকুরী, পদ, সুখ-সম্পদ হেলায় পরিত্যাগ করে পরম সত্যের স্বরূপ সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। তাঁর এই আকস্মিক পরিবর্তন এখনো ঐতিহাসিক ও দার্শনিকদের নিকট বিস্ময়। তবে এ পরিবর্তনই দর্শন জগতের অমূল্য সম্পদ স্বরূপ তাহাফাতুল ফালাসিফা, মিশ্‌কাতুল আনওয়ার, ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্বীনের মতো ভ্রান্তিবিমুক্ত সত্য-সন্ধানের দিশারী গ্রন্থের আবির্ভাব ঘটিয়েছে। প্রচলিত ধর্মব্যবস্থা, নিষ্প্রাণ যুক্তিবাদ, বৈষম্যপূর্ণ দারিদ্র জর্জরিত সমাজ-ব্যবস্থা কিছুই তাঁকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। এর স্বাক্ষর ধারণ করছে তাঁর গ্রন্থাবলী।

খ. পেশা, রুজি, রোজগারের পথ হেলায় ছুঁড়ে ফেলে তিনি দীর্ঘ দশ বছর নিষ্কাম সাধকের মতো উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় বিভিন্ন দেশ ও পবিত্র স্থান সফর করেন। এগুলোর

মধ্যে রয়েছে সিরিয়া, ফিলিস্তিন, দামেস্ক, জেরুসালেম, কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য স্থান। এ সময়ে তিনি বিভিন্ন মসজিদে অবস্থান করতেন ও মসজিদ সংলগ্ন মাদ্‌রাসার ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। এ সময় এক মাদ্‌রাসার অধ্যক্ষ কোন এক বিষয়ে আলোচনাকালে গাজ্জালীর অভিমতের হাওলা বা রেফারেন্স দেন। আত্মপরিচয় গোপনকারী গাজ্জালীকে তিনি চিনতে পারেননি। গাজ্জালী এরপর সবার অলক্ষ্যে বায়তুল মোকাদ্দাসে গমন করেন এবং 'ছাখরাতুল ছাম্মা' নামক বিখ্যাত প্রস্তর খণ্ডের সমীপবর্তী প্রকোষ্ঠে নির্জন বাস করতে থাকেন। এই সফরকালে তিনি বিভিন্ন ওলী-দরবেশের মাজার জিয়ারত করেন। এ সময়ে তিনি বায়তুল মোকাদ্দাসে 'মাকামে খলীল' নামক স্থানে হযরত ইব্রাহিমের (আ.) মাজার জিয়ারত করেন এবং তিনটি সংকল্প গ্রহণ করেন : (১) কদাচ কোন রাজ দরবারে যাবো না, (২) কোন রাজকীয় দান বা বৃত্তি গ্রহণ করবো না, (৩) কারো সাথে কোন মোনাজেরা বা বিতর্কে প্রবৃত্ত হবো না। আমৃত্যু তিনি এই অঙ্গীকারের উপর অটল ছিলেন।

মাকামে খলীল থেকে তিনি হজ সমাপনের উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন এবং হজব্রত শেষে মদীনায় নবীজীর (দ.) রওজা মোবারক জিয়ারত করেন। এই কষ্টকর সফরকালেও তিনি রিয়াজত, ইবাদতে কোন ত্রুটি করতেন না। সুদীর্ঘ দশ বছরের এই সংগ্রাম-সাধনায় তাঁর মন থেকে 'সংশয়বাদ' (scepticism) অপসৃত হয় এবং তিনি প্রকৃত সত্য ও তাঁর করণীয় সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে সক্ষম হন, তাঁর ভাষায় "আল্লাহ্‌র নূরানী জ্যোতির স্পর্শে"।

এ সময়ে তৎকালীন উজীরে আযম ফাখরুল মুলক (ভূতপূর্ব উজীরে আযম নিযামুল মুলকের জ্যেষ্ঠপুত্র) তাঁকে দেশে ফিরে শিক্ষা দানের দায়িত্ব নেবার সনির্বন্ধ অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। বিষয়টা নিয়ে তিনি তাঁর তাসাওউফ সাধনা-সঙ্গীগণ সমেত বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলোচনা ও পরামর্শ করেন। তাঁরাও নির্জন বাসের পরিবর্তে লোকসমাজে এসে শিক্ষাদানে আত্মনিয়োগ করতে অনুরোধ করেন। এছাড়া বহু পবিত্রাত্মা তাঁকে স্বপ্নযোগে পরামর্শ দেন যে, "লোক সমাজ থেকে দূরে নির্জন বাস অপেক্ষা মানুষের মধ্যে থেকে শিক্ষা ও নৈতিকতা প্রসারের কাজে থাকাই উত্তম ও কল্যাণকর।"

১১০৬ খ্রি. (৪৯৯ হিজরী) তিনি পুনরায় বাগদাদে এসে নিজামিয়া মাদ্‌রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। তবে এক বছরের মাথায় উজীর ফাখরুল মূলক গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হলে তিনি ভগ্নহৃদয়ে অধ্যাপনা থেকে অবসর নিয়ে স্বগৃহে ফিরে আসেন। কিন্তু শিক্ষা দানের কর্তব্য থেকে বিরত থাকেন নি। নিজ গৃহের অনতিদূরে ছাত্রদের জন্য একটি মাদ্‌রাসা এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান-পিপাসুদের জন্য একটি খানকাহ্ স্থাপন

করে উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে থাকেন। আমৃত্যু এখানে অবস্থান করে ১১১১ খ্রি. মাত্র ৫৪ বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন।

১২. ইমাম গাজ্জালীর রচনা সম্ভারের বিবরণঃ

ইমাম গাজ্জালী মাত্র ৫৪ বৎসর জীবিত ছিলেন। তন্মধ্যে শৈশবকাল ও পাঠ্য জীবন বাদ দিলে মাত্র ৩৪/৩৫ বৎসর কাল তিনি গ্রন্থাদি রচনার সময় পান। এই সামান্য সময়ের মধ্যে তিনি ছোট বড় প্রায় ৪০০ (চারশ) গ্রন্থ রচনা করেন। তন্মধ্যে "ইয়াক্কুতোত্তাবলীগ" নামক তাফ্সীরুল কুরআন ৪০ জিল্দে রচিত। বিখ্যাত ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্বীন ৪ জিলদে সমাপ্ত। তবে লিখবার জন্য যে ৩৪-৩৫ বৎসর সময় পেয়েছিলেন, তার সম্পূর্ণ সময়টুকু এই কার্যে ব্যয় করার সুযোগ পান নাই। কারণ, দশ/এগার বৎসরকাল তিনি দেশ পর্যটন ও নির্জনবাসে অতিবাহিত করেন। বাকী ২৪/২৫ বৎসর কালও একাধারে গ্রন্থ রচনায় ক্ষেপন করেন নি। বরং অধ্যাপনা, অধ্যয়ন, ধ্যান-সাধনা এবং ইবাদতেও প্রত্যহ কিছু সময় ব্যয় করতেন। তাঁর দরবারে শিক্ষার্থী ও দীক্ষার্থীর সংখ্যা কোন দিনই দেড়শতের কম হত না। এতদ্ভিন্ন বহু দূর দূরান্ত হতে অনেক লোক নানা জটিল বিষয়ে ফতোয়া বা মতামত গ্রহণের নিমিত্ত তাঁর দরবারে আগমন করতেন। তাতেও সময় ব্যয় হত। ইত্যাকার বিভিন্নমুখী কর্ম-ব্যস্ততার ভিতর দিয়ে মাত্র ২৪-২৫ বৎসরের কমপক্ষে ৪০০ (চারশ) গ্রন্থ রচনা করা অসাধারণ বিস্ময়কর প্রতিভার পরিচায়ক বটে।

দৈনিক কত পৃষ্ঠা লিখেছেনঃ

তাঁর দ্রুত কলম চালনা সম্বন্ধে আল্লামা নাবাবী বলেছেন, আমি ইমাম গাজ্জালীর আয়ুষ্কাল ও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর পৃষ্ঠা হিসাবান্তে গড় করে দেখলাম, তিনি প্রত্যহ গড়ে ১৬ পৃষ্ঠা লিখেছিলেন। এসম্বন্ধে আল্লামা শিবলী নো'মানী বলেন, ইমাম সাহেবের রচিত গ্রন্থাবলীর সাথে আল্লামা তাবারী, ইবনে-জাওযী, সইয়ূতী প্রমুখ বিশ্ববরেণ্য ও খ্যাতনামা লেখকগণের রচনাবলীর তুলনা করলে ইমাম সাহেবের রচনাবলীই অধিক হয়। অথচ ইমাম সাহেবের রচনাবলীর মধ্যে **কুরআন-হাদিস ভিন্ন অন্য কোন গ্রন্থকারের উক্তি মোটেও উদ্ধৃত করা হয় নাই। পক্ষান্তরে, উপরোক্ত গ্রন্থকারদের রচনায় অধিক পরিমাণে উদ্ধৃতি বিদ্যমান রয়েছে।**

কি কি বিষয়ে গ্রন্থ লিখেছেনঃ

ইমাম সাহেবের লিখিত বিষয়সমূহ দর্শন, তর্কশাস্ত্র, ইল্মে কালাম, ধর্মতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, স্বভাব-বিজ্ঞান, নীতি-বিজ্ঞান, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, তাসাওউফ প্রভৃতি সত্য বিষয়গুলোসহ বিবিধ নিরপেক্ষ সমালোচনায়ও বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ইহুদী ও খ্রিস্টানগণ যে যে স্বার্থে তাঁদের ধর্মীয় গ্রন্থ তাওরাত এবং ইঞ্জিল কিতাবে নিজেদের মনগড়া পরিবর্তন এবং বিকৃতি সাধন করেছেন, তিনি সে সম্বন্ধেও একখানা তথ্যপূর্ণ

কিতাব রচনা করেছেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ফিকাহ্, উসুলে ফিকাহ্, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান, তাসাওউফ এবং আখলাক সম্বন্ধীয় গ্রন্থগুলো জগতে বিশেষ সমাদর লাভ করে। এমন কি বহু জ্ঞানী ও আলেম উপরোক্ত বিষয়ক কিতাবগুলির নানা ভাষায় ব্যাখ্যা এবং সংক্ষিপ্তসার লিখে সহজবোধ্য করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেই কিতাবগুলি ইমাম সাহেব সূক্ষ্ম যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির পূর্ণ শক্তি প্রয়োগে রচনা করেছেন, ইউরোপে সে সমস্ত কিতাবের যত আদর হয়েছে, তা মুসলিম জগতে পাওয়া যায় না।

তিনি প্রাচীন গ্রীক দর্শনের ত্রুটি সংশোধনকল্পে 'মাকাসেদুল ফালাসেফা' নামক যেই গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন ইসলাম জগতে তার সমাদর না থাকলেও ইউরোপীয় নানা ভাষায় গ্রন্থটি অনুবাদিত হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের প্রসিদ্ধ লাইব্রেরীগুলোতে অতি যত্নসহকারে সুরক্ষিত আছে। এইরূপে তাঁর রচিত "মোন্‌কেয মিনাদ্‌দালাল, তাহাফাতুল ফালাসিফা, নিযামুল আলাম" নামক সূক্ষ্ম চিন্তাপ্রসূত গ্রন্থগুলো ইউরোপে বিশেষ সমাদর লাভ করেছে এবং ইউরোপীয় বক্রপন্থী সুধীবৃন্দের জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত করে দিয়েছে।

১৩. ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্বীন এবং জ্ঞানের জগৎ

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্বীন' নামক গ্রন্থটি ইসলাম জগতে সর্বাপেক্ষা অধিক সমাদৃত হয়েছে। কেহ মন্তব্য করেন– "ইতোপূর্বে ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্বীনের সমকক্ষ গ্রন্থ রচিত হয় নাই।" কেহ বলেন: "জগতের সমস্ত জ্ঞান প্রদীপ নির্বাপিত করে দিলে, একমাত্র ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্বীনের সাহায্যে আমি সমস্ত জ্ঞান প্রদীপ পুনঃ প্রজ্জলিত করতে পারি।" কোন কোন মনীষী এই গ্রন্থখানা হেফয করেছিলেন। কোন আলেম উহাকে বহুবার খতম করেছেন এবং প্রত্যেকবার খতমের পর তালেবে ইল্‌ম ও ফকির-মিসকিনকে বিশেষভাবে ভোজন করিয়েছেন। ইমাম সাহেবের সহপাঠীবৃন্দ ইহ্‌ইয়াউল উলুমকে আল্লাহ্‌তাআলার ইল্‌হামক্রমে লিখিত বলে মনে করতেন। একদা 'শাযালী' নামক এক বিখ্যাত সিদ্ধপুরুষ এহ্‌ইয়া কিতাবটি হাতে নিয়ে প্রকাশ্য স্থানে দণ্ডায়মানপূর্বক জনগণকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন, "তোমরা জান কি–আমার হাতে এটা ইহ্‌ইয়াউল উলুম, এই কিতাবটিকে অবজ্ঞা করার দরুণ আমার বিরুদ্ধে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে অভিযোগ করা হয়েছে। স্বপ্নযোগে আমি দেখলাম বিচারে আমার পৃষ্ঠে চাবুক মারা হয়েছে। এই দেখ আমার পৃষ্ঠে চাবুকের চিহ্ন বিদ্যমান"।

ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্বীন সম্বন্ধে গাজ্জালী বলেন, এই গ্রন্থটিতে এবং কিমিয়ায়ে সাআদাতে আমি কোন নূতন কথা লিখি নাই। পূর্ববর্তী জ্ঞানীবৃন্দের লিখিত কথাই সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে লিখেছি।

তাঁর ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্বীন ও কিমিয়ায়ে সাআদাত গ্রন্থদ্বয় মানব জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে গ্রহণযোগ্য সমাজনীতি-অর্থনীতি-রাজনীতি ও নৈতিকতার সূত্র ও ফর্মুলায় পরিপূর্ণ, যা থেকে অবস্থা, পরিবেশ ও প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে যে যার প্রয়োজনীয় বস্তু তুলে নেবে। একবিংশ শতকের সমাজ ও যুগ যন্ত্রণার স্বরূপ ও সমাধানের যুক্তিমন্ত সূত্র এই দুই পুস্তকে বিশদভাবে বিদ্যমান এবং প্রতিকার ও উপশমের নিদান ধারণ করে, যা বর্তমান বিশ্বেও শোষণ-বঞ্চনা উৎসাদনের পথ নির্দেশক।

১৩ ক. মানুষের যে খাওয়া-পরার রূঢ় সমস্যা আছে, সেটা তাঁর মতো করে কোন তাসাওউফ-দার্শনিক ভাবেননি এবং প্রতিকার নির্দেশ করেননি।

উল্লেখ্য, অছিয়ে গাউসুল আযম তাঁর মহান দাদাজানের শিক্ষার আলোকে নৈতিক ধর্মানুগ এক সমাজ (ethical society) চেয়েছিলেন। ইমাম গাজ্জালী (র.) দর্শন জাগতিক ও আধ্যাত্মিক পথে অভিন্ন অভিযাত্রার সূচনাবিন্দু। **স্রষ্টা তত্ত্ব ও সৃষ্টিতত্ত্বের চূড়ান্ত অভিব্যক্তির লিপিফলক হলো 'তাসাওউফ' আর জাগতিক যাবতীয় তত্ত্বের নির্ঘণ্ট হলো শরিয়ত। ইমাম গাজ্জালীতে উভয় তত্ত্বের স্বীকৃত যৌক্তিক সমাবেশ ও সমন্বয় ঘটেছে।** মানুষকে তিনি এই সত্যটা অনুধাবন করাতে চেষ্টা করেছেন যে, পৃথিবী তথা মহাজগতে প্রত্যেক প্রাণী ও বস্তুর নির্দিষ্ট পালনীয় ভূমিকা রয়েছে। কেউ গৌন কিম্বা উপেক্ষণীয় নয়। সমগ্র সৃষ্টিকে অন্তহীনতার পথে সচল গতিশীল রাখা প্রত্যেকের জন্য অপরিহার্য এবং প্রধান নির্দেশক। তাঁর দর্শনের ক্রম অগ্রসরমান সরল রেখা তাঁর মৃত্যুর প্রায় এক সহস্রাব্দ পর অছিয়ে গাউসুল আযমের বিংশ শতকীয় দর্শন-সমাজ ও সংস্কৃতি চিন্তার সাথে যুক্ত হয়ে পড়েছে। তাঁর অর্থনৈতিক নীতি অর্থাৎ সম্পদ অর্জন-বণ্টনের নীতিভঙ্গী পালনবাদী সমাজ দর্শন তথা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) ও অছিয়ে গাউসুল আযমের আর্থ-সামাজিক নীতিমালার সাথেও সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একথা প্রায় সকলেই জানেন যে, মানব জাতির করণীয় এবং বর্জনীয় কার্য সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল ধর্ম ও সমাজের মধ্যে যে সকল নীতিবাক্য আদিকাল থেকে সাধারণ জ্ঞানের সাহায্যে নির্ধারিত হয়েছে; এমন কি, যা পার্বত্য এবং জঙ্গলী জাতির মধ্যেও দেখা যায়, কুরআনেও তাই সুবিন্যস্ত বৈজ্ঞানিক পন্থায় নির্দেশ করা হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এমন কতকগুলো বিষয় নূতন করে যোগ করা হয়েছে, যা জগতের কোন অংশের কোন জ্ঞানীর চোখে ধরা পড়ে নি। পরের প্রতি দয়া এবং আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি এবং ভালবাসা চিরকালই মানবের কর্তব্য বলে বিবেচিত হয়ে এসেছে। কিন্তু সৌভ্রাতৃত্ব এবং আন্তর্জাতিক অধিকার ও মানুষের অধিকার ও সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখার কথা কুরআনের পূর্বে আর কোন গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ করা হয়নি। ইমাম গাজ্জালীও তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে সেই পূর্ব প্রচলিত নীতিবাক্যসমূহই লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে যে সমস্ত বিষয়ের উপর প্রাচীনকালের কোন দার্শনিক বা সুধীজন আলোকপাত

করেননি, তেমন কথাও তিনি এতদসঙ্গে সুশৃঙ্খল এবং সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেছেন। কোন বস্তুর বাহ্যিক আকার দর্শনে তাকে সমতুল্য অন্য বস্তু বলে ভ্রম হওয়ার রীতি পূর্ব হতেই প্রচারিত আছে। যেমন, রজ্জুকে সর্প এবং সর্পকে হার বলে ভ্রম হওয়া ইত্যাদি। **কিন্তু মানুষের কার্যের উপর সম্প্রদায়গত পক্ষপাতিত্বের চাপ পড়লে মানুষের কার্যাবলীর মধ্যেও যে, ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল বলে ভ্রম হতে পারে বা হয়ে থাকে–একথার প্রতি কোন দার্শনিকেরই দৃষ্টি পড়ে নাই। ইমাম গাজ্জালী সেই ভ্রম আবিষ্কার করে কুরআনের আলোকে কিমিয়ায়ে সা'আদাতের বিনাশন খণ্ডে ৮ম ও ১০ম পরিচ্ছেদে দেখিয়ে দিয়েছেন।** ইমাম সাহেবের গ্রন্থগুলো সর্ব সমাজে সমভাবে আদৃত হওয়ার একটি কারণ এই যে, তিনি প্রত্যেকটি বিষয়ের বিভিন্ন দিক তন্ন তন্ন করে এবং কাল ও পাত্রভেদে তারতম্য দর্শিয়ে এমন শৃঙ্খলা সহকারে লিখেছেন যে, পৃথিবীর প্রত্যেকটি মানুষের কোন না কোন প্রকৃতির সাথে তার মিল হয়ে যায়। তাই এসব গ্রন্থ বিশ্বের সর্বশ্রেণীর মানুষের নিকট সমভাবে আদৃত হয়েছে।

কিমিয়ায়ে সা'আদাত গ্রন্থের মধ্যে ইমাম সাহেব লিখিত এই গ্রন্থগুলোর উল্লেখ দেখা যায়; (১) জাওয়াহেরুল কুরআন (২) মা-আনী আসমায়িল্লাহ্ (৩) আজায়েবুল কুলুব (৪) কিতাবে মা'কুলাত (৫) মিশ্কাতুল আনওয়ার (৬) মিছবাহুল আস্রার (৭) বিদায়াতুল হিদায়াহ। তন্মধ্যে কেবল শেষোক্ত কিতাবটির উল্লেখ ইবাদত খণ্ডে আর অবশিষ্টগুলোর উল্লেখ দর্শন খণ্ডে রয়েছে।

বহু অমূল্য গ্রন্থ দগ্ধীভূতঃ

জগতের অধিকাংশ লোক ইমাম সাহেবের প্রশংসাকারী হলেও তাঁর শত্রুর সংখ্যাও কম ছিল না। এক শ্রেণীর বিদ্বান্ লোক এবং কুসংস্কারাপন্ন নির্বোধরা তাঁর শত্রু ছিল। এদেরই মধ্যকার কোন কোন বিশিষ্ট লোকের চক্রান্তে 'মন্খুল' কিতাবটি পুড়িয়ে ফেলা হয়। বুদ্ধি ও জ্ঞানের পূর্ণ ক্ষমতা প্রয়োগ করে তিনি যে সমস্ত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন, কুসংস্কারাচ্ছন্ন হীনতাগ্রস্তরা সে সমস্ত গ্রন্থের কদর্থ করে সর্বসাধারণকে ক্ষেপিয়ে সেই গ্রন্থগুলোকেও দগ্ধ করে ফেলেছে। এইরূপে তাঁর বহু অমূল্য গ্রন্থ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। ইউরোপীয় মনীষীগণ তন্মধ্য হতে কয়েকখানা গ্রন্থ কুড়িয়ে নিয়ে সযত্নে রক্ষা করেছেন। আধুনিক সভ্যতার উপর সে সমস্ত গ্রন্থের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে। তাঁর যাবতীয় গ্রন্থ রক্ষিত হলে জগতের কি পরিমাণ উপকার সাধিত হত, তা নির্ণয় করা কঠিন।

কতিপয় বিখ্যাত গ্রন্থঃ

তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো বিখ্যাতঃ-

তাফসিরঃ ইয়াকুত্যাবীল, ৪০ খণ্ডে সমাপ্ত।

ফিকাহ্: ওয়াসীত, বাসীত, ওয়াজীয, বায়ানুল কাওয়াইলে লিশ্ শাফেয়ী, তালিকাতুন ফী ফোরুইল মায্হাব, খোলাসাতুর রাসাইল, ইখ্তেছারুল মোখ্তাসার, গাইয়াতুল গাওর; মাজমুআতুল ফাতাওয়াহ্।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের মূলনীতি বা উসুলে ফিকাহ্:

তাহ্সীনুল মা'খায, শিফাউল আলীল, মুন্তাখাল্ ফী ইল্মিল জাদাল্, মান্খুল, মুস্তাস্ফা, মা'থায ফিল্ খেলাফিয়াত, মুফাস্সালুল খিলাফ ফী উছুলিল ক্বিয়াস্।

মান্তিক:

মেইয়ারুল ইল্ম, মেহাক্কুন্নাযার, মিযানুল আমাল (ইউরোপে প্রাপ্য)।

দর্শন:

মাকাছেদুল ফালাসিফা (ইউরোপে সংরক্ষিত)

ইল্মে কালাম:

তাহাফাতুল ফালাসিফা, আল মুন্কেযমিনাদ্দালাল, ইল্জামুল আউয়াম, ইক্তেছাদ, মুস্তায্হারী, ফাযাইহুল এবাহিয়াহ্, হাক্কীকাতুর রুহ্, ক্বিস্তাসুল মুস্তাকীম আল-কাউলুল জামিল ফী রাদ্দিন আলা মান গাইয়ারাল ইন্জীল্, মাওয়াহিবুল বাতেনিয়া, তাফ্রেকাহ্ বাইনাল ইস্লামে ওয়াল্ যিনদেকাহ্, আর্-রিসালাতুল কুদসিয়াহ্।

আধ্যাত্মিক ও নৈতিক (তাসাওউফ ও আখলাক):

ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন, কিমিয়ায়ে সাআদাত, আল্-মাক্ছাদুল আক্ছা, আখ্লাকুল আব্রার, জাওয়াহিরুল কুরআন, জাওয়াহেরুল কুদ্স ফী হাকীকাতিন্নাফ্স্, মিশ্কাতুল আনওয়ার, মিনহাজুল আবেদীন, মি'রাজুস্ সালেকীন, নাছিহাতুল মুলুক, আইয়েহাল ওসাদ, বিদায়াতুল হিদায়াহ, মিশ্কাতুল আনওয়ার ফী লাতাইফিল আখ্ইয়ার।[৮]

১৪. গাজ্জালীর গ্রন্থ এবং ইউরোপ:

ইমাম গাজ্জালীর কোন কোন গ্রন্থ ইউরোপে যেরূপ সমাদৃত হয়েছে, মুসলিম জগতেও তদ্রূপ হয় নি। এতে সন্দেহ নেই যে, মুসলমানগণ তাঁর বহু কেতাব সাদরে গ্রহণ করে ব্যাখ্যা বের করেছেন। কিন্তু তা প্রায়ই ফিকাহ্, ফিকার ওসুল, তাসাওউফ এবং স্বভাব ও চরিত্র বিষয়ে নিবদ্ধ। কিন্তু যে সকল কেতাব বুদ্ধি ও জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তাঁরা তাতে চক্ষু খুলেও দেখেন নি। বরং, এক শ্রেণীর আলেম তা দেখতে নিষেধ করতেন। এই জন্যই মুসলিম সাম্রাজ্যের লাইব্রেরীসমূহে এই সকল কেতাব খুব কমই পাওয়া যায়। 'মনখুল' (চালুনী দ্বারা চালিত) নামক কেতাবখানা ইমাম গাজ্জালীর প্রথম বয়সে লিখিত বলে বলা হয়, তবে তা উচ্চাঙ্গের একখানা দর্শন গ্রন্থ। তিনি যে মজহাবের অন্ধ অনুসারী ছিলেন না, তা তিনি নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে যুক্তিসহকারে ব্যক্ত করেছেন। শুধু এই দোষের জন্য এই কেতাব মুসলিম জগৎ হতে হারিয়ে গেছে। অথচ এই কেতাবখানি গ্রীক দার্শনিকদের প্রভাবে যে সমস্ত ভ্রমপূর্ণ দার্শনিক মতবাদ

ইসলামে প্রবেশ করেছিল, তা ইসলামী দর্শনের সাহায্যে বেছে পৃথক করিয়েছিল। 'মনখুল' ও 'ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্বীনকে' দগ্ধ করবার আদেশ দেওয়া হয়েছিল এবং তা কার্যে পরিণত করা হয়েছিল। ইউরোপ বহু সাদরে এহইয়াকে গ্রহণ করে তা রক্ষা করেছে। নতুবা মুসলিম জগৎ তথা মানবজাতি এই অমূল্য দর্শন গ্রন্থ হতে বঞ্চিত হত।

মাকাছেদুল ফালাসিফাহ্ নামক দর্শনের এক কেতাবে ইমাম সাহেব গ্রীক দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন। এর একখানা কপিও ইসলামিক রাজ্যে পাওয়া যায় না, অথচ স্পেনের শাহী লাইব্রেরীতে এটার একখানা কপি সংরক্ষিত আছে। তা ইউরোপে ইবরাণী ভাষায় অনুবাদিত হয়ে ফ্রান্সের শাহী লাইব্রেরীতেও সংরক্ষিত আছে। খ্রিস্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ল্যাটিন ভাষায় মির ছাল্বী নামক এক ব্যক্তি এই গ্রন্থের অনুবাদ করেন।

আলমোনকেজুম মিনদ্দালালে ইমাম সাহেব মজহাবের পরিবর্তন এবং নবুয়তের হকীকত সম্বন্ধে লিখেছেন। ইউরোপ তা পরম আদরে গ্রহণ করেছে। মূল আরবী হতে ফরাসী ভাষায় এর অনুবাদ করা হয়েছে। মসিয়ে পালীয়া এবং মসিয়ে শামুয়েল দার্স তার ব্যাখ্যা করেছেন।

তাহাফাতুল ফালাসিফাহ কেতাবে ইমাম সাহেব গ্রীক দর্শনের ভ্রান্তমত বের করে তা রদ করেছেন। ইবরানী ভাষায় এর অনুবাদ হয়ে তা ফ্রান্সের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত আছে। মঁসিয়ে শামুয়েল দারস এবং মঁসিয়ে মোনক এই কেতাবের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।

মিজানুল আমল মনতেকের এক কেতাব। ইসলামিক সাম্রাজ্যে এটা পাওয়া যায় না। কিন্তু ইউরোপে তা সংরক্ষিত আছে। এটা হিব্রু ভাষায় মসিয়ে ইব্রাহিম হাসদায়ী নামক এক ইহুদী অনুবাদ করেছেন। মঁসিয়ে গুল ডেন্টহল্ ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এটি মুদ্রণ করেছিলেন।[৯]

আত্তাবিরুল মসবুক (সত্যিকারের সম্পদ): এই পুস্তকটা রাষ্ট্র পরিচালনা ক্ষেত্রে জনকল্যাণমূলক নীতিসূত্র, পরামর্শ ও হিতোপদেশপূর্ণ পুস্তক। প্রত্যেক সূত্রের সমর্থনে তিনি তাঁর দশ বছরের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা ও অর্জিত শিক্ষা থেকে যথার্থ দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। উল্লেখ্য, গাজ্জালীর মৃত্যুর প্রায় চার শতাব্দী পর ইটালীর উদীয়মান ধনতান্ত্রিক সমাজের প্রতিভূ ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭) রাষ্ট্রক্ষমতা শাসকের কব্জা ও নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে ধূর্ততাপূর্ণ যে নীতিপ্রস্ত প্রণয়ন করেন, আত্তাবিরুল মসবুক তার বিপরীতধর্মী। ম্যাকিয়াভেলী যাজকতন্ত্র, বিদ্যমান সামন্তশক্তি এবং পার্শ্ববর্তী বড়ো রাষ্ট্রগুলোর বাধার মুখে পড়েছিলেন। তিনি ধর্মনীতির বন্ধন থেকে রাষ্ট্রের মুক্তি চেয়েছিলেন, তবে তা স্বৈর রাজতন্ত্রের প্রতি সমর্থনসূচক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু আল-

গাজ্জালীর পুস্তকাদি এবং তাঁর কালের রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র পরিচালক নিযাম উল মুল্ক রচিত 'সিয়াসতনামা'য় বর্ণিত নীতিসূত্রগুলো স্বৈরাশাসনের বিরুদ্ধে বাধা হিসেবে দাঁড়ায়।

এখানে একটা বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, তাহাফাতুল ফালাসিফাহ্ (দার্শনিকদের অসঙ্গতি), মাকাছেদুল ফালাসিফাহ্ (দার্শনিকদের উদ্দেশ্য) প্রভৃতি কয়েকটা গ্রন্থের জন্য অপর্যাপ্ত বিদ্যাসম্পন্ন কিছু ব্যক্তি তাঁকে দর্শনবিরোধী বলে ভ্রান্তিপূর্ণ মন্তব্য করেন। বস্তুতঃ দর্শন, রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিতর্ক নতুন কিছু নয়। আল গাজ্জালীর প্রায় সাতশ' বছর পর জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্টের 'ক্রিটিক অব পিওর রিজন', ফরাসী দার্শনিক-সমাজতত্ত্ববিদ-অর্থনীতিবিদ-রাজনীতিবিদ পিয়েরী জোসেফ প্রুধোঁ'র 'ফিলসফি অব পভার্টি' (দারিদ্র্যের দর্শন) এবং এ গ্রন্থের পাল্টা সমালোচনায় কার্ল মার্কসের 'পভার্টি অব ফিলসফি' (দর্শনের দারিদ্র) গ্রন্থগুলোর কথা স্মর্তব্য। এসব পুস্তকে সমকালীন দর্শন-আর্থনীতিক চিন্তার সমালোচনা আছে বলেই সেগুলো দর্শন কিম্বা বিজ্ঞান বিরোধী নয়। অতএব, আল গাজ্জালীকে দর্শন-বিজ্ঞান বিরোধী সাব্যস্ত করা নেহায়েত অজ্ঞতাপ্রসূত বললে অত্যুক্তি হয় না। দর্শনের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, ইউরোপের ধর্মতাত্ত্বিক দার্শনিক সেন্ট টমাস এ্যাকুইলাস (১২২৫-১২৭৪), মহাকবি দান্তে (১২৬৫-১৩২১), রেমন্ড মার্টিন (মৃত্যু : ১২৮৪), ফরাসী মিস্টিক প্যাসকাল (১৬২৩-১৬৬২) অকুণ্ঠিতভাবে গাজ্জালীর-যুক্তি ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের জনক রেনে দেকার্তের (১৫৯৬-১৬৫০) 'ডিসকোর্স দ্য লা মেথড'-এ অবলম্বিত সংশয় পদ্ধতি গাজ্জালীর আল-মানকিজের প্রায় অনুরূপ। সকল বিবেচনায় ইমাম গাজ্জালী দর্শনশাস্ত্র, যুক্তিশাস্ত্র, অর্থ-সম্পদের ইপ্সিত আহরণ ও বণ্টনের তত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্বের প্রগতিমুখী চিন্তার জংশন হিসেবে অবস্থান করছেন।

গাজ্জালীর কবিতা ও সঙ্গীত তত্ত্ব: আল-গাজ্জালীর মধ্যে একজন কবিও ছিলেন। তাঁর দর্শনে 'কবিতাও এক প্রকারের ইল্হাম'। তিনি বহু কবিতা লিখেছেন, যা এখনো সুফি-সাধকদের আবৃত্তির আকর্ষণীয় বিষয়বস্তু। পবিত্র শুদ্ধ সঙ্গীতের প্রতিও ছিল তাঁর আকর্ষণ। তাঁর ভাষায় : "যার শ্রবণ শক্তি নেই, দৃষ্টি শক্তি নেই; শুধু সেই-ই সুর-ছন্দের মূর্ছনা, প্রকৃতির রঙ ও রূপের লীলা বৈভবে মুগ্ধ হয় না। তবে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত তা-ই যার প্রভাবে হৃদয়তন্ত্রীতে ঈশ্ক-ই-ইলাহী ঝংকৃত হয়। সঙ্গীতের আসল উদ্দেশ্যই হৃদয়ে ঐশী প্রেম-ভক্তি জাগিয়ে তোলা, যাতে হৃদয়ে আল্লাহ্র অনন্ত মহিমা মূর্ত হয়ে হাল প্রাপ্তি বা ফানা ফিল্লাহ্য় মাতোয়ারা 'বেখোদ' করে তোলে।" উল্লেখ্য বিভিন্ন সুফি খানকাহ্, ওলী-আল্লাহ্র দরবারে 'সামা' বা পবিত্র সঙ্গীত গীত হয়, যা জিকিরের পর্যায়ভুক্ত।

গাজ্জালী দর্শনের তুলিতে সুফির তৈলচিত্র: আল-গাজ্জালীর মতে, তাসাওউফ পন্থা অবলম্বনপূর্বক সুফি হওয়া মানে আল্লাহ্‌র সাথে অনুক্ষণ অবস্থান করা এবং মানুষের সঙ্গে সর্বদা শান্তিতে বাস করা। যিনি মানুষের সাহচর্যে থাকেন, সৎ ব্যবহার করেন এবং মানুষকেই একান্তভাবে ভালোবাসেন, তিনিই প্রকৃত সুফি। মানুষের সঙ্গে সদ্ব্যবহারের অর্থ এই যে, আপনি আপনার মর্জি মতো তাদের উপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না। বরং তাদের প্রয়োজন মতো আপনি নিজের ঘাড়েই তাদের বোঝা তুলে নেবেন। অন্যের সাথে আপনি ঠিক সে রকমই ব্যবহার করবেন, যেমনটা আপনি নিজে তাঁদের কাছ থেকে প্রত্যাশা করেন। আল্লাহ্‌র প্রকৃত বান্দার ঈমান কেবলমাত্র তখনই সম্পূর্ণ হয়, যখন তিনি নিজের জন্য যেমনটা প্রত্যাশা করেন, ঠিক তেমনটা অন্য সবার জন্যও প্রত্যাশা করার শিক্ষা অনুসরণ করেন। অবশ্য, এই সূত্রটা নবীজীর (দ.) কতিপয় মূল্যবান হাদীসেরই সারমর্ম। তাসাওউফ 'আমলের' উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কেবল বাহ্যিক ইলম দ্বারা তাতে কোন বিশেষ ফল পাওয়া যায় না। আমলের জন্য প্রয়োজন জাগতিক আকাঙ্ক্ষা বিবর্জিত পরিশ্রম ও সংযম।

আল-গাজ্জালী সেই একাদশ শতাব্দীতেই দার্শনিকদের বিভ্রান্তির হেতু নিরসন করে মানব জীবন পথে দর্শনের গতিসূত্র নির্ণয় করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর চিন্তার মাঠে বিচরণ করে কোন যুক্তিবাদী মানুষ আস্তিক্যবাদে অবিশ্বাসী থাকতে পারে না এবং অনন্ত সৃজনশীল একেশ্বরবাদী না হয়ে উপায় থাকে না। তার 'ইহ্‌ইয়াউল উলুমুদ্বীন' 'ধর্ম বিজ্ঞানের পুনরুজ্জীবন' মাত্র না হয়ে 'শুদ্ধ মানব জীবন যাপন বিজ্ঞানের নির্দেশিকা' হয়ে উঠেছে। এ পুস্তকে বিভিন্ন আর্থিক ও সামাজিক শ্রেণীর বিশ্লেষণ আধুনিক অর্থনীতিক শ্রেণীর বিন্যাসের পূর্বসূরী এবং 'বাস্তব জীবনের পদার্থ বিজ্ঞান' বলা চলে। বিস্ময়কর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও বিন্যস্তকরণ শৈলী এ পুস্তককে প্রত্যেক মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে শুরু করে সামগ্রিক জীবনে পরিকল্পিত দিন-পঞ্জীতে উন্নীত করেছে। জার্মান দার্শনিক আর্থার শোপেনহাওয়ার (১৭৮৮-১৮৬০) দর্শনকে 'অন্ধকারে অস্তিত্বহীন কালোবিড়াল সন্ধানী অন্ধের' ছায়ামূর্তি হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। বাংলার লালন সাঁই (১৭৭৪-১৮৯০) আক্ষেপ করেছিলেন, 'আঁধার ঘরে সর্প ধরা/ সাপ নাই প্রত্যয় করা/লালন তেমনি বুদ্ধিহারা/ পাগলের প্রায়।" কিন্তু তাঁদের প্রায় সাত শতাব্দী পূর্বেই আল-গাজ্জালী দর্শনকে অনিশ্চিত গন্তব্যহীন, লক্ষ্যহীন আবর্তন ও ঘুরপাকে আবদ্ধ দিশেহারা অবস্থান থেকে উদ্ধার করে মানুষের বোধগম্য পার্থিব-শাশ্বত লক্ষ্যাভিসারী করে নিজেকে কার্যতঃ 'হুজ্জাতুল ফালাসিফাহ্' হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

মানুষের ব্যক্তি, পারিবারিক, সামাজিক, এমনকি দৃশ্যাতীত জীবনের ঋণবনে প্রাকৃতিক নিয়ম প্রয়োগের যে সূত্রটা নবীজী (দ.) মানব জাতির হাতে তুলে দিয়েছেন,

আল-গাজ্জালীর দর্শন তার কিয়দংশের বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যাদাতা ও উপস্থাপক। বিংশ শতাব্দী থেকে 'আধ্যাত্মিক বস্তুবাদ' বলে যে তত্ত্ব মানব মস্তিষ্কে উপ্ত হয়েছে, তার অস্তিত্বও সুপ্ত ছিল তাঁর দর্শনে। যন্ত্রবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞানে উন্নত বর্তমান বিশ্বে মানব জাতি ও সভ্যতার অস্তিত্বের তাগিদে অভিজ্ঞতাবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা পূরণেও আল-গাজ্জালীর দর্শনের দিশারী ভূমিকা বিদ্যমান বলে বিজ্ঞ-বিদ্বান মানবগোষ্ঠীর বিশ্বাস।

উপসংহার

আল-গাজ্জালীর দর্শনের বিস্তার ধূলি ধূসরিত মাটির পৃথিবীর কঠিন জীবন থেকে অদৃশ্য মনোজগৎ হয়ে ধারণাতীত অধ্যাত্মমণ্ডল পর্যন্ত। মানুষের দেহের উপরিভাগ এবং অভ্যন্তরভাগ একই কাঠামোয় দুটো জগৎ। উপরিভাগ দৃশ্যমান, অন্যটা সাদা চোখে অদৃশ্য। এই দুই জগতের অনুষঙ্গগুলোর চাহিদা ও প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন। অথচ এ দুটোকে অভিন্নভাবে এক সাথে পৃথিবীতে গুজরান করতে হয়। গাজ্জালী দর্শনে এই দুই জগতের সমন্বয়ধর্মী সহাবস্থানের সূত্রাদি বর্ণিত, বিবৃত, মূল্যায়িত ও যথার্থ আসনে সংস্থাপিত।

তাঁর দর্শন অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণে কোন ইতিটানা কঠিন ব্যাপার বটে। মানুষের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক চাহিদা অর্থাৎ পেট তথা শরীর এবং এর পাশাপাশি মন তথা ক্বলবের চাহিদা গাণিতিকভাবে পূরণের ফর্মূলা দিয়েছে তার দর্শনের জ্যামিতি। তাঁর কাল ও চিন্তার গতি প্রকৃতি নির্ণয়ক কয়েকটি তথ্য সূত্র নিম্নে বর্ণিত হলো:

(ক) ইসলামের মৌলিক তাত্ত্বিক-দার্শনিক ও ফলিত নীতির সাথে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবাদ বা মনতেকের সংযুক্তকরণ:

স্রষ্টার অসীমত্বের জ্ঞান অর্জন ও সৃষ্টি রহস্য জানতে বিজ্ঞানের সাথে আধ্যাত্মিকতা ও অতীন্দ্রিয়বাদের সমন্বয় সাধন দরকার। আল-কুরআন এই সমন্বয় সাধনের দার্শনিক ভিত্তি ও নৈতিক কাঠামো তৈরী করে দিয়েছে। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের উদ্দিষ্টও এটাই।

দর্শনের ইতিহাস বিশেষজ্ঞদের বিবরণে দেখা যায়, ইমাম গাজ্জালীই (র.) সর্বপ্রথম ইসলামের মৌলিক তাত্ত্বিক-দার্শনিক ও ফলিত নীতির সাথে গ্রীক দর্শন ও যুক্তিবাদ বা মনতেককে সংযুক্ত করেন, যা তাঁর পূর্বে ছিল না। তিনিই সর্বপ্রথম বাগদাদের নিযামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে যুক্তিশাস্ত্র, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা সংক্রান্ত বিভাগ চালু করেন এবং পুস্তকাদি রচনার পথ প্রদর্শন করেন। এ পথেই ইমাম রাজী, মাওলানা রুমী, ইবনে রুশদ, ইবনে তোফায়েল, ইবনে মাজাহ্ প্রমুখ যুগন্ধর দার্শনিকদের আবির্ভাব ঘটে। ধর্মীয় পুস্তকসমূহে অনুকূল যুক্তি ও তর্কের অবতারণা-রীতি তাঁর থেকেই সূচিত হয়। তাসাওউফ দর্শন ও সাহিত্যে তাঁর প্রভাব এখনো সচল। ইমাম রাজী থেকে শাহ্

ওয়ালী উল্লাহ্ দেহলভী এর জীবন্ত দৃষ্টান্ত। তাঁর পূর্বে পারস্য সাহিত্যে দর্শন ও মনতেকের কোন চর্চা ছিল না। কবিতা রচনায় সুলতানগণ ও ধনী লোকদের প্রশংসা ছাড়া অন্য কোন বিষয়বস্তু ছিল না। তিনি ফার্সী ভাষায় 'কিমিয়ায়ে সাআদাত' রচনার পর এর নৈতিক, বস্তুগত, গুণগত প্রভাবে তাসাওউফ ও সাধারণ সাহিত্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে এবং তাঁর প্রভাবে হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার, মওলানা রুমী, শেখ সাদী, হাফেজ সিরাজী প্রমুখ মহান কবি ও সুফির আবির্ভাব ঘটে। ফার্সি সাহিত্যে তাঁর প্রভাবে তাসাওউফের প্রবেশ ধর্মজগতে এক বিপ্লব আনয়ন করে। মওলানা রুমী, শেখ সাদী, হাফিজ প্রমুখ এর মধ্যে আধ্যাত্মিক প্রেরণার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে বিশ্বসেরা সাহিত্য সৃষ্টি করেন। আধুনিক পরিশীলিত জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাঁর প্রভাব অপরিসীম, অতুলনীয় ও অপরাজেয়।

(খ) সাধারণ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণমুখী জীবনবোধের চেতনা: তাঁর যুগে মুসলিমসহ সবার মধ্যে ধর্মীয় ও নৈতিক শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। নিরেট ধর্মধারীরা কেবল ধর্মাচারের বাহ্যিক রীতি মানতেন এবং সেগুলো ধরে রাখার চেষ্টা করতেন। দার্শনিকরা শুধু নিজেদের চিন্তার রেখা ধরেই চলতেন, সাধারণ লোকদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ ছিল না। অন্যদিকে সুফিরা সাধারণ জীবন-স্রোত হতে বিচ্ছিন্ন থেকে 'আত্মিক উন্নতিতে' মশগুল থাকতেন। সামগ্রিক জীবনবোধ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান ছিল না। **আল-কুরআন ও নবীজীর (দ.) শিক্ষার আলোকে সামগ্রিক জীবনবোধের আদর্শ রূপায়নের জন্য পার্থিব শিক্ষার পাশাপাশি নৈতিক শিক্ষা তথা রূহানী শিক্ষার সমন্বয় সাধনপূর্বক এমন এক শিক্ষা প্রকল্পের গণিত তিনি রচনা করেন, যা মানুষ মাত্রেরই জীবনের সব দিক কভার করে।** প্রফেসর ডি. বি. ম্যাকডোনাল্ডের মতে, সমকালীন সর্বোতমুখী জীবনধারা ও সমস্যাবলী তিনি নিজ জীবনে গ্রহণ করেন, সেগুলোর মধ্য দিয়ে পথ চলেন এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্ভব ঘটে তাঁর জীবন-দর্শন-ধর্মতত্ত্বের। বিভিন্ন চিন্তা পদ্ধতি ও সেগুলোর শ্রেণী বিভাগ, শব্দ ও শব্দ সম্পর্কিত যুক্তিগুলো তিনি উড়িয়ে দেন এবং স্বীয় ক্বলব বা আত্মচৈতন্যে জীবনের যে বাস্তব রূপ প্রতিফলিত হয়েছিল, তাই তিনি বজ্রমুষ্টিতে ধরে রেখেছিলেন।[১০]

তাঁর ব্যাপক অধ্যয়ন ও অক্লান্ত চিন্তার মৃত্তিকা থেকে জন্ম নেয় এক সমন্বয়ধর্মী জীবন দর্শন, যে দর্শন ও দুনিয়া আখেরাতের মধ্যে যোগসূত্র ও মিতালী স্থাপনপূর্বক ইসলামের পরিপূর্ণ ব্যাপ্তি সুস্পষ্ট করে তোলে। তাঁর কলমে যুগপৎ জাগতিক বাস্তবতার প্রতি ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী ও আধ্যাত্মিকতা পরিপূর্ণ মাহাত্ম্যে বিকশিত হয়ে উঠে। সামগ্রিকভাবে দর্শন ও তাসাওউফ বিজ্ঞান সর্বসাধারণ্যে বোধগম্য ও গ্রহণীয় হয়ে উঠে। ইসলামের জাহেরী ও বাতেনী দিকের মধ্যে যোগসূত্র ও সমন্বয় স্থাপন পূর্বক এক পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন মুসলিম তথা মানব সমাজের সামনে উপস্থাপন করে যথার্থ ও

কল্যাণময় জীবন-পথ নির্দেশ করে দর্শন, সমাজ বিজ্ঞান ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানে বিপুল অবদান রেখে গেছেন তিনি। তাঁর ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্দীন আলদ্বীন, কিমিয়ায়ে সাআদাত এর সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর এসব পুস্তকে মানুষের অর্থনৈতিক শ্রেণী বিভাগ, চাহিদা আকীর্ণ অভাবী মানুষের সংজ্ঞা, বিভিন্ন পেশার শ্রেণী বিভাগ, অর্থনৈতিক সমস্যা, বণ্টন ও প্রতিকার সমেত মানব জীবন-ঘনিষ্ঠ সব বিষয়ের উপর শাশ্বত গঠনমূলক আলোকপাত রয়েছে। আল গাজ্জালীর (র.) সমুদয় পুস্তক যেন পার্থিব সুশৃঙ্খল জীবন যাপনের দৈনন্দিন ব্যাকরণ ও ফলিত দর্শন। এগুলোকে একই সাথে আখেরাতের ব্যাকরণ মঞ্জরীও বলা যায়। মোদ্দা কথায়, তাঁর গ্রন্থাবলী ও দর্শন মহান স্রষ্টা ও মানুষের মধ্যে এক অবিনাশী আলোকসূত্র বটে।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. Al-Ghazzali's Mishkat Al-Anwar (The Niche For Lights) by W.H.T. Gairsner Monograph vol.xix. Royal Asiatic Society. London, 1924. এই মনোগ্রাফের প্রায় সমকলেবরের ভূমিকায় ইমাম গাজ্জালীর দার্শনিক সত্যান্বেষার তথ্যবহুল পাণ্ডিত্যপূর্ণ শব্দচিত্র অঙ্কিত হয়েছে। এই পুস্তকে হযরত দাতা গঞ্জে বকশ (র.) এর 'কাশ্ফুল মাহজুব' গ্রন্থেরও রেফারেন্স আনা হয়েছে "কুতুবুজ্জামানিহী"–নির্ণয়ের সূত্র রূপে এবং তাঁর চেতনা ও অনুধ্যানকে অতি বনেদীয়ানাবাদী (conventionalist) 'হাম্বলীদের' চেয়ে উন্নততর ও বিকশিত বলে অভিমত প্রকাশ করা হয়েছে।

২. ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্বীন –প্রথম খণ্ড, বঙ্গানুবাদ: আলহাজ্ব মাওলানা ফজলুল করিম এম. এ. বি. এল. ঢাকা: ১৯৬০ইং। পৃ. ৭।

৩. Prof. S. Rahaman, Islamic Philosophy, Al-Ghazzali.

৪. ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্বীন: দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: আকায়েদ বা ধর্ম বিশ্বাসের নিয়মাবলী: চতুর্থ রুকন: পৃ: ২১৩,

৫. Prof. S. Rahman, Islamic Philosophy. Al-Ghazzali.

৬. মুসলিম মনীষা, আবদুল মওদুদ: ইমাম আল-গাজ্জালী।

৭. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা. প্রফেসর রশীদুল আলম।

৮. (ক) ফজলুল করিম, এম. এ. বিএল: ইহ্ইয়াউল উলুমুদ্বীনের বাংলা অনুবাদ, প্রথম খণ্ডের ভূমিকা ও জীবনী, (খ) মওলানা নুরুর রহমান, কিমিয়ায়ে সাআদাতের বাংলা অনুবাদ, প্রথম খণ্ড।

৯. ইবিড

১০. Prof. D. B. Macdonald: Muslim Theology.

ঊনবিংশ অধ্যায়

হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.)

(১০৭৭-১১৬৫ খৃঃ)

"অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে ন্যায়-বিচারের হক কথা বলাই সর্বোত্তম জেহাদ [হাদিসে রসুল : আবু দাউদ, তিরমিজী]"

১. মুসলিম জাহানের এক সংঘাতপূর্ণ অধঃপতিত সময়ে আবির্ভূত অকুতোভয় সত্যাশ্রয়ী, মহান তত্ত্বজ্ঞানী, রাষ্ট্র-সমাজ ও ধর্মাচারে এখনো পর্যন্ত সমভাবে প্রভাব বিস্তারশীল সংস্কারক হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) জীবন অত্যন্ত কঠোর সংগ্রাম ও সাধনায় পরিপূর্ণ। সমকালীন আব্বাসীয় রাজতন্ত্রের শেষার্ধে অধঃপতিত মুসলিম শাসক ও এলিট শ্রেণীর কব্জা থেকে নবীজীর (দ.) শরিয়তকে অসাধারণ প্রজ্ঞা, সততা ও ব্যক্তিত্ববলে উদ্ধার করে একটি সুসংস্কৃত, সৃজনশীল ও সফল জীবনাচার পদ্ধতি প্রদান করে তিনি একাধারে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস, সামাজিক, রাষ্ট্রিক নীতিমালাকে সমকালীন স্বৈরাচারী, ভোগবাদী, দুর্বৃত্তপনার হাত থেকে কেবল রক্ষাই করেন নি, উপরন্তু সমকালীন মুসলিম সমাজ ও মানসকে জাগতিক ও পারলৌকিক সঠিক দিশা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। রাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতার ক্ষুধা মিটানোর উন্মত্ততায় ইসলামের সুস্থ নৈতিক সমাজ-দর্শন ভিত্তিক নীতিমালাকে ছত্রখান করে দিয়ে ক্ষমতার লালসায় পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত রাজন্যবর্গের জংলী আইনের বিশৃঙ্খল, উচ্ছৃঙ্খল পরিবেশে তিনি সুবিন্যস্ত একটি সুশৃঙ্খল জীবনবাদী কর্মপন্থা বা ত্বরিকা বিশ্ববাসীর সামনে দিয়ে গেছেন। দরবারী আলেম-বুদ্ধিজীবীরা যে স্থলে রাজ-আজ্ঞা পালনকে প্রাধান্য দিতেন, সেস্থলে আল-কোরআন ও হাদিসের নির্দেশনা ও প্রত্যাশার প্রতি সর্বোচ্চ সংশয়াতীত আনুগত্যের পতাকা সমুচ্চ রাখাই ছিল তাঁর জাহেরী-বাতেনী কর্ম-সাধনার একমাত্র লক্ষ্য। এই অজর অবদানের জন্য তাঁকে 'কুতুব'[১] অভিধায় অভিষিক্ত করেন শায়খুল আকবর মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.)। সৎ, সুস্থ, ত্রাসমুক্ত পরিবেশে নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ পেয়ে কৃতজ্ঞ বিদ্বজ্জন তাঁকে মহীউদ্দিন (ধর্মের নবজীবনদাতা) এবং 'গাউসুল আযম বড় পীর' অভিধায় ভূষিত করেন, যা এখনো সমানে তাজা রয়েছে। অত্যাচারী শাসকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ন্যায়-বিচারের হক-কথা বলাই সর্বোত্তম জেহাদ–**হযরত গাউসুল আযম (র.) যেন এই মহান হাদিস শরিফের মূর্ত জাগতিক প্রতীক।**

রাজতান্ত্রিক অনাচারের গতি প্রতিহত করার পাশাপাশি ইসলাম ধর্মাচারসমেত ধর্ম-নীতি, দর্শন ও কল্যাণ-কর্ম ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা তাঁর অমর চলমান কীর্তি ও অবদান। মুসলিম তথা ইসলামী লৌকিক সমাজবদ্ধতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে পৃথিবীতে যে তিনটা প্রধান মহান কেন্দ্র সতত সক্রিয়, তন্মধ্যে অন্যতম হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) বাগদাদ শরিফ। অপর দুই কেন্দ্র গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশ্‌তীর (র.) আজমীর শরিফ এবং গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌'র (ক.) মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ।

২. মেধাবী মানব হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.) কৃতিত্বসহকারে পুঁথিগত বিদ্যার্জনের পাশাপাশি নিভৃতে সত্য সাধনা করেন প্রায় ২৫ বছর; বাগদাদ থেকে দূরে সুস্তার নামক প্রান্তরে। যুগপৎ সামাজিক সৎ লক্ষ্যাশ্রয়ী দুনিয়াবী ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে ৫২১ হিজরীর শেষ ভাগে আবার লোকালয়ে ফিরে এসে তিনি অটল হিমালয়ের মতো দৃঢ়পদে মাথা তুলে দাঁড়ান সকল প্রকার অনাচারের বিরুদ্ধে। নৈতিকতা বিবর্জিত ও অন্তর্কোন্দলে জর্জরিত শাসক ও এলিট শ্রেণী তাঁর সত্যাশ্রয়ী ব্যক্তিত্বের সামনে ন্যূনতম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর জীবনকালে বাগদাদে বিলাসপ্রিয় অথর্ব প্রকৃতির আধা ডজন শাসক গুজরে যান। তারা হলেন: আল-মুকতাদী (১০৭৫-১০৯৪), আল-মুস্‌তাহজিদ (১০৯৪-১১১৮), আল-মুসতারসিদ (১১১৮-১১৩৪), আর-রশীদ (১১৩৪-১১৩৫), আল-মুকতাফী (১১৩৫-১১৬০), আল-মুসতানজিদ (১১৬০-১১৭০)। আব্বাসীয়দের শাসনকালের বিস্তার ৭৫০-১২৫৮ খ্রি.। আল-মনসুর, হারুনুর রশীদ, আল মামুনের মতো সৃজনশীল কয়েকজন রাজন্যের আবির্ভাব ঘটলেও ৮৩৩ খ্রি. থেকে চরম বিশৃংখলা, হানাহানি প্রতিটা দিনকে অশান্ত করে রাখে। হযরত বড় পীরের (র.) জন্মপরবর্তীকালে ধর্মীয় বিতণ্ডা চরম আকার ধারণ করে। হানাফী-হাম্বলী মজহাবী দ্বন্দ্ব, শাসন ক্ষমতা হস্তগত করার লক্ষ্যে ধর্মীয় পবিত্র আবেগ ব্যবহারের কারণে পূর্ব থেকে শিয়া-সুন্নী সম্প্রদায়ের সংঘাতের ফলে সৃষ্ট অরাজকতা, বিতর্কিত-ধর্মভ্রষ্ট কারামতি সম্প্রদায়ের প্রাদুর্ভাব, শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্বগত কারণে বুয়াইয়া ও সেলজুক বংশের পতন, আল হাসান-আল সাব্বাহ প্রতিষ্ঠিত গুপ্ত ঘাতক দলের নির্মম সন্ত্রাস ও খুন-খারাবী ইরাক-ইরান ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটায়। রাজনৈতিক অরাজকতার পাশাপাশি বিভিন্ন ধর্মীয় ফের্কা অবলম্বী এক শ্রেণীর মুসলিমের সংঘাতের দরুন ধর্মীয় অরাজকতাও শুরু হয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও সামাজিক নীতিমালাও বিপন্ন হয়ে পড়ে। এমনকি পবিত্র কলেমার নতুন একটা আরবী ভার্সান তৈরী হয়, "লা মাবুদা ইল্লা আল্লাহ্‌ : মোহাম্মদ আল রসুলুল্লাহ্‌"![২] এসব গর্হিত কাজে সম্মতি থাকে এক শ্রেণীর দরবারী আলেমের। শিয়া-সুন্নী প্রাচীন দ্বন্দ্ব ছাড়াও দাইলামী, কারামতি, মুতাজিলা,

আশয়ারী, জিন্দিক, সর্বেশ্বরবাদী, বাতেনী, ফাতেমী, বার্মেকী, ইসমাইলী প্রভৃতি দ্বন্দ্বে ইসলামের আদর্শ দূরে থাক, প্রকৃত ঈমানের অস্তিত্বের সঙ্কটও দেখা দেয়। এই অরাজক অবস্থায় নৈতিক অধঃপতন, অর্থনৈতিক সঙ্কট, সাধারণ মানুষের উপর অস্বাভাবিক করের বোঝা, রাজকোষের নিদারুন অপচয়, ভোগ-বিলাস, দরিদ্রের সংখ্যা বৃদ্ধির বোঝা সমগ্র রাজ্য তথা সমাজের উপর চেপে বসে। হযরত বড় পীরের সময়কালে এই ছিল পরিস্থিতি এবং এ অবস্থায় সঙ্কটের পরিমাণ ও মাত্রা ধারণাতীত ব্যাপার।

এই প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে তিনি দৃঢ়চিত্তে দণ্ডায়মান হন তৎকালীন সমাজের ধর্মীয় ও নৈতিক দেউলিয়াপনা ঘুচানোর মহান ব্রত নিয়ে। একাজ ছিল অত্যন্ত কঠিন, ঝুঁকিপূর্ণ। কিন্তু নিজের অন্তর্গত বিশ্বাস ও আলো অবলম্বন করে তিনি একাই এগিয়ে যান মশাল নিয়ে।[১] প্রতিকূলতার প্রাচীর ভেঙ্গে পড়ে।[২]

৩. ৫২১ হিজরীর **১৬** শাওয়াল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে তিনি নবীজী (দ.) কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হন: "হিকমত ও উত্তম নসীহত সহযোগে আল্লাহ্‌র পথের দিকে আহ্বান করুন।" তিনি মাঠে নেমে পড়লেন জনতার সামনে। একদিকে বিলাস, অপচয়, অন্যদিকে চরম দারিদ্র্য, অন্যায়, অত্যাচার, কুসংস্কারের প্রতিকারে তাঁর অকুতোভয় বক্তৃতা জনমানসকে জাগিয়ে তোলে। এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার জন্য তাঁকে ভোগ করতে হয় অপরিসীম নিগ্রহ ও দুর্ভোগ। কিন্তু রাজন্যবর্গ থেকে শুরু করে সকল মহলকে চমকে দিয়ে তাঁর ওয়াজ মাহফিল তথা ডিসকোর্সে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে লোক সমাগম হতে থাকে। ইসলাম ও মুসলিম সমাজের নদীতে ভাটির টান থেমে আসে। জয় হয় ন্যায়পন্থী ঈমানী আলোয় উদ্ভাসিত জনগণের। ৫২১ হিজরী থেকে ৫৬১ হিজরী পর্যন্ত একাধারে চল্লিশ বছর তিনি প্রতি সপ্তাহে তিন দিন ওয়াজ করতেন– শুক্রবার দিবাভাগে, শনিবার রাতে মাদ্‌রাসা প্রাঙ্গণে এবং বুধবার ভোরে শহরের বাইরে বিশাল ঈদগাহ্ ময়দানে। তাঁর ওয়াজ হতো সরাসরি কুরআন ও হাদিস ভিত্তিক। তাঁর ৬২টা ডিসকোর্স 'ফতহুর রব্বানী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন হযরত আফি উদ্দীন ইবনে মোবারক (র.)। তাঁর বক্তৃতায় অসাম্য, শোষণ, পীড়নের কড়া সমালোচনা, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে মানুষমাত্রের কল্যাণ, ইহ ও পারলৌকিক মুক্তির বিষয়সহ বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয় নির্দেশনাদি স্থান পেয়েছে। অন্যান্য গ্রন্থাবলী হচ্ছে, ফতহুল গয়ব, সির্‌রুল আসরার, গুনিয়াতুত্তালেবীন, কসিদা-এ-গাউসিয়া। এই সবগুলো পুস্তক কালোত্তীর্ণ, চিরসবুজ এবং সবগুলো বাংলা ভাষায় অনুবাদিত। ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, হযরত খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.), হযরত খাজা কুতুবুদ্দিন বক্তিয়ার কাকী (র.) তাঁর দরবারে গমন করেছিলেন। তিনি পৈতৃক জমিতে

চাষাবাদ করিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সৎ ব্যবসাকেও জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করেন।

৪. হযরত গাউসুল আযম মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) জীবন অসংখ্য কারামতে পূর্ণ। তাঁর বাতেনী-জাহেরী উভয় দিক প্রবলভাবে প্রকাশিত এবং রুহানী কারামতের মতোই তাঁর জাহেরী সংগ্রাম ও বাস্তব কর্মোদ্যোগ ইতিহাসের এক সংঘাতময় হতাশাব্যঞ্জক ব্যাপ্তি প্রতিরোধের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়। তাঁর রুহানী কারামতের বিবরণাদি কোটি কোটি মানুষের ঘরে ঘরে সুবিদিত। অন্যপক্ষে, ভয়াবহ প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র জাহেরী সফল সংগ্রামও এক উন্নত প্রকারের বৃহৎ সামাজিক কারামতই বটে, যা মানব সুসংস্কৃতির এক মহান সঞ্চয় ও অর্জন এবং যা আরো একাডেমিক বুদ্ধিবৃত্তিক বিশ্লেষণের দাবীদার। তাঁর অধ্যাত্ম ও শরিয়তি সংস্কার, যা বেলায়তে মোকাইয়াদা দর্শন হিসেবে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) প্রসিদ্ধ 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে যথার্থ প্রেক্ষিতে বিবৃত ও বিশ্লেষিত হয়েছে; মুসলিম ব্যবহারিক জীবনকে বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনানুগভাবে বিন্যস্ত করেছে। এই মোকাইয়েদা দর্শন তৎকালীন মুসলিম সমাজের সামাজিক-রাজনৈতিক-আর্থনীতিক সংস্কারের ও শুদ্ধি আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সব মিলিয়ে তাঁর জীবন এক মহান প্রতিভাদীপ্ত কর্মযজ্ঞের সমাহার। দর্শন-সামাজিক-রাজনৈতিক-রুহানী পরিমণ্ডলে তাঁর সফল সৃজনশীল পদচারণা বিস্ময়কর বটে। মারেফতি দৃষ্টিতে দেখলে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর কর্ম-কৃতি প্রকৃত প্রস্তাবে দৃশ্যমান কারামতই বটে!

তাঁর প্রগাঢ় সত্যনিষ্ঠা ও সৎ সাহস কিংবদন্তীতুল্য, যা তিনি তাঁর পুণ্যবতী মায়ের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। কৈশোরে উচ্চ শিক্ষার্থে বাগদাদ যাবার প্রাক্কালে মা তাঁর প্রবাস জীবনের একমাত্র সম্বলরূপে চল্লিশটা (মতান্তরে আশিটা) স্বর্ণ দিনার তাঁর অঙ্গরাখার মধ্যে সিলাই করে দেন নিরাপত্তার জন্য এবং বিদায়কালে উপদেশ দেন যে; জীবনে কোনও ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই মিথ্যা বলবে না। পথিমধ্যে দস্যুদল কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে কারাভাঁর সকলের সব মালামাল লুণ্ঠিত হয়। একজন দস্যু তাঁর সাথে কিছু আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি অম্লানবদনে স্বর্ণ মুদ্রার কথা স্বীকার করেন এবং সেলাই করা স্থান দেখিয়ে দেন। দস্যু দলপতি বললো, তুমি বোকা। স্বর্ণ মুদ্রাগুলোর কথা তুমি স্বীকার করলে কেন? কিশোর আবদুল কাদের দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, মা আমাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। বিস্মিত দস্যু দলপতি তাঁর সত্যনিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়ে সৎজীবন যাপন শুরু করে। এই হলেন পীরানে পীর দস্তগীর হযরত আবদুল কাদের জিলানীর (র.) অমলিন চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। প্রবল পরাক্রান্ত

স্বৈরশাসকদের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আজীবন তিনি সত্য-সুবিচারের পথে অটল থেকে ছিলেন।

পবিত্র হাদিস ভিত্তিক তাঁর একটি মহান ঘোষণা: "কেউ ভোগের প্রাচুর্যে হাবুডুবু খাবে, আর কেউ দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে জর্জরিত হবে, এ বিধান ইসলামের নয়। আফসোস যে, তোমার পুরো দিনের খাবার মওজুদ আছে, আর তোমার নিকট প্রতিবেশী উপবাসী থাকছে। তোমার ঈমান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি তুমি নিজের জন্য যা চাও, অন্যের জন্যও তাই না চাও। তোমার ঈমানে গলদ থেকে যাবে, যদি তোমার নিজের ও পরিবারবর্গের জন্য বেশী খাবার মওজুদ থাকে। আর একজন অভাবগ্রস্ত, তোমার দ্বার থেকে ফিরে যায়।" সক্রিয় ও গতিশীল জীবনের পথের দিকে তাঁর আহ্বান; "যারা অলস, তারাই শুধু নসীবের দোহাই দিয়ে থাকে। নসীবের সাথে আমাদের কী কারবার? আমাদের কর্তব্য হচ্ছে কর্মের পথে, কর্তব্যের পথে অগ্রসর হওয়া, বাকী ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র।" তাঁর ত্বরিকা বা জীবন দর্শন এখনো সমানে সজীব ও গতিশীল। তিনি আজো যেনো অশরীরি অবস্থায় হাঁটছেন কেবল মধ্যপ্রাচ্য নয়, এশিয়া তথা সমগ্র বিশ্বের দুঃস্থ জনপদে, আর কামনা করছেন মানবতার মুক্তি ও শান্তি।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. আবদুল মওদুদ: মুসলিম মণীষা: আবদুল কাদের জিলানী।

২. দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকা-২ দ্রষ্টব্য।

৩. ইসলাম ধর্মের জাহেরী-বাতেনী উভয়ফ্রন্টে বেদনাদায়ক অধঃপতন, ছিন্নভিন্ন অকল্পনীয় দুরবস্থা, মূলনীতির বিকৃতি আকীর্ণ ও অস্তিত্বের সঙ্কটপূর্ণ বিশৃঙ্খল অবস্থায় তিনি কঠিন আদর্শিক সংগ্রামে অবতীর্ণ হন।

৪. বিবিধ ঘাত-প্রতিঘাত-দ্বন্দ্বের পর ইসলামের মূলনীতিগুলোকে অবিকৃতভাবে চয়ন ও বিন্যস্ত করে সফলভাবে জনসম্মুখে উপস্থাপন করে তাঁদের সমর্থন ও স্বেচ্ছায় গ্রহণযোগ্য করতে সক্ষম হওয়ায় ইতিহাসে তিনি 'মহীউদ্দিন' বা ধর্মের 'নবজীবনদাতা' হিসেবে অভিষিক্ত আছেন।

৫. তিনি সায়েমুদ্দাহার ছিলেন এবং ইফতারের পর একবার মাত্র স্থানীয় দরিদ্র ও দুঃস্থদের সঙ্গে নিয়ে আহার করতেন। সারারাতব্যাপী ইবাদতে মশগুল থাকতেন। গভীর জ্ঞানী, উদ্যোগী ও আত্মবিশ্বাসে সফল এই মহান ধর্ম ও দর্শনবেত্তা মূর্খতা ও অলস অদৃষ্টবাদকে ধিক্কার দিয়ে সক্রিয় ও গতিশীল জীবনের পথে আহ্বান জানিয়েছেন; "অলস ব্যক্তিরাই নসীবের দোহাই দিয়ে থাকে। নসীবের সাথে আমাদের কী কারবার? আমাদের কর্তব্য হচ্ছে প্রবল আত্মবিশ্বাস ও পবিত্রতাসহকারে কর্মের পথে, কর্তব্যের পথে, সংগ্রামের পথে এগিয়ে যাওয়া। বাকী ব্যবস্থা আল্লাহ্‌র।"

বিংশ অধ্যায়

গরীবে নেওয়াজ হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র.)

[১১৪১/৪২–১২৩৬ খৃঃ]

"ফেরেশ্‌তারা একটা ফোঁটার জন্য ঝিনুকের মতো তৃষ্ণার্ত থাকে, (অথচ) হাজার কূল-কিনারাহীন সমুদ্র উৎসর্গ হয়েছে আদমের মাটিতে (গজল নং ২৫)।"

১. ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে সহস্রাধিক বছর ধরে সসম্মানে দেদীপ্যমান হযরত খাজা মঈনুউদ্দিন চিশ্‌তির (র.) সমগ্র জীবন, কর্ম, সাহিত্য ও অধ্যাত্ম সাধনায় কীর্তিত হয়েছে মানুষের মহিমা। ব্যক্তিজীবন, সমাজজীবন, ধর্মীয়জীবনের প্রতিটা পর্যায়ে তিনি চেয়েছিলেন সৃষ্টির আসমানে মুক্ত বিহঙ্গের মতো পবিত্র মানুষের বহুমুখী সৃজনশীলতার পক্ষ-সঞ্চালন। মানুষের স্রষ্টাপ্রদত্ত মানবিক মর্যাদা, পবিত্র চিন্তা, কর্ম ও জীবনাচারের স্বাধীনতা, ধর্মীয় বিদ্বেষ-জুলুম-পীড়ন-স্বৈরাচারী শোষণের অবসান, পৃথিবীর বাগানে হাজারো ফুলকে নিজস্ব প্রকৃতি, ঢং ও রঙে ফুটতে দেবার অবকাশ সৃষ্টি করাই ছিল তাঁর জীবনের মহান মিশন। তাঁর সে মিশনের বৃক্ষ তিনি রোপণ করেছিলেন আজমীরে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে। সেই বৃক্ষ আজো জাতি-ধর্ম-বর্ণ-বিশ্বাস-রাজনীতি-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষের শীতল ছায়া হয়ে অটল দাঁড়িয়ে আছে এবং প্রতিদিনই তরতাজা ফুলের শোভা ও সুগন্ধি ছড়াচ্ছে।

২. মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের সাথে খাজা বাবার আজমীর শরিফের অনেক বিষয়ে সাযুজ্য রয়েছে। এর মধ্যে দার্শনিক এবং ব্যবহারিক আচারাদির উভয় ক্ষেত্রেই সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়। অছিয়ে গাউসুল আযম বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে আহমদীর যে দার্শনিক প্রকল্প বর্ণনা করেছেন, তার ফলন আজমীর শরিফেও জারী আছে হাজার বছর ধরে। অর্থাৎ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে মানুষ মাত্রেরই নিরাপদ ঠাঁই রয়েছে এখানে। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) একাধিকবার আজমীর শরিফকে তাঁদের 'পুরান বাড়ি' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে আরো একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, হযরত গাউসুল আযম মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.) যখন বিশৃঙ্খল, অধঃপতিত, নৈতিকভাবে বিপর্যস্ত মুসলিম সমাজের উদ্ধারকল্পে বাগদাদে শরিয়তী নিয়মবদ্ধতা বা মোকাইয়াদা পুনর্গঠন কার্যক্রম হাতে নেন; তখন প্রায় একই সময়ে রেসালতি মিশন নিয়ে বেলায়তে মোত্‌লাকায়ে

আহমদীর ঝর্ণাধারা হয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ভারতের দিল্লী-আজমীরে আগমন ঘটে খাজা বাবার। লক্ষ্যণীয়, হযরত আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (র.) এবং হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিচরণকাল প্রায় সমসাময়িক (১০৭৭–১২০৪খৃঃ)। তাঁরা তিন জনের জন্ম ও ওফাতের মোট মেয়াদকাল ১৬৩ বছর এবং পরস্পরের দর্শন ও কর্ম সম্পর্কে তাঁরা সম্যক ওয়াকেবহাল ছিলেন। খাজা বাবার সৌভাগ্য হয়েছিল হযরত বড় পীরের প্রত্যক্ষ তালিম পাওয়ার। ইতিহাসের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, নবী জীবনের মোকাইয়াদা ও মোত্‌লাকা নীতিদ্বয়ের হাত ধরাধরি করে পাশাপাশি চলার যে ধারা সূচিত হয়, তা কাল প্রবাহে শুকিয়ে যায়নি। বরং সর্বদা অব্যাহত থেকেছে এবং আছে, যা ধারণ করে আছে মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফও। এই তিন মহান দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক সাধক মানব জীবনে শরিয়ত ও মারিফাতের সমগুরুত্বের যে শিক্ষা দিয়েছেন, মাইজভাণ্ডার দরবার সেই ঐতিহ্য ধারণ ও বহন করে চলেছে। তাঁদের তিনজনের মধ্যে যথার্থভাবে বিকাশ ঘটেছিল জাহেরী শরিয়ত, সমাজনীতি ও মারিফাতের। হযরত গাউসুল আযম মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানী (র.) এবং হযরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তি (র.) সমকালে, নবীজীর (দ.) মুখ্যতঃ যথাক্রমে মোহাম্মদী বিধিবদ্ধতা ও আহমদী সর্বজনীনতার ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত হিসেবেও ইতিহাসে বিরাজমান।

৩. খাজা বাবা দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ইসলামের পতাকা স্থাপন করেছেন বেলায়তে আহমদীর পতাকারূপেই, যার ছায়াতলে জাতি-ধর্ম-বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী নির্বিশেষে সকলেই নিরাপদ। এ বিষয়টা আধুনিক কোন কোন সমাজ বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। চট্টগ্রামের স্বনামধন্য অধ্যক্ষ রণজিৎ চক্রবর্তী একাধিক তাসাওউফীয় আলোচনা অনুষ্ঠানে এ বিষয়টার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। খাজা বাবা স্থানীয় ভিন্নধর্মী রাজাদের কাছ থেকে কেবল ধর্মীয় কারণে যে প্রতিকূলতা ও জীবন সংশয়াপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিলেন, পরবর্তী পর্যায়ে কোন প্রকার প্রতিশোধস্পৃহা তাঁর মধ্যে উদিতই হয়নি, বরং ক্ষমতাসীন মুসলিম রাজন্যবর্গও অন্ততঃ ধর্মের ব্যাপারে কোন প্রকার জবরদস্তি কিম্বা হস্তক্ষেপ করেননি। তাঁরা খাজা বাবার উদার সহনশীলতার নীতি অনুসরণ করেন। দ্বন্দ্ব কিছু হয়ে থাকলে তা ছিল ক্ষমতা ও রাজ্য নিয়ে। স্থানীয়দের জীবনাচার ও ধর্মাচারের ক্ষেত্রে বাড়িয়েছিলেন সহযোগিতার হাত। খাজা বাবার আধ্যাত্মিক অনুসারীরা এ ক্ষেত্রে আরো বহু কাঠি এগিয়ে গিয়ে ভিন্নধর্মীদের নিরাপদ অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছিলেন। অথচ এর মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে পারস্য, মিশর, রোম, এমনকি ভারতবর্ষে ভিন্ন ধর্মমত পোষণকারীদেরকে শাসকবর্গ এবং সংশ্লিষ্ট পুরোহিত শ্রেণীর হাতে জীবন দিতে হয়েছে।

খাজা বাবার আগমন-পরবর্তীকালে খাজা বাবার দরবারে গুরু নানকসহ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিবর্গের হাজেরীর কথা বাদ দিলেও তাঁর জীবদ্দশায় তাঁর সান্নিধ্য পাবার সৌভাগ্যবান শাহাবুদ্দিন গোরী, কুতুবুদ্দিন আইবেক, সুলতান শামসুদ্দিন ভিন্নধর্মীদের উপর উৎপাতের কথা চিন্তাই করেননি। রাজপুতনার রাজন্যবর্গের সাথে প্রতিটা যুদ্ধে জয়ী সুলতান মাহমুদ গজনী তাদের ধর্মে হাত দেননি। তেমনি ছিলেন গুজরাট রাজ মোজাফ্ফর শাহ। প্রবল প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাট আকবর অন্ততঃ সাতবার খাজা বাবার দরবারে হাজিরা দেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন সম্রাট জাহাঙ্গীর, সম্রাট শাহজাহান, সম্রাট আলমগীর, শাহজাদী জাহানআরা, সম্রাট পঞ্চম জর্জ ও তাঁর পত্নী রাণী মেরী, লর্ড কার্জন, গান্ধীজী, নেহেরুজী। ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষ সেই দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত যাচ্ছেন বিরামহীন স্রোতের মতো। খাজা বাবার মহত্ব, বিশালত্ব ও অন্তহীন ব্যাপকতা চিত্রিত হয়েছে পণ্ডিত সুন্দরলালজীর এই নিবেদনে "আধ্যাত্মিক রাজ্যের মহিমান্বিত সাধকগণ সর্বজাতি ও সর্বধর্মীয় লোকদের চিরদিন ধরিয়া পূজ্যস্পদ। হযরত খাজা গরীবে নেওয়াজ খোদাপ্রেমের ভিত্তিতে স্বীয় ধ্যান-ধারণা ও আমলের যে অবিনশ্বর ইমারত প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, উহা আজও বিপথগামী ও বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় দানের জন্য আহ্বান করিতেছে।"

খাজা বাবার কারামতের 'মহাভারত' কখনো সমাপ্ত হবার নয়। সেই দ্বাদশ শতাব্দী থেকে আজ পর্যন্ত তিনি দয়া, অনুকম্পা, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীর অফুরান ঝর্ণা হিসেবেই বিরাজ করছেন, যা মানবজাতি ও সমাজের জন্য এক বিশ্লেষণাতীত বিস্ময়। সমাজ-ঋণবনে তিনি যেন সুশীতল মলয় ও সুপেয় সলিল।

৪. (ক) খাজা বাবার আধ্যাত্মিক সত্তার পাশাপাশি যে অপরিমাপ্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও মানবিক সক্রিয় সত্তা অগণিত মানুষকে স্বস্তি, সান্ত্বনা, অভয়, শক্তি ও প্রেরণা দিয়ে চলেছে, সে ব্যাপারে রাজনৈতিক সমাজতাত্ত্বিক-দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে যথোপযুক্ত আলোচনা এখনো হয়নি। তাঁর সমাজতাত্ত্বিক ভূমিকা ও সক্রিয় প্রভাব সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণের দাবী রাখে। অসাম্প্রদায়িকতা, সর্বমানবিকতা, রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক সহাবস্থানের জীবন্ত মঞ্চ হিসেবে তিনি বিরাজমান।

আল-কুরআনের অনুবীক্ষণযোগে দেখতে গেলে, তিনি যেন 'রব' সিফতের মূর্তিমান প্রতিনিধি। রবুবিয়াত নীতি তাঁকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট কাল, স্থান, পরিবেশে কার্যকর হচ্ছে সতত। প্রত্যেক যাঞ্চাকারী, জায়েরীন, আশেকীন নিজ নিজ ধর্ম, বিশ্বাস, স্বাতন্ত্র্য নিয়ে স্বস্থানে থাকবেন, অথচ আলো-বাতাসের মতোই খাজা বাবার কাছ থেকে পাবেন নিজের প্রয়োজনীয় উপকরণ। আকাশের মতো অবিচল, স্থির তাঁর সর্বব্যাপী সমতাবাদী সামাজিক, রাজনৈতিক শুভাশিসের সমাজ-বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ন এই

অঞ্চলের সামগ্রিক স্বার্থে ও প্রয়োজনে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ভারতের সমাজনীতি-ধর্মনীতি-রাজনীতি, সাহিত্য-সঙ্গীত সর্বক্ষেত্রে তিনি বহতা প্রভাব।

(খ) খাজা বাবার রচনাবলী অত্যন্ত মূল্যবান ও সারগর্ভ। সেগুলো হলো: (১) দীওয়ান, (২) আনিসুল আরওয়া, খাজা বাবা কর্তৃক লিপিবদ্ধ স্বীয় মুর্শিদ খাজা উসমান হারুনীর ২৮টি ডিসকোর্স, (৩) আসরারে হাকিকি (তাঁর খলিফা খাজা কুতুবুদ্দিন বখতিয়ার কাকীর জন্য লিখিত ডিসকোর্স),

(৪) গঞ্জে আসরার (মারিফাত তত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থ) (৫) রেসালায়ে মুঈনুদ্দিন (জিকির, রিয়াজত প্রভৃতি সম্পর্কে মেথোডলজি), (৬) কালেমাতে মুঈনুদ্দিন (ওয়াহদাতুল ওজুদ, নাফি, ইসবাত, মাকামে নাসুত, লাহুত ও মালাকুত বিষয়ক আলোচনা, (৭) রেসালায়ে তাসাওফে মাসুম (তাসাওউফ অনুশীলন বিষয়ক গ্রন্থ), (৮) মকতুবাতে খাজা মুঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (তাঁর মূল্যবান পত্রাবলী), (৯) আদাবে দাম জাদান।

খাজা বাবার দীওয়ানে ফার্সি ভাষায় ১১৮টি গজল, দুটো ক্বসিদা এবং পাঁচটি রুবাই রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটিই উপমা, উৎপ্রেক্ষা, অনুপম বর্ণনাশৈলী, ভাব ও তত্ত্বের গভীরতা, নূরে মোহাম্মদীর জলোয়ায় উদ্ভাসিত, যা তাঁকে বিশ্ব সাহিত্যের প্রথম কাতারে স্থাপন করে। সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি মওলানা রুমীর (১২০৭-১২৭৭) পূর্বসূরি। তাঁর ধর্ম-তাসাওউফ-দর্শনসমৃদ্ধ 'দীওয়ান' ইরান কিম্বা পাকিস্তান-ভারত-বাংলাদেশে কোন মাদ্‌রাসায় পাঠ্য আছে কিনা জানা যায় না। এটা বড়ই দুর্ভাগ্যজনক বটে। দর্শনের ভুবনে 'নূরে মোহাম্মদী' শিরোনামে কোন শাখা থাকলে সেখানে তাঁর দীওয়ানের আসন থাকবে উচ্চে।

হাজার বছর আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেও খাজা বাবা এখনো দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াসহ বিভিন্ন জনপদে যেনো হেঁটে চলেছেন দয়া-রহমত ও মেহেরবাণীর হৃদয় ভরা তশ্‌তরী হাতে। এই মহান মৃত্যুহীন গরীবে নেওয়াজের আধ্যাত্মিক, সামাজিক, কল্যাণমুখী রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও পালনবাদী চিন্তা-চেতনা ও প্রত্যক্ষ কার্যাবলী সম্পর্কে উন্নত গবেষণা, বিশ্লেষণ ও জ্ঞান আহরণ বিশ্ব মানবতার দাবী। মানুষের মহিমাকীর্তন সূচক তাঁর দুটো গজলের অংশবিশেষ:

'যদি তুমি তোমার সুপ্ত বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোল তাহলে দেখবে
সূর্যের তজল্লি জাগ্রত হৃদয়ের উপর জ্বলছে (গজল নং ৪০)।
"সবাই আদি দরিয়া ওয়াহ্‌দাতের মোতি খুঁজে বেড়ায়।
অথচ খোদা তোমার দেহের ভেতরেই মনি-মুক্তা লুকিয়ে রেখেছেন (গজল নং ১০৫)।

তাঁর দীওয়ানের সর্বশেষ গজলের (১১৮নং) শেষ দুই বয়েতঃ
'যে তোমার দুয়ারে অপেক্ষমান তুমি চিনতে পারো না তারে
তুমি অন্বেষণকারী এবং গৃহের মাঝে তুমিই
মুঈন, মিম্বরের যে অধিকারী তাকেই ইশ্‌কের কথা বল,
কেননা, ইশ্‌ক-বাগানের বুলবুলি তোমার জমানায় তুমিই।

টীকা : তথ্য সূত্র

তথ্যসূত্রঃ ক. দীওয়ান-ই-মুঈনুদ্দিনঃ অনুবাদ, সম্পাদনা ও টীকা ভাষ্য– জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল আলম খান, ২০০৩, [খাজা বাবার ইন্তিকালের প্রায় ৮০০ বছর পর বাংলা ভাষায় প্রথম পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ], খ. হযরত খাজা বাবা গরীবে নেওয়াজের জীবনী ও তাঁর পীরান-পীরানের পরিচিতি, শাহ্‌সুফি সৈয়দ গোলাম মাওলা হোসাইনী চিশ্‌তী, শরিয়তপুর, ১৪০৬, বাংলা গ. বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থ।

এ নিবন্ধে উৎকলিত শেয়ারগুলোর নম্বর তাঁর দীওয়ানে বিন্যস্ত নম্বর অনুসারেই রাখা হয়েছে।

একবিংশ অধ্যায়

শায়খুল আকবর হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.)

[১১৬৫-১২৪০ খৃ.]

[নবীজীর (দ.) সত্তা-স্বরূপ, মানুষ এবং বহুত্ববাদিতার ঐক্যসূত্র 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' তত্ত্বের অন্বেষায় নিবেদিত দার্শনিক]

'মানুষ মূল্যবোধ ও আইন বা নিয়মের জগতে বাস করে'

– ইবনুল আরাবী (র.)

১. তাসাওউফ জীবন ধারার উদ্ভবঃ

খোলাফায়ে রাশেদার পর মুসলিম জাহানে খিলাফত কাঠামোর বহুত্ববাদী গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার স্থলে বংশানুক্রমিক আমিরতন্ত্র বা রাজতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হবার পর বহু মনীষী বিভিন্নভাবে এ ব্যবস্থার সমালোচনা ও প্রতিরোধে অবতীর্ণ হয়ে নির্যাতিত এমন কি মৃত্যুদণ্ডের শিকার হন। বাদ যাননি তাসাওউফকুল শিরোমনি হযরত হাসান বসরী (র.), হযরত ইমাম জাফর সাদেক (র.) প্রমুখ। ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সুফি অভিধায় ভূষিত চিকিৎসক হযরত জাবীর ইবনে হাইয়ানসহ মুসলিম জাহানের শীর্ষস্থানীয় পূত চরিত্রবান মেধাগুলোকে প্রাণ হাতে নিয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পালাতে হয়। স্বজাতি, স্বধর্মীদের হাতে নির্যাতনের এমন নির্মম নেমেসিস এড়াতে পারেননি হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) মতো কালজয়ী প্রতিভাও। তাঁকেও একাধিকবার ছাড়তে হয়েছে একাধিক দেশ।

মুসলিম জাহানের এই আত্মঘাতী দ্বন্দ্ব ও ধ্বংসের প্রধান কারণ শাসন-ক্ষমতার লড়াই। খোলাফায়ে রাশেদার জামানার অবসানের সাথে ইসলামী রাষ্ট্রনীতি অনুযায়ী বহুত্ববাদী প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র, রবুবিয়াত বা পালনবাদী সমাজমুখী অর্থনৈতিক ভাবনা, পালনবাদী এক বিশ্বের (one world) ধারণা, বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমে প্রকৃতি ও মহাকাশ নিয়ন্ত্রণের সাধনা, চিকিৎসা, দর্শন, ইতিহাস, ভূগোল চর্চা, সু-সংস্কৃতি নির্মাণের উদ্যোগ সব ভেস্তে যায়, স্রেফ অস্ত্রবলে ক্ষমতা কব্জা করার উন্মত্ততায়। ৬৬১ খৃ. মুসলিম জাহানের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা কুক্ষিগত করে উমাইয়া পরিবার এবং এরপর আব্বাসীয়রা। খিলাফতের স্থলাভিষিক্ত হয় বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র। বায়তুলমাল হয়ে যায় আমীরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ধর্মবেত্তা, বিদ্বানগণকে চলতে হতো তাঁদের হুকুমে-ইচ্ছায়। ৬৮০ খৃ. ১০ অক্টোবর কারবালার বর্বর শোকাবহ ঘটনার পরের বছর

৬৮১ খৃ. আমীর ইয়াজিদের (৬৮০-৬৮৩) আমলে মদীনা শরিফে (৬৮২ খৃ.) ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়, যাতে শহীদ হন নবীজীর (দ.) ৮০ জন পূত মহান সাহাবা এবং সাতশত কুরআনে হাফেজ। পরের বছর আক্রান্ত হয় কাবা শরিফ, ২৪ সেপ্টেম্বর ৬৮৩ খৃঃ[১]। আমীর আবদুল মালিকের আমলে (৬৮৫-৭০৫ খৃ.) হাজ্জাজ বিন ইউসুফ দ্বিতীয় দফা আক্রমণ চালিয়ে কাবা ঘরে আগুন দেয় এবং হাজার বছরের ঐতিহাসিক এই পবিত্র গৃহের মর্যাদা ও শুচিতা নষ্ট করে, যা মেনে নেওয়া কারো পক্ষে অতীতেও সম্ভব হয়নি, এখনো নয়। ঈমানদার, বিজ্ঞ, উচ্চ ভাবনার মুসলিমরা এর বিরুদ্ধে প্রথমে প্রকাশ্য বিদ্রোহ করেন। কিন্তু স্বৈরী, বৈরী রাজশক্তির সামনে টিকতে না পেরে তাঁরা তাসাওউফের আল-খাল্লা আর পাগড়ী পরে ভিন্ন পন্থায় ইসলামের মৌলিক শিক্ষা ও চেতনার শিখাকে অনির্বাণ রাখতে ব্রতী হন।

মহান সুফি সাধকদের একশ্রেণীর জীবনীকার স্বৈরাচারী রাজশক্তির এই ভয়ঙ্কর নির্মমতার কথা বেমালুম চেপে যাচ্ছেন বহুদিন থেকেই। সুফিদের সংযম ও কল্যাণ সাধনা এবং উৎকৃষ্ট নসিহতগুলোর কথাই শুধু লেখা হয়। কিন্তু কোন যাতনায় এসব প্রতিভাবানরা এ জীবনে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছেন, তা এড়িয়ে যাওয়া হয়! তবে বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাসকাররা রাজতন্ত্রের এসব ধ্বংসযজ্ঞ ও নষ্টামীর কিছু কিছু ফিরিস্তি ও বিশ্লেষণ ধরে রেখেছেন। বিভিন্ন ধর্মীয়-রাজনৈতিক সম্প্রদায়, ধর্মতাত্ত্বিক গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে ক্ষমতাসীন ও প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তির মদদ প্রকারান্তরে ইসলামের মূল সামাজিক ও আধ্যাত্মিক আদর্শের অনুশীলন কীভাবে ব্যাহত ও নষ্ট করেছে, তার যথার্থ আধুনিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। সুফি-সাধকদের জীবনভিত্তিক আকর গ্রন্থ সুবিখ্যাত 'তাজকেরাতুল আউলিয়া' এবং 'মানতিকুত্ তোয়ায়ের' (পাখীদের সংসদ) গ্রন্থের প্রণেতা হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার-ও তো একইভাবে নিগৃহীত ও বিতাড়িত হয়েছিলেন, সে-খবর কয়জন মুসলিম রাখেন? তাঁদের অমর গ্রন্থ ও জ্ঞানের নির্যাসগুলো তাঁদের পাশ্চাত্য গুণগ্রাহীদের কল্যাণে টিকে থেকেছে এবং ঊনবিংশ/বিংশ শতাব্দীর প্রজন্মের হাতে আসার অবকাশ পেয়েছে।

তবে এতো প্রতিকূলতা ঝড়-ঝাপটার মধ্যেও তাসাওউফের একটা ব্যবহারিক গূঢ় জীবনধারা নবীজীর হাকিকতী, মারফতি ঝর্ণা থেকে উৎসারিত হয়ে বহতা থেকেছে। এই ধারাটা মানুষের প্রশান্তির আশ্রয়। রাজনৈতিক-সামাজিক অনাচার-অত্যাচারে হতাশ ক্ষুব্ধ পুণ্যাত্মারা এই ঝর্ণাধারার পাশেই স্থাপন করেছিলেন জীবনের সরাইখানা।

২. 'তাসাওউফ দর্শনের' স্থপতি ইবনুল আরাবীর জীবন-নক্শা :

মেধাবী, সৃজনশীল, স্বার্থলেশহীন মহৎ মানুষদের অক্লান্ত পরিশ্রম, সাধনা ও ত্যাগে তাসাওউফ একটা পূর্ণাঙ্গ দর্শন ও বিজ্ঞানের রূপ পরিগ্রহ করে এবং নতুন এক মানবিক বুদ্ধিবৃত্তিক সমাজ-জগতের পত্তন ঘটায়। হযরত মহীউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র.) এই

নতুন দর্শন ও বিজ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ কাঠামো নির্মাণের চূড়ান্ত কারিগর, যা তৎকালীন সময় থেকে আজ পর্যন্ত প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শনকে প্রবলভাবে প্রভাবিত ও প্রেরণা সরবরাহ করে চলেছে।

দাতা হাতেম তায়ীর অধস্তন বংশধর তীক্ষ্ণ মেধাবী আরাবীর (র.) জন্ম স্পেনের মার্সিয়া নগরীতে। কুরআন, হাদিস, ফিকাহ্, ইলমুল কালাম, দর্শন, তর্কশাস্ত্র তিনি শিক্ষা করেন সেভিলে। তাঁর ছিল কাব্য প্রতিভাও। সুমার্জিত ব্যবহার ও নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অধিকারী ইবনুল আরাবী কৈশোর থেকে সুফি ও আহল্-আল্-হক বা সত্যানুসন্ধানীদের সাহচর্যে কাটাতে তৃপ্তিবোধ করতেন। ৩৭ বছর বয়সে তিনি কিউটা গমন করেন এবং স্থানীয় মশহুর আলেমদের সাহচর্যে অতিবাহিত করেন। তিনি কিছুকাল ফাতেমা বিনতে আল-ওয়ালীয়াহ নাম্মী এক মহিলা তাপসীর খেদমত করেন এবং তাঁর কাছে সুফিতত্ত্বের জ্ঞান লাভ করেন। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি এক সুলতানের খাস মুন্সী হিসেবে কাজ করেন এবং প্রশাসনিক দক্ষতার পরিচয় দেন। কিন্তু নিষ্কাম সুফির জীবন অবলম্বনে হৃদয়ের তাগিদে ১২০২ খ্রি. বিভিন্ন দেশ সফরে বহির্গত হন। পবিত্র হজ সমাপনের উদ্দেশ্যে তিনি স্পেন ত্যাগ করলেও প্রথমে মিশরে গিয়ে বৎসরাধিক কাল বসবাস করেন এবং নিজের শিক্ষা ও মতবাদ প্রচার শুরু করেন। তাঁর অনেক অনুসারী সৃষ্টি হয়। এতে এক শ্রেণীর ক্ষুব্ধ দরবারী উলেমার চাপে কায়রোর সমকালীন শাসক তাঁকে প্রথমে কারারুদ্ধ এবং পরে বহিষ্কার করেন। অতঃপর তিনি বাগদাদ যান। তথাকার আহাল-আল-হক'গণ তাঁর জ্ঞান ও সাধনা-মহিমায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হেজাজ ও সিরিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিন্দাপীর হিসেবে মোবারকবাদ জানান। বাগদাদ থেকে মক্কা শরিফ গিয়ে তিনি সাত বছর অবস্থান করেন। সেখানে একটি কবিতার ভাবের ছুতো ধরে এক শ্রেণীর আত্মস্বার্থকেন্দ্রিক আলেম তাঁকে হেনস্তা করতে উঠে-পড়ে লাগেন। এভাবে এই সৎচিত্ত জ্ঞানী মানুষটাকে কেবল স্বীয় প্রজ্ঞা, যোগ্যতা ও প্রতিভার কারণে 'আপনা মাংসে হরিণা বৈরী'র মতো দুঃসহ পরিস্থিতিতে জীবন কাটাতে হয়। পরবর্তীতে তাঁর 'ইত্তেহাত' বা সর্বধরআল্লাহ্বাদ তত্ত্ব (panentheism) এবং হুলুল (anthromorphism) তত্ত্বের জন্য একদিকে 'আল কামুস' প্রণেতা মুজ্দুদ উদ্দীন, জালাল উদ্দিন সয়ুতী, আবদুর রাজ্জাক আল-কাশানী, আবদুল ওহাব শারানী, আল্লামা জামাল উদ্দিন, ইবনে কামাল বাশা, ইবনুল জওযী, সাহাবউদ্দিন সুহরাওয়ার্দীর মতো কুরআন-হাদিস-ধর্মবেত্তা মণীষাবৃন্দ তাঁকে ওলী, সুফি, সিদ্দিক, হাকায়েক (সত্যতার সমুদ্র) হিসেবে গ্রহণ করেছেন, তেমনি অন্যদিকে ইবনে তাইমিয়া, আল-তাফতাযানী ও ইব্রাহিম আল-বিকায় প্রমুখ দার্শনিকরা তাঁর উপর 'কুফরীর' ইলজাম লাগিয়েছেন।

ইবনুল আরাবী (র.) ১২১৪ খৃ. মক্কা ত্যাগ করে আলেপ্পোয় যান। সেখানকার খৃস্টান শাসক তাঁকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন এবং বসবাসের জন্য একটি প্রাসাদ দেন। কিন্তু তিনি ছিলেন বিষয়-সম্পত্তির প্রতি নিস্পৃহ। ভক্ত-মুরীদদের প্রদত্ত নজরানা তিনি দু'হাতে দুঃখীদের মাঝে বিলিয়ে দিতেন। একদিন এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে ভিক্ষাপ্রার্থী হলে নগদ অর্থ না থাকায় তিনি 'আস্ত প্রাসাদটা' তাকে দান করে বের হয়ে পড়েন এবং মসুলসহ বিভিন্ন স্থান সফর করে দামেস্ক এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। দামেস্কের কাজী-উল-কুয্জাত তাঁকে খাদেমের মতোই সেবা করতেন। মালেকী মজহাবের প্রধান কাজী তাঁর ভক্তে পরিণত হন এবং নিজের এক মেয়ের সাথে তাঁর বিয়ে দেন। হাজার হাজার মানুষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তিনি 'সিদ্দিক' নামে অভিহিত হন। অবশ্য কিছু সংখ্যক বিরোধীও ছিল, যারা 'যিন্দিক' বলে তাঁর কুৎসা রটাতো। শেষ জীবন তিনি সেখানেই অতিবাহিত করেন এবং বহু দার্শনিক ও সাধনমার্গীয় গ্রন্থ রচনা করেন। ইন্তিকালের পাঁচ বছর পূর্বে (১২৩৫ খ্রি.) তিনি নিজেই তাঁর রচিত ২৮৯টি গ্রন্থের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন। এর পরেও তিনি রচনা অব্যাহত রাখেন। তাঁর ১৫০টি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি এখনো বিদ্যমান। দর্শনের বাঙ্গালী অধ্যাপক সায়েদুর রহমানের In.roduction to Islamic Philosoply-গ্রন্থে[২] তাঁর রচিত গ্রন্থ সংখ্যা পাঁচ শতাধিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

তাঁর সাধনা, নিষ্ঠা, কৃচ্ছ্রতা, বিদ্যাবত্তা ও রুহানী উরুজের জন্য তিনি 'শায়খুল আকবর', 'হুজ্জাতুল্লাহিল যাহিরা' (আল্লাহ্র প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য) এবং 'আয়াতুল্লাহিল বাহিরা' (আল্লাহ্র আশ্চর্য নিদর্শন) খেতাবে ভূষিত হন। ১২৪০ খ্রি., ৬৩৮ হিজরী, ২৮ রবিউস সানী, শুক্রবার তিনি জান্নাতবাসী হন। হাসিয়ুন পাহাড়ের পাদদেশে আল-কিবরিত আল-আহমর নামক স্থানে তাঁর মাজার বিদ্যমান।

৩. তাঁর সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ পরিচিতিঃ

তাঁর অমূল্য গ্রন্থাবলীতে চূড়ান্ত মানবের জাগতিক ও ঐশী মাহাত্ম্য বিশ্লেষিত হয়েছে। মানুষই আল্লাহ্র গুণাবলীর পরিপূর্ণতার প্রতিভূ এবং সে জন্যই সে তাঁর প্রতিনিধি ও প্রতিবিম্ব। আদি প্রজ্ঞা বা নূরে-ইলাহী (Logos) জগতের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। জগৎ বিশ্লেষণাত্মকভাবে এবং মানুষ সংশ্লেষণাত্মকভাবে এটার প্রকাশ ঘটাচ্ছে। এর মাধ্যমে স্রষ্টা আত্মসচেতন। এই আত্মসচেতনতা পূর্ণাঙ্গভাবে পরিপূর্ণ মানব হযরত মোহাম্মদ (দ.)-এ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং তাঁর মধ্যেই জগৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করেছে। আল্লাহ্ এই ইনসানে-কামেলের [হযরত মোহাম্মদ (দ.)] মাধ্যমেই নিজেকে পরিপূর্ণভাবে জানছেন। আদি প্রজ্ঞার আধার 'নূরে মোহাম্মদী' এবং এটাই পরম সত্তার প্রথম প্রকাশ। তাঁর রচনাবলী এখনো মুসলিম জাহানসহ সমগ্র বিশ্বের দর্শন চর্চা, তাসাওউফ চর্চা, মানবতাবাদ চর্চা, ইসলামের

মৌলিক বিষয়াদি চর্চার রসদের যোগান দেয়। ইউরোপসহ পাশ্চাত্য-প্রাচ্যে এগুলোর প্রভাব এখনো অসীম এবং শুধু দর্শন ও তাসাওউফ ক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য ক্ষেত্রেও সমানে প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। ইটালীয় মহাকবি দান্তের ডিভাইনিয়া কমেডিয়া (Divinia Comedia) তার চমৎকার দৃষ্টান্ত।

হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) রচিত পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে প্রধান কয়েকটা হলো:

(ক) আল-ফুতুহাত আল্-মক্কীয়া (মক্কার প্রত্যাদেশ: Meccan Revelation): এটি তাঁর শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। মক্কায় অবস্থানকালে তিনি এ গ্রন্থ রচনায় রুহানীভাবে প্রত্যাদিষ্ট হন বলে দাবী করেন এবং বলতেন, 'আমি যদি ফুতুহাত না লিখতাম তাহলে আগুন হয়ে পুড়ে যেতাম। এই পুস্তকে শাশ্বত সত্যবাণী ছাড়া আর কিছু নেই। তাঁর বর্ণনা মতে, মক্কায় অবস্থান করার সময় তিনি নবীজীকে (দ.) ফেরেশ্তা, নবী, আউলিয়া সমভিব্যহারে আলমে-মামুরে তখ্তে আসীন অবস্থায় দেখেন এবং তাঁর দ্বারা ইলাহী রহস্য উদ্ঘাটনপূর্বক তত্ত্বকথা লিখতে আদিষ্ট হন। অন্য কোন এক সময়ে কাবা শরিফ তাওয়াফ করার সময় এক নূরানী চেহারার যুবককেও তাঁর সাথে তাওয়াফে দেখেন, যিনি তাঁকে অন্তহীন শাশ্বত আল্লাহ্র নূরানী আরশ দেখান। যার পর্দা সাধারণ চর্মচক্ষু ভেদ করতে পারে না, নশ্বর চোখ যে আলো সহ্য করতে পারে না, সেই বিমল জ্যোতিঃপ্রভা দেখে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়েন এবং হুঁশ ফিরে পাবার পর তিনি রুহানী আদেশ পান যে, তিনি যা প্রত্যক্ষ করেছেন, তা যেন বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করেন।

পাশ্চাত্য-প্রাচ্যে গভীর নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসা সহকারে পঠিত ও আলোচিত এই গ্রন্থে আল্লাহ্, মানুষ, নবুয়ত, রেসালত, ওহী, সৃষ্টি-রহস্য, রোজ কিয়ামত, পাপ-পুণ্য, বেহেশ্ত-দোজখ, পুরস্কার-শাস্তি, কুরআনের উৎপত্তি, লাওহে-মাহফুজ, আরশ-কলম, আদমের পয়দা প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। এছাড়া রয়েছে শরীয়ত, ইলমুল কালাম প্রভৃতি সম্পর্কে নবতর দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত আলোচনা। এই গ্রন্থ পাঁচশো আটটি অধ্যায়ে চারটা সুবৃহৎ খণ্ডে রচিত। উল্লেখ্য, আল-কুরআনে বিবৃত নবীদের বিবরণে মানব সভ্যতার ধারাবাহিক ক্রমপ্রগতিশীল বিবর্তনের তথ্য বিধৃত, যা নবী-রসূল তথা মানবিক প্রয়াস, সংগ্রাম এবং প্রকৃতির সাথে দ্বন্দ্ব ও মিতালীর সংমিশ্রণের ফসল। পর্যায়ক্রমে রসূল প্রেরণের কথা সূরা বাক্বারার ২:৮৭ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) ফুসুস আল-হিকাম (Bezels of Philosophy):

এটি তাঁর দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। এটিকে বাংলায় 'জ্ঞান/দর্শন কোষ' বলা যায়। পাশ্চাত্যে এই বইটা Wisdom of the Prophets (নবীদের প্রজ্ঞা) নামে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদিত। কুরআনে বর্ণিত ২৭ জন নবীর নাম শীর্ষক ২৭টি অধ্যায়ে রচিত এই পুস্তক প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দর্শন, জ্ঞান-সাধনা ও তাসাওউফের ভুবনে এখনো সমভাবে প্রভাব

বিস্তার করে চলেছে। কুরআনের বয়ানের সূত্রের উপর ভিত্তি করে নবীদের প্রজ্ঞার বিশ্লেষণে অন্তহীন জ্ঞানের নিযুত রশ্মিজাল এ গ্রন্থে বিধৃত। ইংরেজী, ফরাসী, তুর্কী, ফার্সী ভাষায় এর অনুবাদ এবং আরবীসহ বিভিন্ন ভাষায় প্রচুর ভাষ্য রচিত হয়েছে। এই পুস্তক রুহানী ভাবধারার চরম উৎকর্ষ এবং শরিয়তের নিয়মবদ্ধ পায়রবীর এক অপূর্ব সংমিশ্রণ।

(গ) কুরআনের তফসীরঃ

হযরত ইবনুল আরাবী (র.) কুরআনের তফসীরও রচনা করেন। এর মধ্যে সাধারণ লোকদের জন্য ১৫ দফতরে পনেরো পারার তফসীর এবং তাসাওউফপন্থীদের জন্য আট দফতরে একখানি তফসীর রচনা করেন।

অতএব, হযরত ইবনুল আরাবী (র.) যুগপৎ শরিয়তি ও মারেফতি জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার হিসেবে বিরাজ করছেন। **তাঁর দর্শন ও রুহানী প্রজ্ঞা ও অনুসন্ধিৎসা এতোই সূক্ষ্ম, বহু-বিস্তারী ও প্রবল যে, তা গড়পড়তা মানুষের পক্ষে ধারণ করা সাধ্যাতীত। তাই তিনি শরিয়তি বিধি-বিধান পালনের উপর জোর দিয়ে গেছেন। দার্শনিক আল-মাকারীর মতে "তিনি ধর্মমতে জাহেরী এবং ধর্মবিশ্বাসে বাতেনী ছিলেন।"** তাঁর শিক্ষার সারমর্ম হলোঃ মানুষের উৎকর্ষের স্তর চারটিঃ ঈমান, বেলায়ত, নবুয়ত ও রিসালাত। এগুলোর একমাত্র ভিত্তি তাওহীদ।

(ঘ) ইবনুল আরাবীর দর্শন পরিচিতি এবং ওয়াহদাতুল ওজুদঃ

আগেই বলা হয়েছে, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতাকে (mystic) দার্শনিক কাঠামোতে স্থাপনের ক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ। তিনি ক্বলব বা হৃদয়, অধিবিদ্যা, এক ও বহু, কার্যকারণ তত্ত্ব, পরম সত্তা নির্ণায়ন, আদিপ্রজ্ঞা, ফানা ও বাকা, স্বপ্নতত্ত্ব, প্রভৃতি নিগূঢ় দার্শনিক ও ইন্দ্রিয়বোধাতীত বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, **ক্বলব বা হৃদয় (soul)** আধ্যাত্মিক জ্ঞানের উপায়। দেহের মাধ্যমে সক্রিয় হলেও ক্বলবই মানুষের জ্ঞানের ভিত্তি; অর্থাৎ মানুষই আধার এবং মানুষই মানদণ্ড। অধিবিদ্যা (metaphysics/ontology) সম্পর্কে তাঁর অভিমতঃ পরম সত্তা বা হক্ব (essence) সব অস্তিত্বের মূল। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের সব সত্তা মূলতঃ এক অভিন্ন সত্তা, সর্বজনীন দ্রব্য বা খোদা। তবে দার্শনিক ফিকটে (১৭৬২-১৮১৪ খ্রি.) এই অভিন্ন সত্তাস্বরূপ গড্‌কে দ্রব্য বলতে রাজী নন। তাঁর মতে, এই সম্বোধনে গডের অসীমত্বের হানি ঘটে।

অবশ্য এসব দার্শনিক মতভিন্নতায় প্রকট হয়ে উঠে যে, 'আল্লাহ্' শব্দের মোড়কে আল-কুরআনে যেই ধারণাতীত মহাসত্তাকে বুঝাতে চাওয়া হয়েছে, তা দর্শন-বিজ্ঞানের কাছে যেমন ধারণার অতীত, তেমনি প্রকাশেরও অতীত এবং তা বুঝানোর মতো বিশেষ্য-বিশেষণ নির্বিশেষে কোন যথার্থ শব্দ কোথাও মওজুদ নেই।

এক ও বহু বা হক্ব ও খাল্‌ক সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ: পরম সত্তা দুটো দৃষ্টিকোণ থেকে দৃশ্যমান। অধিবিদ্যায় পরম সত্তা অদ্বিতীয় হলেও জ্ঞানবিদ্যায় (epistomology) এর রয়েছে দুটো দিক – এক ও বহু। এক-এর মধ্যে সব বা বহু জমাটবদ্ধ। আবার বহু পরস্পর ভিন্ন, এক থেকেও ভিন্ন। একই সাথে বহু পরস্পর অভিন্ন এবং একের সঙ্গেও অভিন্ন। প্রথমটা পার্থক্যের দিক, দ্বিতীয়টা অভিন্নতার দিক। অর্থাৎ শেষ ফল=আহাদ বা এক। জড় বস্তুকে তিনি আধ্যাত্মিকতায় মণ্ডিত করেছেন। এটাই **'ওয়াহ্‌দাতুল ওজুদ'** দর্শনের ভিত্তিভূমি। এই তত্ত্ব গাণিতিক ও নৈয়ায়িক (Logical) প্রক্রিয়ায় দেখানো হয়েছে (প্রথম অধ্যায়ের ৭ম অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

তাসাওউফ দর্শন: তাঁর পূর্বে তাসাওউফ কৃচ্ছ্রতাপূর্ণ ধর্মীয় সাধনা-মাত্র হিসেবে বিবেচিত হতো। তাঁর প্রজ্ঞা ও সাধনা বলে তা সুসংহত চিন্তা ও দর্শনে উন্নীত হয়। তিনি যুগপৎ সুফি ও দার্শনিক। ওয়াহদাতুল অজুদ বা সর্বধরআল্লাহ্‌বাদ (panentheism) তাঁর দর্শনের প্রধান সুর।

কার্যকারণ তত্ত্ব: তাঁর মতে কুল্‌-মাখলুকাত আল্লাহ্‌র স্বতঃস্ফূর্ত অথচ অপরিহার্য আত্মবিকাশ প্রক্রিয়ার ফসল। কার্য ও কারণ (cause and effect) পরম সত্তার আত্মবিকাশের অন্তহীন প্রক্রিয়ার দুটো দিক মাত্র। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ আদি কারণ এবং মাখলুকাত তাঁর কর্ম-প্রকাশ। স্রষ্টা ও সৃষ্টি পূর্বাপর নয়। উভয়ই চিরন্তন। কোন বিশেষ মুহূর্তে জগৎ বা মাখলুকাত সৃষ্টি হয়নি। এটা আল্লাহ্‌র বাহ্য অভিব্যক্তি (menifestation)। তিনি যেমন অন্তহীন-চিরস্থায়ী বা হাইয়ুল কাইয়ুম, তেমনি তাঁর বাহ্য বিকাশ হিসাবে জগৎ বা মাখলুকাতও অন্তহীন এবং চিরস্থায়ী। **"এই জগত ও পরজগত সৃষ্টির নব নব প্রক্রিয়ার স্বতন্ত্র নাম। যে মুহূর্তে একটি রূপ বিলীন হচ্ছে, সে মুহূর্তে অন্য একটি রূপের আবির্ভাব ঘটছে। সৃষ্টি বস্তু-ধর্মে নিহিত রয়েছে এবং বস্তু নিজ ইচ্ছানুসারেই ব্যক্ত হয়। আল্লাহ্‌ বস্তুর মধ্যে শুধু 'হবার ইচ্ছা' জাগ্রত করেন। বস্তু নিজ গুণে ইচ্ছাবিশিষ্ট হয়।" এসব তত্ত্বের প্রভাব আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনে দৃশ্যমান।**

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, **জড়বস্তুকে তিনি আধ্যাত্মিকতায়** মণ্ডিত করেছেন। তাঁর নিকট সমগ্র বিশ্বজগৎ একটি সার্বিক 'আত্মা; মানব মনের চেয়ে উন্নততর ঐক্যের নির্দেশক। কাজেই সাধারণভাবে স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নেই। 'গুণ' যেমন দ্রব্যের মধ্যে নিহিত আছে, তেমনিভাবে 'বহুও' 'এক'-এর মধ্যে বিলীন হয়ে আছে। আবার খাদ্য যেমন দেহের সঙ্গে মিশে আছে, তেমনিভাবে 'এক' 'বহুতে' অন্তর্লীন হয়ে আছে। এক পরম 'আধ্যাত্মিক দ্রব্য' 'বহুতে' মিশে আছে এবং বহুকে নিয়ন্ত্রণ করছে। তাঁর মতে এ জীবন ব্যতীত আমাদের অন্য কোন জীবন নেই। ভাবী জীবন বলে কিছু নেই। আমরা 'এক'-এর মধ্যেই বাঁচি এবং মৃত্যুর পরও সেই 'এক' এর ঋেণরেই অবস্থান করবো।[৩] ইবনুল আরাবীর (র.) 'অধ্যাত্ম দ্রব্য' তত্ত্বে পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট

আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুব তত্ত্ব বা Cosmological Constant-এর ছটা দৃশ্যমান। তাছাড়া আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞানের 'vitalized physics' এবং 'an almost spiritualized matter' এর স্পর্শও অনুভব করা যায়।[৪]

তবে পরজীবন বা ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণার পাশাপাশি ঊনবিংশ/ বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্যের প্রথম শ্রেণীর কয়েকজন দার্শনিকের অনুকূল উপলব্ধি অবলোকনের দাবী রাখে। এসব দার্শনিকদের মধ্যে রয়েছেন, ড. স্টিফেন, (Dr. Stephen : Problem of Metaphysics); মার্টিনিউ (Dr. Martineau: Study of Religion) প্রমুখ। তাঁরা মৃত্যু-পরবর্তী জীবন ও চিরন্তনতা (future life and eternity) সম্পর্কে মানুষ ও প্রকৃতিতে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন বস্তুগত ও অবস্তুগত উপাদান বিশ্লেষণ করে আত্মা অথবা অহংকে (soul or self) প্রকৃতির নিষ্ক্রিয় সৃষ্টি অথবা অংশের পরিবর্তে বরং ব্যাপকার্থে প্রকৃতির ঊর্ধ্বের (above) বিষয় হিসেবে জ্ঞান করেন। এ ক্ষেত্রে আক্বলের প্রকৃতি (nature of in.ellect) ও মানুষের অন্তর্জাত নৈতিক সংগঠনের প্রকৃতি (nature of moral constitution বা revelation of conscience) বিশ্লেষণ করে এসব দার্শনিক অভিমত প্রকাশ করেন যে, আমাদের মানসিক শক্তিগুলো–বুদ্ধিবৃত্তিক বা আক্বল, আবেগ ও নৈতিক প্রকৃতি বিশ্বাস করতে বাধ্য করে যে, পার্থিব এই জীবনের সীমার বাইরেও আত্মা বা রুহের (soul) অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকে। এ প্রসঙ্গে আল-কুরআনে বর্ণিত 'ইয়াউমিদ্দিন' বা হাশর/বিচার দিবসের অমোঘ নিশ্চয়তার বিষয়টি অনুধাবনীয়। এসব দার্শনিকের যুক্তির সারবস্তু হলো: মানুষের অন্তর্গত নৈতিক প্রকৃতি, তার মধ্যে বিরাজমান নূরী উপাদানই (divine element) অমরতা দাবী করে। লক্ষ্যণীয়; শীর্ষ কাতারের প্রাচ্য-পাশ্চাত্য দার্শনিক টমাস একুইনাস, রেনে দেকার্ত, লাইবনিয, ফ্লিন্ট, জর্জ গ্যালোয়, হেগেল, সেন্ট এনজেলেস, ইম্যানুয়েল কান্ট, বার্কলী, হিউম, পেলী হিক, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী, ড. গোবিন্দ চন্দ্র দেব, এ এস প্রিঙ্গল, প্যাটিসন, ম্যাক গ্রেগর, এমনকি প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, এ্যারিস্টটল, মধ্যযুগীয় স্টোয়িক দার্শনিকদের চিন্তা ও সাধনা **'সৃষ্টির পশ্চাতে একজন মহাস্রষ্টার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলশ্রুতির তত্ত্বের'** (teleology) বৃত্তভুক্ত হয়ে আস্তিক্যবাদকে সৃষ্টিগত বা প্রাকৃতিক সত্যের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

তবে আকর্ষণীয় বিষয় এই যে, এসব মহান দার্শনিক পরস্পরের যুক্তি ও সিদ্ধান্তের আলোচনা-সমালোচনায় ব্যাপৃত হয়ে মানবিক জ্ঞানকে যেমন এগিয়ে নিয়েছেন, তেমনি নিজেদেরকে অভিন্ন উদ্দিষ্টের অভিযাত্রী হিসেবেই স্থাপন করেছেন। তাঁদের এই স্রষ্টা-সাধনার সাথে আল-কুরআনের যুক্তিপূর্ণ অভিব্যক্তিগুলো যোগ করা গেলে **'এক অখণ্ড মৌলিক মহাসৃজনের'** নিশ্চিত অস্তিত্ব সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা কিম্বা

যথার্থতা অনুভব করা সহজতর হয়। আল-কুরআনের শিক্ষা ও সত্যের অভিব্যক্তি আর আধুনিক দর্শনের অর্জনকে অকারণ ব্যবধানে না রেখে সমন্বিত অন্বেষার সদাসচল বাহন হিসেবে কি ব্যবহার করা যায় না? বেলায়তের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সে সব কিছু আত্মস্থ করতে চায়। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তও একটি গতিশীল জ্ঞান চর্চা ও আচরণ প্রক্রিয়া হিসেবে এর ব্যতিক্রম নয়।

সত্তা ও অবভাস (immanence and transcendence), ওয়াহদাতুল ওজুদ: তিনি সত্তা ও অবভাসের মধ্যে কোন তফাত দেখেন না। তিনি আল্লাহ্‌র অন্তর্ব্যাপিতা (immanence) এবং অতিবর্তিতা (transcendence) দুটোই স্বীকার করেন। তবে, তাঁর মতে শুধু বিভেদক গুণাবলীর (সিফত) মধ্যে দ্বৈত আছে।

অতিবর্তী আল্লাহ্‌বাদ বা দ্বিত্ববাদ (deism): তাঁর মতে আল্লাহ্‌র সাথে জগতের সম্পর্ক বাহ্যিক। জগৎ সৃষ্টির পূর্বে তাঁর একক রূপ এবং সৃষ্টির পর জগতের নিয়ন্ত্রণভার সৃষ্টবস্তুর গুণাবলীর উপর অর্পণপূর্বক নিরপেক্ষ অবস্থানগত রূপ।

অন্তর্বর্তী আল্লাহ্‌বাদ বা সর্বধরআল্লাহ্‌বাদ (Panentheism: Pan-all, en-in, Theos-God): তাঁর মতে স্রষ্টা সব কিছুর মধ্যে ব্যাপ্ত। এটাই ওয়াহদাতুল ওজুদ। তিনি সীমাতীত। তাঁর সত্তা অনিঃশেষ। আল্লাহ্‌র এই অতিবর্তী সত্তা প্রজ্ঞার মাধ্যমে অবগত হওয়া যায় না। সুফি-ভাবতন্ময়তা বা মোরাকাবা, মোশাহেদা, মোকাইয়াদা, হাল, ফানা, বাকার মাধ্যমে এই নিত্যতার (eternity) উপলব্ধি অর্জিত হয়। **তবে সাধক তাঁর এই পরম ও চরম অভিজ্ঞতা সাধারণকে অবহিত করতে পারেন না। শুধু নিজেই এর মর্ম উপলব্ধি করতে সক্ষম।** হযরত ইবনুল আরাবী (র.) এই উপলব্ধিকে 'ওয়াহদাতুল ওজুদ নামীয়' দার্শনিক তত্ত্বে কাঠামোবদ্ধ করে দর্শনের জগতে বিপুল স্থান জুড়ে বিরাজ করছেন।

আদিপ্রজ্ঞা তত্ত্ব বা কালিমাত (doctorine of logos) এবং নবীজী (দ.)[৫]: এই কালিমাত বা লোগোস আল্লাহ্‌র অন্তর্বর্তিতা বা ওয়াহদাতুল ওজুদ বা panentheism-এর প্রজ্ঞাময় নীতি। ইবনুল আরাবীর মতে, এটা পরম সত্তার প্রথম প্রকাশ, যা 'নূরে মোহাম্মদী' বলে অভিহিত। আল্লাহ্‌র জাত বা সত্তার তিন স্তর : **১.** আহাদিয়াত: এ স্তরে তিনি আপনাতেই বিদ্যমান এবং অতি সূক্ষাতিসূক্ষ্ম দরিয়া, যা atom বা পরমাণুর চেয়েও সূক্ষ্ম। **২. ওয়াহদাত:** এই স্তরে তিনি তাঁর ইরাদা বা ইচ্ছা বা ইশ্‌ক থেকে নূর-ই-মুহাম্মদী সৃষ্টি করেন; **৩. ওয়াহদিয়াত:** এ স্তরে তিনি নূর-ই মুহাম্মদী থেকে সব কিছুর বিকাশ ঘটান, অর্থাৎ নূর-ই-মুহাম্মদীকে কুল-মখলুক সৃষ্টির মাধ্যমে 'আহমদ'-রূপে প্রকাশ করেন।

আদিপ্রজ্ঞা তত্ত্বের কাঠামো এই যে, ক. হযরত মুহাম্মদ (দ.) এই সিলসিলার প্রধান ও বাস্তব জ্ঞানের উৎস। বাতেনী ও জাহেরী জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সত্তাই কার্যকর নীতি।

তাঁর সত্তাই আদি প্রজ্ঞা বা logos– প্রাথমিক বুদ্ধিময় নীতি (first in.ellect), আর-রুহ্ (বা আল-আক্বল আল-আউয়াল) এবং সব নবী-রসূল ও ওলী আল্লাহ্দের মাধ্যমে এই প্রজ্ঞার পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। সব নবী-রসূলই প্রজ্ঞা (wisdom)। কিন্তু আদিপ্রজ্ঞা হযরত মুহাম্মদের (দ.) জন্য রক্ষিত। অন্যান্য নবী-রসূল ও হযরত মুহাম্মদের (দ.) মধ্যে পার্থক্য এই যে, **অন্যান্যরা পৃথক পৃথকভাবে যে প্রজ্ঞার অধিকারী, হযরত মুহাম্মদ (দ.) এককভাবে সকল প্রজ্ঞা ও গুণের সমাহার বা সমন্বিত রূপ। আরাবীর (র.) এই সূত্রের আলোকে নবীজীকে (দ.) অধ্যয়নের চেষ্টা করলে এই প্রতীতি জন্মে যে, তাঁর পূর্বের সকল নবী-রসূল, বা পরের সিদ্ধ পুরুষ, দার্শনিক, রাষ্ট্রবেত্তা, সমাজ বিজ্ঞানীদের নিজ নিজ প্রতিভা ও সাধনার যে সারবস্তু খণ্ডিতভাবে মানব সমাজের জ্ঞানের টেবিলে পরিবেশিত হয়েছে ও হচ্ছে; সেগুলো নবীজীর (দ.) সত্তার মধ্যে সুসমন্বিতভাবে বিন্যস্ত হয়ে আছে এবং ভবিষ্যতের দিকে চলমান সকল জ্ঞান ও বিকাশ যেন তাঁর পূর্ণাঙ্গতার মহাসাগরে মিশে গিয়ে পরিপূর্ণতার মূল্যবান অংশ হিসেবে ঠাঁই করে নিচ্ছে। নবীজীর (দ.) জীবন ও চিন্তা-সাধনাকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের মানমন্দিরে পর্যবেক্ষণ করলে এই বাস্তবতাই চোখের সামনে উপস্থিত হয়।**

খ. আদি প্রজ্ঞা বা আল-আক্বল্ আল্-আউয়াল বা logos পূর্ণাঙ্গ। মাখলুকাতের অবয়বে ও মধ্যে তা পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। মাখলুকাত বিশ্লেষণাত্মক (analytically) ও মানুষ সংশ্লেষণাত্মক বা সমন্বয়মূলকভাবে (synthetically) এর প্রকাশ ঘটাচ্ছে এবং এই প্রক্রিয়ায় প্রকাশ পায় আল্লাহ্র আত্মসচেতনতা (consciousness) যা পূর্ণাঙ্গ মানব বা ইনসান-ই-কামিল হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এ-সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে। তাঁর (নবীজীর) মধ্যেই মাখলুকাত সৃজনের উদ্দেশ্য সার্থকতা লাভ করছে এবং তাঁর মাধ্যমেই আল্লাহ্ পরিপূর্ণভাবে নিজেকে প্রকাশ করছেন। পরম সত্তা ও আদি কারণের (causua sue) প্রথম প্রকাশ হলো আদি প্রজ্ঞা।

গ. সৃষ্টির মধ্যে ইনসানে কামেলের (হযরত মুহাম্মদ দ.) স্থান সকলের ঊর্ধ্বে। তিনি আদি প্রজ্ঞা। ঐশী বা রুহানী জগৎ এবং বস্তুজগৎ বা আমল-ই-নাসুতের [রূহ জামাদী বা অজৈব ধাতু আত্মা তথা আলম-ই-আজসাম বা বস্তু+আলম-ই-ইনসান বা মানব জগৎ] মধ্যবর্তী চিরন্তন ও দৃশ্যমান জগতের মধ্যবর্তী সব বস্তুতে তাঁর সত্তা বা নূর সমভাবে বিদ্যমান।

আদি প্রজ্ঞার মরমী (mystic) ক্ষেত্রে হযরত মুহাম্মদ (দ.) সিলসিলার প্রধান ও মারিফাত জ্ঞানের উৎস বলে বিবেচিত। রুহানী ও বাতেনী জ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁর সত্তাই কার্যকর। অতএব, নবীজীর (দ.) সত্তাই আদিপ্রজ্ঞা বা প্রাথমিক বুদ্ধিময় নীতি (আল্-আক্বল আল-আউয়াল) এবং সকল নবী-রসূল ও ওলী-আল্লাহ্দের মাধ্যমে তার বহমান

অভিব্যক্তি। সব রসূলই প্রজ্ঞা; কিন্তু তা সেই আদি প্রজ্ঞা নয়, যা নবীজীর (দ.) জন্য সংরক্ষিত। অন্যান্য রসূল ও হযরত মুহাম্মদের (দ.) মধ্যে পার্থক্য এই যে, **অন্যান্য সকলে স্বতন্ত্রভাবে যেসব গুণের অধিকারী, হযরত মুহাম্মদ (দ.) এককভাবে সব গুণের সমন্বিত রূপ।** আল-কুরআনে হযরত ঈসার (আ.) ক্ষেত্রে 'কলেমা' বা প্রজ্ঞা শব্দটা ব্যবহার করা হয়েছে। সব রসূলের মধ্যে অভিন্ন সার্বিক নীতি (প্রজ্ঞা) সক্রিয়, যা গোটা মাখলুকাতের প্রজ্ঞাময় বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। **এই নীতি অনুসারেই হযরত আদম (আ.) থেকে সকল নবী রসূল এবং ওলী-আল্লাহ্‌দের নিকট মারিফাত বা আধ্যাত্মিক জ্ঞান সঞ্চারিত।**

অতএব, ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, অছিয়ে গাউসুল আযম যথার্থই বিশ্বাস করেন যে, "মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.) মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্বমানবতার প্রতীক"। [বেলায়তে মোত্‌লাকা দশম অধ্যায়]

কুল-মাখলুকাতে অনন্য মহিমায় দীপ্ত হযরত মুহাম্মদের (দ.) নূর বা আদি প্রজ্ঞার তিনটা বৈশিষ্ট্য: ক. এটা আল্লাহ্‌র অন্তর্বর্তিতার অর্থাৎ immanence (ওয়াহদাতুল ওজুদ)-এর বহিঃপ্রকাশ, খ. এটা পার্থিব নীতি এবং সৃষ্টির কারণ, এটা পাক্-রুহের সাথে অভিন্ন বা একীভূত এবং আল্লাহ্‌র সৃজনশীলক্রিয়া, গ. পরিপূর্ণ মানবতা (ইনসান-ই-কামিল)। যে বস্তু যতো বেশী খোদায়ী বা ঐশী গুণাবলী (সিফত) ব্যক্ত করবে বা ব্যক্ত করতে পারবে, সে বস্তু তত পূর্ণতার অধিকারী। পরম সত্তা (জাত/essence) হলেন আল্লাহ্ এবং আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হলেন পরিপূর্ণ মানব (ইনসান-ই-কামিল)। তিনি আদি প্রজ্ঞার তিনটা দিক উল্লেখ করেছেন: ১. পরাবৈজ্ঞানিক (metaphysical) দৃষ্টিকোণ থেকে এই আদি প্রজ্ঞা সত্তার সত্তা (জাত এর জাত্ বা reality of realities), ২. আধ্যাত্মিক (mystic) দৃষ্টিকোণ থেকে, তা হযরত মুহাম্মদের (দ.) সত্তা বা জাত এবং ৩. মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে আদি প্রজ্ঞা হলেন ইনসান-ই-কামিল বা পরিপূর্ণ মানব (Perfect Man)।

ইবনুল আরাবী (র.) সম্ভাব্য বা অব্যক্ত প্রজ্ঞা (reason বা logos), সত্তার সত্তা (জাত এর জাত্ বা reality of realities), এবং ইন্‌সান-ই-কামিলের মধ্যে পরিদৃষ্ট ব্যক্ত প্রজ্ঞার মধ্যে তফাত নিরূপণ করেছেন। শাশ্বত প্রজ্ঞার যে নীতি প্রত্যেক কিছুতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে, তা হলো ঐশী চেতনা (divine consciousness, sub-consciousness)। হযরত মুহম্মদের (দ.) সত্তা (জাত) সব কিছুতে সমভাবে বিরাজমান নয়। তবে মানুষের মধ্যে এই সত্তা-গুণ এতো উচ্চ মাত্রায় বিকশিত যে, সে আল্লাহ্‌র 'খলিফা' (প্রতিনিধি) এবং 'প্রতিবিম্ব' হবার দাবীদার এবং সে ক্ষুদে বিশ্ব (microcosm) অথবা এমন এক আয়না, যার মধ্যে সকল কামালিয়াত (পূর্ণতা)

এবং আল্লাহ্‌র সকল সিফত অথবা এমনকি খোদ আল্লাহ্‌র প্রতিবিম্বায়ন ঘটে। তাঁর উপলব্ধি **"আল্লাহ্ নিজেকে মানুষের চোখ দিয়ে দেখেন"**।

ইবনুল আরাবীর (র.) দর্শনে মানুষ, তার মর্যাদা ও শক্তি: 'সমগ্র বিশ্বজগৎ' আল্লাহ্‌র অভিব্যক্তি বিধায় তা 'বৃহৎ মানুষ' (Great Man) হিসেবে অভিহিত। অতএব; 'ইনসান-ই-কামিল' নিজেরই মধ্যে বিশ্ব জগতে ব্যক্ত সব কিছু সমষ্টিগতভাবে ধারণ করেন। তিনি বিশ্ব জগতের চেতনা (spirit)-এর 'কারণ' 'ক্ষেত্র', 'অবস্থা' এবং 'গতি'। অবশ্য, এই মানুষ স্রেফ প্রাণী-মানুষ নয়; তিনি প্রজ্ঞাদীপ্ত (rational) মানুষ। সকল নবী-রসূল এবং ওলী-আল্লাহ্‌রা এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

জগতের প্রত্যেক কিছু নিজ নিজ সক্ষমতা অনুযায়ী শাশ্বত আক্বল বা বুদ্ধির প্রকাশ ঘটাচ্ছে। **এমনকি নিষ্প্রাণ বা জড়বস্তুগুলিও নিজেদের লুক্কায়িত প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটাচ্ছে, যেহেতু তারা নিজেদের অভ্যন্তরীণ আইন মেনে চলে। সমগ্র বিশ্ব জগতের নিম্নতম খনিজ থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ শ্রেণীর মানুষ পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যে বুদ্ধিমত্ত কাঠামো পরিলক্ষিত।** মানুষ তার অনন্য ও অতুল প্রকৃতির কারণে সর্বোচ্চ অবস্থানে স্থিত। ইবনুল আরাবী (র.) বলেন, "যারা আল্লাহ্‌কে পূর্ণাঙ্গরূপে অনুধ্যান করতে জানেন, তাঁরা ছাড়া অন্য কেউ কুল-মখলুকে মানুষের মহিমা ও অবস্থান সম্পর্কে অবহিত নয়। **মানুষই একমাত্র প্রাণী যার শক্তির মধ্যে আল্লাহ্‌কে পরিপূর্ণভাবে জানবার সম্ভাবনা নিহিত। বস্তুতঃ মানুষের মধ্য দিয়ে আল্লাহ্ নিজেকে জানেন, কারণ, মানুষই আল্লাহ্‌র ব্যক্ত সচেতনতা"**। তিনি বলেন, "অন্যান্য সত্তাগুলোও আল্লাহ্‌কে জানে, তবে তাদের জ্ঞান মানুষের তুলনায় অসম্পূর্ণ ও অপূর্ণাঙ্গ। কেবল মানুষই তার নিজের মধ্যে আল্লাহ্‌র সকল সিফত বা গুণাবলী সমষ্টিগতভাবে ধারণ করে। এমনকি, আল্লাহ্ সম্পর্কে ফেরেশ্‌তাদের জ্ঞানও অপূর্ণাঙ্গ। কারণ, তাঁরা আল্লাহ্‌কে অতীন্দ্রিয়-অতিপ্রাকৃত সত্তা (transcendental) হিসেবে জানেন, দৃশ্যমান (phenomena) ভুবনের সাথে যার কোন সম্পর্ক নেই। কেবল মাত্র মানুষই আল্লাহ্‌কে যুগপৎ অন্তর্ব্যাপী ও অতিবর্তী হিসেবে জানে। কারণ, **মানুষ এক দিকে যেমন বস্তু উপাদানে গঠিত বলে সব কিছুর সাথে সংশ্লিষ্ট, তেমনি অন্য দিকে রুহের অধিকারী হওয়ায় বিশ্বজগতের সব কিছুর ঊর্ধে সমাসীন।** ইনসান-ই-কামিল হযরত মুহম্মদ (দ.)-এর 'হৃদয়' (ক্বলব) আদি প্রজ্ঞার আসন এবং এতেই আদি প্রজ্ঞার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ। ইনসান-ই-কামিলই পরম সত্তা আল্লাহ্‌র সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্কে সংযুক্ত এবং তাঁর মাধ্যমেই 'সামগ্রিক ও বিশেষের' ঐক্যের সূত্র গ্রথিত হয়। ইনসান-ই-কামিল-এর কামালিয়াত বা পূর্ণতার কারণ এই যে, তিনি আল্লাহ্‌র পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ এবং তিনি অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাথে তাঁর অভিন্নত্ব উপলব্ধি করতে পারেন। এটাই সাধারণ মানুষ এবং পরিপূর্ণ মানবের মধ্যকার ভেদ-রেখা। সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষুদ্র পরিসরে বিশ্ব জগৎ

প্রতিবিম্বিত হলেও তা শুধু 'সম্ভাবনার' আধার হিসেবে সীমিত থাকে, আর পূর্ণ মানবের মধ্যে তা বাস্তবিক অর্থে প্রতিফলিত হয়। তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র সংস্করণ। কারণ, তাঁকে উপলক্ষ্য করে আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ বিকাশ উদ্ভাসিত, তাঁরা আল্লাহ্‌র গুণে গুণান্বিত অর্থাৎ 'রব্বানী' হয়ে যান (৩:৭৯) এবং তাঁদের এই উপলব্ধি আল্লাহ্‌রই পরিপূর্ণতার প্রতিচ্ছায়া। অতএব, প্রত্যেক পরিপূর্ণ মানব বা ইনসানে কামিল অবশ্যই একজন সুফি (mystic)। কারণ, কেবলমাত্র তাসাওউফের পথের পথিকদেরই শুধু এই উপলব্ধি লাভ হতে পারে।

প্রকৃত সুফি ইনসান-ই-কামিলের রুহানী ওয়ারিশঃ মানুষের মর্যাদাকে কোন প্রকারেই অবমূল্যায়ন করা যাবে না। সে আল্লাহ্‌র সেরা সৃষ্টি এবং সর্বাপেক্ষা সম্মানিত জীব। আল্লাহ্‌ বিশ্ব ও প্রকৃতির সব কিছুকে মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছেন। মানুষের জন্য পৃথিবীর সব কিছু কেবল সৃষ্টি করা হয় নি, উপরন্তু এগুলো রক্ষণাবেক্ষণের বা পালনের দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছে। যতোদিন পূর্ণাঙ্গ-মানব বিশ্বে থাকবেন, ততোদিন বিশ্ব সচল থাকবে। বিশ্বনীতি (cosmic principle) হিসেবেও পূর্ণাঙ্গ মানব এই জগতের রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন করছেন। কাজেই পূর্ণাঙ্গ-মানব সৃজনশীলতা ও বিচার-বুদ্ধিমত্তার নীতি তথা আদিপ্রজ্ঞার সাথে অভিন্ন।

ইবনুল আরাবীর (র.) মতে, সুফি-সাধকরা সর্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন 'সুফি শিরোমনি' হযরত মুহাম্মদের (দ.) রুহানী ওয়ারিশ। 'প্রথম' থেকে 'অন্ত' পর্যন্ত প্রত্যেক আউলিয়া নিজের দিশারী আলো পেয়ে থাকেন মুহাম্মদ (দ.) অর্থাৎ নূর-ই মুহাম্মদী থেকে। তবে তিনি মনে করতেন যে, শুধু পবিত্রতা কিম্বা খোদাপরস্তির জন্য নয়, 'জ্ঞান'-ই সুফির স্বাতন্ত্র্য নির্ণায়ক, যে জ্ঞানের সাহায্যে তিনি আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক আদায় করতে পারেন।

যে সব মানুষ আল্লাহ্‌র সাথে তাঁদের অপরিহার্য একাত্মতা অনুভব করেন, তাঁরাই আউলিয়া। সব প্রেরিত পুরুষ নবী-রসূল আউলিয়া গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আউলিয়াত্ব সকল মারেফাতি পদমর্যাদা বিন্যাসের ভিত্তি। আউলিয়া এবং নবী-রাসূলের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নবী-রসূলদের উপর আল্লাহ্‌র কোন বাণী প্রকাশ-প্রচারের দায়িত্ব অর্পিত হয় এবং তাঁরা অদৃশ্য জগতের অনুপম জ্ঞানসম্পন্ন। প্রত্যেক আউলিয়াই আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি, তবে প্রকৃত প্রতিনিধি বা খলিফা হলেন হযরত মুহাম্মদের (দ.) আত্মা, যা সকল আউলিয়ার মধ্যে চির-প্রকাশমান। সকল নবী-রসূল এবং আউলিয়া এক ও অভিন্ন গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত। কারণ, তাঁরা সবই একক অভিন্ন নীতি অর্থাৎ নূর-ই মুহাম্মদীর অভিব্যক্তি। তাই, হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত মুহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত প্রেরিত সকল নবীর ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন যুগে মানবজাতির চাহিদা ও প্রয়োজন অনুসারে 'একমাত্র বিশ্বজনীন ধর্ম-ইসলাম'-এর সমকালীন ইহজাগতিক অভিব্যক্তি ব্যতীত অন্য কিছু

নয়[৬]। 'নবুয়ত' খতম হওয়ায় সুফিরা সার্বজনীন অভিন্ন প্রতিনিধিত্বের আধার 'নূর-ই-মুহাম্মদী' থেকে 'ঐশী নূর' গ্রহণ করতে পারেন। কাজেই সুফিরাও প্রত্যাদেশ বা ইলহাম লাভ করতে পারেন। তবে তা কেবল তাঁর নিজের পথ চলার জন্যই। কোন সুফির 'কাশ্‌ফ' (in.uition) এবং 'ওহীর' (revelation) কোন দ্বন্দ্ব বা ফারাক প্রতিভাত হলে সে স্থলে 'ওহী'কেই প্রাধান্য দিতে হবে।

সকল নবী ও আউলিয়া নূর-ই-মুহাম্মদী বা আদি প্রজ্ঞার অভিব্যক্তি। মোহরে আউলিয়া (Seal of the Sain.s) অসংখ্য অভিব্যক্তির মধ্যে একটি মাত্র অভিব্যক্তি। 'তাঁর' সাথে অপরাপর আউলিয়া ও নবীর পার্থক্য এই যে, **'তাঁর'** এবং কেবল **'তাঁর'** মধ্যেই নূর-ই-মুহাম্মদী পরিপূর্ণভাবে ব্যক্ত। তিনিই এই আদি প্রজ্ঞানীতির (Rational Principle) প্রকৃষ্টতম রুহানী বা আধ্যাত্মিক ওয়ারিশ এবং অধ্যাত্মলতিকার (spiritual hierachy) সর্বশেষ সদস্য–যাঁর মধ্যে নূর-ই-মুহাম্মদীর গুপ্তসূত্র (esoteric doctorine) সরাসরি প্রবিষ্ট।[৭]

আত্মা (ক্বলব): বাংলা 'আত্মা' শব্দটার অর্থ ও তাৎপর্য প্রাণী দেহে ব্যাপৃত চৈতন্যময় সত্তা, প্রাণ, জীবাত্মা, নফ্‌স, স্বভাব, হৃদয়, পরমাত্মা, রুহ্ [বাংলা একাডেমী বাংলা অভিধান]। দর্শন ও তাসাওউফের বিভিন্ন অন্তর্লীন ব্যঞ্জনা বুঝাতে বাংলায় সাধারণতঃ এ শব্দটা ব্যবহৃত হয়। তবে এতে উদ্দিষ্ট বিষয় অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্ট হয় না। অবশ্য আল-কুরআন ও ইসলামী দর্শন এক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিষয়কে যথাসাধ্য নির্দিষ্টভাবে বোধগম্য করতে পৃথক পরিভাষা সৃষ্টি করেছে। এগুলো হলো : রুহ্ (spirit, আত্মা), নফস্, (soul, psyche, সরহফ আত্মা, মন), ক্বলব (heart, হৃদয়, আত্মা)।

'রুহ্' কে আল-কুরআনে বর্ণনা করা হয়েছে "আল্লাহ্‌র আদেশ" (আমর)। এছাড়া তাসাওউফ দর্শনে 'রুহ্' শব্দটি মানুষের ব্যক্তিগত স্বভাব ফিত্‌রতের চেয়ে উন্নতর 'আক্বল' বা বুদ্ধিবৃত্তিক ভঙ্গী অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

'নফ্‌স' দ্বারা বুঝানো হয় জৈবিক খায়েস, যার ব্যক্তিগত চাহিদার সীমানা কেবল বাড়ন্ত।

'ক্বলব' (হৃদয়) হচ্ছে 'নফ্‌সের' (soul) কেন্দ্রীয় যন্ত্র বা অঙ্গের প্রতীক স্বরূপ, যা দৈহিক গঠন কাঠামোর অপরিহার্য কেন্দ্রের অনুরূপ। নফস্ হচ্ছে সমতল ভূমি, যাতে ক্বলব এমন এক বিন্দু, যেখানে রুহ্ সঞ্চারিত হয় খাড়াভাবে।

ইবনুল আরাবীর (র.) মতে ক্বলবই জ্ঞানের ভিত্তি। দেহের মাধ্যমে সক্রিয় এই ক্বলবই রুহানী জ্ঞানের উপায়। এটা আদি প্রজ্ঞার অংশ ও অন্তরচক্ষু। প্রজ্ঞাময় আত্মাই বিশুদ্ধ আত্মা।

স্বপ্নতত্ত্ব: ইবনুল আরাবীর (র.) স্বপ্নতত্ত্বও আগ্রহোদ্দীপক। ক্বলবই আধ্যাত্মিক জগতের কুঞ্জী। জজ্‌বা বা প্রেরণা ক্বলব থেকেই উৎসারিত হয় এবং প্রকৃত সুফিদের নিকট অনেক সময় তা স্বপ্নের আকারে উপস্থিত হয়। তবে সুফিদের স্বপ্নের ধরণ আলাদা। স্বপ্ন হচ্ছে ঘুম ও জাগরণের মাঝামাঝি অবস্থা। কল্পনা স্বপ্ন ও জাগরণ উভয় অবস্থাতেই সক্রিয়। বাস্তব জীবনের ঘটনা নিদ্রার মধ্যে ক্বলবের চক্ষুতে প্রতিফলিত হয়ে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। তাঁর মতে সুফির হৃদয় একখানি আর্শি। পরম সত্তার প্রকাশের সব স্তরই সুফির হৃদয়ে বিম্বিত হয়।

ফানা ও বাকা: তাসাওউফের শেষ কথা হলো, আল্লাহ্‌র সাথে মিলন এবং এটাই সুফির জীবনের চরম লক্ষ্য। এই মিলন 'নেতিবাচক ও অস্তিবাচক–' যথাক্রমে ফানা ও বাকা। এ দুটো পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। ফানা অর্জন করতে **ক.** ফানা ফিন নাফস্ বা ফানা ফিল ওজুদ বা যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি, দৈহিক, জাগতিক বাসনার বিনাশ, **খ.** ফানা ফিশ্ শায়েখ বা সুফি সাধক পীরের নিকট সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ, **গ.** ফানা ফির-রসূল বা আপন অস্তিত্বকে নূর-ই-মুহাম্মদীতে বিলীন করা, **ঘ.** ফানা ফিল্লাহ্ বা ব্যক্তিগত চৈতন্যকে আল্লাহ্‌র মোরাকাবা ও ইশ্‌কে সমাহিতকরণ–এই চারটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। ইবনুল আরাবীর মতে, ফানায় সুফি ব্যক্তিগত সত্তা থেকে দূরীভূত হন না। স্বতন্ত্র সত্তা হিসেবে নিজের অস্তিত্বহীনতা অনুভব করেন। পরাবৈজ্ঞানিক দিকের বিবেচনায় ফানা হলো পরিদৃশ্যমান জগতের বিভিন্ন রূপ থেকে অন্তর্হিত হয়ে 'সার্বিক দ্রব্য' (universal essence) হিসেবে স্থায়ী হওয়া এবং এই স্থিতিই হলো বাকা। সহজ কথায় 'ফানা' হলো জাগতিক নাছুতী মানবিক সত্তার বিনাশ এবং বাকা হলো বিশুদ্ধ মানব-রূপকে আল্লাহ্‌তে বিলীন করে 'স্থিতি' লাভ। অন্য কথায় সসীম-আত্মা অসীম-জাতের অসীমত্ব লাভ করে। ফানার স্তর নঞর্থক বা negative এবং বাকা সদর্থক বা positive। হযরত শাহ বু-আলী কলন্দরের (র.) ভাষায়:

তা-তুয়ী ইয়ারে গরদাদ ইয়ারে তু,
চুঁ নাবাশী ইয়ারে বাশদ ইয়ারে তু ॥

[বঙ্গানুবাদ: যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার তুমিত্ব জীবিত থাকবে, ততক্ষণ তুমি মাশুককে (আল্লাহ্) পাবে না, যখন তোমার তুমিত্ব থাকবে না, তখনই তোমার আল্লাহ্‌প্রাপ্তি ঘটবে]।

বেহেশ্‌ত-দোজখ ঃ সুখ ও শাস্তি তত্ত্ব:

হযরত ইবনুল আরাবীর বেহেশ্‌ত-দোজখের ধারণা গতানুগতিক ধারণা থেকে আলাদা। তাঁর মতে, মানুষের নৈতিক স্বাধীনতা নেই বলে বেহেশ্‌ত-দোজখের বণ্টনের ব্যাপারটি উঠে না। বেহেশ্‌ত হলো 'বহু'র অনুপস্থিতি, ঐশী সাধারণ গুণের একীভূত সমাবেশ। দোজখ হলো: 'দূরত্ব বা ব্যবধান'। "মানুষ ও খোদার মধ্যে প্রকৃত ব্যবধান

বিদ্যমান এবং তাঁর (খোদা) সাথে অপরিহার্য ঐক্য উপলব্ধির অক্ষমতা–এই কল্পনাই হলো দোজখ।" দোজখে শাস্তি হবে প্রপঞ্চময় (phenomenal), যদিও অবিশ্বাসীর কাছে তা প্রকৃত বলে প্রতীয়মান হবে। দোজখ হলো 'আমিত্বের দাসত্ব, আর বেহেশ্‌ত হলো 'স্বীয় অস্তিত্বের ঐশী সত্তা উপলব্ধির স্থান (the realisation of one's Lordship i.e. of the Divine aspect of his being)'। বেহেশ্‌ত ও দোজখের মধ্যে খুব বেশী পার্থক্য নেই। কারণ, কোন মানুষ চিরকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করবে না। অনুগ্রহপ্রাপ্ত ও অভিশপ্তদের মধ্যে তফাত এই যে, অনুগৃহীত ব্যক্তি অনায়াসে খোদার দীদার লাভ করবে। তবে অভিশপ্তদের এতে বিলম্ব ঘটবে। তাঁর মতে, আমাদের এই দুনিয়াবী জীবন ব্যতীত অন্য কোন জীবন নেই। 'ভাবী জীবন' বলে কিছু নেই। আমরা এখন 'আহাদ' বা এক-এর (the One) মধ্যে বাঁচি এবং পার্থিব জীবনের অবসানের পরেও সেই আহাদ বা একের মধ্যে অবস্থান করবো। এই 'শাশ্বত যাতে' (Eternal Essence) – যেখান থেকে আমাদের আগমন – প্রত্যাবর্তনের পরেও আমরা রহমত অথবা রুহানী ধরনের যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করবো। পুণ্যবান ও দুষ্ট উভয়েই সুখের অভিজ্ঞতা লাভ করবে, তবে এতে তজল্লীর (মাত্রা) তফাত থাকবে। বেহেশ্‌ত্, দোজখ এবং আখেরাতের জীবন সম্পর্কে হযরত আরাবীর (র.) এই মতবাদ অনন্য। "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন (the One whence all things come is the one to which they will return)। তবে তাদের প্রত্যাবর্তনের পর আল্লাহ্‌র ফিত্‌রাত সম্পর্কে তাদের জ্ঞান এবং তাঁর সাথে তাদের সম্পর্কের অনুপাত অনুযায়ী বিভিন্ন মাত্রার সুখ অনুভব করবে। তিনি কাশ্‌ফের (gnosis) উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যার সাথে মজবুত ঈমান যুক্ত হয়ে বেহেশ্‌ত প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। অন্য পক্ষে অজ্ঞানতা ও অবিশ্বাস দোজখের পথে ঠেলে দেবে। আমরা যখন ঐ 'আহাদ' বা এক-এর কাছে পৌঁছবো, তখন আমাদের বিশ্বাসের সত্যতা ও অসত্যতা উপলব্ধি করতে পারবো এবং ঐসব বিশ্বাসের প্রকৃতি অনুযায়ী "তাঁর" সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান নির্ণীত হবে। কেবল তত্ত্ব জ্ঞানীরাই (gnostics) দ্রুত 'তাঁর' সাথে সম্পর্কিত হবেন এবং এটাই বেহেশ্‌তে সর্বোচ্চ 'সুখ'। দোজখে 'অজ্ঞতা ও কপটতার' দণ্ড হবে, যা 'সত্য সম্পর্কিত জ্ঞান' উদ্ভাসিত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। কেবল এবং কেবল তারপরই 'আল্লাহ্‌র সর্বজনীন করুণায় সকলেই সিক্ত হবে এবং সব কিছুর উপর প্রাধান্যতায় বিরাজ করবে'।

লক্ষ্যণীয়, তাঁর এই সূত্রের সম্প্রসারণ হিসেবে তিনি তাঁর 'ওয়াহদাতুল ওজুদ' বা সর্বধরআল্লাহ্‌বাদের থিওরীকে দাঁড় করিয়েছেন, যার উপর মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত বা বেলায়তে মোত্‌লাকার খুঁটি স্থাপন করেছেন অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী

(ক.)। অবশ্য দৃশ্যতঃ তাঁর মূল ও একক অবলম্বন বিশুদ্ধ তৌহিদ এবং 'মানব চরিত্রের সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ভরযোগ্য বিশ্ব মানবতার প্রতীক' হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দ.)। হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) মতে, সকল পথই সোজা একই দিকে এগোয়, যা খোদা অভিমুখী। স্থূল মূর্তিপূজা থেকে শুরু করে সর্বাধিক বিমূর্ত (abstract) ধর্মীয় দর্শন যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 'সবই খোদায় বিশ্বাস' সম্পর্কীয়। বিভিন্ন পার্থক্য সত্ত্বেও সকল ধর্ম ও বিশ্বাস 'এক বিশ্বজনীন ধর্ম' (universal religion) বৈ কিছু নয়। বহু ঈশ্বরবাদ ও তৌহিদের মধ্যে ফারাকটা 'এক' এবং 'বহুর' মধ্যে পার্থক্যের মতো নৈয়ায়িক (logical)। বহু ঈশ্বরবাদীরা যাকে পূজা করে, তা একটি 'আকার' (form) এবং ঈশ্বরের একটি 'দিক' (aspect)। প্রকৃত প্রস্তাবে তা 'ঈশ্বর' ব্যতীত অন্য কিছুর উপাসনা নয়। 'মূর্তি' ও প্রতীকগুলো দ্বারা যদি ঈশ্বরের 'আকার' বুঝানো হয় এবং বহু ঈশ্বরবাদীরা উপলব্ধি করে যে, এসব মূর্তি ও প্রতীক তাদের অন্তরালের 'বাস্তবতার' (reality) অভিব্যক্তি, তাহলে 'বহু ঈশ্বরবাদকে' নাকচ করে দেওয়া যায় না। তারা এগুলোর পূজা করে এই ভেবে যে, এই মূর্তিগুলো তাদেরকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী করে। [টীকা ২,৩-এর ইবনুল আরাবী অধ্যায় দ্রঃ]।

তবে দর্শন ও বিজ্ঞানের ধারাবাহিক অগ্রযাত্রায় এই ধারণা 'স্রষ্টার অসীমত্ব ও ধারণাতীততার' নিরেট বাস্তবতার সাথে সাংঘর্ষিক বিবেচিত বিধায় নৈয়ায়িক ও সমীক্ষণবাদী বিচারে গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তাই বহু ঈশ্বরবাদ একটি নির্বিচারবাদী (dogmatic) থিওরীতে পর্যবসিত।

মানুষ ও তার কাজের স্বাধীনতাঃ

ইবনুল আরাবীর চিন্তা-পদ্ধতিতে 'গঠনমূলক অর্থে' ব্যক্তি-স্বাধীনতা অস্বীকৃত। তাঁর মতে, মানুষ নিজেই তার কাজ ও পরিণতির জন্য দায়ী। অবশ্য তা এ কারণে নয় যে, নৈতিক অর্থে সে স্বাধীন ঘটক (agent) অর্থাৎ সে কোন বাহ্যিক কিম্বা অভ্যন্তরীণ নির্ধারক হেতুর প্রভাবমুক্তভাবে নিজেই নিজের ইচ্ছায় কাজ করতে সক্ষম। তাঁর মতে, একমাত্র এই অর্থেই মানুষ স্বয়ং দায়ী যে, তার কাজ সরাসরি তার নিজ থেকেই উৎসারিত এবং সেগুলো তার নিজের ফিত্‌রাত বা স্বভাব ও সেই স্বভাব-অনুশাসনকারী নিয়মাবলী দ্বারা স্থিরীকৃত। মানুষের স্বভাবের নিয়ম এতোই অপরিবর্তনীয় যে, প্রত্যেক কিছু পূর্ব নির্ধারিত। বাহির থেকে ব্যক্তির উপর যে বাধ্যবাধকতা অর্থাৎ 'জবর' চেপে দেওয়া হয়; তা তিনি (আরাবী) স্বীকার করেন না; অথচ একই সাথে মানুষের নিজস্ব স্বাধীন কোন পছন্দের শক্তিতেও তিনি বিশ্বাস করেন না। মানুষের সামনে একটিই মাত্র বিকল্প এবং এই বিকল্পকেই তাদেরকে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, **তা তাদের নিজস্ব প্রয়োজনীয় আইন দ্বারা নির্ধারিত**। মানুষ এমনভাবে গঠিত যে, আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন, প্রকৃত পক্ষে সে তা-ই করে। সম্ভাব্য সকল বিকল্প পথ থেকে সে ঐ পথটাই

বেছে নেয়; যা আল্লাহ্ ইচ্ছা করেন। তাঁর মতে, শেষ কথা হলো কবির ভাষায় : আখের ওয়াহী হোতা হ্যয় যো মঞ্জুরে খোদা হোতা হ্যয়'। বস্তুতপক্ষে, অতি সীমিত শক্তিসম্পন্ন অসহায় মানুষের জন্য এই উপসংহার ব্যতীত আর কিইবা আছে! এই মানদণ্ডে তাঁকে বেঠিকও বলা যায় না। এখানে অবশ্য তকদীর, teleology, cosmological constant প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক বিষয়াদিও সামনে এসে হাজির হয়। সৃষ্টি ও জ্ঞান কতোই অসীম ও রহস্যময় কুল কিনারাহীন!!

ভালো ও মন্দ:

হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) মতে, যাত (Real/পরম সত্তা)-এর বলয়ে ভালো-মন্দের বাদ-প্রতিবাদের কোন প্রয়োগ নেই। এই বলয় নিরঙ্কুশ ভালোর (Absolute Good) বলয়। পরিদৃশ্যমান জগতে ভালো ও মন্দ দু'টোই বিরাজমান। সকল ভালো বা কল্যাণের উৎস আল্লাহ্। মন্দের দায় মানুষের উপর আরোপিত, তবে তা এই অর্থে নয় যে, মানুষ প্রকৃত প্রস্তাবে মন্দ সৃষ্টি করে; বরং তা এ জন্যেই যে, মানুষের কোন কোন কাজ মন্দ বলে বিবেচিত হয়। **মানুষ মূল্যবোধ ও আইন বা নিয়মের (values and laws) জগতে বাস করে।** কাজেই মন্দ ইতিবাচক বা উপকারী কোন গুণ নয়। নির্ভেজাল মন্দ নির্ভেজাল অনস্তিত্ব ও অন্ধকারেরই অনুরূপ। অন্যপক্ষে বিশুদ্ধ ভালো বা কল্যাণ বিশুদ্ধ জাত বা সত্তা ও নূর বা আলো।

জ্ঞান তত্ত্ব:

হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) মতে তিন ধরণের নিশ্চয়তামূলক জ্ঞান রয়েছে: **১.** প্রত্যক্ষণজাত নিশ্চয়তামূলক জ্ঞান (all perceptual judgments), **২.** কতিপয় বুদ্ধিগত জ্ঞান; যথা, অবরোহ অর্থাৎ বিশেষ সত্য থেকে সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া, বিশুদ্ধ গণিত এবং প্রথাগত যুক্তিবিদ্যাসম্মত স্বতঃস্পষ্ট সূত্রাবলী (some in.ellectual judgments such as a priori, self-evident propositions of Pure Mathematics and Formal Logic), **৩.** সকল কাশ্ফগত অবধারণ (all in.uitive judgements)। তিনি কাশ্ফগত জ্ঞানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যা বস্তুকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখার প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বুদ্ধিবলে অর্জিত অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিপরীত। এটা তাৎক্ষণিক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; 'ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিমূর্ত রুহানী উপলব্ধির হাল'– 'বোধ' বা 'অবধারণ' (cognition) নয়। কাজেই এটা কাশ্ফ ঋদ্ধ, অন্তর্দৃষ্টিসঞ্জাত বা তাৎক্ষণিক সত্যপ্রত্যক্ষণ–, যা অনুধ্যানমূলকচিন্তার (reflective thinking) বিপরীতধর্মী।

কাশ্‌ফ বা বাতেনী জ্ঞানের (in.uitive or esotoric knowledge) বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে :

১. বাতেনী জ্ঞান সহজাত, বুদ্ধিগত জ্ঞান অর্জিত। বাতেনী জ্ঞান ক্বলবের গভীরতম কন্দরে সুপ্ত অবস্থায় বিরাজ করে এবং কতিপয় মোরাকাবা অর্থাৎ মনের পরিপূর্ণ সমাহিত বে-খোদ অবস্থায় ব্যক্ত হয়।

২. বাতেনী জ্ঞান যুক্তি-বিচারের (reason) ঊর্ধ্বে। কাশ্‌ফগত সত্য যুক্তি-বিচারের মানদণ্ডে বিচার্য নয়;

৩. বাতেনী জ্ঞান "নূর" বা আলোর আকারে ব্যক্ত হয় এবং কেবল উন্নত স্তরের মারফতি এলমে জ্ঞানী কতিপয় ব্যক্তির মধ্যে নিজের রূপায়ণ ঘটায়।

ইবনুল আরাবীর দর্শনে সৃষ্টিলোকের উপর মানুষের কর্তৃত্বের ক্ষমতার উৎস:[৮]

আল্লাহ্‌র সব সিফাত বা গুণ মানুষের মধ্যেই বিকশিত এবং সেই শক্তিতেই সে সৃষ্টলোকের উপর কর্তৃত্ব করে। আল্লাহ্‌ মানুষের জন্যই ফেরেশ্‌তাদেরকে ভর্ৎসনা করেছিলেন; কারণ, তাঁরা মানুষের মূল্য জানতেন না। তিনি আদি-অন্তবিহীন, আমাদের মাধ্যমেই তিনি আউয়াল, তিনি আখের, আমরা তাঁর নিকট থেকে এসেছি, তাই তিনি আদি। আবার আমরা তাঁর মধ্যেই ফিরে যাবে, তাই তিনি অন্ত। তাঁর আকুতি:

তুমিই মানুষ, তুমিই আল্লাহ্‌
তাহলে তুমি কার সৃষ্টি?
তুমি আল্লাহ্‌, তুমি মানুষ
তাহলে তুমি কারে ডাকছো?

সৃষ্টি তার নিজের জন্য যাকে সৃষ্টি করেছে, সে-ই তো কল্পিত আল্লাহ্‌! যেমনটা হযরত জুনায়ের বাগদাদী (র.) বলেছেন পাত্রের রঙই পানির রঙ!

আরাবী (র.) এক কবিতায় বলেছেন: আল্লাহ্‌র দিদার বা দর্শন অশরীরি অবস্থায় সম্ভব নয় এবং 'নারী রূপে' আল্লাহ্‌র বিকাশই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ [টীকা ৮, ইবনুল আরাবী অধ্যায়]।

ব্যতিক্রমী এই সুফি দার্শনিকের তৌহিদী "অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্ম সূত্র" অশেষ। তিনি বলেন, নবুয়ত রোজ-কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। 'কেতাব দেওয়া' নবুয়তের একটা বিশিষ্ট কার্য মাত্র। এটি অসম্ভব যে, আল্লাহ্‌র সংবাদ ও সৃষ্টিলোকের জন্য তাঁর চিন্তা-ভাবনা শেষ হয়ে যাবে! যদি তা বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সৃষ্টিলোক বেঁচে থাকবার শক্তি বা আহার পাবে না। দুনিয়াবী রিসালাত বন্ধ হয়েছে সত্যি। কারণ, রসূল (দ.) সেকথা বলে গেছেন। কিন্তু তাঁর কাজ চলছে এই দুনিয়ায় ও পর-দুনিয়ায়। এর ব্যতিক্রম হবার যো নেই। যদি তা হতো, তাহলে ওহীর মালিক ও রসূল (দ.) অন্যের প্রত্যাদেশ ও

অন্তর্দৃষ্টির কথা বলতেন না। মৌমাছিটা রোজ-কিয়ামত পর্যন্ত তার বাসা ও মধুর জন্য প্রত্যাদেশ পাবেই (১৬: ৬৮-৬৯)। নবীজী (দ.) বলেছেন: নবুয়ত ও রিসালাত বন্ধ হয়ে গেলো। তবে তার অর্থ এই নয় যে, 'নবী ও রসূল' পদবীগুলো শেষ হয়ে গেলো। কিন্তু মুবাশ্‌শিরিন বা সংবাদদাতা ও মুজতাহিদীন বা ব্যবস্থাদাতার আগমন শেষ হয়নি। প্রত্যেক মুজতাহিদের কেতাব আছে– শাফেয়ী কোডে যা নিষিদ্ধ, হানাফী কোডে তা প্রচলিত; আবু হানিফা যা নিষেধ করেছেন, আহমদ ইবনে হাম্বল তা অনুমোদন করেছেন। তাঁরা নানা বিষয়ে অভিন্ন অভিমত দিয়েছেন। নানা বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। তবু আমরা জানি, তাঁরা কেউ নবী-রসূল ছিলেন না।

সুফি মতের একনিষ্ঠ অনুসারী ইবনুল আরাবী (র.) সকল ধর্মেই আল্লাহ্‌র সন্ধান করতেন, সকল ফুলেই মধু খুঁজে বেড়াতেন। তিনি বলেন, "আল্লাহ্ মানুষকে নিজের সিফাতে সৃষ্টি করেছেন; অতএব, মানুষ ব্যতীত আর কেউ আল্লাহ্‌র রহস্য উদ্‌ঘাটনে সমর্থ নয়। অতএব, কেউ যদি আল্লাহ্‌র সৃষ্টিকে অকারণে ধ্বংস করতে চায়, তাহলে সে নিজেকেই নির্যাতন করে।"

তাঁর মতে প্রেমই হলো আল্লাহ্‌র বন্দেগীর শ্রেষ্ঠ উপায়। আল্লাহ্‌র প্রেমে সিক্ত হয়ে শাশ্বত মানব তথা সৃষ্টি-প্রেমের সাগরে বিলীন ইবনুল আরাবী (র.) নিবেদন করেন:

"হৃদয় আমার সবার লাগিয়া সকল সুরত ধরে
সুফির লাগি বিজন-বাস, দেউল ঠাকুর তরে।
চারণভূমি হরিণ কুলের, ভক্তজনের কাবা ঘর,
তাওরাত সে, কুরআন সে, নয় সে কারও পর।
প্রেমই আমার ধর্ম জেনো–যাক্ না যেথায় খুশী
কাফেলা তাঁর প্রেমের পূজায় সদাই তাঁদের তুষি।"

(বঙ্গানুবাদ : আবদুল মওদুদ)

তবে তাঁর শেষ কথা: মানুষের উৎকর্ষের স্তর চারটি– ক. ঈমান, খ. বেলায়ত, গ. নবুয়ত ও ঘ. রিসালাত। সব কিছুর উপরে তিনি স্থাপন করেছেন, নবীজীর (দ.) শরিয়তকে। দার্শনিক আল-মাকারী বলেন; ধর্মমতে তিনি জাহেরী বা আনুষ্ঠানিক ও আচারনিষ্ঠ এবং ঈমানে বা ধর্মবিশ্বাসে তিনি বাতেনী বা অজ্ঞেয়বাদী। অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন শরিয়তের দিকে। মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তাই নিতান্তই বাস্তবোচিতভাবে বিংশ শতাব্দীতেও তাঁকে তাত্ত্বিক-দার্শনিক-এমনকি অনুশীলনের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে এবং তাঁর খনি থেকে জ্ঞানের হীরক মালা আহরণ করে সমকালে আলো বিতরণ করছে।

আয়ান-আস-সাবিতা বা সৃষ্টির বীজরূপী সত্তা তত্ত্ব এবং আরাবীর চিন্তাচক্রঃ

আল-কুরআনে আল্লাহ্‌র ১৩৩টি সিফত বা গুণবাচক নামের উল্লেখ রয়েছে। এসব নাম স্রেফ কল্পিত ধারণা বা abstract idea নয়, বরং পৃথিবী তথা মহাজগতে সতত ক্রিয়াশীল বস্তুনিষ্ঠ ও কর্মনিষ্ঠ গুণবাচক বা (objective attributes)। হযরত ইবনুল আরাবী (র.) আল-কুরআনে বর্ণিত ২৭ জন নবীর প্রজ্ঞা বিশ্লেষণমূলক গ্রন্থ 'ফুসুসুল হিকাম' (wisdom of the prophets) রচনার পাশাপাশি আল্লাহ্‌র কর্মনিষ্ঠ গুণবাচক নামগুলোরও দর্শনসমৃদ্ধ বিশ্লেষণ প্রদান করে দর্শনের সাগরে নতুন চরের পত্তন করেছেন। এই নামসমূহ থেকে তিনি 'সংশ্লিষ্ট আয়াতের প্রেক্ষাপটে ও ভিত্তিতে' সূক্ষ্ম ও অন্তর্ব্যাপী (immanent) মর্মার্থের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। অখণ্ডনীয় যুক্তি সহকারে তিনি আল্লাহ্‌র সিফাতগুলো খোদ আল্লাহ্‌র 'হাজারাত' বা উপস্থিতির প্রকাশ বলে ব্যক্ত করেছেন। আবার কখনো বেখোদ বা তন্ময় অবস্থানও বুঝিয়েছেন। তিনি সিফতগুলোর দুটো দিকের প্রতি নির্দেশ করেছেন: ক. অন্তর্বর্তী (immanent), খ. অতিবর্তী (external teleology)। আল্লাহ্ নামের অন্তবর্তী দিক হলো, পরম সত্তা জগতে প্রকাশিত এবং জগতের অভ্যন্তরে থেকেই জগতকে উদ্দেশ্য পানে এগিয়ে নিচ্ছেন; এই উদ্দেশ্যটা জগৎ বা প্রকৃতিতে একান্তভাবে অন্তঃস্থিত। অতিবর্তী বা বাহ্য উদ্দেশ্যবাদ হলো, "জগতের বিবর্তন ক্রিয়ার উদ্দেশ্যের আধার বা শক্তি জগতের 'বাইরে' অবস্থিত"। বাহ্য উদ্দেশ্যবাদ তত্ত্ব অনুসারে পরম সত্তা জগতকে স্বীয় উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা অনুযায়ী সৃষ্টি করার পর তন্মধ্যে কিছু শক্তি সঞ্চার করেন এবং তাদেরই উপর জগৎ পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে অদৃশ্য থেকে নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে কোন অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে তিনি প্রয়োজন মতো হস্তক্ষেপ করেন। এভাবে তিনি তাঁর **'আয়ান আস-সাবিতা'** বা 'সৃষ্টির বীজ রূপ সত্তা' তত্ত্বের বুনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ তত্ত্বে আরাবী (র.) বলেন, আল্লাহ্‌র বিভিন্ন নাম 'সুপ্ত' আকারে বাহ্যিক বা প্রকাশিত বিশ্ব ব্যতীত অন্য কিছু নয় এবং 'আয়ান' বা সৃষ্টির বীজ রূপে সেগুলো সক্রিয়। সাদামাটা ভাষায় বলা যায়, হযরত ইবনুল আরাবী (র.) আল্লাহ্‌র সিফাতকে 'সৃষ্টির কারণ' বা উৎস বলে বর্ণনা করেছেন। ঐসব সিফাতে নিহিত আছে শক্তি। জাত বা ঐশী সত্তার সিফত হিসেবে সেগুলো দৃশ্যমান জগতে প্রকাশ পায়। এসব সিফত মহাবিশ্বের সৃষ্টিধর্মী ক্রিয়ার রসায়ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এসব সিফত আদর্শ বা মডেল সত্তা। মৌলিক কিম্বা যৌগিক প্রত্যেক সৃষ্টির বাস্তবতা ও বৈশিষ্ট্য এক একটা ঐশী সিফত। সহজতরভাবে বলা যায়, **পরিদৃশ্যমান জগৎ আল্লাহ্‌র সিফতেরই বস্তুগত রূপায়ণ, যা আল্লাহ্‌র বর্ণনা ব্যক্ত করে**।

হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) এই অন্তর্বর্তী ও অতিবর্তী দার্শনিক উপস্থাপনাকে অনেকে তাঁর 'চিন্তা-চক্র' হিসেবেও মূল্যায়ন করেছেন। আল্লাহ্‌র নাম-তত্ত্ব তাঁর মিস্টিক

অভিজ্ঞতা বা কাশ্‌ফ সাধারণ দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ওয়াহদাতুল ওজুদ দর্শনের প্রায় পুরো অংশ জুড়ে আছে। তাঁর ফানা বা আত্ম বিনাশন ও বিলোপন তত্ত্ব (self-annihilation and self-absorption) অন্যান্য দার্শনিকদের বিশ্লেষণ থেকে ব্যাপক ও বিচিত্র বিভিন্নতায় সমৃদ্ধ। তাঁর মতে ফানার দুটি অবস্থার এক অবস্থা হলো: আত্মার সকল প্রকার বৈশিষ্ট্য তথা ব্যক্তিত্বের বিলোপ সাধন, যা নিদ্রার সাথে তুল্য। অপর অবস্থা হলো; কাশ্‌ফ বা সজ্ঞামূলক জ্ঞানের এক তন্ময় অবস্থায় আত্মার বিলোপ, যে অবস্থায় পরম সত্তার সামগ্রিক ঐক্যের প্রকাশ ঘটে সুফি বা সাধকের কাছে। তাঁর মতে 'ফানা' একটা ধারাবাহিক প্রবাহ এবং এই ধারায় আল্লাহ্‌র জ্ঞান লাভে সাতটা স্তর তিনি চিহ্নিত করেন; যথা, ১. সর্ব প্রকার পাপ থেকে বিরত থাকা, ২. সকল কার্য থেকে বিরতি গ্রহণ, ৩. অনিত্য সত্তাসমূহের গুণাবলী থেকে ফানা হয়ে পরম সত্তাকে নিত্য সত্তার উৎস জ্ঞান করা, মানুষের কাজকে আল্লাহ্‌র কাজ মনে করা, ৪. নিজের ব্যক্তিত্ব বা অহং বিলোপন, ৫. বাহ্যজগৎ পরিত্যাগ করা ৬. আল্লাহ্‌ থেকে ভিন্ন সব বস্তুতে থেকে বিস্মৃতি, এমনকি 'ফানা' থেকে ফানা হওয়া, ৭. আল্লাহ্‌র সিফাত থেকে 'ফানা' হওয়া অর্থাৎ **আল্লাহ্‌কে বিশ্বের কারণ হিসেবে না ভেবে বিশ্ব জগতের অন্তর্নিহিত সত্তা (Essence বা যাত) রূপে ধ্যান করা**।

হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) সৃষ্টির পর্দান্তরালের গূঢ় তত্ত্ব এবং ওয়াহদাতুল ওজুদের দর্শন তাঁকে ধর্ম-বিশ্বাস নির্বিশেষে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দার্শনিক সমাজে উদ্‌ঘাটনযোগ্য রহস্য ও তত্ত্বজ্ঞানের আধার হিসেবে সাব্যস্ত করেছে।

ভারতের অদ্বৈতবাদী দার্শনিক শংকরাচার্য, গ্রীসের ইলিয়াটিক দর্শন, গ্রীক দার্শনিক পারমানাইডিস, আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজার দর্শন সর্বধরআল্লাহ্‌বাদী (panentheism) ধারণাপুষ্ট। তবে আধুনিক বস্তুবাদী পাশ্চাত্য দার্শনিক হেগেল, লোটজা, ব্রাডলী, পলসন, লক, বার্কলী, হিউম প্রমুখের দর্শনস্রোতও ওয়াহদাতুল ওজুদ বা সর্বধরআল্লাহ্‌বাদের (panentheism) সাগরে গিয়ে পড়েছে। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে প্লেটো, এ্যারিস্টটলের 'ধারণা', 'আকারের' মধ্যে পরম সত্তার ঐক্য সমুপস্থিত। অতএব, পরম আস্তিক্যবাদ বা ওয়াহদাতুল ওজুদের অন্তহীন আলিঙ্গনেই শেষ পর্যন্ত সকল প্রকার অবস্তুগত-বস্তুগত দার্শনিক চিন্তা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই তত্ত্বকে যুক্তিমন্ত দার্শনিক কাঠামোয় স্থাপন করতে পারার মধ্যে হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) কৃতিত্ব ও সাফল্য প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে; যার চরম শাব্দিক প্রকাশ ঘটেছে বাংলাদেশের লালন সাঁইয়ের গানে:

"মেয়ারাজের কথা শুধাবো কারে:।
আদম তন আর নিরাকারে মি'ল্লে কি করে:।
নবী কি ছাড়িল আদমতন,

কিবা আদমরূপ হৈলা নিরাঞ্জন,
কে বলিবে সেই অন্বেষণ এ অধীনে রে ঃ।"

নূরে মোহাম্মদী বা সৃজনের সূচনা বিন্দুঃ[৯]

নূরে মোহাম্মদী তত্ত্ব মুসলিম দর্শন, তাসাওউফ দর্শনসহ মিস্টিক জগতে প্রতিষ্ঠিতভাবে আলো বিস্তার করে চলেছে।

হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) মুসলিম দার্শনিকদের মধ্যে প্রথম মরমী সুফি, যিনি 'নূরে মোহাম্মদী' তত্ত্ব চয়ন করেন এবং বলেন, সৃষ্টির সূত্রপাতের পূর্ব থেকেই এমনকি অনস্তিত্বের পূর্ব থেকেই মুহাম্মদের (দ.) সত্তাসার (essence) বিদ্যমান ছিল এবং কলম বা আকলের প্রকাশ-মাধ্যম সৃষ্টির পূর্ব থেকেই তাঁর নাম অস্তিত্ববান ছিল। দ্রব্য ও গুণ এবং পূর্বাপর সকল সম্বন্ধ সৃষ্টির বহু পূর্ব থেকেই তাঁর 'অস্তি' ছিল। তিনি পূর্ব বা পশ্চিম কোন দিকেরই নন। হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.) বলতেন, মুহাম্মদ (দ.) ও চিরন্তন নূর অভিন্ন। সকল নবী ও সুফি-সাধকরা মুহাম্মদের নূর থেকেই নূর বা জ্ঞান লাভ করেন। তবে তাঁর বক্তব্যে সূত্রাবদ্ধ কোন দার্শনিক ব্যাখ্যা ছিল না। তাঁর পর হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) তাঁর 'মেশকাতুল আনোয়ার' পুস্তকে 'আল-মুতা' মতবাদে নূরে-মোহাম্মদী সম্পর্কে আলোকপাত করেন, যাতে হাল্লাজের (র.) উক্তির প্রতিধ্বনি মিলে। এরপর হযরত ইবনুল আরাবীই (র.) প্রথম দার্শনিক যিনি নূরে মোহাম্মদী সম্পর্কে বিশদ ও সূত্রাবদ্ধ উপস্থাপনা পেশ করেন, যা প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের দার্শনিক জগতে সমাদৃত।

হযরত ইবনুল আরাবী (র.) নূরে-মোহাম্মদী-ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৮টি (আঠারো) শব্দ প্রয়োগ করেনঃ ১. আল-হাকিকাতুল মুহাম্মদিয়া (মুহম্মদের মূল সত্তা), ২. হাকিকাতুল হাকিকত (মূল সত্তাগুলোর মূল সত্তা), ৩. রুহে মুহাম্মদী (মুহাম্মদের রুহ্), ৪. আল-আকল্ আল-আউয়াল (প্রথম প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি), ৫. আরশ (যে হৃদয় প্রভুর ধ্যানে মগ্ন, সেই আসনরূপ হৃদয়), ৬. আল-কালামুল আলা (সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা), ৭. আল-খলিফা (প্রতিনিধি), ৮. আল-ইনসানুল কামিল (পরিপূর্ণ মানব), ৯. আসল-উল-আলম (বিশ্বজগতের মূল বা উৎস), ১০. আদম আল-হাকিকি (মূল আদম), ১১. আল-বরজখ (মধ্যস্থতাকারী), ১২. ফালাকুল হায়াত (জীবন-স্তর), ১৩. আল-হক্কুল মখলুকুবিহী (সৃষ্টির মূলতত্ত্ব), ১৪. আল-হায়ুনা (মূল বা আদিম জড় উপাদান), ১৫. আল-রুহ্, ১৬. আল-কুতুব, ১৭. আবদ্-আল-জামি (সর্বব্যাপক এককের অনুগত)। তিনি নূরে-মুহাম্মদীকে সৃজনশীল, প্রাণদায়ী ও আদি প্রজ্ঞাপূর্ণ (logos) নীতি হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, এর মধ্যে সত্তা, নাম ও গুণের (যাত, ইসম ও সিফাত) অপূর্ব

মিলন নিহিত এবং এর মাধ্যমে বাহ্যিক জগত ও তার বৈচিত্র্য প্রকাশ পায়। তাঁর ভাষায় এটা আয়ান-আস-সাবিতা (সৃষ্টির বীজরূপী সত্তা)। অর্থাৎ মূল সত্তাগুলোর সত্তা (Reality of Realities); এটা থেকে বিশ্বের উদ্ভব। এটা ঐশী জ্ঞানের আধেয়।

বাংলা সাহিত্যে 'নূরে-মুহাম্মদী':

বাংলা সাহিত্য 'নূরে-মুহাম্মদী'র আলোয় ঝলমল। বাঙ্গালী মরমী সাধক লালন সাঁই, পাঞ্জু শাহ্, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, দৌলত কাজী, হায়াত মামুদ এবং পরবর্তীতে কাজী নজরুল ইসলামসহ বাংলাদেশের প্রত্যেক সাধক-ওলী-কবি নূরে-মুহাম্মদীর আলোর সমুদ্রে অবগাহন করেছেন, অনেকে হারিয়ে গেছেন। পাঠকদের সামনে সামান্য নমুনা পরিবেশন করা হলো:-

লালন সাঁই:

ক. আকার কি নিরাকার সেই রব্বানা,
আহমদ আর আহাদ নামের বিচার হৈলে যায় জানা।
খুদিতে বান্দার দেহে খোদা সে লুকাইয়ে আহাদ,
মিম হারিয়ে আহমদ হইল সে নাম।...

খ. ও...

দুইটি নূরের ভেদ বিচার জানা উচিত বটে,
নবীজী আর নিরূপ খোদার নূর সে কি প্রকার।
নবী জন আকার ছিল তাহাতে নূর চোয়ায় বল,
নিরাকারে কি প্রকারে নূর চোয়ায় খোদার।
আকার বলিতে খোদা শরাতে নিষেধ সদা,
আকার বিনে নূর চোয়ায় প্রমাণ কি গো তার।
জাত এলাহি ছিল জাতে, কি রূপ সে এল সেফাতে,
লালন নূর চিনিলে ঘোচে ঘোর অন্ধকার।

গ. লালন দর্শনে নূরে মোহাম্মদীর মানবিক দিকও ফুটে উঠেছে। ইনসানে কামিল বা পরিপূর্ণ মানব নূরে মুহাম্মদী বা আল্লাহ্র পূর্ণ প্রকাশ–পূর্বসূরী সুফি দার্শনিকদের এই বিশ্বাসের সাথে লালন সাঁইও অভিন্ন অভিমত পোষণ করেন। তিনি গেয়েছেন:-

অনন্ত রূপ সৃষ্টি করলেন সাঁই,
শুনি রে মানবের উত্তম কিছু নাই।

তিনি ইনসানে কামিল বা পরিপূর্ণ মানুষ বুঝানোর জন্য 'মনের-মানুষ', 'সোনার-মানুষ', 'সহজ-মানুষ', প্রেমের মানুষ', 'ভাবের-মানুষ', 'আলেক-মানুষ', 'অচিন-মানুষ', মানুষ-রতন প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করেছেন সম্পূর্ণ সচেতন ভাবেই। লালনের কামিল-মানুষের ধারণা স্টোয়িকদের 'সাধু ব্যক্তির' ধারণার মতো। তাঁদের বিশ্বাস, সাধুর আত্মা পরমাত্মার প্রতীক, তাঁর হৃদয় আল্লাহ্‌র সিংহাসন। তাঁর বুদ্ধি (in.ellect) ভাগ্যলিপি লেখনীর কলম। তাঁর আত্মা লাওহে মাহফুজ ও পরম জ্ঞানের উৎস। নূরে মুহাম্মদী (ক) পরাতাত্ত্বিক দিক থেকে মূল সত্তাসমূহের মূল সত্তা (essence), (খ) মরমী দিক থেকে মুহাম্মদের (দ.) মূল সত্তা এবং গ. মানবীয় দিক থেকে পূর্ণ মানব।

(ঘ) শাহ্ মুহাম্মদ সগীরঃ

জীবাত্মার পরমাত্মা মহাম্মদ নাম, প্রথম প্রকাশ তথি হৈল অনুপাম।

ঙ. আলাওলঃ

জ্যোতি সমুদ্রে আদ্যি নূর মোহাম্মদ
জগৎ বিজয়ী হৈতে পাইল সম্পদ।

চ. সৈয়দ সুলতানঃ

আহমদ হোন্তে নূর কৈলা মকার
আহাদ আহমদ দুই এক কলেবর।

ছ. হায়াত মামুদঃ

আহাদ হইতে আল্লাহ্ কৈল আহমদ
মীমাধিকে পূর্ণ সেই কৈল মহাম্মদ।
আহাদ আহমদ দুই এক করি জান
মীমে মোহাম্মদ শেষে কৈল উপাদান।
স্বর্গেতে সকলে জপে নাম আহম্মদ
মর্তপূরে জপে লোকে নাম মহাম্মদ।
পাতালে মাহমুদ নামে জপে নাগগণে
এক মীমে তিন নাম হৈল ত্রিঋণবনে।

জ. পাঞ্জু শাহঃ

নূরে খবর জানি নাই
আল্লাহ্‌র নূরে নবীর জন্ম শুনতে পাই,
নবীর নূরে ছারে জাহান
নূর ছাড়া আর কিছু নাই।

ঝ. কবি নজরুলঃ

(ক) যাহার মাঝে দেখল জগৎ
ইশারা খোদার নূরের,
পাপ দুনিয়ায় আন্‌ল যে রে
পুণ্য বেহেশ্‌তী সনদ...
ছিল নবীর নূর পেশানীতে
তাই ডুবলনা কিশ্‌তী নূহের
পুড়লনা আগুনে হযরত
ইব্‌রাহীম সে নমরুদের।
(খ) সূর্য ওঠে, ওঠে রে চাঁদ,
মনের আঁধার যায় না তায়,
হৃদ-গগন যে করল রওশন,
সেই মোহাম্মদ ঐ যে হাসে ॥
(গ) করে আউলিয়া আম্বিয়া তোমারী ধ্যান,
গুণ গাহিল নিজে আল্লাহ্‌তালা ॥

নূর-নবীর দেহ মোবারক জড়ধর্মী ছিল নাঃ

হযরত ইবনুল আরাবী (র.) তাঁর আদি-কারণ তথা নূরে-মুহাম্মদী বা লগস তত্ত্বে নূর এবং নবী মুহাম্মদ (দ.) সম্পর্কে নৈয়ায়িক সূত্র ধরে সারগর্ভ আলোচনা করেছেন যা ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। এই অনুচ্ছেদে নবীজীর (দ.) শারীর উপাদান সম্পর্কে ঐতিহাসিক বিবরণ পত্রস্থ করা হচ্ছে। একথা সমকালীন চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের ভিত্তিতে বর্ণিত ঐতিহাসিক সত্য যে, নবীজীর (দ.) কোন ছায়া ছিল না। এই তথ্য সৃষ্টি জগতের সবার জন্য একটা বিস্ময়ও বটে। এ বিষয় নিয়ে জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-দার্শনিকরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছেন। বৈজ্ঞানিক, রাসায়নিক, পদার্থিক, থিওসফি, আধ্যাত্মিক বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে এর কারণ অন্বেষণের প্রয়াস এখনো অব্যাহত।

এসব অন্বেষার সারাংশ হলো– নবীজীকে (দ.) বাহ্যিকভাবে দেহী মানবরূপে দেখা গেলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি যে জড়ধর্মী ছিলেন না, তাঁর শরীরের 'ছায়া বিহীনতা'-ই এর অন্যতম প্রমাণ। পদার্থের যা সার–সেই নূর বা জ্যোতিই তাঁর পবিত্র শরীরের উপাদান। এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য ছহি হাদিসঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নূর থেকে এবং বস্তুনিচয় আমার নূর থেকে সৃষ্ট এবং আল্লাহ্‌ সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করেছেন, তা আমার নূর।' আল-কুরআনেও বর্ণিত আছেঃ 'নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহ্‌র নূর এবং সুস্পষ্ট

কিতাব (৫:১৫)। নিরেট বাস্তব তথ্য এবং দার্শনিক-তাত্ত্বিক বিষয়াদির রসায়নের ফলাফল এই যে, তাঁর শরীর মোবারক অন্য সব প্রাণীর মতো স্থূল উপাদানের সমাহার নয়, অন্য কিছু; যা 'নূর' নামে অভিহিত, তারই আধার।

লালন সাঁই-এর ভাষায়:

মদিনায় রসূল নামে কে এল ভাই,
কায়াধারী হয়ে কেন তার ছায়া নাই ॥
কি দিব তুলনা তারে
খুঁজে পাইনা এ সংসারে
মেঘে রইত্ ছায়া ধরে ধুপের সময় ॥
ছায়াহীন যাহার কায়া
ত্রিঋণবনে তার ছায়া
একথার মর্ম লওয়া অবশ্য চাই ॥
কায়ার শরীর ছায়া দেখি
যার নাই সে লা শরিকি
লালন তাও উঘারি বলতে ডরাই ।

উপসংহার:

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত বা বেলায়তে মোত্লাকা'র দার্শনিক অবয়ব নির্মাণে হযরত ইবনুল আরাবী'র (র.) শিক্ষার প্রয়োগ:

১. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের তাত্ত্বিক গঠন কাঠামো সম্পর্কে আলোকপাত করা যাক। ইবনুল আরাবীর (র.) ওয়াহদাতুল ওজুদ তত্ত্বে অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) ইসলামের মূলনীতি ও মর্মবাণীর ঘনীভূত প্রতিফলন প্রত্যক্ষ করেছেন, যা আল্লাহ্র রব্-রহমান-রহিম সিফতের আলোয় উদ্ভাসিত। মানুষসহ আল্লাহ্র সকল সৃষ্ট জীব ও বস্তু এখানে একই সমতলে অধিষ্ঠিত থেকে পরস্পরের অস্তিত্বের সহযোগী হিসেবে সক্রিয় রয়েছে, যা ইসলামের সমতাবাদী (egalitarian) জীবনবোধেরই রূপায়ণ। সকল প্রকার 'কৃত্রিম' ভেদাভেদ এখানে বিলুপ্ত। সৃষ্টরা (মখলুক) নিজ নিজ দায়িত্ব ও ভূমিকা পালনে রত, যার মূল্যায়ন ও বিচারের ভার ও নিয়ন্ত্রণ একমাত্র খালেক বা স্রষ্টার হাতে।

২. পদার্থ বিজ্ঞানসমেত বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও দর্শনের জগতের যুক্তিসিদ্ধ উন্নততর বিকাশের ফলাফল বিশ্লেষণে প্রতিভাত হয় যে, ইবনুল আরাবী'র (র.) ওয়াহদাতুল ওজুদের তত্ত্বের ধারা আর আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের দিকপাল কান্ট, বার্কলী,

হেগেল প্রমুখের পরম-সত্তা অন্বেষার ধারা এক মোহনায় মিলিত হয়ে অভিন্ন অন্তহীন জ্ঞান ও অনুভবের সাগরে মিশে চলেছে। মানব সমাজের বর্তমান সচেতন জ্ঞান-জিজ্ঞাসা এসব বিষয়ে বিজ্ঞতর জ্ঞান-সন্ধানীদের কাছ থেকে প্রজ্ঞাপূর্ণ জবাবের প্রত্যাশায় আছে।

৩. অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) তাঁর সুগভীর প্রজ্ঞা ও ধ্যানী অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিশ্লেষণমূলে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্'র (ক.) মধ্যে হযরত ইবনুল আরাবী'র (র.) গ্রন্থ ফুসুসুল হিকাম-এর ফচ্ছে শীষ (আ.) অধ্যায়ে বর্ণিত 'ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তি খাতেমুল অলদ বা আহল এর গুণ ও বৈশিষ্ট্য' চিহ্নিত করতে সক্ষম হন এবং সমকালীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া তথা বিশ্বে 'ইসলামী হুকুমাতের পতন ও বৃটিশ হুকুমতের পত্তনের ফলে' কালের চাহিদা অনুযায়ী 'ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুগ সংস্কারক অলী উল্লাহ্ হিসেবে সাব্যস্ত করেন, যা পরবর্তীকালের ইতিহাস ও ঘটনা প্রবাহে সপ্রমাণিত হয়। সমকালীন প্রসিদ্ধ আলেম-উলামা, সাধক-ফকির, কলেজ শিক্ষায় শিক্ষিত বিজ্ঞ ও সচেতন ব্যক্তিবর্গসহ সাধারণ মানুষ নিজ নিজ সহজাত অর্থাৎ খোদাদাদ অন্তর্দৃষ্টি বলে তাঁকে যুগ সংস্কারক অলী উল্লাহ্ তথা গাউসুল আযম হিসেবে বরণ করে নিজেদের উপরে আলোক ও কল্যাণের মেহেরবাণীপূর্ণ ছত্রছায়া হিসেবে জ্ঞান করতে থাকেন, যে ধারা আজো সমভাবে বহমান।

হযরত ইবনুল আরাবী'র (র.) সূত্র অনুসারে "অলদ বা আহল ঐ ব্যক্তি যিনি পিতার গুপ্ত রহস্যের ও দৃষ্টিভঙ্গীর হামেল বা বাহক এবং খাতেমুল আউলিয়া। খাতেমুল আউলিয়া রসূলুল্লাহ্র (দ.) অলীয়ে ওয়ারেছ হন। খাতেমুল আউলিয়া রসূলুল্লাহ্র বিভিন্ন রূপের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম রূপ।" বেলায়তে খিজরী হিসাবে তিনি ফরদুল আফরাদ 'জামেউত্ তনজিহ্ ওয়াত্তশবীহ্, অর্থাৎ সূক্ষ্মত্ব ও স্থূলত্বের সমাবেশকারী [দ্রঃ মোতালেবে রশীদী]। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মধ্যে এসব বিশেষত্ব বিকশিত ও সর্বপ্রকার বিবেচনার মানদণ্ডে যথার্থ হিসেবে প্রতিভাত।

'নবুয়ত' আল্লাহ্পাক প্রদত্ত দায়িত্বপূর্ণ মহিমান্বিত পদবীর নাম। ইহা স্থান কাল পাত্র ও পরিবেশে সীমাবদ্ধ। কিন্তু বেলায়ত অসীম। "অলীউন" আল্লাহ্তায়ালার একটি নামও বটে। তার অর্থ 'অন্তরঙ্গ' বন্ধু। সুতরাং, খোদা যেমন নিত্য, খোদার গুণ-গরিমাও নিত্য ও অবিনশ্বর। সেইরূপ বেলায়তও নিত্য ও অবিনশ্বর, প্রকৃত পক্ষে বেলায়তই নবুয়তের প্রাণ।

শায়খুল আকবর ইবনুল আরাবী'র (র.) 'ফুসুসুল হিকাম' থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) লিখেছেন, "খাতেমুল আউলিয়া রসূল করিম (দ.) এর উত্তরাধিকারী অলী হন; যিনি মূল হইতে সব কিছু লইয়া থাকেন। তিনি বেলায়তের সমস্ত মোকাম ও মর্যাদার নিরীক্ষণকারী হন। তিনি রসূল করিম (দ.)-এর সমস্ত রূপের

মধ্যে সর্বোত্তম রূপ। রসূল করিম (দ.) জামায়াতের ইমাম হন এবং শাফায়াতের দরজার উন্মোচনকারী হিসেবে আদম সন্তানের সর্দার হন।"ooo "নিশ্চিত শ্রেষ্ঠত্ব ঐ ব্যক্তির জন্য যিনি বর্তমান, আগত ও বিগত সমস্ত দরজার অবস্থাকে বেষ্টনকারী বলিয়া সাব্যস্ত হন এবং কামালিয়াতের সমস্ত ছিফত বা গুণের অধিকারী হন। যদিও তাঁহার ঐ ছিফত ও গুণাবলী প্রচলিতভাবে মানব-বুদ্ধির নিকট এবং শরিয়তের নিয়ম হিসাবে ভালো বা মন্দ বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এই কামালে মোহিত বা সর্বব্যাপ্ত কামালিয়াত নিশ্চিতভাবে "আল্লাহ্" শব্দ বিশিষ্ট অলী উল্লাহ্র জন্য সাব্যস্ত।"ooo "আম্বিয়া ও রসূলগণ যাহা কিছু দেখেন, তাহা খাতেমুর রসূলের দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখেন এবং যাহা কিছু কোন অলী উল্লাহ্ দেখেন, তাহা খাতেমুল আউলিয়ার আলো বা দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখেন। এমনকি রসূলও দেখিয়া থাকেন, যেহেতু নবুয়তে তশরীয়ী বা বিধানগত ও তাঁহার রেছালত নতুন ধর্মের প্রাদুর্ভাবে এক সময়ে ছুটিয়া যায়। কিন্তু বেলায়ত কোন সময়ে ছুটিতে পারে না। বন্ধও হয় না, যেহেতু ইহা খোদার সঙ্গে অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কযুক্ত।"ooo "খাতেমুল বেলায়ত বা খাতেমুল আউলিয়া ইসলাম রূপ দেওয়ালের শেষ গাঁথুনি বা শেষ ইটা। নবুয়ত ইসলাম রূপ দেওয়ালের প্রথম গাঁথুনি বা ইটা। যেহেতু, নবুয়ত আহকামী আদেশ-নিষেধমূলক; হযরত জিব্রাইল (আ.)-এর মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত ওহী। ইহা খনি হইতে প্রাপ্ত চাঁদির ইটের সহিত তুল্য। কিন্তু বেলায়ত্ খাতেমুল আউলিয়া কর্তৃক নিজ হাতে ঐ খনি হইতে প্রাপ্ত শক্তি, যেই খনি হইতে হযরত জিব্রাইল (আ.) অহী আনিতেন। তাই ইহা সোনালী ইটের সহিত তুল্য। এই অহী ও এলহাম বিশিষ্ট নবুয়ত ও বেলায়ত ইটা দ্বারা ইসলামী ইমারত নামক ঘর নির্মাণ পরিসমাপ্ত" **[বেলায়তে মোত্লাকা তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]**।

হযরত ইবনুল আরাবী (র.) বেলায়ত তথা এলহামের চিরন্তনতার যে চিত্র উপস্থাপন করেছেন, তা আল-কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন আয়াতের অনুসৃতি। বেলায়ত বা এলহামের অন্তহীনতা সম্পর্কে এই অধ্যায়ের 'ইবনুল আরাবীর দর্শনে মানুষের স্থান' শীর্ষক অনুচ্ছেদেও আলোকপাত করা হয়েছে। হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) উপস্থাপিত সকল বিশ্লেষণ, উপাত্ত ও নমুনা অনুযায়ী হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) 'বেলায়তে মোত্লাকা' যুগ প্রবর্তক হিসেবে সপ্রমাণিত।

৪. খাতিম-আল-বেলায়ত (khatim al-wilayah):[১০]

খাতেমুল বেলায়ত সম্পর্কে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) যে সব বৈশিষ্ট্য, গুণ, পরিবেশ ও চেতনার স্তরের উপর আলোকপাত করেছেন, তা তাসাওউফ এবং হযরত ইবনুল আরাবী ও হযরত আবদুল করিম আল-জিলি-বিশেষজ্ঞ Titus Burckhardt-এর বিশ্লেষণের সাথেও

সামঞ্জস্যশীল। ইবনুল আরাবীর বরাত দিয়ে তিনি লিখেন: "খাতিম-আল-বেলায়ত (seal of sanctity) সকল আউলিয়া বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তির যুগপৎ আদিরূপ এবং কুতুব বা ধ্রুব বিন্দু (pole)। আরবী শব্দ 'বেলায়ত'-এর অর্থ আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞানের একটা চিরস্থায়ী অবস্থা বা নৈকট্য।" এটা হযরত আকদাস (ক.) সম্পর্কে সর্বাংশে প্রযোজ্য।

বলা হয়, সকল আধ্যাত্মিক পবিত্র গুণাবলীর সমাহার ঘটে 'বেলায়তের' মধ্যে, যা হলো আল্লাহ্র সর্বত্র বিরাজমানতা সম্পর্কে বিরতিবিহীন সচেতনতা বা ইয়াদগারী। আল-কুরআন বলেন যে, আল্লাহ্র নৈকট্যপ্রাপ্তরা (ওলীরা) এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর জিকির বা স্মরণবিচ্যুত হন না। 'ফাযকুরুনি, আয্কুরুকম' (২:১৫২) আমার জিকির করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো।" সকল ইবাদতই আল্লাহ্র জিকির বটে। এমনকি সমগ্র কুরআনকে 'জিকির' বলে গণ্য করা হয়; কারণ, নবীজীর (দ.) শিক্ষা অনুসারে কুরআনের কোন না কোন অংশ সালাতের সময় পাঠ করা হয় এবং সেগুলো সমুদয়ই 'জিকির'। সকল পবিত্র কাজ-কর্মই ইবাদত (দ্র: ২৯:৪৫, ৬২:৯, ৬৯:৯ প্রভৃতি)।

এই নৈকট্য বা বেলায়ত এর ব্যবহারিক সহজ দৃষ্টান্ত হযরত আকদাসের (ক.) বাণীতেই পাওয়া যায়, যথা: "তুমি আমার সামনে থেকেও যদি স্মরণ বিচ্যুত হও, তাহলে তুমি ইয়ামন দেশে। আবার ইয়ামন দেশে থেকেও যদি আমার স্মরণ বিচ্যুত না হও, তাহলে তুমি আমার সামনে।" রুহানী শুভ্রতার জিসমানী অভিব্যক্তি শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) ব্যাকুল দর্শনার্থীদের উদ্দেশ্যে মধুর স্বরে নিবেদন করতেন কুরআনের আয়াত: 'ফাযকুরূনী আযকুরুকম'। এটাই আল্লাহ্র সাথে নৈকট্য বা বেলায়ত তথা বেলায়তে মোত্লাকার মূলসূত্র।

"All spiritual virtues may be said to be summed up in sanctity (al-wilayah) which is unin.errupted awareness of the Divine Presence." [An In.roduction to Sufi Doctrine, Titus Burckhardt, part three: spiritual realisation; Ch-1, Three Aspects of the way: Doctrine, Virtue and Spiritual Alchemy.]"

৫. স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়েরই শাশ্বত অস্তিত্বশীল বহমানতা প্রসঙ্গে হযরত ইবনুল আরাবী (র.) এবং হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উপলব্ধি:

হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) রুহানী উপলব্ধিতে স্রষ্টা ও সৃষ্টি উভয়ই শাশ্বত, অনন্ত। আল্লাহ্ সৃষ্টির কারণ। তবে এর অর্থ এই নয় যে, স্রষ্টা পূর্বে এবং তাঁর পরেই সৃষ্টি। উভয়ই চিরন্তন। এক এবং বহুর মধ্যে কোন ব্যবধান বা ফারাক থাকতে পারে না। বিশ্ব জগৎ যদি 'কারণ সম্ভূত' অথবা 'সৃষ্ট'ও হয়, তার অর্থ এই যে, কোন নির্দিষ্ট সময়ে

একটির উদ্ভব কিম্বা সৃজন ঘটেছে, কিম্বা "কিছু না' (ex nihilio) থেকে এর সৃষ্টি হয়েছে (out of nothing, nothing comes)। তাঁর মতে, এমন নয় যে, মহাবিশ্ব কখনো 'অনস্তিত্ববান' ছিল এবং পরে কোন এক সময়ে এটাকে 'অস্তিত্ববান' করা হয়েছে। বরং বিপরীতক্রমে এই মহাবিশ্ব শাশ্বত, অসীম ও চিরস্থায়ী। কারণ; তা ঐ শাশ্বত, অসীম, চিরঞ্জীব 'আহাদ' অর্থাৎ 'এক'-এর বাহ্য অভিব্যক্তি।

তাঁর মতে, 'আখিরাত' বা পরজগৎ এক শাশ্বত অন্তহীন নির্মিতি। দুনিয়ার 'ইন্তিহা' বা সমাপ্তি এমন একটা কিছু যা বাস্তবায়নাতীত। আর দুনিয়ার কোন পরম লক্ষ্যও নাই। কথিত 'আখিরাত' অবিরাম নির্মিতিশীল কিছু। এই 'দুনিয়া' এবং 'আখিরাত' চিরন্তন নব নব সৃজন প্রক্রিয়ার নাম মাত্র। দুনিয়ায় বস্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে তা আখেরাতে স্থানান্তরিত হয়। যখন সেগুলো আবার ভিন্নতর রূপে আবির্ভূত হয়, তারা এ জগতে আসে। যে মুহূর্তে একটি রূপ বিলীন হচ্ছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্যরূপে তার আবির্ভাব ঘটছে এবং এই 'ফানা ও কুন' অর্থাৎ 'ধ্বংস ও সৃজন, প্রক্রিয়া জ্ঞানের অতীত অনন্তকাল অব্যাহত রইবে (ad infinitum)। সময়ের কোন ফাঁক বা বিরতি নেই এবং এটা ব্যতীত সৃজনের অন্য কোন প্রক্রিয়াও নেই। সম্ভবতঃ আমরা একথা বলতে পারবো না যে, "কোন কিছু একদা ছিল না, অতঃপর ছিল।" তাঁর মতের 'অতঃপর' শব্দ দ্বারা সময়ের বিরতি বা ফারাক বুঝায় নাা। বরং তা 'কারণ' থেকে 'কার্যের' যৌক্তিকবিদ্যা সম্মত 'অগ্রবর্তিতা' (priority) নির্দেশক। এখানে প্রতি মুহূর্তের বিবর্তনমূলক পরিবর্তনশীলতার বিষয়টা এসে পড়ে, যার আভাস আল-কুরআনেও মিলে যেমন: (১০:১৪,১৪:৪৮)। এ প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে ইউরোপীয় দর্শনের বার্কলী-কান্ট প্রমুখের জমানায় 'অপসৃয়মান কিম্বা অপসৃত এই মুহূর্তের স্থলাভিষিক্ত নতুন মুহূর্তের আবির্ভাব ও পর মুহূর্তে আবার নবরূপে বিবর্তনের' অব্যাহত অন্তহীন প্রক্রিয়ার উপর দার্শনিক ও বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাতের বিষয়টাও প্রণিধানযোগ্য।

ইবনুল আরাবী'র (র.) তত্ত্ব অনুযায়ী, আল্লাহ্ নতুন কিছু 'সৃজন' করেন না। তাঁর মতে 'সৃজন' হলো ইতোমধ্যেই অস্তিত্বশীল কোন বস্তুর বাস্তব অভিব্যক্তি। 'সৃজন' বস্তুধর্মেই নিহিত রয়েছে। 'এটা হলো'–মানে এই যে, বস্তু নিজ ইচ্ছা অনুসারেই ব্যক্ত হয়। তাঁর মতে, এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ শুধু এটুকু করেন যে, 'বস্তুর মধ্যে হওয়ার ইচ্ছাটা' জাগ্রত করেন 'অর্থাৎ 'বাস্তবভাবে ব্যক্ত হবার ইচ্ছাটা' জাগিয়ে দেন। বস্তুর নিজেদের মধ্যে আল্লাহ্ দ্বারা প্রবিষ্ট ও স্থিত গুণ, প্রকৃতি ও বিধান বলেই 'ইচ্ছা বিশিষ্ট' হয় বিধায় আল্লাহ্র ইচ্ছা কিম্বা আদেশের প্রসঙ্গ এখানে বান্তর নয়।" তাঁর মতে 'আল্লাহ্' এসব আইনের অপর নামও বটে। তাঁর অভিমত এই যে, "আল্লাহ্র আমর বা আদেশের মুহূর্তে কোন বস্তুর প্রকৃতিতে 'হবার' ইচ্ছা প্রবিষ্ট না থাকলে, এটা কখনো 'হয়ে উঠতো

না'। সুতরাং, কোন কিছুই কোন বস্তুকে অস্তিত্ববান করে না, অর্থাৎ বস্তু নিজেই নিজের অস্তিত্ব ব্যক্ত করে।"

'বস্তু নিজেই নিজের অস্তিত্ব ব্যক্ত করে' কথাটা বস্তুবাদীদের ধারণার সাথে মিলে যায়। তবে পার্থক্য এই যে, বস্তুবাদীদের এই ধারণা শিকড়বিহীন। আর হযরত ইবনুল আরাবী'র (র.) সিদ্ধান্তের শেকড় পরম কারণ তথা আল্লাহ্ থেকে উদ্ভূত। এ জন্যেই কী বলা হয়, আস্তিক্য-নাস্তিক্যের ব্যবধান অতি সূক্ষ্ম!!

হযরত ইবনুল আরাবী'র (র.) এই তত্ত্বের পাশাপাশি হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)-এর একটি কালাম বা উক্তি নিগূঢ়ভাবে লক্ষ্যণীয়। চট্টগ্রাম জিলার ফরহাদাবাদ নিবাসী মৌলানা আবদুল জলিল সাহেব একদিন, হযরত কেবলার খেদমতে 'গায়েব বলার মাসায়েলা' জানতে চাইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'হুজুর'! গায়েব বলা, প্রকাশ করা কি জায়েয আছে?" হযরত উত্তর করিলেন, 'যব কুন্ কাহা, সব হোগেয়া। ফের গায়েব কাঁহা হ্যায়' অর্থাৎ আল্লাহ্তায়ালা যখন হয়ে যাও বলিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গেই সব হইয়া গিয়েছে। তখন আর অদৃশ্য কোথায় রহিল?।[১১]

হযরত ইবনুল আরাবী (র.) এবং হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উপরে বর্ণিত বিবরণের কোন ছায়া গত শতাব্দীর যশস্বী পদার্থ বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধ্রুব (cosmological constant) তত্ত্বে পাওয়া যায় কি না, ভেবে দেখার দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক অবকাশ রয়েছে।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের অন্যতম দার্শনিক ও তাত্ত্বিক ভিত্তি হিসেবে হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) যে শিক্ষাকে মৌলিক উপাদান হিসেবে অছিয়ে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী চয়ন করেছেন, সেগুলো হলো: ক. আল-কুরআনের শিক্ষা ও সমকালীন বিজ্ঞান-দর্শনের আলোকে কুল-মখলুকে আখেরী নবী ও শাশ্বত লোক্ শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (দ.)- এর বা নূরে মোহাম্মদীর, যথার্থ স্থান (যা সর্বোচ্চ স্থান) নির্ণয়করণ, খ. প্রত্যেক প্রাণ ও বস্তুতে আল্লাহ্র নিশ্চিত সক্রিয় অস্তিত্ব উদ্ঘাটন, গ. মহাসৃষ্টি বা কুল-মখলুকের অবিনশ্বর বিবর্তনশীল অন্তহীনতার দার্শনিক-নৈয়ায়িক প্রক্রিয়ার স্বরূপ চিহ্নিতকরণ এবং এর প্রয়োগ ও ফলাফলের স্বরূপ চিহ্নিতকরণ; এবং মানুষের পার্থিব কাজ কর্মের উদ্ভব ও পরিণতির দায়ভাগ যে তার নিজেরই, তা যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন, ঘ. পার্থিব ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, বেহেশ্ত, দোজখের দার্শনিক সংজ্ঞা (আইনী নয়) নির্ণয়, ঙ. তিনি আল-কুরআনের বিভিন্ন শব্দ, আয়াত এবং সেগুলোর সংযোজন ও বিন্যাসের কৌশলের বহুমুখী গূঢ়ার্থ উদ্ঘাটন করার পাশাপাশি কুরআনে বর্ণনার অনুসরণে প্রত্যেক নবী-রসূলের প্রজ্ঞার ঝিনুক থেকে বিবিধ প্রকার কল্যাণময় শিক্ষার মুক্তা আহরণ করেছেন এবং সে সব প্রজ্ঞার শেকড় হযরত মোহাম্মদ (দ.) তথা

'নূরে মোহাম্মদী' নামক অনন্ত পুষ্পজ-ফলদ বৃক্ষের সাথে বিস্ময়কর দার্শনিক কৃতিত্ব ও সৌকর্যসহকারে যুক্ত করেছেন, যা বলতে গেলে মৃত্তিকার নীচের শেকড়ের উপরিভাগের সাথে দৃঢ় সংযুক্তি সম্পন্ন এক বিশাল শাশ্বত মহীরুহ। কুরআন তাঁর কাছে ব্যতিক্রমী ও ভিন্নতর ব্যঞ্জনায় প্রতিভাত হয়েছে, যা দর্শনশাস্ত্র এবং কুরআন অধ্যয়ন ও উপলব্ধির জগতের এক বিস্ময়। আধুনিক ইউরোপীয় দর্শনের উন্মেষ ও বিস্তারের বহু পূর্বেই সৃজন-বিবর্তন-বিষয়ক নৈয়ায়িক ভাবনার উৎসারণ তাঁর মধ্যে লক্ষ্যণীয়। মানব-প্রাণীজগৎ-বৃক্ষজগৎ-বস্তুজগতের সৃজন ও স্থিতির একটা পূর্ণাঙ্গ নিত্য বিবর্তনচক্র তাঁর দর্শনে বিন্যস্ত, চ. তিনি আল-কুরআনে বর্ণিত কোন প্রকার বিনিময়-অমুখাপেক্ষী নবী-রসূল এবং নবীজী হযরত মোহাম্মদ (দ.) কে নবতর চেতনার রঙে উদ্ভাসিত ও উপস্থাপন করে কেবল দর্শনের ভুবন নয়, চিরায়ত মানবতার ভুবনকেও বহুভাবে সমৃদ্ধ করেছেন, যার সৃজনশীলতা এখনো অব্যাহত, ছ. নবী-রসূলদের জীবন ও কর্মসঞ্জাত শিক্ষার বিবরণ ও সমীক্ষণবাদী বিশ্লেষণ (critical analysis) প্রদান করতে গিয়ে কুরআনের বিভিন্ন শব্দ, আয়াত ও বর্ণনার যে তাৎপর্য তাঁর জ্ঞানচক্ষুতে উন্মোচিত হয়েছে; তা সহজ ও সর্বজনীনভাবে ফুসুসুল হিকাম (wisdom of the prophets) গ্রন্থে ব্যক্ত করেন, যা দর্শন ও কুরআন চর্চার ইতিহাসে এখনো একমাত্র ও অদ্বিতীয় স্থানে আসীন, জ. তিনি এখনো প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সকল শ্রেণীর দার্শনিকদের কাছে জ্ঞান ও উপলব্ধির বিবেচনায় এক ধ্রুব বিস্ময়, ঝ. কুরআনে বয়ান, আয়াতসমূহ এবং এগুলোর অন্তর্গত স্পন্দনকে অবলম্বন করে নির্মাণ করেছেন এক সর্বমানবিক, বিশ্বজনীন মহান গতিশীল জীবনমুখী দর্শন, যে দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুতে আল্লাহ্ বা পরম সত্তা এবং নূর-ই-মোহাম্মদী আর এই বৃত্তে বিরতিহীনভাবে ঘূর্ণায়মান মানুষ-মানুষ-মানুষ তথা সমগ্র সৃষ্টি। তাঁর অন্যতম প্রধান কৃতিত্ব ও মহত্ব এখানে।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. (ক) প্রফেসর ড. সৈয়দ মাহমুদুল হাসান: ইসলামের ইতিহাস ষষ্ঠ সংস্করণ, ৪র্থ মুদ্রণ, ১৯৮১, পৃ: ৩৩১, ঢাকা; (খ) Prof. Monjoor Ahmed Hanafi: A Survey of Muslim Institution and Culture, Revised and Enlarged Edition, sept, 1964, Lahore: আমীর আবদুল মালিক (শাসনকাল ৬৮৫-৭০৫ খ্রি.) ক্ষমতা লাভ করে কুরআন শরিফ হাতে নিয়ে বলেন, ' তোমার সাথে এই আমার শেষ দেখা (this is my last time with you)।' আমীর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত আমীরতন্ত্র বা বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র অব্যাহত রাখেন তৎপুত্র ইয়াজিদ এবং তাঁর নিঃসন্তান উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় মুয়াবিয়া। নিঃসন্তান দ্বিতীয় মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর আবু সুফিয়ানের পিতা হারবের নামানুসারী হারবীয় বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে। অতঃপর প্রথম মুয়াবিয়ার চাচাত ভাই প্রথম মারওয়ান আমীরি তখতে আরোহণ করেন। প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ধারাবাহিকতায় তিনি স্বীয় পত্নীর হাতে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় ৬৮৫ খ্রি. নিহত হন। তৎপর তখ্তনশীন হন আবদুল মালিক। তাঁদের সবার শাসনকাল ষড়যন্ত্র, ক্ষমতা দখল, নিষ্ঠুর হত্যালীলা, প্রতিবাদী বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নির্মম নিধন, প্রজাতান্ত্রিক খেলাফতের দুর্বাঘাসটি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করার বিভীষিকায় পরিপূর্ণ। এই অশুভ মতলবেই একাধিকবার পবিত্র মদীনা ও মক্কা তাদের হাতে ধ্বংস ও নৃশংসতার শিকার হয়। এভাবে তিনি উমাইয়া বংশীয় আধিপত্য ও রাজতন্ত্র সুদৃঢ় করেন। হাজ্জাজ বিন ইউসুফ স্বীয় নৃশংসতা ও বর্বরতার জন্য আরবদের নীরো (Nero of the Arabs) বলে নিন্দিত। তিনি মক্কা আক্রমণ করে কাবা শরিফে অগ্নিসংযোগ করেন। তিনি জোরপূর্বক খাজনা আদায় ও অন্যান্য নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁর হাতে অন্ততঃ দেড় লাখ লোক নিহত ও পঞ্চাশ সহস্রাধিক লোক কারাবন্দী হয়। বৃটিশ রাজতান্ত্রিক সাম্রাজ্যের যুগের স্যার উইলিয়াম ম্যুর, স্পুলার, বার্নার্ড লুইস প্রমুখ বিজ্ঞ ঐতিহাসিক 'রাজতান্ত্রিক' দৃষ্টিকোণ থেকে এসব আমীরদের নিজ নিজ সাম্রাজ্য ও শাসন শক্তি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে 'দক্ষতা ও সাফল্য' কীর্তন করলেও তাঁরা যে প্রজাতান্ত্রিক খিলাফতের মূলোৎপাটন করে কুরআন ও নবীজীর (দ.) লোককল্যাণমূলক প্রশাসন ধারণাকে ধূলায় মিশিয়ে দেন, তা ঘুণাক্ষরেও উল্লেখ করেন নি। আমীর মুয়াবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ানের রাজত্বকাল থেকে খিলাফতের বায়তুল মাল আমীরদের ব্যক্তিগত কোষাগারে পরিণত হয়। সমগ্র বিশ্বে এখনো বরেণ্য ইতিহাসবিদ আল্লামা বালাযুরী (র.) [২০৩-২৭৯ হিজরী] তার সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'ফুতুহুল বুলদানে' উমাইয়া রাজবংশে কেবল মাত্র উমর ইবনে আবদুল আজিজ ব্যতীত আর কাউকেই 'খলিফা' বলে উল্লেখ করেননি। রাজা-বাদশাহ্দের 'গুণ' কীর্তন করতে হবে বলে তিনি তাঁর পুস্তকে কোন ভূমিকা রাখেননি। 'বড় জোর তিনি যতটুকু আনুকূল্য প্রদর্শন করেছেন, তাহলো আব্বাসীয় খলিফাদের বর্ণনাকালে তাদের সকলকেই 'খলিফা' বলেছেন (ফুতুহুল বুলদানের অনুবাদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ, ঢাকা ১৯৯৮ইং)। আরো লক্ষ্যণীয় যে, পাশ্চাত্যের এবং প্রাচ্যের কোন কোন ঐতিহাসিক রাজতান্ত্রিক একনায়কত্বের মধ্যে বিদ্যমান মন্দগুলোকে এক পাশে আড়ালে রেখে উপরোক্ত রাজন্যবর্গের বিভিন্ন 'রাজ্য' জয়, 'শাসন ব্যবস্থা সংহতকরণের' প্রশংসা করলেও ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে একটা তথ্য পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, খোলাফায়ে রাশেদার সময়ে নির্যাতন ও শোষণ থেকে মুক্তির প্রবল আকাঙ্ক্ষায় জনতা নিজেরাই 'ইসলামকে' সাদরে আমন্ত্রণ ও গ্রহণ করেছিলেন। আর এর বিপরীতক্রমে আমীরদের শাসনামলে নিজেদের মধ্যকার আত্মবিনাশী রক্তক্ষয়ী সংঘাত এবং নবরাজ্য জয়ে জনতার আকাঙ্ক্ষার তোয়াক্কা না করে জোরপূর্বক দখল প্রতিষ্ঠা করা হয় রোমীয় ও পারস্য সম্রাটদের পদ্ধতির অনুসরণে। এদের এ কাজের ফলে 'তরবারির জোরে ইসলামের প্রচার ঘটেছে'

বলে বিরুদ্ধবাদীরা অভিযোগ তোলার অবকাশ পেয়েছেন। তবে এখানে আরেকটা বিষয়ও লক্ষ্যণীয় যে, খেলাফত পরবর্তী আমীরতন্ত্র-রাজতন্ত্রে মসজিদে নামাযের কাতারে বর্ণ-ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সাম্য এবং নবীজী (দ.) কর্তৃক বিলুপ্ত বর্ণবৈষম্য ও বর্ণভেদ প্রথার ধারাবাকিতা বজায় ছিল ও আছে।

২. Prof. S. Rahman: An In.roduction to Islamic Philosophy, Dhaka, 1951.

৩. প্রফেসর রশীদুল আলম, মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭১, পৃ. ৫০৭, ৫১৯।

৪. Prof. P. B. Chatterjee: Outlines of General Philosophy, Calcutta, 16th edition, 1956, P. 286.

৫. আদি প্রজ্ঞা বা নূর-ই-মুহাম্মদী বিষয়ক তথ্যাবলীর উৎসসূত্র : (১) Prof. S. Rahman. An In.roduction to Islamic Philosophy, (২) প্রফেসর রশীদুল আলম, (৩) Titus Burckhardt : An In.roduction to sufi Doctrine;

৬. খাদেমুল ফোক্বারা মওলানা সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী : বেলায়তে মোত্লাকা, দশম ও চতুর্দশ পরিচ্ছেদ।

৭. Titus Burckhardt Zuvi An In.roduction to sufi Doctrine গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে THE SPIRIT শীর্ষক ৫ম অধ্যায়ে লিখেছেন: The Universal Spirit (ar-Ruh) which is also called the "first In.ellect" (al-aql al-awal), is described sometimes as created, sometimes as uncreated. According to the saying of the prophet "the first thing which God created is The Spirit (ar-Ruh)' it is created and, according to the passage in the Quran where God says of Adam "And I breathed in.o Him My Spirit", it is uncreated, because directly united with the Divine Nature. As for the verse in the Quran which describes the nature of the spirit in these words: "They will Question you about the Spirit; say to them: The Spirit (proceeds) from the commaud (al_Amr) of my Lord---(XVII, 84)." This can be in.erpreted in either sense—that the spirit is of the same nature as the Divine Command---or order---which is of necessity uncreated since it is It which creates all things, or that the Spirit proceeds from the Order and is itself at an ontological level immediately below that Order.

If there are both these aspects of the Spirit it is because it is the mediator between the Divine Being and the conditioned Universe. Uncreated in its immutable essence it is yct created in as much as it is the first cosmic entity. It is compared to the supreme Pen (al-Qalam al-a'la) with which God inscribes all destinies on the guarded Tablet (al-Lawh al-Mahfuz) which itself corresponds to the universal soul (an-Nafs al-Kulliyah). For the Prophet said that the "first thing God created is the Pen; He created the (guarded) Tablet and said to the Pen; Write! And the Pen replied : and what shall I write? (God) said to it: Write my Knowledge of my creation till the day of resurrection; then the pen- traced what had been ordained." So the Spirit includes all the divine Knowledge concerning created beings, and--this means that it is the Truth of truths or the Reality of realities (Haqiqat al Haqa'iq) or `according to the aspect in which it is envisaged-- the direct and immediate manifestation of Reality of realities.

Certain Sufi writers, such as `Abdal-karim al-Jili, give the name Holy Spirit (Ruh al-Quddus) to the uncreated essence of the spirit and compare it to the Face of God (Wajh Allah); this is what is here to be understood by the divine In.ellect.

* The Divine Command (al-Amr)
* The Divine In.ellect or the Holy Spirit (Ruh al Kuddus).

The most "central" image of the Spirit on this earth is Man (also vide: the Quran 2:30, 95:4)

৮. মুসলিম মনীষা : আবদুল মওদুদ, কলিকাতা, ১৯৫৫ইং (মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবী) অধ্যায়।

৯. দীওয়ান-ই-খাজা মাঈনুদ্দিন চিশ্‌তি: অনুবাদ, সম্পাদনা, টীকাভাষ্য: জেহাদুল ইসলাম ও ড. সাইফুল ইসলাম খান, ঢাকা, ২০০৩ পৃ: ১০০) এবং মুসলিম দর্শন বিষয়ক পূর্বোক্ত গ্রন্থাবলীসহ লালনগীতি সংগ্রহমালা এবং অন্যান্য সমজাতীয় অপরাপর গ্রন্থ। [লালন সাঁই-এর গান: শক্তিনাথ ঝা, কবিতা পাক্ষিক, কলকাতা, ২০০৫]; লালন সংগীত (অখণ্ড), সংকলন ও সম্পাদনা: দিলীপ বিশ্বাস, মম প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৬]।

১০. An In.roduction to Sufi Doctrine: Titus Burckhardt: Chapter vii; `Union in the Doctrine of Muhyi D-Din Ibn 'Arab' Ref. The Wisdom of the Prophets, The Chapter on Seth.

১১. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত: সঙ্কলন সংগ্রাহক: মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন (মাইজভাণ্ডারী), পঞ্চম প্রকাশ, সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ, হযরতের মজহাবী মছায়েলের উত্তর দান–অনুচ্ছেদ পৃ: ১৮৫।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

আরিফ বিল্লাহ হযরত আবদুল করিম ইবনে ইব্রাহিম আল-যিলি (র.)

[১৩৬৫-১৪১৭ খৃ.]

১. হযরত ইবনুল আরাবীর (র.) ইন্তিকালের ১২৫ বছর পর জন্ম হযরত আবদুল করিম আল যিলি ইবনে ইব্রাহিমের। ইবনুল আরাবীর ফুতুহাত আল-মক্কিয়াহ্ এবং ফুসুস-আল-হিকম গ্রন্থের দর্শন ও অধ্যাত্মতত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত তাঁর চিন্তাধারা। তিনি ২০টির বেশি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলোর মধ্যে বিস্ময়কর গ্রন্থের নাম 'ইনসান-ই-কামিল (আদর্শ মানব, পূর্ণাঙ্গ মানব, Universal Man)। তাঁর উদ্দিষ্ট ইনসান-ই-কামিল হলেন নবীজী হযরত মোহাম্মদ (দ.)।

২. তাঁর দর্শনের সার কথা: সত্তা (হক্ব, বাস্তবতা, reality) একক ও অদ্বিতীয়। মাখলুকাত এই হক্বের বাহ্যিক প্রকাশ। হক্ব বা সত্তার বিভিন্ন স্তর রয়েছে ঃ

প্রথম স্তর: ওজুদে মৎলক (জাত বা প্রকৃত অস্তিত্ব), যা দু'ভাগে বিভক্ত: (ক) আমা অর্থাৎ অন্ধকারময় অচিন্ত্যনীয় সত্তা, (খ) আহাদিয়াত (oneness একত্ব)।

দ্বিতীয় স্তর: ওয়াহদাত (একমাত্র অদ্বিতীয়ত্ব, uniqueness), যা দু'ভাগে বিভক্ত: (ক) গুণবিহীনতা (impersonal/attributeless) (খ) বহুত্বের সত্যতা (plurality)

তৃতীয় স্তর: ওয়াহ্দিয়াত বা একক সত্তা, যা তাঁর নাম ও গুণাবলীর মাধ্যমে প্রকাশিত, যার ফল এই মাখলুকাতের সৃজন ও বিকাশ।

ওয়াহ্দিয়াতের পরে এর প্রকাশ ঘটেছে দুই রূপে: ক. রহমানিয়াত, খ. নবুবিয়াত, আল্লাহ্র জাতের প্রধান গুণ বা সিফাত ১. জামাল (সৌন্দর্য), ২. জালাল (প্রমত্ততা), ৩. কামাল (পরিপূর্ণতা), ৪. হায়াত (জীবন, life), ৫. ইল্ম (জ্ঞান, knowledge), ৬. ইরাদা (ইচ্ছা, মমতা প্রভৃতি), ৭. কুদরত (শক্তি, power), ৮. কালামুন (বাণী, উচ্চারণ) ৯. সামিউন (শ্রবণ) এবং বশীরুন (অবলোকন)।

গ. 'ইনসান-ই-কামিল' পুস্তকে তিনি নফ্সকে (প্রবৃত্তি) পাঁচ ভাগে ভাগ করেছেন: ক. নফ্সে হাইওয়ানী, খ. নফ্সে আম্মারাহ, গ. নফ্সে মোলহেমা, ঘ. নফ্সে লাওয়ামা, ঙ. নফ্সে মুতমাইন্না।

ইবনুল আরাবী'র ওয়াহদাতুল ওজুদ তত্ত্বের অনুসারী আল-যিলি ইনসানে-কামিলের স্তর বুঝাতে আল্লাহ্র ওয়াজেবুল ওজুদ ও বান্দার আরেফুল ওজুদের এক ও অভিন্ন

ওয়াসেলকে (একত্রীভবন) বুঝিয়েছেন। উপমাস্বরূপ তিনি বলেছেন: অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত দাহ্য ও আগুনের রঙে একাকার লোহাকে পৃথকভাবে সনাক্ত করা যায় না। লোহা আর আগুনের পার্থক্য দৃশ্যতঃ বিলুপ্ত হয়। বস্তুতঃপক্ষে, ওয়াহদাতুল ওজুদ তৌহিদবাদের এক অনির্বচনীয় অভিব্যক্তি।[১]

টীকা : তথ্য সূত্র

১. সুফি দর্শন, ফকির আবদুর রশীদ, (খ) An In.roduction to Sufi Doctrine, Titus Burckhardt;

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

দার্শনিক মাওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (র.)

[১২০৭-১২৭৩ খৃ.]

"নবীর অত্যাবশ্যকীয় কাজ হলো মানুষকে মুক্ত করা"

১. 'বেলায়তে মোত্লাকা'র মর্মার্থের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) দার্শনিক মওলানা জালাল উদ্দিন রুমীর (র.) মসনবী শরিফের এই বয়েত উদ্ধৃত করেন:

হাস্তে দুনিয়া আয খোদা গাফেল বুছন
নাহ্ কামাস্থ ও নাকরাহ ও ফরান্দ ওজন্

["খোদাকে ভুলে যাবার নামই দুনিয়া; সংসার, সামগ্রী, টাকা-পয়সা-স্ত্রী-পুত্র দুনিয়া নহে।"]

এই বিখ্যাত লাইন দুটো নবীজীর (দ.) একটি হাদিসের ফার্সী কাব্য রূপান্তর। দর্শন ও তাসাওউফ জগতের অন্যতম প্রভাবশালী দার্শনিক জালাল উদ্দিন রুমী (র.) দুনিয়া ও আখিরাতের সুসমন্বিত অর্থপূর্ণ মানব জীবন কামনা করেছিলেন এবং সে কারণেই মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে তিনি আবশ্যকীয় হয়ে আছেন, যেভাবে হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) শরিয়ত ও মারিফাতের সমন্বয়ে পরিপূর্ণ মানব জীবনের ছক এঁকেছেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গ্রীক, ভারতীয়, মুসলিম দর্শন তথা সামগ্রিক দর্শনশাস্ত্র সম্পর্কিত বিষয়ে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-শিক্ষক জালাল উদ্দিন রুমী তাঁর সময়কাল থেকে এ যাবৎকাল পর্যন্ত কেবল দর্শন, শরিয়ত, মারিফাত বিষয়ে নয়, উন্নততর সাহিত্য জগতেও প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসনে আসীন। অতি আধুনিক জীবন-যন্ত্রণায় বিক্ষত পশ্চিম গোলার্ধের মানুষ তাঁদের ক্ষতে শান্তি-শুচিতার প্রলেপ লাগাতে গিয়ে এই মহান দার্শনিক-সাধকের দর্শন-সাহিত্যের ঝর্ণার তীরে ভিড় করছেন এবং তাঁদের এই আকাঙ্ক্ষার ফলশ্রুতিতে নব নবভাবে আবিষ্কৃত ও উদ্ঘাটিত হচ্ছেন রুমী। রুমীর দর্শন, সাহিত্য শুধু নয়, তাঁর ঘুর্ণন নৃত্য-জিকির পদ্ধতিও ঠাঁই করে নিচ্ছে পশ্চিমা বিবর্ণ সমাজে।

২. মওলানা রুমী পিতার দিক দিয়ে প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.)-এর বংশধর এবং মায়ের দিক দিয়ে খোরাসানের শাসক খাওয়ারিজম শাহ্ তাঁর প্রমাতামহ। এই বংশে আবির্ভূত হয়েছেন কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাপস। তাঁর দাদা মওলানা হোসেন বলখী ও বাবা মওলানা বাহাউদ্দিন উভয়েই আলেম ও সাধক হিসেবে সাধারণ্যে শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। রুমী নিশাপুরে অবস্থানকালে বাল্যকালে হযরত ফরিদ উদ্দিন

আত্তারের (র.) সান্নিধ্য ও স্নেহ লাভ করেন। তিনি রুমীকে এক খণ্ড 'আসরার নামা' উপহার দেন ও দোয়া করেন।

রুমী পিতার হাতে তফসীর, হাদিস, ফিকাহ্, যুক্তিবিদ্যা, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা লাভ করেন এবং মারিফত সাধনার সবক নেন। তিনি বিজ্ঞান ও কলাবিদ্যায় শিক্ষা অর্জন করার জন্য সিরিয়া, দামেস্কে সাত বছর অধ্যয়ন করে বিভিন্ন দেশ পর্যটন করেন এবং কুনিয়াতে (রুম বা এশিয়া মাইনর) বিজ্ঞান, দর্শন শাস্ত্রে অধ্যাপনা, গ্রন্থ রচনা ও আধ্যাত্মিক সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন।

প্রথম দিকে তিনি রক্ষণশীলমূলক শরিয়তী জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। কিন্তু বিখ্যাত মজজুব তাপস হযরত শামসে তাবরীজের (র.) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত হয়ে বাতেনী জ্ঞানের সমুদ্রে ঝাঁপ দেন এবং নতুন এক সৃজনশীল মানুষ হিসেবে আবির্ভূত হন। তাসাওউফ বিজ্ঞানের জগতে তিনজন দার্শনিক একই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা হলেন: ইমাম গাজ্জালী, ইবনুল আরাবী, মাওলানা রুমী। আবার মিস্টিক বা অতীন্দ্রিয়বাদী কবি হিসেবে বর্ণিত তিনজন হলেন: হযরত ফরিদ উদ্দিন আত্তার, সানাই ও রুমী। অতএব, যুগপৎ দর্শন ও সাহিত্য ভুবনে রুমী অতি উচ্চ আসনে সমাসীন।

আত্তার ও সানাই-এর প্রতি তাঁর চিন্তা-দর্শনের ঋণ স্বীকার করে তিনি লিখেন :

'(তাসাওউফ তত্ত্বে) আত্তার ছিলেন আত্মা, সানাই ছিলেন চক্ষু,
আমি আত্তার ও সানাইয়ের চরণ চিহ্নে কদম ফেলেছি মাত্র।'

৩. বিশ্বের দর্শন-সাহিত্য জগতে তাঁর অতুল অবদান 'দীওয়ান-ই-শামসে তাবরীজ', 'মসনবী' এবং 'রুবাইয়াৎ', তাঁর পত্রাবলীর সঙ্কলন 'ফিহ-মা-ফিহ'। দীওয়ানে শামসে তাবরীজে আছে আড়াই হাজার গজল। রুবাইয়াৎ-এ আছে ষোল হাজার রুবাই। মসনবীতে রয়েছে ছয় খণ্ডে ত্রিশ হাজার শ্লোক বা দ্বিপদী অর্থাৎ ষাট হাজার পঙ্‌তি, এটা রচিত হয় চল্লিশ বছরের বেশী সময় ধরে। রুমী দর্শন-সাহিত্যের বিশেষত্ব এই যে, এগুলো কোন সম্প্রদায়ের গণ্ডীতে আবদ্ধ নীতিগ্রন্থ নয়। মুসলিম-হিন্দু-খৃস্টান-ইহুদী, পার্সী নির্বিশেষে সবাই এসব গ্রন্থ থেকে গভীর পরমার্থ প্রেমের অনাবিল সুধা পান করতে পারেন। আচার, শাস্ত্র বিধান বা ধর্মের বাহ্যিক আচরণ নিয়ে এতে কোন বিতর্ক নেই। মানবাত্মা ও পরমাত্মার শাশ্বত ঐক্য ও প্রেমই মসনবীর বিষয়বস্তু, যা বিভিন্ন কাব্যিক রূপক-উপমায় বিবৃত। তিনি বিশ্ব-মানবতাকে আল্লাহ্‌র অভিন্ন সৃষ্টিরূপে জ্ঞান করতেন এবং তাঁর দর্শন-সাহিত্য এই চিন্তার সুস্পষ্ট রূপায়ণে সমৃদ্ধ। স্রষ্টার প্রেমের রাজ্যে কোন প্রকার জাতি-বর্ণ বা দেশ ভেদ থাকতে পারে না, এটাই তাঁর রচনার প্রতিপাদ্য। তাই তৌহিদে আদ্বীয়ান তত্ত্বে আস্থাশীল মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বিশ্বস্ত অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছেন মাওলানা রুমী।

৪. দার্শনিক রুমীর বিস্তার সমগ্র দর্শন-ভুবন জুড়ে। তাঁর খুদীর বিনাশ তত্ত্ব বা ফানা দর্শন জগতে অব্যাহত আলোচনার বিষয়-বস্তু, যা দার্শনিক ইকবালকে নবতর চিন্তার আকাশে উৎক্ষেপণ করেছে। তবে তাঁর খোদা 'নির্গুণ একক' নন; সক্রিয় গতিশীল। কাজেই খোদার মধ্যে ফানার মানে তাঁর মধ্যে অবলুপ্ত হওয়া নয়, বরং 'তাখাল্লাকু বি আখলাফিল্লাহ্' বা খোদার সিফত বা গুণাবলী অর্জনপূর্বক নিজেকে সমৃদ্ধ ও উন্নত করা। তাঁর খোদা-তত্ত্বের মূলমন্ত্র হলো নিজের খুদী না হারিয়ে খোদার গুণে গুণান্বিত হওয়া। খোদাতে প্রত্যাবৃত্ত হয়ে সেখান থেকেই নবরূপে উপ্ত হওয়া।

তাঁর দর্শনের সারবস্তুঃ

আত্মার স্বরূপ অন্বেষা, সৃষ্টিতত্ত্ব, দেহ ও মানবতাবাদ, ইচ্ছার স্বাতন্ত্র্য, নূরে মোহাম্মদী, ইনসানে কামিল হযরত মোহাম্মদ (দ.), ইলমে লাদুন্নি বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান, ব্যক্তিত্বের উদবর্তন, উরুজ প্রভৃতি দর্শনের সর্ব বিষয়ে তাঁর চিন্তার স্বাতন্ত্র্য দর্শন জগতকে নানাভাবে উদ্বুদ্ধ ও প্রভাবিত করে চলেছে। তাঁর মতে, খোদার সত্তায় ব্যক্তিসত্তার সমাধি সুফির লক্ষ্য অর্থাৎ 'ফানা' মানে নিম্নতর আত্মার উচ্চতর আত্মায় উন্নয়ন। সৃষ্টিদর্শন সম্পর্কে তাঁর পরিশীলিত ধারণা তাঁকে বিবর্তনবাদী চিন্তাবিদের আসনে স্থাপন করেছে। বিগত শতাব্দী থেকে সূচিত আধ্যাত্মিক বস্তুবাদের spiritual materialism-এর বীজ তাঁর দর্শনেও সুপ্ত রয়েছে।

একদিকে ভাব-বিভোরতা, অন্যদিকে জীবন ও সৃষ্টির বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের গতিশীলতা উভয় গোলার্ধের চিন্তা ও কর্মজগতে দার্শনিক-সাধক-কবি জালাল উদ্দীন রুমীর বলিষ্ঠ পদচারণাকে করে রেখেছে অনিবার্য। তাঁর উপলব্ধিঃ আল্লাহ্কে মানব চিন্তার সীমায় আবদ্ধ করতে চাওয়া ধৃষ্টতামাত্র। বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তা-শক্তির সকল জরীপের অতীত তিনি।

রুমীর উপলব্ধি :

'তুমি যা কিছু চিন্তা করবে, ধারণা করবে, তা নশ্বর,
তুমি যা ধারণা করবার কল্পনাও করতে পার না, তাই আল্লাহ্',
অতএব, আল্লাহ্র প্রেমে মশগুল হয়ে, পাগল ও আত্মহারা বা মস্ত ও মদহোশ হয়ে তাঁর সান্নিধ্য লাভের সাধনা করাই হচ্ছে মানব জীবনের চরম চাওয়া ও পরম পাওয়া'।

রুমীর তৃপ্তি :

"আমার ঐশী সত্তা দৈহিক সত্তায় মিশে গেছে
আর দৈহিক সত্তা ঐশী সত্তা লাভ করেছে,
আমার আল্লাহ্র পিয়ালা আমার ক্ষুধা মিটিয়েছে
প্রেমের এই তো মহৎ লক্ষণ।"

তবে ইশ্‌কে ইলাহীতে মগ্ন হয়ে মানুষ, সমাজ ও দেশের প্রতি কর্তব্য ও সেবাকে গৌন করতে বা ভুলে যেতে বলেননি তিনি। তাঁর পরম কথা: সত্যকে, কল্যাণকে, সুন্দরকে, মানুষকে, মিল্লাতকে, স্বদেশকে ভালোবাসাই হচ্ছে ইশ্‌কে ইলাহীর পথে 'সিরাজুম মুনীরা– শ্রেষ্ঠতম আলোকবর্তিকা।'

নায়েবে রাসূলের সংজ্ঞা: "প্রকৃত প্রস্তাবে সেই ব্যক্তিই রসূলুল্লাহ্‌র নায়েব বা প্রতিনিধি, যাঁর দিলের মধ্যে খোদার হুকুম নাজেল বা অবতীর্ণ হয়।"

টীকা : তথ্য সূত্র

১. অহ In.roduction to Islamic Philosophy; Prof. S. Rahman.
২. Metaphysics of Rumi: Dr. Khalifa Abdul Hakim.
৩. মুসলিম মনীষা, আবদুল মওদুদ
৪. মুসলিম দর্শনের ভূমিকা: প্রফেসর রশীদুল আলম।

চতুর্বিংশ অধ্যায়

হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)

[তাসাওউফের বহুত্ববাদী সংসারের দার্শনিক অভিভাবক,
মহান এক চির আধুনিক মানব]
[১৮২৬-১৯০৬]

"দুনিয়া দারুল রেহালত। পান্থশালা। এখানে আড়ম্বরের দরকার কী"!
স্থূল ভোগবাদী প্রবৃত্তি-পূজা প্রত্যাখ্যান

১. এক চির আধুনিক মানবঃ

আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন আল-কুরআনের একাধিক আয়াতে নবী-রাসূলগণ সম্পর্কে এই মর্মে প্রত্যয়ন করেছেন যে, তাঁরা তাঁদের খেদমতের 'বিনিময় প্রত্যাশী' নন। নবীদের ওয়ারিশ হিসেবে মহান ওলী-আল্লাহ্রাও মানুষ তথা পৃথিবীর কাছ থেকে কোন প্রকার বিনিময় প্রত্যাশী নন। নবী-ওলীদের জীবনচরিতই তার প্রমাণ। অতএব, নবীরা যেমন শাশ্বত আধুনিক মানব, তেমনি মহান ওলী-আল্লাহ্রাও তাঁদের ওয়ারিশ হিসেবে জীবন-বৈশিষ্ট্যগুণে শাশ্বত আধুনিক মানব। উল্লেখ্য, 'আধুনিকতা' শব্দটার অন্তর্গত ব্যঞ্জনা এই যে, সমকালে সর্বজনীন কল্যাণময়তা বিশেষ করে দুর্গত মানবতার মুক্তি ও মঙ্গল কর্মসূচী আর কর্মই 'আধুনিকতা' হিসেবে লোকসমক্ষে আবির্ভূত হয়। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্'র (ক.) জাহেরী জীবন সর্বজনীন কল্যাণের পথে দিশারী আলোকচ্ছটার মতো, সমাজের বিশুষ্ক রুঠা মাঠে প্রত্যাশিত কল্যাণময় বৃষ্টির মতো লোক-সমাজে উদ্ভাসিত। তাই তাঁকে 'চির-আধুনিক মানব' হিসেবেই গ্রহণ, বরণ ও মূল্যায়ন করতে হবে, যিনি সতত কল্যাণময়তার আধার। তাঁর একটি মহান বাণী: "যে কেউ আমার সাহায্য প্রার্থনা করবে, তাকে আমি উম্মুক্ত সাহায্য করবো। আমার সরকারের এই প্রকৃতি হাশর তক্ জারি থাকবে।"

মহান নবী-রসূলদের রেওয়াজ ও ঐতিহ্য অনুসারে সাধারণ মানুষদের অতি সহজবোধ্য ভাষায় বিবৃত তাঁর এই ধরনের উক্তি বা কালামগুলোকে বৃহত্তর দার্শনিক, রূহানী ও সামাজিক আয়নায় অবলোকনপূর্বক আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে গ্রহণ করলে অনুদ্ঘাটিত বহু তথ্যে ভর্তি মহান সৃষ্টি-প্রকল্পের অনেক গভীরে প্রবেশ করা সম্ভবপর। একই সাথে

হৃদয়ঙ্গম করা যাবে পৃথিবীতে তাঁর আবির্ভাব ও অস্তিত্বের শাশ্বত প্রকৃতি ও সজীব ক্রিয়াশীলতাকে।

২. জীবন-সাধনার গুরুত্বপূর্ণ ফসল ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেলায়তে মোত্লাকা তথা রবুবিয়াত নীতির পর্দা উন্মোচনঃ

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কঠোর জীবন-সাধনার সর্বাধিক সামাজিক গুরুত্বপূর্ণ ফসল হলো বেলায়তে মোত্লাকা তথা রবুবিয়াত বা পালনবাদের নীতির যুগপৎ জাহেরী ও রুহানী সক্রিয়তার পর্দা উন্মোচন, যা দ্বন্দ্ব-অসাম্য-জুলুম বিক্ষত পৃথিবীতে সমতাবাদী, সহনশীল, বহুত্ববাদী পারস্পরিক সহাবস্থানমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র বিনির্মাণের সহজ পথ নির্দেশক। মানুষকে পৃথিবীতে শুধু তাদের নিজেদের ভোগ-স্বাচ্ছন্দ্য, তৃপ্তি লাভের মধ্যে সীমিত থাকার জন্য পাঠানো হয়নি; সকল মানব, প্রাণীকুল এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যশীল করে পাঠানো হয়েছে। গণমুখী ইসলাম ধর্মসমেত সকল ধর্মের এটাই মৌলিক দার্শনিক মর্মবাণী।

তিনি শাশ্বত আধুনিক, পরিশীলিত, পবিত্র একজন পরিপূর্ণ মানব। নিজের ও নিজের সংসারের চেয়ে দুনিয়া জোড়া প্রতিবেশীদের কল্যাণই তাঁর প্রধান কর্মসূচি, যা সম্পাদনে সাফল্য তাঁকে গাউসিয়াত ও কুতুবিয়াত উভয় শিরোপার অধিকারী করেছে, যা মানব রুহের অমর গতিশীলতার বিধানের সূত্র ধরে দুনিয়াদারী ও দুনিয়াগিরির প্রথম পর্বের উপসংহার রোজ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। মহাজাগতিক বৈজ্ঞানিক তথ্যাদির আলোকে এসব অধরা বিষয় বিশ্লেষণ করলে মূল সত্য সম্পর্কে যথাকিঞ্চিৎ ধারণা পাওয়া সম্ভব।

৩. শিক্ষা এবং জীবনের অভীষ্ট স্থিরকরণঃ

তীক্ষ্ণ মেধাবী ও সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মানব হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) উচ্চতর শিক্ষার উদ্দেশ্যে ১২৬০ হিজরী সনে কোলকাতা আলীয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হন এবং ১২৬৮ হিজরী সনে কৃতিত্বের সাথে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেন। তাঁর শিক্ষা জীবন অত্যন্ত উজ্জ্বল। সব পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করতেন। মাসিক বৃত্তি, বিবিধ মেধা পুরস্কার তাঁর শিক্ষার ব্যয় সংস্থানে সহায়ক হয়। কুরআন, হাদিস, তাফসির, ফিকাহ্, মন্তেক, হিকমত, বালাগত, উসুল, আকায়িদ, ফিলসফা, ফরায়েজ যাবতীয় শাস্ত্রে তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। আরবী, উর্দু, বাংলা, ফার্সী ভাষায় তাঁর পারদর্শিতা ছিল চমকপ্রদ।

বর্ণাঢ্য শিক্ষা জীবনের পটভূমিকায় তিনি "হক্কুল ইবাদ" অর্থাৎ বান্দার অধিকার সংরক্ষণকেই তাঁর জীবনের লক্ষ্য হিসেবে স্থির করেন। আইন শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন মানসে তৎকালীন 'মুন্সেফী' অধ্যয়নে ব্রতী হন এবং যশোহর জেলায় ১২৬৯ হিজরী সনে বিচার বিভাগে কাজী পদে নিয়োজিত হন। এর মধ্যে শিক্ষকতাকে তিনি

অধিকতর কল্যাণপ্রসূ বিবেচনা করে ১২৭০ হিজরী সনে কাজী পদে ইস্তাফা দিয়ে কোলকাতায় মুন্সী বুঁ-আলী (র.) মাদ্‌রাসায় প্রধান মোদার্রেসের দায়িত্ব গ্রহণ করেন[১]। তাঁর সততা, নিষ্ঠা, মহৎ চরিত্র, জ্ঞান-গরিমায় আস্থাশীল হয়ে বহু পরীক্ষা-সমীক্ষা শেষে হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ মহীউদ্দিন আবদুল কাদের জিলানীর (র.) অধঃস্তন পুরুষ ও আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী সৈয়দ আবু শাহমা মোহাম্মদ সালেহ্ আল-কাদেরী লাহোরী (র.) তাঁকে মারিফাতের 'লাল' হস্তান্তর করেন এবং খলিফা রূপে অভিষিক্ত করেন। এর পাশাপাশি প্রায় একই সময়ে হাজীউল হারামাইন হযরত শাহ্ দেলাওয়ার পাকবাজ (র.) [হযরত আবু শামা লাহোরীর (র.) জ্যেষ্ঠভ্রাতা] থেকে ইত্তেহাদী ফয়েজ অর্জনে ধন্য হন।

এই দুই বিশাল গুরুভার খোদায়ী আমানত সংরক্ষণ এবং বহন শক্তি অর্জনের জন্য তিনি কঠোর রিয়াজতে মগ্ন হন। এর মধ্যে তাঁর উপর দিয়ে প্রচণ্ড সাংসারিক ঝড়-ঝাপটা বয়ে যায়। আর্থিক টানা-পোড়েনের মধ্যে শুরু হয় তাঁর অগ্নিপরীক্ষা। তিনি প্রবল ধৈর্য, তাওয়াক্কাল অবলম্বন করে জাহেরী-বাতেনী উভয় ময়দানে সংগ্রামে কামিয়াবী অর্জন করেন এবং উভয় বুরুজের মর্যাদাসম্পন্ন অধিবাসী হিসেবে আল্লাহু রাব্বুল আলামিনের মেহেরবাণীতে সিক্ত হন।

৪. হক্কুল ইবাদ : মানব তথা জীবের অধিকার সচেতনতা

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন পথে অভিযাত্রা শুরু হয় হক্কুল ইবাদ–বান্দার অধিকার সংরক্ষণের ব্রত নিয়ে। হক্কুল ইবাদ হচ্ছে আল্লাহ্‌র রবুবিয়তের (পালনবাদের) সুবিন্যস্ত, সুপরিকল্পিত মহা-প্রশাসনের প্রধান বিভাগ। তাসাওউফ শাস্ত্র মতে, এই বহুমুখী গুরুদায়িত্ব অর্পিত হয় প্রবল রুহানী শক্তিসম্পন্ন ওলী-আল্লাহ্‌দের উপর। হযরত সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) তেমনই এক প্রবল কল্যাণশক্তিসম্পন্ন ওলী-আল্লাহ্। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য; তাসাওউফ মতে, মুসলিম ওলী-আল্লাহ্‌রা যেহেতু যে কোন সমীক্ষণমূলক বিবেচনা ও বাস্তব কাজে পূর্ণ মাত্রায় সামাজিক মানুষ হিসেবে বিরাজ করেন, সেহেতু তাঁদের জীবন ও কর্মের বিশ্লেষণ বাস্তব আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে হওয়া বাঞ্ছনীয়। সকল মহান ওলী-আল্লাহ্‌র জীবন-কর্ম-সংগ্রাম এই রূঢ় বাস্তবতারই দৃষ্টান্ত বহন করে। তাঁরা সর্বজনীন রবুবিয়াতের জীবন্ত প্রতীক। আল্লাহ্ অর্পিত এই দায়িত্বের প্রতি অতি-সংবেদনশীল। মানব সমাজ ও জীবনের সাথে তাঁদের সম্পৃক্ততা অহোরাত্র সার্বক্ষণিক। আগেই বলা হয়েছে, ওলী-আল্লাহ্‌রা জীবন-ঘনিষ্ঠ মানব। হযরত গউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিদ্ধ হচ্ছিলেন যুগ-যন্ত্রণায়। চারপাশের নিম্নবর্গীয় মানুষদের সার্বিক দুর্দশা তাঁকে পীড়িত করছিল এবং তাদের জন্য 'হক্কুল ইবাদ' প্রতিষ্ঠার ব্যাকুলতা তাঁর মধ্যে উচ্ছ্বসিত হচ্ছিল, যা আল্লাহ্‌র মেহেরবাণী লাভে সমর্থ হয়।

তিনি জীবনকে দেখেন এক অন্তহীন কাফেলারূপে। এর শুরু-শেষ কোথায়, তা কেবল আল্লাহ্ই জ্ঞাত। পৃথিবী সেই অন্তহীন কাফেলা পথের একটা অংশ মাত্র। সেই কাফেলার একজন 'সাধারণ অভিযাত্রী' হিসেবেই তিনি বেঁচেছিলেন সবার জন্যে, সবার সাথে ও মাঝে একজন হয়ে। অতি সাদামাটা মমতাময় তাঁর জীবন। আড়ম্বর, সঞ্চয়, বৈভব, প্রতিপত্তি সব কিছুই কৃত্রিম, বুদবুদের মতো। তাই তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় বলতে পেরেছেন–'দুনিয়া দারুল রেহালত। পান্থশালা। এখানে আড়ম্বরের দরকার কী?' একবিংশ শতাব্দীর দারিদ্রক্লিষ্ট দুনিয়ার তথা পৃথিবীর ইতিহাসের অভাবী মানুষদেরকে, যারা সর্বদা সংখ্যাগরিষ্ঠ; সম্যক অনুভব করতে সক্ষম প্রজ্ঞাবান মানবই এই সহজ কথাটা এভাবে সহজে ব্যক্ত করতে পারেন।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনে ওলী-আল্লাহ্গণের শাশ্বত রুহানী বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর জাহেরী জাগতিক প্রদীপ্ত বিচ্ছুরণ বর্ণাঢ্য। তাঁর সুবিশাল মহৎ জীবনে সংযোগ, সংশ্রব, উঠা-বসা, দৈনন্দিন আচার ছিল লক্ষ লক্ষ মানুষের সাথে। স্রেফ দার্শনিক, বিদ্বজ্জন, জ্ঞানী-পণ্ডিতদের সাথে ওলী আল্লাহ্দের মোটা দাগে তফাত এখানেই। জ্ঞানী-গুণী-দার্শনিকরা সাধারণতঃ থাকেন তাঁদের মহৎ গ্রন্থাগার, গবেষণাগার, সৃজনশীল রচনাবলীর সারিতে। আর ওলী-আল্লাহ্দের কারবার, জীবন, ধ্যান চলে দিবারাত অবিরাম মানুষ নিয়ে, মানুষের কল্যাণের ময়দানে। অগণিত চিত্র প্রতিফলিত হয় তাঁদের জীবন-পর্দায়, যেগুলোর রকম বা প্রকারের শ্রেণী বিন্যাস করা অসম্ভব। তাঁরা দর্শনের তাত্ত্বিক ও ফলিত উভয় প্রক্রিয়ার নিদর্শন। এই হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কথাই ধরা যাক; তাঁর জীবন গ্রন্থের অধ্যায় বেশুমার: সকলের প্রতিপালন-দায়িত্ব, ধর্মীয় সহাবস্থান, নির্বিলাস সাধনা, শুচি সিগ্ধ জীবন, দর্শন, শিক্ষা ও ধর্মীয় তালিম প্রদান, সামাজিক-পারিবারিক বিবাদ-ভঞ্জন, রাজনীতি-সমাজনীতির গতি প্রবাহ পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি। সর্বজনীন কল্যাণময়তা, মানব-সমতার নীতি সুরক্ষা, কল্যাণমূলক প্রশাসনের পৃষ্ঠপোষকতা, বর্ণবাদ-ধনবৈষম্যবাদ-সাম্প্রদায়িকতাবাদ প্রতিরোধের তালিম প্রদান ইত্যাদি ছোট-বড়ো এমন কোন বিষয় ও সমস্যা নেই, যেখানে তাঁর কল্যাণ পরশ লাগেনি। তাঁর এই জীবন, এই কর্তব্য, এই দায়িত্ব সর্বাংশে আমাদের একবিংশ শতকের একজন সৎ, সৃজনশীল নাগরিকেরই জীবন যেন। তিনি একজন শিক্ষক, তিনি ত্রাতা, তিনি ছায়া, তিনি আশ্রয়–একজন মহান ওলী আল্লাহ্। তিনি মহান রাব্বুল আলামিনের প্রতিভূ। আধুনিক বিশ্লেষণে তিনি বহুত্ববাদী সংসারের দার্শনিক অভিভাবক, এক চির আধুনিক মানুষ।[২]

৫. হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কর্ম-কৃতি সর্বাংশে রুহানী প্রকৃতির এবং অদৃশ্য বাতাসের মতোই চারপাশের জীবন ও পরিবেশকে সুরক্ষা দিয়ে চলমান

থাকতে অকৃপণ সহায়তা যোগাচ্ছে। হযরত গাউসুল আযম সৈয়দ আবদুল কাদের জিলানীর (র.) বেলায়তে 'মোকাইয়াদা' ইসলাম ও মুসলিম সমাজের এক সঙ্কটপূর্ণ অধ্যায়ে অচলায়তন ভেঙ্গে গতিশীলতা এনেছিল সমাজের বিদ্যমান বহু অন্যায়, অনাচার প্রতিহত ও অপসারণ করে। তাঁর প্রায় ছয়শত বছর পর বিজ্ঞানে, জ্ঞানে, যন্ত্রপ্রকৌশলে উন্নত বিশ্বে ইসলাম তথা আল-কুরআন এবং নবীজীর (দ.) শিক্ষাকে সমকালে তাৎপর্যপূর্ণ ও উপযোগী হিসেবে প্রয়োগ করার যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাঁর আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকারী হিসেবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উপর সেই গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে। হযরত বড়পীরের (র.) অধস্তন উত্তরাধিকারীর কাছ থেকে তিনি যেমন মারিফাতের 'লাল' পেয়েছিলেন, তেমনি 'বেলায়তে মোত্লাকা'র উদ্ভব ও সচলতার দায়িত্বও যেন পেয়েছিলেন আধ্যাত্মিক উত্তরাধিকার হিসেবে। মানব সমাজ ও সভ্যতার বিকাশ ও চাহিদা পূরণ করতে আল-কুরআন ও নবীজীকে (দ.) অধিকতর সম্প্রসারিত স্বরূপে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে উদার, মুক্ত বা মোত্লাকার তশতরীতে বিশ্ব সমাজের সামনে পেশ করেন তিনি এবং তা 'বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের' বিবরণ অনুযায়ী রব্বানিয়াত বা রবুবিয়াত হিসেবে নীরবে-নিঃশব্দে জগতে বিস্তার লাভ করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকে শুরু করে যুদ্ধমুক্ত শান্তিমণ্ডিত বিশ্ব নির্মাণের যে আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া সূচিত হয়, তার সাথে তাঁর বেলায়তে মোত্লাকা দর্শনের সামাজিক রূপকল্প 'রবুবিয়াতের' নিবিড় সাযুজ্য বিদ্যমান। পৃথিবীর ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, দুই-দুইটা ভয়াল বিশ্বযুদ্ধের ক্ষত বুকে নিয়ে বিশ্ব মানব সমাজ জাতিসংঘের মতো ছত্রছায়ার উদ্ভব ঘটিয়েছে, যা সর্বজনীন পালনবাদের আংশিক রাজনৈতিক বহিঃপ্রকাশ বটে।

তাঁর নীরব সৃজনশীল প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাঁর স্বদেশ বাংলা মুল্লুকের বিবর্তনের ধারা লক্ষ্য করলে। শোষিত, নিপীড়িত চাষী-মাঝি অধ্যুষিত পূর্ব বাংলার বৈদেশিক পরাধীনতা ছিন্ন করার ধারা সূচিত হয়, যখন তিনি কোলকাতায় নিজের মানুষদের দুর্দশা লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছিলেন: "সিয়াসতকে আমি পূর্ব দিকে নিয়ে যাব।" বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ঢাকাকে রাজধানী করে পূর্ববঙ্গ–আসাম প্রদেশ গঠন, বৃটিশের বিদায় ও স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান গঠন এবং অতঃপর পশ্চিম পাকিস্তানী নয়া ঔপনিবেশিক কব্জা ছিন্ন করে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয়, যেন তাঁর সেই বাণীরই সম্মুখ পানে দৃঢ় অভিযাত্রা। ভবিষ্যতে এর গতিময়তার স্বরূপ কি হতে পারে, তা ভবিতব্যই জানেন।

হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানীর (র.) বেলায়তে মোকাইয়াদার কালোপযোগী সম্প্রসারিত রূপ 'বেলায়তে মোত্লাকার' তত্ত্ব ও দর্শনকে বাস্তবে প্রয়োগযোগ্য সামাজিক প্রকল্পরূপে বিন্যস্ত করার গুরু দায়িত্ব পালনকারী হযরত

গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আবির্ভাব ও কর্মকাল হিসেব করলে মুসলিম ঐতিহ্যানুযায়ী (tradition) তিনি 'মোজাদ্দেদ' মর্যাদায়ও প্রাকৃতিক নিয়মে অভিষিক্ত। মানব সভ্যতার আগামী দিনগুলোতে এ তথ্যের আরো প্রস্ফুটন ঘটাবে।

তাঁর বেলায়তী জীবনের প্রতি মুহূর্ত অসংখ্য কারামত বা সৃষ্ট জীবের কল্যাণময়তায় নিবেদিত ছিল। এগুলোর হিসেব-নিকেশ সম্ভব নয়। তাঁর অস্তিত্ব, পদচারণা, চলন-বলন, ইশারা-ইঙ্গিত সব ছিল সক্রিয় কারামতময়। 'কারামত' তাঁর কাছে ছিল নিতান্তই আটপৌরে ব্যাপারের মতো অর্থাৎ তাৎক্ষণিক কর্তব্য-করণীয়ের যথার্থ বাস্তবায়ন মাত্র। এ ব্যাপারে কোন সংশয় কিম্বা প্রশ্নের অবকাশও তিনি রাখেননি। স্পষ্ট ভাষায় তিনি বলেছেন: যব কুন্ কাহা, সব তো হোগেয়া। ফের গায়েব কাঁহা হ্যায়?" সমগ্র সৃষ্টি প্রক্রিয়া তাঁর চোখের সামনে প্রতিভাত! তিনি শুধু 'সৃষ্টের' পূর্ব নির্ধারিত অবস্থাটার গ্রন্থি খুলে দিচ্ছেন মাত্র! এমনই তাঁর মর্তবা।

না! এতে চোখ কপালে তুলবার কিছুই নেই। মানুষের অন্তহীন সম্ভাবনার কুরআনী দর্শনে বিশ্বাসীরা ছাড়াও যারা মানুষকে অনন্ত সম্ভাবনাময় সৃজনশীল প্রাণী হিসেবে স্বীকার করেন, তাঁরা যুক্তি বিজ্ঞান মতে যেমন এটা অস্বীকার করতে পারেন না, তেমনি পদার্থ বিজ্ঞানের আধুনিক উন্নয়ন ও বিকাশ সমগ্র মহাজগৎকে জ্ঞানের অভিন্ন এক কুলুঙ্গিতে স্থাপন করে চলেছে। তা বুঝবার ও অবলোকনের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিপক্ক জ্ঞান-চক্ষুর। হাদীসে কুদসীতে যেমনটা বলা হয়েছে: "আমি ফকীরের ভিতর এবং ফকীর আমার ভিতর। যখন বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে। তখন আমি তাঁকে বন্ধু বলে জানি। যখন আমি তাঁকে বন্ধু বলে জানি, তখন আমি তাঁর কর্ণ হই, যদ্বারা তিনি শ্রবণ করেন, আমি তাঁর চক্ষু হই যদ্বারা তিনি দর্শন করেন, আমি তাঁর হস্ত হই, যদ্বারা তিনি ধারণ করেন। আমি তাঁর পদযুগল হই, যদ্বারা তিনি হাঁটেন।" হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এই মহান বাণীরই নিদর্শন!

৬. স্থূল ভোগবাদী প্রবৃত্তি পূজা পৃথিবীতে সকল অনাসৃষ্টির উৎস:

নিবন্ধের শুরুতে উদ্ধৃত হযরত সাহেব কেবলার বাণীতে ভোগবাদী প্রবৃত্তি-পূজা প্রত্যাখানের তাগিদ রয়েছে। তিনি অত্যন্ত সরল ভাষায় ভোগবাদ তথা প্রবৃত্তি পূজাকে নাকচ করে দিয়েছেন। মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের প্রবণতা সক্রিয়। প্রবৃত্তিপূজা নিয়ন্ত্রণহীন দানবীয়। পৃথিবীর ইতিহাসের কালো অধ্যায়গুলো প্রবৃত্তি পূজার অভিশাপ ও কলঙ্কে জর্জরিত। তৌহিদ ব্যতীত অন্যসব পূজা ও উপাসনার মধ্যে জঘন্যতম হলো প্রবৃত্তিপূজা। অন্য সব সাকার-নিরাকার পূজা-অর্চনায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে সংযম, নীতিকথা প্রভৃতি সু-বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। কিন্তু ভোগবাদী প্রবৃত্তি পূজায় সৎ কোন লক্ষ্য নেই। আছে শুধু ভোগ, বাসনা ও রসনা তৃপ্তি। স্থূল ভোগবাদ, ভোগবাদী সংস্কৃতি আজ পৃথিবীকে জাহান্নামে পরিণত করে ফেলেছে। এর পরিণতি

মানব সভ্যতা সংস্কৃতি, এমনকি অস্তিত্বের জন্য ভয়াবহ। সাম্প্রতিক ২০২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে সূচিত কোভিড-১৯ মহামারীর ব্যাপকতায় এর কিঞ্চিৎ পরিচয় মিলেছে। আল-কুরআনের সূরা নজম ও সূরা জাসিয়াসহ বিভিন্ন স্থানে ইন্দ্রিয় প্রবণতা, ভোগ প্রবৃত্তি খায়েশকে ঘৃণা বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) এ বিষয়ে মানব সমাজকে শালীন ভাষায় সতর্ক করেছেন এবং উৎকট ভোগবাদ পরিহার করার তাগিদ দিয়েছেন যা কার্যতঃ সুষম স্নিগ্ধ কল্যাণময় সমাজ বিনির্মাণের অন্যতম মূলসূত্র।

বস্তুতঃ পৃথিবীর ইতিহাসের যে বিবরণ বিভিন্ন সূত্রে লিপিবদ্ধ আছে, তা বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ-ভিত্তিক কিম্বা সমাজতাত্ত্বিক গবেষণা ভিত্তিক, যা-ই হোকনা কেন; তাতে স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায় যে, কালে কালে যুগে উৎকট ভোগ-বিলাস প্রবণতাই মানব সমাজের পতন ও সর্বনাশ ডেকে এনেছে। এ আল-কুরআনে এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ বেশ কিছু বয়ান মানবজাতির জন্য সতর্কতামূলক বার্তা হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। প্রত্নতাত্ত্বিক বহু গবেষণায়ও কোনও না কোন জাতির করুণ পরিণতির স্কেচ উঠে আসছে। আমাদের এই একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীতে মোট সম্পদের কোন ঘাটতি দেখা যায় না। প্রতি মুহূর্তে জীবন ধারণের জন্য আবশ্যকীয় খাদ্য সামগ্রী অপচয় হচ্ছে। অথচ এই একবিংশ শতকের প্রথম পাদে উন্নত পশ্চিমা দুনিয়াই বলি, আর প্রাচ্যের দারিদ্র জর্জরিত অনুন্নত দেশগুলোই বলি, ধনতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক নির্বিশেষে সকল পদ্ধতির সমাজেই বঞ্চিত, অভাব-প্রপীড়িত মানুষের হাহাকার। প্রায় প্রত্যেক দেশেই হাজার হাজার কোটি ডলারের বাজেট প্রণীত হয়। নতুন নতুন মারণাস্ত্র তৈরীর প্রতিযোগিতা হয়। মানবতার শান্তি, সুখ, নিরাপত্তার পরিবর্তে হনন ও ধ্বংসের মহড়া চলছে প্রতিনিয়ত। এই কোভিড প্যানডামিককালেও তাতে বিরতি নেই।

আগের জমানায় নবী-রাসূলগণকে এই অনৈতিক ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা গেছে। এখন নবুয়ত-রেসালাত বন্ধ। মানবজাতির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হয়েছে ঐশী নবুয়তি-রেসালতি তালিমের কল্যাণে। আমরা বহন করছি তারই বিকাশশীল ঐতিহ্যের। প্রত্যেক রাষ্ট্রে প্রতি বছর উন্নয়নের বর্ণাঢ্য ফিরিস্তি প্রকাশিত হয়। অথচ কোটি কোটি মানুষের অত্যাবশ্যকীয় আহার্য ও বাসস্থানের অভাব প্রকট। সবই কাগুজে বাকসর্বস্বতা ও শুভঙ্করের ফাঁকিতে পর্যবসিত হয়। 'মানুষ মানুষের মতো প্রত্যাশিত জীবন যাপন করতে পারছে না। মানুষকে মানুষের মতো বাঁচবার পরিবেশ দিতে হবে।' হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) দুনিয়া ও মারেফাতী জীবনের অন্যতম প্রধান মিশন এটাও।

এ প্রসঙ্গে উৎকট ভোগবাদ অর্থাৎ প্রবৃত্তি পূজার ধূম-ধারাক্কা সম্পর্কে আল-কুরআনের হুঁশিয়ারীগুলোর কয়েকটা আয়াত পাঠ করা যাক : ক. যারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মতোই। বরং, আরো অধিক পথভ্রষ্ট (১৫: ৪৩-৪৪)। খ. তারা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির তাবেদারী করে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র হেদায়েতের পরিবর্তে স্বীয় প্রবৃত্তির তাবেদারী করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে (২৮:৫০)? এমন অপদার্থরা এলো, যারা সালাতের খেলাপ করলো এবং কুপ্রবৃত্তির তাবেদারী করলো (১৯:৫৯), আপনি তার প্রতি লক্ষ্য করেন নি, যে তার প্রবৃত্তিকে স্বীয় উপাস্যে পরিণত করেছে (৪৫:২৩)। ...যার নিকট নিজের মন্দকর্মগুলো উত্তম বলে মনে হয় এবং সে নিজের খেয়াল-খুশির তাবেদরী করে (৪৭:১৪)...এবং নিজেদের কামনা-বাসনার অনুসরণ করে (৪৭:১৬); তারা তো অনুমান ও নিজেদের প্রবৃত্তির তাবেদরী করছে (৫০:২৩)। এগুলো ছাড়াও আল-কুরআনে মানুষের জন্য উপযুক্ত পটভূমিকায় যথার্থ বার্তা ও তথ্য রয়েছে। স্থূল ভোগপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আল-কুরআনের এই নিরাপোষ অবস্থান ভোগবাদীদেরকে ইসলামের চরম প্রতিপক্ষ করে তুলেছে। যুগের অন্যতম মুজাদ্দেদ এবং মনোনীত 'হাদী' হিসেবে স্বীয় সমাজ ও পৃথিবীর প্রতি নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে গেছেন হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)।

৭. হযরত আকদাসের (ক.) কারামত প্রসঙ্গঃ

হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.)-এর জাহেরী ও বাতেনী উভয় আকাশ অসংখ্য কারামতের নক্ষত্রে ভরা। সাদা-মাটা পার্থিব নজরে কারামতকে আটপৌরে দৈনন্দিনতার স্বাভাবিকতার ব্যক্তিক্রম বলে মনে হলেও মূলতঃ এই বিষয়টা রুহানী এবং বিজ্ঞানময় ঘটনা বা ওয়াকেয়ার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। মহান পল্লী কবি জসীম উদ্দিন তাঁর বিখ্যাত 'মুর্শিদা গান' গ্রন্থে হযরত আকদাসের ৪৪টা কারামত বা দৃশ্যতঃ 'অলৌকিক ঘটনার' শিরোনাম লিপিবদ্ধ করেছেন। (অবশ্য হযরত সৈয়দ দেলাওয়ার হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) সংকলিত-সংগৃহীত জীবনী ও কারামত গ্রন্থে ১০২টি ওয়াকেয়ার বস্তুনিষ্ঠ বিবরণ বিবৃত হয়েছে)। এসব ঘটনা রূঢ় বাস্তবতার সাথে সম্পর্ক বিযুক্ত কোন 'হাউই' ব্যাপার নয়। এই 'কারামত' শব্দের মোড়কে যে বিজ্ঞান ও রুহানী ব্যাপারাদির রসায়ন দার্শনিক ও বাস্তবতার বস্তুরূপ ধরে বিরাজমান, তার শেকড় বহু বহু গভীরে প্রোথিত। ইতিহাসের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী তা হযরত দাউদ (আ.)-এর সময় (খ্রি. পূ. ১০৮৬–খ্রি. পূ. ১০১৫ সন) পর্যন্ত বিস্তৃত। আল-কুরআনে বিবৃত : "আল্লাহ্ তাকে [দাউদ (আ.)কে] রাজত্ব ও হেকমত দান করলেন এবং যা ইচ্ছে হয়, তা শিক্ষা দিলেন (২:২৫১)। আরো বিবৃত : "হে দাউদ! আমি আপনাকে পৃথিবীতে খলিফা বানিয়েছি, অতএব আপনি মানুষের মাঝে ন্যায় বিচার করুন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, কেননা উহা আপনাকে আল্লাহ্‌র রাস্তা

থেকে বিচ্যুত করে দেবে (৩৮:২৬)। তাঁর সম্পর্কে আল-কুরআনের (৪:১৬৩, ২১:৯৭) নং আয়াতেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত দাউদকে (আ.) প্রদত্ত ক্ষমতাসমূহের মধ্যে তাইয়্যে জমান ও তাইয়্যে আরদ্ অর্থাৎ সময় সঙ্কোচন ও স্থানিক দূরত্ব সঙ্কোচনের ক্ষমতাও রয়েছে। এ বিষয়ে সহহী-বুখারী শরীফের হাদীস বর্ণিত আছে। এগুলো "কুল্লু শাইয়িন ক্বদীর" আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের কুদ্রতের অনির্বচনীয় চিহ্নের অন্যতম ক্ষুদ্র নিদর্শন। 'তাইয়্যে জমান ও তাইয়্যে আরদ্' দ্বারা চোখের পলকে অনেক ঘটনা বাস্তবিক পক্ষে সংঘটিত হয়। এ বিষয়ে-বিশদ বিবরণ মওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মওলানা আজিজুল হক অনূদিত বোখারী শরীফ [বাংলা তরজমা ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা] ৪র্থ খণ্ডে, (পৃঃ ২১৬-২১৭, সংস্করণ, ১৯৯৭ইং) বিবৃত আছে।

বলা বাহুল্য, হযরত আকদাস (ক.) রুহানী ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় এই শক্তিতে বিভূষিত। 'কারামত' সাদা-মাটা ভাষায় মরমী রহস্যের বহিঃপ্রকাশ (Manifestation), যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বর্তমান বিকশিত অবস্থায় দর্শন শাস্ত্র ও বিজ্ঞান সহযোগে অনুধাবনযোগ্য বলে বিজ্ঞজনদের অভিমত। রাব্বুল আলামিনের এই অনুগ্রহ মানুষ, প্রাণীকুল তথা সর্ববিষয়ের (কুল্লু শাইয়িন) কল্যাণে বিশেষ অবস্থা ও আবহে প্রবাহিত হয়। পূর্বেই আভাস দেওয়া হয়েছে যে, কারামত এক ধরনের সূক্ষ্ম হেকমত বা বিজ্ঞান, যা অর্জন করা অত্যন্ত কঠিন ও সাধনা-সাপেক্ষ রুহানী সংসারের অন্তর্ভুক্ত। এই শক্তি বিশেষ পরিশুদ্ধ মানবের ক্বলবের আওতাধীন করা হয়। গতানুগতিক বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের টেবিলে কিম্বা সাধারণ যুক্তিশাস্ত্রের মাপকাঠিতে এগুলোর উপাদান পরিমাপ্য নয়। বরং রুহানী ও নৈতিক উৎকর্ষের মানদণ্ডে কল্যাণপ্রদরূপে বাস্তবে ঘটমান ক্রিয়া হিসেবে স্ব-প্রমাণিত ও গ্রহনীয়– যেমন মানুষের নিজের কাছে নিজের অস্তিত্ব, আবির্ভাব ও জীবন-গতিশীলতার বিষয়টা স্বয়ংক্রিয়রূপে গ্রহণীয় হয়। অর্ধশতাব্দী পূর্বেও একশ্রেণির শিক্ষিত মানুষ মনে করতেন যে, "এখনকার এই বিজ্ঞানের যুগে এসব অর্থাৎ কারামত কেহ বিশ্বাস করতে চাইবেন না।" কারামতকে 'অলৌকিক' ঘটনার ব্রেকেটে বন্দী রেখে এ ব্যাপারে হাজার বছরের ঐতিহাসিক তথ্য ও সাধনাকে পাশ কাটিয়ে যাবার প্রবণতাও প্রকট। কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞানের ক্রমাগত বিকাশ, মহাজগত (Cosmos) একটি মাত্র সৃষ্ট ইউনিট এবং তার মধ্যে সক্রিয় একটি মাত্র সৃজনশীল স্পন্দন, মানব জাতি তথা জীবজগতের অভিন্ন প্রাণসত্তা প্রভৃতি সম্পর্কে নিত্য-নবতর উদ্ভাস যেন রুহানী জগতের অন্তহীন আলিঙ্গণের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। মানবজাতির নবতর প্রজন্ম এসব ব্যাপারে ক্রমাগত স্পষ্টতর তথ্য উদ্ঘাটন করতে পারবেন বলে আশা করা যায়। সূরা আদ-দ্বোহাসহ আল-কুরআনের বহু আয়াতে জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ অনাগত ভবিষ্যৎ সম্পকে ইশারা বিদ্যমান। আরো সহজভাবে বলা যায়, মহাজগত বা আ'লামীন পদার্থ বিজ্ঞানের

দৃষ্টিতে একক ইউনিট। উদাহরণ স্বরূপ, 'রসুনের কোষ অনেক হলেও জড় এক'। এই দৃশ্যমান বাস্তবতার বিজ্ঞান বা হেকমতের অন্তর্নিহিত শিক্ষা সম্যক আত্মস্থ করতে পারলে তৌহিদের মর্মবাণী, কারামত, সময় ও দূরত্বের ব্যবধানের অনস্তিত্ব প্রভৃতির উৎস হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নয়। আল-কুরআনে দৃশ্যমান মাখলুক, প্রকৃতির আচরণ, বিবর্তনক্রিয়া প্রভৃতি অধ্যয়ন ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণের তাগিদ দেওয়া হয়েছে বার বার।

ধর্মীয় পরিভাষায় 'কারামত' শব্দটা আল্লাহ্‌র প্রদত্ত দান, সম্পূর্ণ মুক্ত ও অবারিত অনুগ্রহ (ইহসান, ইন'আম) বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। তবে অধিকতর যথাযথ ব্যাখ্যা হলো, 'কারামত' শব্দটা গঠিত হয়েছে আল্লাহ্‌র বন্ধুদের (আওলিয়া, একবচনে ওয়লী) অলৌকিক ঘটনাবলীকে নির্দেশ করার জন্য, যা আল্লাহ্‌তায়ালা অনুগ্রহ করে তাঁদেরকে এগুলো সম্পাদনের ক্ষমতা দান করেছেন।

এসব ঘটনা সাধারণতঃ বস্তুজগতে সংঘটিত অসংখ্য বিস্ময়কর ঘটনার সমবায়ে গঠিত অথবা-ভবিষ্যতের কোনো পূর্ব সঙ্কেত স্বরূপ, নতুবা আধ্যাত্মিক বিষয়ের কোনো ব্যাখ্যা-স্বরূপ। 'কারামত' শব্দের ভাবার্থ 'মুজিযা' থেকে ভিন্ন। তবে উভয়ই বস্তুর স্বাভাবিক নিয়ম-কানুন ভঙ্গের (খারিকুল-আদা) সাথে জড়িত, অর্থাৎ এটা একটা বিস্ময়কর ঘটনা, যা ঐশী নিয়ম কানুনের (সুন্নাত্‌ল্লাহ্‌) ধারা এবং দৃশ্যতঃ স্বাভাবিক ধারাকে লংঘন করে। কিন্তু মুজিযা হলো, পার্থিব ঘটনা সংবলিত, যা কোন দাবী বা চ্যালেঞ্জের (তাহাদ্দী) মুকাবিলায় নবীগণ কর্তৃক ব্যবহৃত, যা দ্বারা তাঁরা শ্রোতাদের অক্ষমতাকে পূরণ করে তাদের বক্তব্য বিষয়কে অখণ্ডনীয়ভাবে সুনিশ্চিত করেছেন। 'কারামত' হলো সাধারণ (General) ব্যক্তিগত অনুগ্রহ, এটা গোপন রাখা উচিৎ এবং কোন ক্রমেই এটা নবীর মিশনের নিদর্শন নয়। গতানুগতিক স্বীকৃত নিয়ম অনুযায়ী নবীগণ কর্তৃক সম্পাদিত বিষয়কর ঘটনাবলীকে "মুজিযা" বলা হয় এবং ওলী-দরবেশ কর্তৃক সাধিত বিস্ময়কর ব্যাপারকে কারামত বলা হয়। (ইসলামী বিশ্বকোষ, সপ্তম খণ্ড, কারামত, ইফা. দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৮ ইং পৃ: ৪৫৭)।

আল্লাহু রাব্বুল আলামিন হযরত মুহাম্মদকে (দ.) সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরণ করেছেন (২০:১০৭) এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছেন (৩৪:২৮)। এই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ্‌ উম্মতে মুহাম্মদীর মধ্যে উচ্চমার্গীয় 'হাদী' বা পথ প্রদর্শক মনোনীত করেন, যারা তাঁর নির্দেশ অনুসারে পথ প্রদর্শন করেন, ধৈর্যধর ও আয়াতসমূহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। আল্লাহ্‌র মনোনীত বান্দাদের সুউচ্চ মর্যাদা সম্পর্কেও আল্-কুরআনে ব্যক্ত হয়েছে: "তিনি নিজ অনুগ্রহে আসমান ও জমিনের সব কিছুকে তোমাদের আওতাধীন করে দিয়েছেন, নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল কওমের জন্য এতে নির্দশন রয়েছে (৪৫:১৩)।" একই সূরায় উক্ত আয়াতের

পূর্ব-আয়াতে পার্থিব জীবন ঘনিষ্ঠ বাস্তবতার চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বলা হয়েছে "আল্লাহ্-ই তো নদী-সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, যাতে তাঁরই নির্দেশে নৌকা জাহাজ উহার মধ্যে চলাচল করতে পারে। যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ তালাশ করতে পারো এবং তোমরা শোকর আদায় করো (৪৫:১২)। আরো বলা হয়েছে: "তারা কি দেখেনা যে, আমি তাদের জন্য আমার (কুদরতের) হাতে সৃষ্ট জিনিসগুলির মধ্যে গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুও সৃষ্টি করেছি। অতঃপর তারা এগুলোর মালিক হয়েছে। আমি এগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে তারা এগুলোর কোনটার উপর সওয়ার হয় এবং কোনটাকে আহার করে (৩৬: ৭১-৭২)। আরো সহজভাবে বলা হয়েছে: "তোমরা কি দেখোনা, আল্লাহ্ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন এবং তোমাদের প্রতি তাঁর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করেছেন (৩১:২০)।

এখানে যে বিষয়টা সুস্পষ্ট তা'হলো এই যে, কুল-মখলুক আল্লাহ্র অবিনাশী মহাপরিকল্পনার অবভাস বিশেষ। পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে মরণশীল মানুষকে (বশর) সৃজন ও প্রেরণের পূর্বেই তিনি পুরো সমীকরণটা যথাযথভাবে করে রেখেছেন। সূরা জাসিয়ার পূর্বোক্ত ১৩নং আয়াত এই নির্ভুল গণিতের একটা অংশ মাত্র। অতএব, আল্লাহ্র খালেছ-মোখলেছ বান্দাদের কারামত প্রভৃতি কর্ম সম্পাদন ক্ষমতা মহান স্রষ্টা প্রদত্ত এবং মহাবিশ্বপরিকল্পনার গণিত অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত এবং মহান ওলী-আল্লাহ্দেরকে অর্পিত এ ক্ষমতা গণিতসিদ্ধ। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.) আল্লাহ্র এই মেহেরবাণীতে অভিষিক্ত। অতএব, কারামত তাঁর জন্য আটপৌরে স্বাভাবিক ক্রিয়ার মতোই। একই বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.), শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মতো উচ্চ মর্তবার ওলী-আল্লাহ্গণ।

হযরত আকদাসের 'কারামাত' বিষয়ক বিবরণগুলোর সংগ্রন্থনা একটা বিশাল গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ করে; যা এখানে সংস্থান করা সম্ভব নয়। বিজ্ঞ পাঠকদের সংক্ষিপ্ত অবগতির জন্য কবি জসীমউদ্দীন-এর 'মুর্শীদা গান' গ্রন্থে শ্রেণীবদ্ধ ৪৪টা মশহুর কারামতের শিরোনাম উদ্ধৃত করা হলো। 'সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী জীবনী গ্রন্থে' বহু অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ আছে। তাহার কথকগুলি নিম্নে প্রদত্ত হল।

১. হযরতের প্রভাবে বিপরীত দ্রব্যে রোগমুক্তি। ২. হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে মোহসনিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত। ৩. হযরতের কশ্ফ ক্ষমতায় হাটহাজারী মাদ্রাসার স্থান নির্ধারণ। ৪. হযরতের প্রভাবে আহমদীয় মাদ্রাসা ও মসজিদের স্থান নির্দেশ ও পত্তন। ৫. হযরতের প্রভাবে সাগরডুবি হতে সামগ্রীসহ ভক্ত উদ্ধার। ৬. আনার প্রদানে

হযরতের আশ্চর্য কেরামত। ৭. মসজিদে হযরতকে নূরানী জ্যোতির্ময় দেখা। ৮. স্বপ্নযোগে হযরতের বেলায়েতের পরিচয়। ৯. বেলায়েতি ক্ষমতায় হযরত কর্তৃক রোগমুক্তি। ১০. স্বপ্নযোগে বাতেনী এলেম শিক্ষাদান। ১১. হযরতের ফয়েজ এর্শাদ ও পরিচয়, জনাব মৌলভী আবদুর রহমান সাহেবের প্রতি রহস্যময় বাণী ও ফয়েজ এর্শাদ। ১২. মহাজেরে মক্কীর সালামের উত্তরদানে অলৌকিক কেরামত প্রদর্শন ও সালাম প্রেরণ। ১৩. তাবারৌক প্রদানে সন্তান দান। ১৪. খান বাহাদুর ফজলুল কাদেরের প্রতি পরীক্ষার হলে রহমত বর্ষণ। ১৫. মুর্দাদের প্রতি হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব ও দয়া। ১৬. হযরতের বেলায়েতের প্রভাবে অযোগ্যকে যোগ্যতাদান। ১৭. কলা মারফত জাফর আলী শাহকে কশ্‌ফ শক্তিদান। ১৮. সাগর জলে হযরতের অসাধারণ প্রভাব ও খালের গতি পরিবর্তন। ১৯. হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে এক রাতে মক্কা শরীফ হতে চট্টগ্রাম শহরে হাজীর প্রত্যাবর্তন। ২০. আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবে বাড়ীতে থাকিয়া মক্কা-মদীনা ছায়ের। ২১. হযরতের বেলায়েতি ক্ষমতায় বাহুতে হাত রাখিয়া জনৈক হাজীর অলৌকিকভাবে বাড়ীতে প্রত্যাবর্তন। ২২. হযরতের বেলায়েতি ক্ষমতায় নাজিরহাট হতে বাজার প্রেরণ। ২৩. সূর্যের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব। ২৪. হযরতের প্রতি ব্যাঘ্রের আনুগত্য। ২৫. মহামারী আপদ-বালাই প্রভৃতির উপর হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাব। ২৬. হযরতের প্রভাবে সাধারণ দ্রব্যে কলেরা রোগ নিরাময়। ২৭. যষ্টির আঘাতে কুষ্ঠরোগ নিরাময়। ২৮. ব্যাঘ্রের কবল হতে প্রাণ রক্ষা। ২৯. হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে পুনর্জীবন প্রাপ্ত। ৩০. হযরতের আধ্যাত্মিক প্রভাবে গরুর দুগ্ধে তিক্তস্বাদ। ৩১. হযরতের জুতার ধুলায় দুরারোগ্য রোগমুক্তি। ৩২. হযরতের অলৌকিক প্রভাবে বৃষ্টি বর্ষণ। ৩৩. হযরতের বেলায়তি প্রভাবে মৃত্যুকালে আযরাইল ফেরৎ ও ঘাট বৎসর আয়ু বৃদ্ধি। ৩৪. হযরতের প্রভাবে অল্প খাদ্যে তুষ্টি। ৩৫. মূকের প্রতি কোরান পাঠের আদেশে অদ্ভুত কেরামতি। ৩৬. হযরতের অসাধারণ ক্ষমতা হাকিমের অন্তরে প্রবেশ ও রায়দান। ৩৭. হযরত খিজির (আ.) এর সঙ্গে হযরতের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। ৩৮. মজহাবী মাহফেলে হযরতের অদ্ভুত উপস্থিতি। ৩৯. বিনা ঔষুধে হস্তপঁচা ও ক্ষতনালী আরোগ্য। ৪০. হযরতের স্বপ্নযোগে চট্টগ্রামকে জাপানী বোমা হতে নিরাপদে রাখার আভাস ও অভয়দান। ৪১. ওফাতের পর হযরতের প্রত্যক্ষ দর্শনদান। ৪২. হযরতের ওরস শরীফে উট বুকিং এ আশ্চর্য কেরামত। ৪৩. দরবার শরীফে নবাগত ব্যক্তির প্রতি অপূর্ব দর্শন দানে কেরামত। ৪৪. হযরতের প্রভাবে আয়ু বৃদ্ধি ও মৃত্যুবরণ।

হযরত আকদাসের (ক.) বহু কারামত লোকচক্ষুর জ্ঞাতসারে সংঘটিত। রাঙ্গুনিয়া নিবাসী দরিদ্র কাঠুরিয়া আসমত আলীকে তিনি ব্যাঘ্রের হাত থেকে নিরাপদ করেন মাইজভাণ্ডার শরিফে পুকুর পাড়ে বসে তাঁর হস্তস্থিত লোটা নিক্ষেপ করে, যা সেখান

থেকে ৪২ মাইল দূরে কোদালা পাহাড়ে বাঘের মুখে গিয়ে পড়ে। ভক্ত আসমত আলী সেই লোটা চিনতেন এবং দু'দিন পর তা নিয়ে হাজির হন মাইজভাণ্ডার শরিফে। উপস্থিত অনেক লোক সেই লোটা পুকুরে পড়তে দেখেছিলেন এবং পানিতে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পান নাই। এ ধরনের অনেক কারামতের প্রত্যক্ষদর্শীরা সমকালে তা প্রকাশ করেছেন, যা মওলানা আবদুল গণি কাঞ্চনপুরীর (ক.) 'আয়নায়ে বারী'সহ বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত আছে। কাঠুরিয়া আসমত আলীর ঘটনা অধ্যাত্ম সমীকরণে তাইয়্যে জমান ও তাইয়ে আরদ্ অর্থাৎ যথাক্রমে সময় ও স্থানিক দূরত্ব সঙ্কোচন পর্যায়ভুক্ত।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. মাহবুবে ইলাহী হযরত খাজা নিজামউদ্দীন আউলিয়া (র.)-ও শিক্ষা জীবন শেষে কাজী পদে অধিষ্ঠিত হয়ে খেদমত করতে অভিলাষ পোষণ করেছিলেন। এই প্রত্যাশায় তিনি কুতুবুল আকতাব হযরত খাজা কুতুব উদ্দিন বখতিয়ার কাকীর (র.) মাজার শরিফ জিয়ারতে যান। সেখানে এক মজ্জুব ফকির তাঁকে নাম ধরে ডেকে বললেন, তুমিকি কাজী হতে ইচ্ছা কর? আমি তোমাকে দেখছি তুমি ধর্ম বিশারদ এক বাদশাহ্॥ তুমি এমন স্তরে পৌঁছে যাবে, যেখান থেকে সকল বিশ্ববাসী তোমার কাছ থেকে ফয়েজ লাভ করে ধন্য হবে।' এরপর তিনি হযরত শায়খ নজীব উদ্দিন মুতাওয়াক্কিলের (র.) নিকট-ও একই অভিলাষ নিয়ে দোয়া প্রার্থী হলে তাঁকে বলা হয়, 'তুমি কখনো কাজী হতে পারবে না, বরং আমি তোমার মধ্যে একটা জিনিষ দেখছি, যা আমি ছাড়া আর কেউ জানে না'। [সূত্রঃ দিল্লীর বাইশ খাজাঃ ড. জহুরুল হাসান সারেবঃ বঙ্গানুবাদ এম, আনোয়ার তালুকদার (এম. এফ), ২০০৯ ইং, চট্টগ্রাম]। লক্ষ্যণীয়; ভিন্ন প্রেক্ষাপটে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কর্ম জীবনের সূচনায় একই গতিধারা পুনরাবৃত্ত হয়, যা তাঁকে বিশ্বজনীন কল্যাণময়তার আধারে উন্নীত করে। এই গ্রন্থে আরো বর্ণিত আছে যে, মাহবুবে ইলাহীর প্রাথমিক জীবন অতীব অভাব-অনটনের মধ্যে অতিবাহিত হয়। সে সময় তাঁর কাছে এমন কপর্দকও ছিল না, যা দিয়ে দু'একটি রুটি ক্রয় করে খাওয়া যায়। এই ক্ষেত্রেও মাহবুবে ইলাহীর সাথে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উঠতি জীবনের সাযুজ্য।

২. নিবন্ধের মর্মবস্তুসমূহ গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত : সঙ্কলন-সংগ্রাহকঃ মৌলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.); পঞ্চম প্রকাশ, ১৯৮১ইং; –গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

'মানুষ-ধরা কল বসাইছে আমার বাবা ভাণ্ডারী
সেই কলেতে পড়লে ধরা, আর থাকে না ঘরবাড়ী'[১]

হযরত সৈয়দ গোলামুর রহমান বাবা ভাণ্ডারী (ক.)

[১৮৬৫-১৯৩৭ খৃ.]

১. "নিরুদ্দেশ! শুনে কোন আড়ালীর ডাক
ভাটিয়ালী পথে চলো একাকী নির্বাক?
অন্তরের তলা হতে শোন কি আহ্বান?
কোন অন্তরিকা কাঁদে অন্তরালে থাকি' যেন, চাহে তব প্রাণ।
বাহিরে না পেয়ে তারে ফের তুমি অন্তরের পানে---"
–কাজী নজরুল ইসলাম।[২]

হযরত বাবা ভাণ্ডারী সৈয়দ গোলামুর রহমান (ক.) এক দীপ্তিময় মৌনী তাপস। দরিয়ার জলে ঝিলিক মেরে উঠা সূর্য কিরণের মতো ঠোঁটে এক ঝিলিক নির্মল হাসি! যেন প্রশান্তির অদৃশ্য ইথার ছড়িয়ে দেয় চারপাশে, ভুবন জুড়ে।
অধ্যাত্ম-সমাজের জ্ঞানী-গুণীদের সংজ্ঞায় 'আল্‌মে-আরওয়ায় (রুহের জগতে) পদাচারণা তাঁর। পৃথিবীতে অভিবাসী।' হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্‌র (ক.) ভাষায় : "উহ্ সাহেবে জালাল হ্যায়। মূলকে এয়ামন মে রাহাতা হ্যায়, আলমে আরওয়াহ মে ছায়ের করতা হ্যায়।" পরিবারে, সংসারে, দেশে, জগতে থেকেও তিনি নিরুদ্দেশের 'বাসিন্দা'। কবি কাজী নজরুল ইসলামের উপরোক্ত কবিতার-ক্যানভাসে যেন চিত্রিত হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) রূপ-স্বরূপ!

২. হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) জন্মলগ্ন থেকেই তাঁর জেঠা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) সুনজরে ছিলেন। তিনি বয়সে তাঁর জেঠা থেকে ৩৯ বছরের ছোট। জন্মের সপ্তম দিবসে আকিকার দিনে তাঁকে হযরত আকদাসের কোলে অর্পণ করা হলে তিনি উর্দু জবানে বলেন, "এই শিশু আমার বাগানের গোলাপ ফুল। তার মধ্যে হযরত ইউসুফের (আ.) চেহারা এসেছে। তাকে যত্ন করিও। আমি তার নাম গোলামুর রহমান রাখলাম।" এই নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ হযরত আকদাসের এই জবানেই অঙ্কিত হয়ে যায়। তাঁর শৈশব, কৈশোর, যৌবন এবং পরম বিকাশ ধাপে ধাপে এই মারিফতী প্রকল্পের পবিত্র বহিঃপ্রকাশ।

তীক্ষ্ণ মেধাবী, নির্জনতাপ্রিয়, ধ্যানী মন-মানসের অধিকারী হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) শিক্ষা জীবনের সমাপ্তিক্ষণ পর্যন্ত যে বিবরণ রয়েছে, তাতে প্রথমেই ফুটে উঠে তাঁর বিস্ময়কর সংযম, অধ্যয়নতৃষা এবং নীরব-গোপন সাধনা। যথাসময়ে মারিফাতের 'লাল' দ্বারা অভিষিক্ত হবার পর ১৮৯০ খ্রি. চট্টগ্রাম শহরস্থ সরকারী মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসায় জামায়াতে উলার ফাইনাল পরীক্ষার তৃতীয় দিবসে তাঁর পরম ভাবান্তর সৃষ্টি হয় এবং তিনি পরীক্ষার হল থেকে প্রচণ্ড জজব অবস্থায় বের হয়ে যান। তাঁর জীবনীগ্রন্থ সমূহে এসবের বিশদ বিবরণ রয়েছে। মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম ইতিহাসের অভিযাত্রায় অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখা যায় ৬৩ বছর পর ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর দৌহিত্র শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ক্ষেত্রে, যখন তিনি কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ কলেজে বি.এ. টেস্ট পরীক্ষার তৃতীয় দিবসে সাদা খাতা জমা দিয়ে তেমনি জজব হালে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে পড়েন মারিফাতের অন্তহীন ভুবনে। নানার পদাঙ্ক অনুসরণ করে নাতিও পরীক্ষার তৃতীয় দিবসেই দুনিয়াবী শিক্ষা-ছুটদের খাতায় নাম লেখান! স্মরণ করা যেতে পারে যে, আজ (২০১৯ খ্রি.) থেকে প্রায় পৌনে আটশো বছর পূর্বে সমকালীন এশিয়া-ইউরোপের শীর্ষস্থানীয় দার্শনিক-শিক্ষক মওলানা জালাল উদ্দিন রুমী (র.) (১২০৭-১২৭৩ খ্রি.) মহান মজজুব সাধক হযরত শামসে-তাবরীজের (র.) প্রবল জজবিয়াতের টানে দুনিয়াবী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পেছনে ফেলে মারিফাতের স্রোতে ভেসে যান এবং মসনবী শরিফ ও দীওয়ানে শামসে তাবরীজের মতো অতুল গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটে, যার দীপ্তি এখনো যুগপৎ কাব্য-সাহিত্য-দর্শন ও মারিফাত জগতের বিস্ময়।

৩. মাদ্‌রাসার উচ্চতর শিক্ষার শ্রেণীকক্ষ থেকে বের হয়ে পৃথিবীর বা প্রকৃতির তথা আল্লাহ্‌র পাঠশালায় জ্ঞানের মূল রহস্যের অন্বেষায় ঝাঁপিয়ে পড়েন বাবা ভাণ্ডারী। এ সময়ে তিনি একাকী এক কাপড়ে এক চাদরে বের হয়ে যান এবং ঝড়-বৃষ্টি- রৌদ্র-শীত-ক্ষুধা-যন্ত্রণা-বিশ্রাম উপেক্ষা করে বৃহত্তর চট্টগ্রামের হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল পার্বত্য অঞ্চল কিম্বা সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে কঠোর রিয়াজতি সফরে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই কঠোর রিয়াজতের চাক্ষুষ দর্শকদের বিবরণ সমকালেই লিপিবদ্ধ হয়ে অধ্যাত্ম-জ্ঞান অর্জনের সাধনা-সংগ্রামের ইতিহাস আলো করে আছে। এসব বিবরণে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে যে বিশেষ তথ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো, তাঁর মৌনতা; সুখ কিম্বা দুঃখ, আনন্দ কিম্বা ব্যথার প্রকাশসূচক কোন শব্দ উচ্চারণ দূরে থাক, তিনি জবান খুলেননি। তাঁর এই রিয়াজত-সাধনার কঠোরতা একাধারে আত্মজয়, প্রকৃতিজয় ও মানবচিত্ত জয়ের ধারা বিবরণী হয়ে আছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, তাঁর মধ্যে কখনো বা হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.), বুঁ আলী কলন্দর (র.), কবি হাফেজের (র.) প্রকৃতি

পরিলক্ষিত হলেও প্রতীয়মান হয় যে, তিনি প্রবল ধৈর্য ও সংযমবলে সব কিছু নিজের সিনার অভ্যন্তরে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আল-কুরআনের ভাষায়: 'ধৈর্যশীল ও সংযমীরাই প্রকৃত সাহসী'!

৪. হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) ১৮৯৪ ইং থেকে বারো বৎসরাধিককাল কঠোর বেরিয়া সাধনা-সংগ্রাম শেষে চল্লিশ বছর বয়স অতিক্রান্তে ১৯০৬ খ্রি. মাইজভাণ্ডার শরিফে স্বীয় হুজরায় গোশানশীন হন, তাঁর মুর্শিদ হযরত আকদাসের বেসালের পর (জুন ১৯০৬ইং)। তবে লক্ষণ্যীয় যে, গোশানশীন অবস্থায় প্রথম দু' বছর পরেই স্বীয় জবানে কথাবার্তা বলা প্রায় ত্যাগ করেন এবং বেসালের পূর্ববর্তী তেইশ বছরের বেশি সময় ধরে জবান সম্পূর্ণ বন্ধ রাখেন। অথচ এ সময়ে তাঁর আধ্যাত্মিক, রূহানী সক্রিয়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে বিস্ময়করভাবে। হাজার হাজার দুর্গত মানুষ, ভক্ত, জায়েরীন, আশেকীন, তাঁর অকৃপণ রহমানী কৃপাধারায় সিক্ত হতে থাকেন। হাদিসে কুদ্‌সিতে আছে: 'মানুষ আমার রহস্য, আমি মানুষের রহস্য'। আল্লাহ্‌র অভিপ্রকাশ তাঁর সৃষ্টিনিচয়ের মধ্যে। প্রত্যেক সৃষ্টিই তাঁর কাছে প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান তাঁর বিশাল সৃষ্টযন্ত্রকে সচল রাখার জন্য। মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি, যার সম্ভাবনা অপার। অতএব, এই সম্ভাবনাকে বাস্তবরূপ দিতে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিন হযরত বাবা ভাণ্ডারীদের মতো নিদর্শন সৃষ্টি করবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

এই গোশানশীন অধ্যায়ে হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির এক বনি-আদম। স্থির-অচঞ্চল-ক্ষুৎ-পিপাসাহীন-মৌন-নির্বাক। পৃথিবীতে কোন সৃষ্ট বস্তুর কাছে তাঁর চাওয়ার-পাওয়ার কিছু নেই। তিনি এক স্নিগ্ধ আলোর পিণ্ড, মানবিক অবয়বে আলো। শৈশব থেকে মজ্‌জুবী দরিয়ায় নিমজ্জিত হবার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত নামায, রোযা, তাহাজ্জুদ নামায, কুরআন তেলাওয়াতসহ শরিয়তের যাবতীয় বিধান কঠোরভাবে পালন করে তিনি 'নূরের মানবিক অবয়বে' রূপান্তরিত হন। এই জীবনে তিনি 'সায়েমুদ্দাহার' (ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সময়ে বারিত সময় ব্যতীত) ছিলেন এবং একমাত্র সন্ধ্যায় ইফতারের সময় সামান্য আহার গ্রহণ করতেন। এসব তথ্য সপ্রমাণিত। এভাবে জীবনের প্রায় চল্লিশ শতাংশ সময় কঠোর শরিয়তী অনুশাসন পালন করে তিনি মারিফাত বা তাসাওউফের উচ্চতম মোকামে উপনীত হয়ে হযরত দাতা গঞ্জেবখ্‌শ (র.), হযরত আবু হাফস হাদ্দাদ নিশাপুরী (র.), হযরত গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী (র.), হযরত খাজা বাবা (র.), হযরত ইনবুল আরাবী (র.), হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) প্রমুখের এই অভিজ্ঞতারই সত্যতা প্রকাশ করেন যে, 'শরিয়তের আহকাম পালনের সড়ক ধরেই মারিফাতের মালভূমিতে উপনীত হতে হয়'।

৫. হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) বর্ণনাতীত। তাঁকে কেবল গভীর নিষ্ঠা ও ধ্যানযোগেই অনুভব করা যায়। হযরত আকদাসের প্রদত্ত 'সনদ'ই তাঁর মর্যাদার মোকাম নির্দেশক: 'তিনি সাহেবে জালাল!' হযরত বায়েজিদ বোস্তামী (র.), হযরত মনসুর হাল্লাজ (র.), হযরত ইবনুল ফরিদের (র.) মতো প্রবল জালালিয়াত তাঁর মধ্যে মুখরিত হলেও তিনি খাজাবাবার (র.) মতো তা আত্মস্থ করতে সক্ষম হন এবং মহাসৃষ্টির মৌন অথচ সক্রিয় দর্শক হিসেবে, বেলায়তে মোত্লাকা বাগানের 'গোলাপ' হিসেবে সার্বজনীন সুবাস ও কল্যাণ বিলানোর দায়িত্বে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন। খাজা বাবার গজলের ভাষায়:

(ক) "যেহেতু খোদার পবিত্র দরবার আমার মন্জিলে মকসুদ,
সেহেতু দু'জগতের ঘটনাবলীকেও অতিক্রম করেছি।[৩]
(খ) "যখন হাস্তী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছি, তখন
রূপান্তরিত হয়েছি আল্লাহ্র হারিমে,
যেহেতু আমি নিজ থেকে ফানা হয়েছি,
কী বলবো! যা বলবো তা হয়ে গেছে।[৪]

হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) জীবনের শেষ ভাগের অধিকাংশ সময় মৌন ছিলেন। তিনি জবানে জাহেরীভাবে কথা বলেন নি। অথচ প্রত্যেক মানুষ ব্যক্ত হন কথা ও লেখায়, যা শিখিয়েছেন আল্লাহ্।[৫] হযরত বাবা ভাণ্ডারী ব্যক্ত হয়েছেন আশেক-ভক্ত-ফকির-মজ্জুবদের গীত-গজলে-ক্রন্দনে-হাহাকারে, মর্মভেদী শব্দে ভরা ভাবের দর দালানে এবং এখনো হচ্ছেন---।

৬. অন্যান্য বিখ্যাত সাধক দরবেশদের মতো তাঁরও ছিল শায়েরী প্রতিভা। হস্তাক্ষর ছিল সুন্দর। তাঁর রচিত একটা চতুর্দশপদী ফার্সী শেয়র তদীয় হস্তাক্ষরের প্রতিলিপি, উচ্চারণ ও বঙ্গানুবাদসহকারে নিম্নে উৎকলিত হলো:[৬]

হযরত বাবা ভাণ্ডারী কেবলার স্বাক্ষর করা হস্তলিপি

বাংলায় উচ্চারণ

সালহা শুদ্ আয্ তু মীখাহম্ তুরা,
হাজতম্ রা'চুঁ নমী সাযী রাওয়া?
আয্ লেসানিল গায়্ব ই দারম্ নবে'দ;
আয্ দরে তূ কস্ নগশ্তাহ না-উম্মীদ।
হার্কেহ বর্ দরগাহে তূ চুঁরু'বদ্?
না উমিদ আজ দরগাহে তু হাজত রাওয়ার
হার্কেহ্ আ-মদ্ রব্ দরত্ উম্মীদ্ওয়ার
শাহেদে মকসূদ ইয়াবদ্ দ্কিনার।
আয় খোদায়ে মন্ বাহক্কে মুস্তফা।
আয় তোফায়লে হুরমতে আলে আবা,

আয় খোদায়ে মন বাহককে চার ইয়ার
হার্‌চেহ্ করদম 'অফ্'ব কুন্ রোযে শুমার।
রোয়ে মাহশর্ দার্ বা আলে রাসূল,
আয্ তোফায়লে মুকবলাঁ গিরদা কবুল

রাক্কেমে খাদেমে আছেম গোলামুর রহমান
গুফেরালাহু ফাদাও রে জামাতে সোওয়াম।

[অনুবাদ]
"বহু বছর ধরে আমি তোমার (আল্লাহ্‌র) সন্ধানে আছি,
আমার প্রাপ্য এখনও তুমি পূর্ণ করছো না,
আমি দৈববাণীযোগে জানলাম,
তোমার দুয়ার হতে কেউ নৈরাশ হয়ে ফিরে যায়নি,
যে ব্যক্তি তোমার দুয়ারে হাজির হয়েছে,
সে কখনও বিফল মনোরথে ফিরে যায় না,
যে ব্যক্তি তোমার দুয়ারে আশার আলো নিয়ে হাজির হয়েছে,
সে তার মন্‌জিলে মকছুদে পৌঁছবেই।

হে খোদা, হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.) এবং তাঁর প্রিয়জনদের উসিলায়
আমি প্রার্থনা জানাই–
আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করো এবং
হাশরের দিন রসূলে খোদা (দ.)-এর অনুসারী
বংশধরগণের সাথে আমাকে স্থান দিও
আর তোমার নৈকট্যপ্রাপ্তদের উসিলায় আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর কর।
শেষ
লেখক গুণাহ্‌গার খাদেম
উৎসর্গকৃত গোলামে রহমান
(তাকে ক্ষমা করা হোক)
জামাতে সিয়ম।"

৭. হযরত বাবা ভাণ্ডারীকে (ক.) বর্ণনা করা সংসারীদের সাধ্যাতীত। আগেই বলা হয়েছে, তিনি শুধু অনুভবযোগ্য। হযরত খাজা বাবার (র.) নিম্নে উদ্ধৃত গজলের ক্যানভাসে তাঁকে হয়তো কিঞ্চিৎ অবলোকন করা সম্ভব হতে পারে:

"হক তায়ালার মত্ততার শরাব যখন তোমার নসীবে জুটবে,
যতো পর্দাই থাকুক না কেন, তা থেকে তুমি বেরিয়ে আসবে।
অর্ধ পেয়ালা পান করেই হাল্লাজের হৃদয় হাজার বার বলেছে 'আনাল হক'
হে মুইন! তুমি খামোশ হও এবং নিজের দিকেই তাকিয়ে দেখ তুমি কোথায়?[৭]
এবং
যে হৃদয়ে শাহানশাহ্‌র ইলহাম হয়, খোদার কসম,
সে হৃদয় গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং সে সর্বক্ষণই উপস্থিত।
ফেরেশ্‌তারা একটা ফোঁটার জন্য ঝিনুকের মতো তৃষ্ণার্ত থাকেন,
হাজার কূলকিনারা বিহীন সমুদ্র উৎসর্গ হয়েছে আদমের মাটিতে।[৮]

৮. উপরের অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে খাজা বাবার শেয়রঃ

"যে হৃদয়ে শাহানশাহ্'র ইলহাম হয়, খোদার কসম,
সে হৃদয় গায়েব সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং সে সর্বক্ষণই উপস্থিত।"
এই শেয়রের সূত্র ধরে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) দুটো ওয়াকেয়া (ঘটনা) নমুনাস্বরূপ নিম্নে বিবৃত হলো। ওলী-আল্লাহ্‌দের বিভিন্ন কাজ কর্মকে কারামত বা কল্যাণ বর্ষণ যেমন বলা হয়, তেমনি ওয়াকেয়া বা ঘটনা বলেও অভিহিত করা হয়।
মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আবির্ভাব সময় থেকেই ভিন্নতর ত্রুটিপূর্ণ সীমিত ধর্মীয় ব্যাখ্যা অবলম্বন করে একটা প্রতিপক্ষ শ্রেণী গড়ে উঠে। এরা যুক্তি, তথ্য, কুরআন-হাদিসের অন্তহীন ব্যাপকতা সম্পর্কে অনবহিত অবস্থায় বিবিধ প্রকার কুৎসা প্রচার করতো। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এ ধরনের কুৎসা ও অপব্যাখ্যার পাশাপাশি শারীরিক আক্রমণ করতেও এরা দ্বিধা করতো না। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার পায়রবী করতে গিয়ে একাধিকবার এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হন গুরা মিঞা চৌধুরী। তিনি তৎকালীন সময়ে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অনুসারী হিসেবে হযরত বাবা ভাণ্ডারীর (ক.) সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ছিলেন। তিনি বাবা ভাণ্ডারীর অনেক ওয়াকেয়ার চাক্ষুষ সাক্ষী এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সেগুলো বর্ণনাও করেন। তিনি বলেনঃ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের পার্শ্ববর্তী কুলাল পাড়ার কিছু লোক এই সিলসিলার বিরোধিতা করতো এবং ভক্ত-অনুসারীদের নানাভাবে নাজেহাল, কটুকাটব্য করতো। এমন এক কটুকাটব্যকারী লোকের মৃত্যুর খবর পেয়ে হযরত বাবা ভাণ্ডারী (ক.) তার গোসলের সময় গিয়ে হাজির হন। একটা পিঁড়িতে কিছুক্ষণ বসে তিনি এক বদনা পানি নিয়ে তার শরীরে ঢেলে দেন। স্বীয় হুজরায় ফিরে আসার পর ভক্তদের জিজ্ঞাসার জবাবে প্রায় মৌনব্রত অবলম্বনকারী বাবা ভাণ্ডারী (ক.) বলেন; 'কী করবো, প্রতিবেশী তো'! বাবা ভাণ্ডারীর হাতের পানিতে স্নাত হওয়ার মাহাত্ম্য অনেক। এখানে লক্ষ্যণীয় যে,

বাবা ভাণ্ডারীকে দৃশ্যতঃ বেখোদ অর্থাৎ সদা সমাহিত অবস্থায় মনে হলেও তিনি কুরআন-হাদিসের শরিয়তি নির্দেশনা মতে প্রতিবেশির হক্ব' ঠিকই আদায় করেছেন।[৯] পরিশুদ্ধ আত্মার অধিকারী মহান অধ্যাত্ম মানবদের এসব কাজ, কারামত, ওয়াকেয়া নিয়ে গবেষণা, চর্চা ও বিতর্কের শেষ নেই। কী ভাবে এসব ঘটনা ঘটে! অদৃশ্য অধ্যাত্ম জ্ঞানবলে এগুলো সম্পাদিত হয় বলে লোকেদের বিশ্বাস। তবে পদার্থ বিজ্ঞানের অগ্রগতি এ বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করার উপকরণ যোগান দিচ্ছে বলে প্রতীয়মান হয়। দর্শন শাস্ত্রের 'বিশ্ব-জগতের উৎস' (origin of the world) সম্পর্কিত গবেষণা ও আলোচনায় 'সৃজন ও বিবর্তন সূত্রসমূহ: যান্ত্রিক ও পরিকল্পিত উদ্দেশ্যমূলক বিবর্তনবাদ' (doctrines of creation and evolution--mechanical and teleological) গুরুত্বপূর্ণ অংশ দখল করে আছে। Teleological তত্ত্ব আল-কুরআনের বয়ানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ (সূরা দুখান: ৪৪:৩৮-৩৯)।[১০]

টীকা : তথ্য সূত্র

১. রমেশ শীল : আশেক মালা ৩৪নং গান

২. সিন্ধু-হিন্দোল: সিন্দু, দ্বিতীয় তরঙ্গ, চট্টগ্রাম, (৩১.৭.১৯২৬),

৩. দীওয়ানে খাজা: গজল নং ৭১, দশম দ্বিপদ,

৪. দীওয়ানে খাজা: গজল নং ২৫, চতুর্দশপদ,

৫. সূরা ৯৬:৪, সূরা ৫৫:৪

৬. অলীকুল শিরোমণি হযরত বাবা ভাণ্ডারী ঃ মওলানা সৈয়দ বদরুদ্দোজা মাইজভাণ্ডারী, ৫ম সংস্করণ, ১৪০৮ বাংলা, সূচনা পৃষ্ঠা অনুবাদ-৭০

৭. দীওয়ানে খাজা, গজল নং ১১৭, শেষ চারি পদ।

৮. দীওয়ানে খাজা, গজল নং ২৫, ষষ্ঠ দ্বিপদ।

৯. গুরা মিঞা চৌধুরী পীং হামদু মিয়া চৌধুরী, তিনি ১১২ বছর বেঁচে ছিলেন। এ তথ্যের বর্ণনাকারী স্বয়ং স্রোতা নুরুল আলম চৌধুরী, ধলই, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

১০. দর্শন শাস্ত্রবেত্তাদের মতে, টেলিওলজিক্যাল বিবর্তন তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বিজ্ঞানের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সমর্থিত। "According to this view of immanence of God, all things are in.er-related as factors of one organic whole, one vast connected system. Thus one spiritual principle or idea governs the entire universe --one. rational energy regulates every process, one rhythm throbs in every constitution, nothing is accidental, nothing is unmeaning; every constituent of the world fulfils some function as factor of the whole" Outlines of General Philosophy, P.B. Chatterjee, 11th edition, P. 146. এ যেন সৃজন, বিবর্তন, পরিচালন সম্পর্কিত আল-কুরআনের আয়াতগুলোর সমাহার ও সারাংশ।

মহান বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইন বলেন, "সব কিছু আগে থেকেই নির্ধারিত হয়ে আছে, শুরু ও শেষ দুটোই। যে শক্তির বলে এটি হচ্ছে, তার উপর আমাদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। কোনো এক অদৃশ্য বংশীবাদকের রহস্যময় সুরের ছন্দে আমরা নেচে চলেছি।"

অনুসন্ধানী বিজ্ঞ চিত্ত এসব বিষয়ে চিন্তা করুক। পৃথিবীতে অধ্যাত্ম স্তরে সদা ঘটমান ঘটনাবলীর পরম্পরার রহস্য ও উত্তরের অন্ততঃ কিছুটা এতে নিহিত। তাসাওউফ সে রহস্যের সন্ধান পেতে চায়, পর্দা সরাতে চায়।

ষষ্ঠবিংশ অধ্যায়

ড. মোহাম্মদ ইকবাল

[১৮৭৩-১৯৩৮ খৃ.]

'জিস্ ক্ষেত চে দহ্কান কো ময়স্সর ন হো রোযী,
উস্ ক্ষেতকে হর্ খোশা-এ গন্দুম কো জ্বলা দো'।
[যেই ক্ষেত থেকে জোটেনা চাষীর দিনের রুযী
সেই ক্ষেত্রের গন্দুমের প্রতিটা খোশা জ্বালিয়ে দাও]
–ফরমান (ফেরেশ্তাদের প্রতি)ঃ বাল-এ-জিব্রিল

১. অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁর বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থের নির্যাস স্বরূপ 'ইবাদাতে মোতনাফিয়া' শীর্ষক চতুর্দশ পরিচ্ছেদের উপসংহার টেনেছেন ড. আল্লামা মোহাম্মদ ইকবালের বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ আসরারে খুদীর (ব্যক্তিত্বের রহস্য) ১০টি বয়েত বা বিশটি পঙতির বঙ্গানুবাদ দিয়ে। এই বিশ পঙতির যে বঙ্গানুবাদ তিনি করেছেন, তা নিম্নে উদ্ধৃত হলো:

অন্তরের, উচ্ছ্বাসই মুসলমানের জ্ঞান পূর্ণতাকারী,
অনিত্য পরিত্যাগই ইসলামের অর্থ ॥
ওহে! উম্মুল কেতাবের হেকমত রক্ষাকারী!
তোমার অন্তর্নিহিত ওয়াহদাত বা একত্বকে পুনঃ তালাশ কর ॥
আমাদের (খেয়ালী) মূর্তিতে কাবাগৃহ পরিপূর্ণ,
যাহার ফলে অস্বীকারকারীরা হাস্যরত ॥
পীরের বোতের ভালোবাসাতে ইসলাম বিক্রয় করিয়াছে,
পৈতার সূত্র দ্বারা, তসবীহ গাঁথিয়াছে ॥
দাড়ি পাকার ফলেই মোরশেদ সাজিয়াছে
যাহার ফলে ছেলেরা ঠাট্টা করে ॥
যেহেতু অন্তঃকরণ 'লা এলাহার ছবি অবগত নহে'
বরং লালসার মূর্তিতে বোতখানা বিশেষ ॥
দুঃখের বিষয় যাহাদের দাড়ি লম্বা, তাহারাই খেরকা পরে,
এবং দীন-ধর্ম বিক্রয়ের ব্যবসা করে ॥
রাত-দিন মুরীদের সঙ্গে সফর করে।
দীন-ধর্মের আবশ্যকীয়তা সম্বন্ধে কোন খবরই রাখে না ॥

আমাদের ওয়াজকারীরা চক্ষু বোতখানাতে সেলাই করিয়াছে,
মুফ্‌তিরা নির্মল ধর্মের ফতোয়া বিক্রয় করিয়াছে ॥
এহেন অবস্থায় আমাদের উপায় কি?
যেহেতু আমাদের পীর ছাহেব শরাবখানা অনুরাগী ॥

অছিয়ে গাউসুল আযম স্বীয় জীবনে যে রূঢ় বাস্তবতা, প্রত্যক্ষ করেছেন, দেখেছেন ধর্ম-আদর্শের নামে বিপরীতধর্মী কাজ, সব কিছুতে লাভ-লভ্য ও তেজারতি মনোবৃত্তি; কুরআন-হাদিসের পরিপন্থী এসব যন্ত্রণাদায়ক অনাচারের বিরুদ্ধে যে আদর্শিক সংগ্রাম তিনি শুরু করেছিলেন, সে সংগ্রামের দীর্ঘ সড়কে আশা-হতাশায় জর্জরিত তাঁর হৃদয় দার্শনিক ইকবালের দর্শন-ঝর্ণা থেকে শীতল বারি গ্রহণ করে তৃষ্ণা নিবারণ করতে উন্মুখ হয়েছিল। প্রকৃত ইসলামী-আদর্শ মানবতার মুক্তি সনদ। দর্শন-বিজ্ঞান-সমাজতত্ত্বের কষ্টি পাথরে পরীক্ষিত এই আদর্শের পতাকা তিনি আজীবন বহন করেছেন এবং তা পবিত্র উত্তরাধিকার হিসেবে অর্পণ করে গেছেন মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা তথা বেলায়তের অনুসারীদের হাতে। এখানে ছোট একটা বিষয় পরিষ্কার করে রাখা দরকার যে, উপরে উদ্ধৃত পঙতিগুলোতে বোত বা প্রতিমা, পৈতার সূত্রদ্বারা জপমালা গাঁথার যে উপমা পেশ করা হয়েছে, সেগুলো মূলতঃ প্রবৃত্তিপূজা অর্থাৎ অর্থ-বিত্ত-ক্ষমতা-আয়েশের বোত-পূজাকে বুঝানো হয়েছে। সূরা নজম ৫৩:২৩ আয়াতের শেষার্ধে তার প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। এছাড়া আধুনিককালে মার্কসবাদীরাও অর্থগৃধ্নুতা-ভোগ-বিলাসকেও এক ধরনের প্রবৃত্তিপূজা (worship) হিসেবে নিন্দা করে। ইকবালের এই শন্দ-শৈলী বৃহত্তর অর্থ প্রকাশের সহজবোধ্য অবলম্বনের বেশী কিছু নয়। অছিয়ে গাউসুল আযমও একইভাবে ধর্মের পোশাকে প্রবৃত্তি পূরণের লালসার প্রতি অনীহা, অননুমোদন প্রকাশ করেছেন। তাঁর মহান হাদী বা পথ প্রদর্শক হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী 'কালামুল্লাহ্ বিক্রেতা' বা ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রতি খড়্গ হস্ত ছিলেন।

২. ধর্ম-ব্যবসার প্রতি সুস্পষ্ট ঘৃণা হযরত ঈসার (আ.) সময় থেকেই প্রকট। কুরআনেও রয়েছে এ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারী। ধর্ম, আল্লাহ্, ঈশ্বর নিয়ে ব্যবসা নীতিশাস্ত্র, ধর্ম, দর্শন, জীবন-দর্শনে কোথাও স্থান পায়নি। মানবতার মহত্বের অধঃপতনের অন্যতম প্রধান কারণও এটি। এ বিষয়ে অছিয়ে গাউসুল আযমের চিন্তা ও চেতনার ধারা দার্শনিক ইকবালের সাথে মিলে গেছে। বিপন্ন মানবতা ও অধঃপতিত মুসলিম সমাজকে উদ্ধারের লক্ষ্যে তাঁদের সংগ্রামের বাঁশিতে তাই একই সুর ধ্বনিত হয়েছে।

৩. উপরের দুটো অধ্যায়ে প্রকাশ পেলো যে, ধর্মাচারের সামাজিক ব্যবহারের যথার্থতা বিচারে তাঁরা উভয়েই সংবেদনশীল। এ ক্ষেত্রে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী অভিন্ন এবং অন্য

অনেকের চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। ড. ইকবালের মতো তিনিও ধর্মকে বিজ্ঞান ও সমাজচেতনার আলোকে দেখেছিলেন। খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের ফলে তিনি সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন যে, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে কর্কশ ও নিরেট সামাজিক বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটে। স্বীয় কৈশোর-তারুণ্যের দিনগুলোতে আর্থিক অমসৃণ পথ চলার অভিজ্ঞতা তাঁকে করে তুলেছিল আরো বাস্তববাদী। তাই নিজের চারপাশের, সমাজের, দেশের মানুষের দুর্দশা মোচনের এক ঐশী প্রেরণা তাঁকে আন্দোলিত করেছিল। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল সংসার তথা পার্থিব জীবন যাপনের ক্ষেত্রে নির্বিলাস, সংযমী ও অভাবীদের প্রতি আল্লাহ্মুখী সংবেদনশীলতা পোষণের জন্য হযরত সাহেব কেবলার শিক্ষা। আধ্যাত্মিক চক্ষু উম্মীলনের পাশাপাশি তাঁর সমাজ-চক্ষুও প্রস্ফুটিত হয়েছিল। "ইকবালের লেখনীতে ভর করে ফেরেশ্তাদের প্রতি আল্লাহ্র ফরমানের" তরঙ্গ সজোরে আঘাত হেনেছিল তাঁর হৃদয় উপকূলে :

"ওঠো! আমার এই দুনিয়ার গরীবগণে জাগিয়ে দাও
ওমরাহদের মহলগুলোর দুয়ার-প্রাচীর হেলিয়ে দাও।"

এই সমাজ চেতনার অনবদ্য ফসল বেলায়তে মোত্লাকায় সন্নিবেশিত নবম, দশম ও দ্বাদশ পরিচ্ছেদের বেশ কয়েকটা সমাজ ঘনিষ্ঠ অনুচ্ছেদ, যেগুলোকে তিনি মহৎ মানবিক সুফি চেতনার বন্ধনীভুক্ত করে এ ক্ষেত্রে আধুনিক মননের স্বাক্ষর রেখেছেন।

৪. ইকবাল দর্শনের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিশ্লেষণ সুদীর্ঘ ও কঠিন ব্যাপার। সংক্ষেপে দুএকটা বিষয় পত্রস্থ করা হলো। আসরারে খুদী (ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব) এবং রমুজে বেখুদী (আত্মলয়ের রহস্য), বিশ্বময় দর্শন ও তাসাওউফ জগতে প্রচণ্ড আলোড়নশীল এই দুই দার্শনিক খণ্ডকাব্য যেন দ্যুতিময় হীরক খণ্ড। আসরাবে খুদীতে তিনি এঁকেছেন পূর্ণাঙ্গ মানবের পরিচয়–যার আদর্শ হযরত মুহাম্মদ (দ.) এবং এতে ব্যাখ্যাত হয়েছে ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ও বিকাশের মূল সূত্রগুলো। তিনি এক ধারার সুফি-সাধকদের নিষ্ক্রিয়তাবাদের কঠোর সমালোচক এবং ফানা বা আত্মলয়ের প্রাচীন ধারাকে প্রত্যাখ্যান করে প্রমাণ করেছেন যে, 'আত্মলয় করতে হবে বৃহত্তর সামাজিক কল্যাণের জন্য'।

"ব্যক্তি হিসেবে মানুষের জন্য যেমন খুদীর প্রয়োজন, সামাজিক জীব হিসেবে তেমনি প্রয়োজন বেখুদীর। সামাজিক অস্তিত্ব ব্যক্তির পরস্পর সম্মিলনের উপর নির্ভরশীল, যার পূর্ণতা নির্ভর করে নবুয়তের উপর। ইসলামী আদর্শিক জাতীয়তাবাদের মূল স্তম্ভগুলোর প্রথম স্তম্ভ তৌহিদ। দ্বিতীয় স্তম্ভ নবুয়ত। হযরত মুহাম্মদের (দ.) নবুয়তের প্রধান লক্ষ্য মানবজাতির মধ্যে সাম্য, স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃত্বের ভিত্তিস্থাপন। মুসলিম সমাজতন্ত্র তৌহিদ ও নবুয়তের উপর স্থাপিত হওয়ায় এর কোনও বাসভূমি নাই। এর কোনও

সাময়িক মেয়াদও নাই। জাতীয় চরিত্রের সুষমা নির্ভর করে হযরত মুহাম্মদের (দ.) পদ্ধতি অনুকরণের উপর। জাতীয় জীবনের জন্য একটি প্রত্যক্ষ কেন্দ্র প্রয়োজন। পৃথিবীর সমস্ত মুসলিম জাতির সেই কেন্দ্র পবিত্র কাবা। মুসলিম জাতীয় জীবনের লক্ষ্য একত্ববাদের সংরক্ষণ ও প্রচার। এর উপরই নির্ভর করে তাদের প্রকৃত সংহতি। জাতীয় জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য আবশ্যক এই যে, গোটা জাতি এক ব্যক্তির ন্যায় সমাজ-আত্মার উপলব্ধি করবে। জাতীয় রীতি-নীতি সংরক্ষণ দ্বারা এবং সমাজ জীবনে ব্যক্তির আত্মলয়ের দ্বারা এক কথায় বেখুদীর দ্বারা এইরূপ সমাজ-আত্মবোধের সৃষ্টি ও পূর্ণতা হয়। তাঁর ভাষায়, যখন ব্যক্তি সমাজের মধ্যে লয় পায়, তখন বিস্তৃতি প্রয়াসী বিন্দু সিন্ধুরূপ ধারণ করে"। **[ইকবাল : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্]**

৫. ইকবালের দর্শন-ইমারত বর্ণাঢ্য। তিনি বলেন : "ইউরোপের জ্ঞানীগণ আমার জ্ঞান বাড়িয়েছেন, দিব্যজ্ঞানীদের সংসর্গ আমার হৃদয় উজ্জ্বল করেছে।" তাঁর বাণী হিন্দু, মুসলমান, ইহুদী, খৃস্টান নির্বিশেষে সকল ধর্মাবলম্বীর জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। তাঁর দর্শনে সকল ধর্মাবলম্বীর চিন্তার খোরাক রয়েছে। তিনি নব্য ইসলামী দর্শনের ভিত্তি পত্তন করেছেন। ইকবাল দর্শনে খোদা তত্ত্ব ও প্রেম, নারী সম্পর্কিত ধ্যান-ধারণা, স্বদেশপ্রেম, মানবতা, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব ও মিল প্রভৃতি সকল গুরু বিষয়ে সারগর্ভ আলোকপাত রয়েছে। ইকবাল দর্শন বৈদিক, বৌদ্ধ, জরথুস্ত্র, ইসলাম, গ্রীক, পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিবাচক অবদানের সমাহার এবং ইসলামী-ইউরোপীয় দর্শনের সাথে এগুলোর সামঞ্জস্য সাধনে প্রয়াসী। ইকবালের খুদীতত্ত্ব এতোই বুলন্দঃ

খুদী কো কর্ বুলন্দ ইত্না কী হর্ তকদীরসে পহেলে,
খোদা বন্দেসে খোদ্ পুছে, বন্দা তেরী রযা ক্যা হ্যয়।

[বঙ্গানুবাদঃ ব্যক্তিত্বকে এমনতরো উন্নত করো, যেনো প্রত্যেক ভাগ্য নির্ধারণের পূর্বে খোদা নিজে তার বান্দাকে জিজ্ঞেস করেন, বলো, কিসে তোমার সন্তুষ্টি?]

আপনি দুনিয়া আপ পয়দা কর্ আগর যিন্দা মেঁ হ্যয়।
সির্‌রে আদম হ্যয় যমীরে কুন্ ফকাঁ হ্যয় যিন্দেগী।

[বঙ্গানুবাদঃ নিজের পৃথিবী তুমি নিজে সৃষ্টি করো, যদি তুমি জীবিতের মধ্যে হও। জীবন হচ্ছে আদমের গুপ্ত রহস্য, বিশ্বের বিবেক]।

আরো আছেঃ

বা জহাঁ না মসা অদ সাখতন
ইস্ত, দর য়দাঁ সপর আন্দাখতন।
সর্দে খোদাদারেকে বাশদ পুখতাকার,
বা মিযাজে উ-বিসাযদ রোযগার।

[বঙ্গানুবাদ: অশুভ পৃথিবীর সঙ্গে সন্ধি করা যুদ্ধ ক্ষেত্রে ঢাল ফেলে দেবার সমান। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ব্যক্তি যে নিজ কাজে পরিপক্ক হয়, সময় তার মরজি-মেজাজের সাথে সন্ধি করে।]

তকদীর সম্পর্কে তাঁর উপসংহার: নিয়তি বা তকদীর খুদীর আন্তরপরিণতি। খুদী তার আন্তর সম্ভাবনা, আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের দ্বারা পরিচালিত। "Destiny is not the inward reach of an ego ---. The ego is however determined by its inner possibilities, its own aspirations and ideals" [The Reconstruction of Religious Thought in Islam]।

মানুষ সম্পর্কে তাঁর শিলালিপি: 'একদিন এক মুঠো ধূলোর আলো স্বর্গীয় দূতদের জ্যোতিকে অতিক্রম করবে। একদিন পৃথিবী তার সৌভাগ্যের তারায় স্বর্গে পরিণত হবে।"

ড. ইকবালের দর্শন, বিজ্ঞান, জীবন-বাস্তবতা, তাসাওউফের বিশাল আসমানের আয়নায় অছিয়ে গাউসুল আযম নিজের চেতনা ও ভাবনার প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছিলেন এবং সে কারণে তাঁর বেলায়তে মোত্লাকায় তাঁকে সশ্রদ্ধ আসনে স্থাপন করেছেন।

৬. ইকবালের রচনাবলী: ক. ১৮৯৯/১৯০০ খৃস্টাব্দে লাহোর সরকারী কলেজে ইংরেজী ও দর্শন শাস্ত্রে অধ্যাপনাকালে তাঁর রচনা **উর্দু ভাষায় অর্থনীতি বিষয়ক প্রথম পুস্তক**। খ. আসরারে খুদী (ফার্সী ভাষায়, ১৯১৫ ইং; ইংরেজী অনুবাদ: প্রফেসর এ. আর. নিকলসন, ১৯২০ ইং); গ. রমুজে বেখুদী (ব্যক্তিত্ব বিলোপনের গুপ্ত কথা, ফার্সী, ১৯১৮ ইং); ঘ. খিজরে রাহ (অমৃত উৎসের পথ প্রদর্শন, ১৯২১), ঙ. তুলূ-এ-ইসলাম (ইসলামের উদয়, ১৯২২), চ. বাঙ্গে দারা (ঘণ্টাধ্বনি, ১৯২৪, পূর্ব রচিত সমগ্র উর্দু কবিতা ও খন্ডকাব্য), ছ. পয়ামে মাশরিক (প্রাচ্যের বাণী, ফার্সী, ১৯২৩), (জ) তসখীরে ফিতরত (সৃষ্টির অধিকার, মহান জার্মান দার্শনিক কবি গ্যাটের West-Oestilicer Diwan–এর জবাবী কাব্য), (ঝ) যবুরে আযম (অনারব দেশীয় মহাগীতি; ফার্সী, ১৯২৭, (ঞ) গুলশনে রায জদীদ এবং বন্দেগীনামা–এই দুই খণ্ডকাব্য এ কাব্যের অন্তর্ভুক্ত), (ট) জাওয়ীদনামা (অমরলিপি, ফার্সী, মহাকবি দান্তের Divinia Comcdia-এর আদলে রচিত, ১৯৩২), (ঠ) মুসাফির (পথিক, ফার্সী, ১৯৩৪), (ড) বালে জিব্রিল (জিব্রাইলের ডানা, উর্দু কবিতা সঙ্কলন ১৯৩৫), (ঢ) পস্ চি বয়াদ কর্দ (অতঃপর কিংকর্তব্য! ফার্সী, ১৯৩৬), (ণ) যর্বে কলীম (মুসার যষ্টির আঘাত, উর্দু কবিতা সংগ্রহ, ১৯৩৬), (ত) আর্গুমানে হেজাজ (হিজাজের উপঢৌকন), উর্দু ও ফার্সী কবিতা সঙ্কলন, ১৯৩৮), (থ) Reconstruction Of Religious Thought in Islam (ইংরেজীতে প্রদত্ত ছয়টি দার্শনিক বক্তৃতা-প্রবন্ধ

সঙ্কলন, যা বিশ্বের দার্শনিক সমাজে অজর দর্শনগ্রন্থ হিসেবে সমাদৃত হয়ে আসছে) (দ) The Development of Metapphysics in Persia.

টীকা : তথ্যসুত্র

বিশেষ করে চতুর্থ অনুচ্ছেদসহ পুরো অধ্যায় রচনায় যেসব পুস্তকের সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে, সেগুলো হলো: (ক) ইকবাল: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ১৯৪৫, ঢাকা, (খ) The Reconstruction of Religious Thought in Islam : Muhammad Iqbal, (গ) ইকবালের কাব্য সঞ্চয়ন : মনির উদ্দীন ইউসুফ, (ঘ) মুসলিম মনীষা: আবদুল মওদুদ ১৯৫৫, কলিকাতা, (ঙ) মুসলিম দর্শনের ভূমিকা, প্রফেসর রশীদুল আলম ১৯৭০, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

সপ্তবিংশ অধ্যায়

অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.)

[১৮৯৩-১৯৮২]

"হে বারে খোদা! আমার মধ্যে আমাকে জানিতে শক্তি দাও।
আমাকে খাঁটি রাখ এবং খাঁটি থাকিতে শক্তি দাও, আমীন।
এয়া রাব্বাল আলামিন।"[১]

১. জাহেরী পৃথিবীতে এক দৃঢ়চিত্ত সংগ্রামী পদাতিক ঃ রুহানী জগতে নিভৃতচারীঃ

"A man without any contemporary progressive socio-political outlook is in.ellectually blind and incomplete" – কোন সামাজিক মানুষের সমীক্ষণবাদী মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসেবে অনুসৃত এই সূত্রের ধরা-ছোঁয়ার বহুযোজন দূরে অছিয়ে গাউসুল আযম হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অবস্থান। জীবনের রূঢ় বাস্তবতা তাঁর জন্য বরাদ্দ করেছিল স্ব-নির্মিত, স্ব-শিক্ষিত, স্ব-পরিশুদ্ধ একজন মানুষ হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলবার উন্মুক্ত ময়দান। তাঁর জীবনের কর্ম-পর্যায়ের সূচনা থেকে জীবনাবসান পর্যন্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তাঁর পার্থিব সকল কাজ ও পদক্ষেপ তথা পারিবারিক, সাংসারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক তথা জনসেবামুখী কর্মসূচি, সাংস্কৃতিক, সাংগঠনিক, আধ্যাত্মিক তথা বাতেনী, এমনকি তাঁর সৃজনশীল জ্ঞানগর্ভ লেখক সত্তা বিনির্মাণের দুরূহ সাধনাও ছিল সুপরিকল্পিত এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিসারী। তাঁর সংগ্রাম বহুল কর্মজীবনের আলেখ্য এই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি জীবন থেকে পলায়নী মনোবৃত্তিসম্পন্ন কিম্বা ধূলি-কর্দমময় বাস্তবতাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার কিম্বা মানুষের জন্য আল্লাহ্‌র সর্বশ্রেষ্ঠ দান 'সীমিত পার্থিব জীবনকালকে' উপেক্ষা করার বা অপাঙক্তেয় হিসেবে এড়িয়ে যাবার মানসিক পক্ষাঘাতে আক্রান্ত ছিলেন না। তিনি ছিলেন মাটির পৃথিবীতে জীবনবাদী ও বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গী লালনকারী এক দৃঢ়চিত্ত পদাতিক এবং একই সাথে রুহানী জগতে নিভৃতচারী।

নবীজীর (দ.) শরিয়ত ও মারিফাত সত্তাকে পথের দিশা হিসেবে গ্রহণ করে তিনি তাঁর কর্ম ও সাধনার ক্ষেত্রগুলোতে বিশ্বস্ত উম্মত বা অনুসারীরূপে বিংশ শতাব্দীতে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন চারপাশের সকলের জন্য। তাঁর মাঝে একাধারে একজন পবিত্র, সৎ, ধর্মাচারী, তাসাওউফের ভাষায় জাহেরী-বাতেনী উভয় ক্ষেত্রে

সমৃদ্ধিশালী একজন সমাজ-সচেতন সংস্কারক, লোক কল্যাণকামী এবং একই সাথে একজন অস্তিত্ববাদী (existentialist) দার্শনিকের সমন্বয় ঘটেছে।

২. জন্ম ও শিক্ষা জীবন: হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জন্ম ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৩ ইং, মোতাবেক ১৩ ফাল্গুন, ১২৯৯ বাংলা। তাঁর পিতা হযরত সৈয়দ ফয়জুল হক (১৮৬৫-১৯০২ ইং) এবং দাদা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.) (১৮২৬-১৯০৬ ইং)। মাত্র নয় বছর বয়সে (১৯০২) তিনি তাঁর পিতাকে, তেরো বছর বয়সে (১৯০৬) দাদাকে হারিয়ে বলতে গেলে 'ইয়াতিম' অবস্থায় উপনিত হন এবং জীবিত দাদীর আশ্রয়ে বড়ো হতে থাকেন। ইতোপূর্বে পাঁচ বছর বয়সে শিক্ষার হাতেখড়ি হয় তাঁর দাদাজানের হাতে। এ সময়ে পার্শ্ববর্তী গ্রাম বাবুনগর (ফটিকছড়ি থানা) নিবাসী মওলানা অলি উল্লাহ্ প্রথম এবং হাটহাজারী থানার মির্জাপুর নিবাসী মওলানা হাফেজ ক্বারী তফাজ্জল হোসেন তাঁর দ্বিতীয় গৃহ শিক্ষক নিযুক্ত হন। শেষোক্ত জনের উপযুক্ত শিক্ষায় তিনি আলোর দিশা পেয়েছিলেন এবং পরবর্তীকালে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে তাঁর নামে 'তফাজ্জল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা করেন। এই দুই মহান নিষ্ঠাবান শিক্ষকের কাছে তিনি আরবী, বাংলা, ফার্সী, উর্দু ভাষা এবং কুরআন-হাদিসের মৌলিক শিক্ষা লাভ করেন। তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেন তৎকালীন বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মোহসেনিয়া মাদ্‌রাসায় (বর্তমানে হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজ)। [তাঁর শিক্ষা জীবন, জ্ঞান সাধনা, রুহানী উরুজ প্রভৃতি সম্পর্কে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বিশদ বিবরণ রয়েছে]।

৩. রাজনৈতিক জীবন: বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে তিনি প্রসিদ্ধ খেলাফত আন্দোলনের সাথে জড়িত থাকেন এবং মওলানা মোহাম্মদ আলীসহ বিখ্যাত সর্বভারতীয় নেতাদের সংস্পর্শে আসেন। মওলানা মোহাম্মদ আলী ঐ সময়ে সংঘাত বিক্ষুব্ধ, বহু জাতি ও ধর্মে বিভক্ত ভারতবাসী ও ভারত-ভূমিকে অভিন্ন নৈতিক সূত্রে আবদ্ধ এবং একই সমতলে স্থাপন করার জন্য 'ফেডারেশন অব ফেইথ' তত্ত্ব পেশ করেন আল-কুরআনের শিক্ষা ও মদীনা সনদে বিধৃত সর্বমানবিক দর্শনের ভিত্তিতে, যা তাঁর ভাষায়, "Here in this country of hundreds of millions of human beings, in.ensely attached to religion and yet infinitely split up in.o communities, sects and denominations. Providence has created for us the mission of solving a unique problem and working out a new synthesis, **a Federation of Faiths**.[১]

খেলাফত আন্দোলনে যোগদানের সুবাদে তিনি ভারত বিখ্যাত শীর্ষনেতা ও আলেমদের সাহচর্যে যেসব শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন, সেগুলো পরবর্তীকালে

তাঁকে তৌহিদে আদ্বিয়ান; বিচার-সাম্য বা আদলে মোত্লাক দর্শন সূত্রায়িত করতে উদ্বুদ্ধ করে, যা 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এই বিবেচনায় তাঁকে একজন 'রাজনৈতিক-দার্শনিকের' মর্যাদায় অভিষিক্ত করা যায়। অবশ্য পরবর্তী পর্যায়ে তৎকালীন বাস্তব বিশ্ব ও সর্বভারতীয় পরিস্থিতিতে খেলাফত আন্দোলনের অসারতা প্রতিপন্ন হলে সমকালীন অনেক নেতার মতো তিনিও এই আন্দোলন থেকে বিযুক্ত হন। তবে মুসলিম সমাজের দুর্দশা ও ইসলাম ধর্মের মৌলিক শিক্ষা সম্পর্কে সাধারণ্যে অজ্ঞতা তাঁকে ব্যথিত করে তোলে, যা তাঁর একই গ্রন্থে ব্যক্ত হয়েছে। এ সময়ে তিনি ১৯২১-২২ ইং সনে দিল্লী, আগ্রা, আজমীর, পণ্ডিচেরী, হুগলী, কলিকাতা, বার্মা প্রভৃতি স্থান ও অঞ্চল সফর করেন এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন।

৪. সমাজসেবা ও শিক্ষা কার্যক্রম: বলা যায়, অছিয়ে গাউসুল আযম জন্মগতভাবেই সমাজ ও রাজনীতি সচেতন ছিলেন এবং তেমন একজন মানুষ হিসেবে, প্রত্যক্ষ উপকারমুখী মানুষ হিসেবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না, যা একজন দায়িত্বশীল মুসলিমের শরিয়তী কর্তব্যও বটে। ১৯১৬ সনেই তিনি মাইজভাণ্ডারের অজ পাড়াগাঁয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'আহমদিয়া জুনিয়র মাদ্রাসা, যা বর্তমানে চাড়ালিয়াহাটে স্থানান্তরিত হয়ে হাই স্কুলে পরিণত হয়েছে। তিনি ১৯৪৩ সনে 'তফাজ্জল মেমোরিয়াল লাইব্রেরী', দারুত্ত্বালিম প্রতিষ্ঠা করে জ্ঞান পিপাসুদের রসদ যোগানোর ব্যবস্থা করেন। এরপর ১৯৪৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন মাইজভাণ্ডার আহমদিয়া প্রাইমারী স্কুল। এছাড়া "আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারী" নামে একটি সামাজিক সংগঠন তৈরী করেন, যার প্রধান লক্ষ্য ছিল সমাজ থেকে অনাচার দূর করে সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং শান্তি ও সংহতি মজবুত করা। এই সংগঠনের আদর্শ, লক্ষ্য ও দর্শন দার্শনিক আল্লামা আজাদ সুবহানীর পরিকল্পিত 'রব্বানী সংঘের' অনুরূপ।

১৯৪৩ সনের দুর্ভিক্ষের সময় তাঁর সামাজিক-ধর্মীয়-রাজনৈতিক-ঈমানী বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে যা এখনো আধ্যাত্মিক ঘরানাগুলোর সমাজসেবামূলক কর্তব্যের স্মারক হয়ে আছে। এর পাশাপাশি স্থানীয় কৃষি উন্নয়নে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন, কৃষি উন্নয়ন সমিতি গঠন, সড়ক ও যোগাযোগ উন্নয়ন প্রভৃতিতে সক্রিয় অবদান রেখে একজন প্রকৃত আধুনিক ধার্মিক ও আধ্যাত্মিক ব্যক্তির যথার্থ স্বরূপের দৃষ্টান্ত হিসেবে ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়ে আছেন। বাংলা ভাষা আন্দোলন ও সংগ্রামের প্রতি সমর্থন, ১৯৫০ এর দশকে বাঙালির স্বায়ত্তশাসন আন্দোলন, ১৯৬০ এর দশকে স্বাধিকার এবং এরপর সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামে ধর্মীয়-সামাজিক-রাজনৈতিক তথা সর্বপ্রকার সক্রিয় সমর্থন দিয়ে নিজেকে একজন পূর্ণাঙ্গ বাস্তববাদী শরিয়তী মানুষ হিসেবে নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ ঘটান, যাতে নবীজী (দ.) এবং খোলাফায়ে রাশেদার জীবনধর্মী সৃজনশীল ভূমিকার প্রতিফলন দেখা যায়। তাঁর রচিত ১২টি (বারো) পুস্তক

তাঁর শৈক্ষিক, দার্শনিক প্রজ্ঞা, ধর্মীয় চেতনার গভীরে সফল অবগাহনের সাক্ষ্য বহন করছে।

তাঁর অনন্য কীর্তি প্রকৃত সুন্নী সিলসিলায় নবীজী (দ.), খোলাফায়ে রাশেদা এবং মহান দার্শনিক সমাজবিদদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিচার-সাম্য, সামাজিক সম্প্রীতির লক্ষ্যাভিসারী তৌহিদে আদ্বিয়ান, জনকল্যাণ, মারিফাত চর্চা প্রভৃতি সব কিছুকে একটা বাস্তবতামুখী ফ্রেমে স্থাপন করে ইসলামের শাশ্বত সর্বজনগ্রাহ্য প্রকল্প আধুনিক বাঙালি প্রজন্মের কাছে পেশ করা; যা 'বেলায়তে মোত্লাকা' শিরোনামে সিলমোহরাঙ্কিত।

একটি ধর্মীয় আবহে জন্মে ও বেড়ে উঠেও তিনি বিজ্ঞান চেতনাসমৃদ্ধ সমাজের মূল্যবোধ, আধুনিকতা ও আন্তর্জাতিকতাকে সৃজনশীলভাবে আত্মস্থ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বৈদেশিক ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সক্রিয় প্রতিবাদী। বাংলাদেশের মুসলিম সমাজের শিক্ষা পদ্ধতিতে হাজার বছরের বিজ্ঞান-দর্শন-সংস্কৃতিপুষ্ট মানবতাবাদী শিক্ষার প্রতি বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসকদের উপেক্ষা, তাঁকে এবং তাঁর দাদাজান হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীকে কী মাত্রায় পীড়িত করেছিল, তার বিবরণ বেলায়তে মোত্লাকা গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে।

৫. ওহী তথা কুরআন-হাদিসের খেদমতে: দর্শনের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে যে, খৃষ্টীয় নবম শতকে মুতাজিলা চিন্তাবিদরা যুক্তিকে (reasons) ওহীর (revelation) উর্ধ্বে স্থান দিয়ে যুক্তিকে জ্ঞানের প্রধান উৎস হিসেবে গণ্য করতেন এবং তৎকালীন খলিফা আল-মামুন এই দর্শন চিন্তাকে সরকারি অধ্যাদেশ বলে বাধ্যতামূলকভাবে অনুসরণীয় করার পদক্ষেপ নিলে হিতে বিপরীত হয়; যার ফলে বিজ্ঞান ও যুক্তির বিরুদ্ধে এক ধর্মান্ধ শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। নবী সাহাবা হযরত আবু মুসা আল-আশআরীর অধস্তন বংশধর আবু হাসান আল-আশআরী প্রথমে ছিলেন তৎকালীন মুতাজিলা চিন্তাগোষ্ঠীর [যা পরবর্তী উন্নততর দার্শনিক সমীক্ষণে অসম্পূর্ণতাকীর্ণ হিসেবে বিবেচিত] শেষ শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ আল-জুব্বাইয়ের প্রতিভাবান ছাত্র। দর্শন জগতে তখন যুক্তি ও ওহীর মধ্যে কোনটা যথার্থ জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিতে পারে, তা নিয়ে প্রবল বিতর্কের ঝড় চলছিল। আল-মামুনের হুকুম-আইন এ সমস্যার সমাধান দিতে পারেনি। কারণ, মন ও হৃদয়, বিবেক ও চিন্তার উপর কোন প্রকার দুনিয়াবী আইন বিন্দুমাত্র নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে পারে না। এ বিষয়টা গভীরভাবে আলোড়িত করে আবুল হাসান আল আশআরীকে এবং সমাধানসূত্র পাবার উদ্দেশ্যে তিনি স্বীয় শিক্ষকের সাথে যুক্তি-যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুক্তি-পাল্টাযুক্তির এক পর্যায়ে দার্শনিক আল-জুব্বাই স্বীয় ছাত্রের প্রশ্নের সামনে নিরুত্তর হয়ে পড়েন। সন্তোষজনক জবাব না পেয়ে আবুল হাসান আল আশআরী স্বীয় শিক্ষকের পথ থেকে সরে আসেন এবং প্রখর যুক্তিমত্তার সাহায্যে সিদ্ধান্তে আসেন যে, 'শুধু যুক্তি বলে মানব জীবনের 'সকল' সমস্যার সমাধান

পাওয়া যায় না, এ ব্যাপারে ওহীর উপর নির্ভর করতে হয়'। খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিনি এবং তার অপর দুই সহযোগী আল তাহাবী (মিশর), আল-মুতুরুদী (সমরকন্দ) 'যুক্তিকে' 'ওহীর' অধীন বলে দার্শনিকভাবে সাব্যস্ত ও উপস্থাপন করে সর্বস্তরের জনগণের সমর্থন লাভে সমর্থ হন এবং একই সাথে 'যুক্তি ও বিজ্ঞান' বিরোধীদের ভ্রান্তি অপনোদনে সক্ষম হন। আল-আশআরীর দার্শনিক সমর্থকরা ইতিহাসে আশআরীয় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। ইতিহাসে আরো বর্ণিত আছে যে, মানসিক এই প্রবল দ্বন্দ্বকালে আল আশআরী উদভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং তাঁর নিত্য অনুসৃত দর্শন চর্চা, ওজীফা-আচারাদি থেকেও বিরত থাকতে মনস্থ করেন। ঐ সময়ে একদিন ২৭ রমযান রাতে সকল আচার বাদ দিয়ে তিনি শুয়ে পড়লে স্বপ্নে নবীজীর (দ.) প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'আমি দার্শনিক চিন্তা পরিত্যাগ করে শুধু কুরআন-হাদিস পাঠ ও আলোচনা করছি'। নবীজী (দ.) বলেন: "আমি আপনাকে দর্শন চর্চা পরিত্যাগ করতে বলিনি। বলেছিলাম, আমার হাদিস সমর্থন করতে। কেননা, এগুলো যথার্থ।" একই রমযান মাসের প্রথম দশকে নবীজী (দ.) তাঁকে স্বপ্নে পরামর্শ দেন : "আমার হাদিস সমর্থন করুন। কারণ, এগুলো সত্য।" দ্বিতীয় দশকেও একইভাবে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে নবীজী (দ.) তাঁকে বললেন, "আমি আপনাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তার কি করলেন?" আশআরী বললেন, "হুজুর! আমি সনদ পরীক্ষা করে হাদিস গ্রহণ করি এবং এসব হাদিসকে যুক্তির মাধ্যমে ব্যাখ্যা করে দার্শনিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে থাকি" (অবরোহ পদ্ধতি)। তাঁর জবাব শোনার পর নবীজী (দ.) আবার বললেন, "আমার হাদিসমূহকে সমর্থন করুন। কেননা, এগুলো যথার্থ।" দ্বিতীয় দফা স্বপ্নাদেশের পর তিনি দার্শনিক চিন্তাধারা একেবারে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলে তৃতীয় দফা স্বপ্নে নবীজী (দ.) তাঁকে সঠিক পথের দিশা দেন, যা উপরে বর্ণিত হয়েছে। এরপর থেকে আল-আশআরী যুক্তি-বুদ্ধিমত্তার উপরে নবীজীর (দ.) হাদিস, ওহীকে প্রাধান্য দিতে থাকেন এবং প্রত্যেক হাদিস ও ওহীর সমর্থনে অচিন্ত্যপূর্ব শাণিত যুক্তি তাঁর জবানে মওজুদ হতে থাকে। আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাত এর কাছে অতীব শ্রদ্ধাভাজন এই দার্শনিক আল-আশআরী উপরোক্ত পদ্ধতি অনুসরণ ও প্রয়োগপূর্বক যুক্তিভিত্তিক দর্শনকে ওহীর সাথে জুড়ে দিয়ে দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে অসীম এক গগনের সৃষ্টি করেছেন, যা এখন পর্যন্ত সর্বত্র গ্রহণীয় ও সম্প্রসারণশীল এবং এই সত্যেরই সুস্পষ্ট সংকেত দিচ্ছে যে, ওহী তথা কুরআন হাদিসের যথার্থতা সপ্রমাণে ব্রতী হলে প্রকৃত সত্য বা হক্কুল ইয়াকিনের সন্ধান মিলে।[২] এরপর হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) আশআরীয় মতবাদের সাথে তাসাওউফ সংযুক্ত করে এই তত্ত্বকে দর্শনের সর্বোচ্চ আসনে সংস্থাপন করেন।

আবুল হাসান আশআরীর এই বৃত্তান্ত এখানে পরিবেশন করার উদ্দেশ্য হলো এই যে, অছিয়ে গাউসুল আযম সমকালে বিরাজমান বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন বিভ্রান্তির কুয়াশাজাল ছিন্ন করে সম্পূর্ণ আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে কুরআন-হাদিসকে উপস্থাপন করেছেন বিশ্বমানবিক প্রেক্ষাপটে। তাঁর আরো বিশালত্ব হলো, যে সূক্ষ্ম ও জটিল কাজটা সাধনের দায়িত্ব ছিল বিশেষ করে বাঙালি মুসলিম দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের, সে কাজটাই তিনি হাতে নিয়েছিলেন গতানুগতিক পন্থায় ধর্ম কিম্বা ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য নয়; জ্ঞান, দর্শনের ভুবনকে প্রকৃত সম্পদে সম্পদশালী করে বিশ্ব মানবতার কল্যাণের লক্ষ্যে। বেলায়তে মোত্লাকাসহ তাঁর গ্রন্থরাজি সেই সাক্ষ্য ধারণ করে আছে।

অছিয়ে গাউসুল আযমের দৃষ্টিভঙ্গীতে একটা জিনিস ধরা পড়েছে যে; যে-কোন ধর্মীয় আচার-সংস্কৃতি; তা মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, উপজাতি, প্রকৃতিপূজক যা-ই হোক না কেন; সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে গড়ে উঠার পেছনে একটা আর্থ-সামাজিক বাস্তব পরিস্থিতি বিদ্যমান থাকে; সংশ্লিষ্ট ধর্মাচারের প্রকৃতি, নৈতিক-ব্যবহারিক স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য যা বিশ্লেষণ ও নিরীক্ষণ প্রয়োজন। এই সামাজিক বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া যথার্থভাবে অনুসরণ করেছিলেন হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) এবং সমাজ বিজ্ঞানের জন্মদাতা ইবনে খালদুন। বেলায়তে মোত্লাকার দার্শনিক কাঠামো বিনির্মাণ করতে গিয়ে অছিয়ে গাউসুল আযম সমকালীন সমাজের প্যানোরামাও বিশ্লেষণ করেছেন, যার স্বাক্ষর 'বেলায়তে মোত্লাকা' গ্রন্থে বিধৃত। এ বিষয়টা আমাদের বাংলাদেশের ধর্মাচার-সংস্কৃতির উদ্ভবের বাস্তব সামাজিক কারণ নির্ণয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এতে সমাজের দীনতা, প্রত্যাশা ও সম্ভাব্য সমাধানসূত্র নির্ণয় করার পথ সুগম হয়।

৬. মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার আচার-আচরণ বিধি (যা হযরত আকদাসের সময় থেকে প্রবর্তিত হয়) লিখিত পুস্তিকা আকারে সুবিন্যস্ত করে রেখে তিনি যেমন এক গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন, তেমনি ত্বরিকা ও বেলায়তের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আচার-সংক্রান্ত এসব পুস্তিকা: মূল তত্ত্ব, বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার, মুসলিম আচার ধর্ম, মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া। এসব পুস্তক পড়ে যে কোন ব্যক্তি ত্বরিকার আচার সংক্রান্ত সম্যক জ্ঞান অর্জন করে এস্তেমাল করতে সক্ষম। তাঁর জীবন-কর্ম-কীর্তি আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্লেষণের দাবী রাখে। এতে কেবল ত্বরিকতপন্থীদের জন্য নয়, সামগ্রিকভাবে মুসলিম জনগণ তথা আরো বৃহত্তর পরিসরে সর্বমানবিক কল্যাণের দিগন্ত প্রসারিত হবে। রুহানী ফুল বক্ষে ধারণ করে যারা জাহেরী জগতে সুগন্ধ বিলান, তাঁরাই পূর্ণাঙ্গ আদর্শ মানব।

৭. অছিয়ে গাউসুল আযমের রচিত পুস্তকাবলী: ১. বেলায়তে মোত্লাকা, ২. গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর জীবনী ও কেরামত, ৩. মুসলিম আচার ধর্ম, ৪. বিশ্ব মানবতায় বেলায়তের স্বরূপ, ৫. মানব সভ্যতা, ৬. মূল তত্ত্ব বা তাজকীয়ায়ে মোখতাছার (১ম ও ২য় খণ্ড), ৭. মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া, ৮. এলাকার রেনেসাঁ যুগের একটি দিক, ৯. প্রতিবাদলিপি, ১০. আঞ্জুমানে মোত্তাবেয়ীনে গাউসে মাইজভাণ্ডারীর গঠনতন্ত্র, ১১. জীবন দর্শন।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. Moulana Muhammad Ali: My Life.

২. স্বপ্নযোগে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ): [ইমাম আবু সাঈদ আবদুল মালেক ইবনে উসমান নিশাপুরী (মৃ. ৪০৭ হি.) বিরচিত সীরাত গ্রন্থ 'শরফুন-নবী']: অনুবাদ" মুহীউদ্দিন খান, সীরাত গবেষণা ও প্রচার সংস্থা, ঢাকা ৬ষ্ঠ সংস্করণ; ১৯৯৮ ইংরেজী।

বিঃদ্রঃ এই অধ্যায়ের উপাদান-উপকরণ অছিয়ে গাউসুল আযমের রচিত বেলায়তে মোত্লাকাসহ বিভিন্ন গ্রন্থ ও পুস্তক থেকে সংগৃহীত ও বিন্যস্ত।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)

[১৯২৮-১৯৮৮]

"জমি আল্লাহ্র, টাকা আল্লাহ্র; মানুষ আমানতদার"।
"হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ্ আল্লাহ্ জিকির কর"।

১. আল-কোরআন 'মানব-দেহ আর আত্মা সহযোগে যৌগিক অখণ্ড সত্তার' ব্যবহারিক গণিতও বটে :

আল-কোরআন বহুবিধ বিষয়ের মধ্যে ব্যবহারিক অর্থনীতি বিষয়ক সূত্র, নীতি এবং নিদের্শনাও ধারণ করে। ইসলামী দর্শনে দেহ আর আত্মা মিলে এক অখণ্ড সত্তা। তাই কেবল রুহানী বা আধ্যাত্মিক বিষয় নয়, বরং আপাতদৃষ্টিতে যা জীবনের তুচ্ছ নেহায়েত আটপৌরে বৈষয়িক ব্যাপার, তা নিয়েও কোরআন উৎসুক এবং আন্তরিকভাবে সমাধান দিতে ব্যস্ত। মানুষ যেহেতু দেহ আর আত্মা নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ সত্তা, সেহেতু জীবনের কোন দিকই এমন তুচ্ছ নয়, যা তার দর্শন তথা ধর্মীয় চৌহদ্দির বাইরে থাকবে। কোরআনে বার বার দৃষ্টান্তসহকারে বলা হয়েছে যে, পার্থিব জীবন মানুষের উচ্চতর জীবনের পথে একটা স্তর মাত্র, যে জীবনের প্রকৃতি হচ্ছে আধ্যাত্মিক। পার্থিব জগতে দৈহিক অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি বৈষয়িক উন্নতি ও সমৃদ্ধি কাম্য, তবে তা-ই পরম লক্ষ্য নয়। তাই ক্ষুধা-তৃষ্ণা-কামনা-বাসনার সীমিত নিজস্ব যৌক্তিকতাকে নৈতিক চেতনা সহযোগে সংহত ও নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। শুধু যে আল্লাহ্র সাথে মানুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই চেতনার যোগ থাকবে, তা নয়; মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্কের রসায়নের সাথেও এর যোগ হয়েছে। কেবল আধ্যাত্মিক পূর্ণতাপ্রাপ্তির সাধনার সাথেই তা সম্পর্কিত নয়, বরং নৈতিকতাভিত্তিক সামাজিক অবস্থা ও পরিবেশ সৃষ্টির সাথেও তা সম্পৃক্ত, যা সকলের আত্মিক বিকাশেরও অনুকূল, যাতে সকল মানুষ পূর্ণাঙ্গ জীবন যাপন করতে পারে। আল-কোরআন এই বিষয়টাকেও মানুষের বোধগম্য করে তোলার বাণী ধারণ করে।

হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) তত্ত্ব-দর্শন সম্বন্ধীয় জ্ঞানকে বলেছেন, আত্মার খোরাক। পক্ষান্তরে দেহের খোরাক হলো খাদ্য-সামগ্রী। দুনিয়াতে মানুষ নিজের দেহ রক্ষার্থ ত্রিবিধ দ্রব্যের মুখাপেক্ষী: ক. আহার্য দ্রব্য, খ. পরিধেয় বস্ত্র, গ. আত্মরক্ষার নিমিত্ত গুহা বা বাসস্থান। দেহকে টিকিয়ে রাখার জন্য এই ত্রিবিধ বস্তু ভিন্ন মানুষের আর

কিছুরই দরকার হয় না। অতএব, এই তিনটি দ্রব্যই দুনিয়াদারীর মূল[১]। এ প্রসঙ্গে অর্থনীতির ভাষায় মানুষের মৌলিক চাহিদা ও অধিকার (basic needs and rights) সম্পর্কে নবীজীর (দ.) সূত্র প্রণিধানযোগ্য : "থাকবার জন্য একটা ঘর, লজ্জা নিবারনের জন্য এক খণ্ড বস্ত্র, ক্ষুধা নিবারণের জন্য কয়েকটা রুটি এবং পানি পান করার জন্য একটা পাত্র–এর অতিরিক্ত কোন সম্পদের অধিকারী হবার হক্ বা অধিকার আদম সন্তানের নেই [হযরত উসমান (রা.) সূত্রে তিরমিজী]। এই একবিংশ শতাব্দীর প্রথম সিকিতে বিশ্বময় উভয় গোলার্ধে কোটি কোটি বাস্তুহারা নিঃসম্বল মানুষের ন্যূনতম চাহিদার আলোকে এই হাদিস শরিফের বাস্তবতার গভীরতা ও ব্যাপকতা পরিস্ফুট। অতএব, মহাজাগতিক প্রেক্ষাপটে আল-কোরআনের পাঠশালায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে মানবদেহ আর আত্মার সমন্বয়ে গঠিত যৌগিক অখণ্ড পার্থিব সত্তার ব্যবহারিক গণিতও অন্তর্ভুক্ত।

২. কোরআনের বিভিন্ন আয়াতে সমাজ-দর্শন-বিজ্ঞান সূত্রের পাশাপাশি ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির মৌলিক সূত্রও বিধৃত:

আল-কোরআন রুহানী বা আধ্যাত্মিক সূত্র ধারণের পাশাপাশি মানব সমাজ ও জাগতিক পরিবেশের পাটীগণিত এবং বনি-আদমের জন্য দিক নির্দেশক উপপাদ্য-সম্পাদ্যে পরিপূর্ণ, যা সপ্রমাণ কিম্বা সম্পাদন করা মানব-সমাজের নিজের স্বার্থেই আবশ্যক। কোরআনের দ্বিতীয় অধ্যায় সূরা বাক্বারা থেকে শুরু করে ১১১তম অধ্যায় সূরা লাহাব পর্যন্ত বিভিন্ন আয়াত বা বাক্যে, শব্দে সমাজ সূত্র, আর্থিক সূত্র, আইন সূত্র, যথার্থ দর্শন সূত্র, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞান প্রভৃতি সর্ব বিষয়ে তত্ত্ব ও ব্যবহারিক আয়াত বা নিদর্শন বিন্যস্ত আছে। মানুষ তার সমকালীন প্রয়োজন অনুযায়ী সেখান থেকে সূত্র, দিশা, আলো আহরণ ও প্রয়োগ করে মাত্র। এই গ্রন্থ শাশ্বত কল্যাণময়তার আলোকে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পার্থিব সম্পদ আহরণ, অর্জন, বণ্টন, ব্যয়, ভোগ, দান প্রভৃতি সর্ববিষয়ে যুক্তিসিদ্ধ ব্যাকরণরূপে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক অর্থনীতির (micro and macro economics) মৌলিক সূত্রাদি সরলভাবে পরিবেশন করেছে। এতে ব্যষ্টিক ও সামষ্টিক আর্থনীতিক বিষয়াদির মধ্যে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক এমনকি আন্তর্জাতিক পরিসরে আহরণ, অর্জন, উপার্জন, ব্যয়-বণ্টন খাতগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত যে, এটা যেন একটা ব্যবহারিক অর্থনীতিরও পুস্তক; এমনকি ক্ষেত্র বিশেষে হিসাব-বিজ্ঞান হিসেবেও প্রতিভাত হয়ে উঠে। তাই আধুনিক অনেক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বিজ্ঞ ও বিদ্বজ্জনের পরিভাষায় আল-কোরআন অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অর্থনীতির ব্যষ্টিক, সামাজিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে অর্জন-উপার্জন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি ইপ্সিত (optimum) ভোগ,

বিশ্বমানবতার কল্যাণমুখী সুষম বণ্টন প্রভৃতি জরুরী বিষয়াদির ব্যাকরণ হিসেবে ব্যবহারযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য।

মহান নবী-রসূলগণ এবং তাঁদের বিবিধ প্রকার আলোময় ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার ধারক ও বহনকারী ওলী-আল্লাহ্গণ, যাঁরা নিজেদের কর্ম, সেবা ও অবদানের জন্য সকল প্রকার বিনিময়ের ঊর্ধ্বে, কোরআনের এসব সূত্র নিজ নিজ কর্ম-পরিমণ্ডলে প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগে সচেষ্ট থেকেছেন। এই ধারাবাহিকতায় হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ (ক.), হযরত সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.), শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাাইজভাণ্ডারী (ক.) নিজ নিজ কর্তব্য ও দায়িত্ব হিসেবে কোরআনের রূহানী ও দুনিয়াবী সূত্রগুলো যুগপৎ রুহানী ও জাগতিকভাবে প্রয়োগ করে হক্কুল্লাহ্, হক্কুল ইবাদ তথা মানবিক কর্তব্য সম্পাদনের স্টেশন বা মন্জিল হিসেবে বিরাজ করছেন।

৩. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আর্থনীতিক দর্শনের রূপরেখা :

উপরোক্ত বিশাল পটভূমিকায় শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) কালাম বা বাণীতে শাশ্বত অর্থনৈতিক সূত্রের রূপরেখা খতিয়ে দেখা যাক, যা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আর্থনীতিক দর্শনের রূপরেখা ধারণ করে। পার্থিব ও সামাজিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ তাঁর তিনটা কালাম তথা সূত্র উদ্ধৃত করা যাক:

॥ এক ॥

সূত্র 'ক': কোন মানুষই সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত বাস করতে পারে না। কেউ ক্ষতি করলেও তার জন্য ভালোটা করা উচিৎ।

সূত্র 'খ': জমি কারো নয়, জমি আল্লাহ্র।

সূত্র 'গ': টাকা কার? টাকা আল্লাহ্র।[২]

ক. সূত্র 'ক' মানব সমাজের বাস্তব অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে আজ থেকে সহস্রাধিক বছর আগে থেকেই শিক্ষা-সংস্কৃতির মানমন্দিরে স্বীকৃত। আধুনিক অর্থনীতি বিজ্ঞানের জনক এডাম স্মিথ (১৭২৩-১৭৯০) তাঁর বিখ্যাত 'দি ওয়েলথ অব নেশনস্' গ্রন্থের প্রারম্ভিক আলোচনায় বলেছেন: "মানুষ যে নিজেকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে; তার একমাত্র কারণ, তার সামাজিক সত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা।" আল-কোরআন ও হাদিস শরিফে মানুষে-মানুষে সর্বপ্রকার কল্যাণমূলক সহযোগিতার তাগিদ ও পরামর্শ দেওয়া আছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রখ্যাত আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মুহম্মদ বিন হাসান তুসী (১২০১-১২৭৪) ইসলামী জীবন দর্শনের আলোকে "অর্থনীতিকে পারস্পরিক সহযোগিতা, বৃত্তি ও জনকল্যাণের বিজ্ঞান" বলে সংজ্ঞায়িত করেন[৩]। তিনি বলেন, "যদি প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার নিজ প্রয়োজনীয় খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও যন্ত্রপাতি তৈরী করতে হতো..., তাহলে তার পক্ষে

জীবন ধারণ সম্ভব হতো না। কারণ; এসব দ্রব্যাদি উৎপাদন করতে যে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হয়, ততোদিন তাকে না খেয়ে থাকতে হতো। তবে যেহেতু মানুষ পরস্পর সহযোগিতা করে এবং প্রত্যেকে তার পছন্দসই বৃত্তিতে নিজ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অনেক বেশী উৎপাদন করে এবং যেহেতু উৎপাদিত দ্রব্যাদি বিনিময়ের ব্যাপারে ন্যায়-বিচার সুপ্রতিষ্ঠিত, কাজেই প্রত্যেকেই তার প্রয়োজন অনুসারে অর্থনৈতিক দ্রব্যাদি পেতে পারে। এমনিভাবে আল্লাহ্ তাঁর অপরিসীম জ্ঞান ও সৃষ্টি কৌশল দ্বারা মানুষের কার্যাবলি ও প্রবণতায় পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন, যাতে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন পেশা গ্রহণ করতে পারে এবং পরিণামে একে অন্যের সাহায্য করতে পারে।"

পার্থিব জীবনের বাস্তবতা সম্পর্কে আল-কোরআন ও হাদিসের কড়া নজরদারি, শৃঙ্খলা এবং যে কোন প্রকার বিচ্যুতিমুক্ত নিয়মানুবর্তিতার গুরুত্ব সম্পর্কে ইমাম আযম হযরত আবু হানিফা (র.), ইমাম গাজ্জালী (র.) প্রমুখ আইন বিশারদ ও দার্শনিকবৃন্দ সহজ আলোচনা করেছেন। সিহাহ্সিত্তার হাদিসবেত্তাগণ পৃথক পৃথক অধ্যায়ে এসব বিষয় বিন্যস্ত ও বিশ্লেষণ করেছেন। ইমাম আবু ইউসুফ (র.) তাঁর 'কিতাবুল খারাজ' গ্রন্থে; ইমাম আবু উবায়েদ আল-কাসি ইবনে সালাম (র.) তাঁর 'কিতাবুল আমওয়াল' শীর্ষক অর্থনীতি ও অর্থ বিষয়ক গ্রন্থে এসব ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূত্রের প্রবর্তন করেছেন। বর্তমান সময়েও অর্থনীতি বিশেষজ্ঞগণসমেত সমাজ-বিজ্ঞানীরা কোরআন-হাদিসের আর্থনীতিক দর্শনের শাশ্বত কল্যাণমুখীনতার তত্ত্ব ও সমকালীন প্রয়োগের শ্রমসাপেক্ষ চর্চা করে চলেছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে যান্ত্রিক উৎপাদনভিত্তিক যে বিনিময় বাণিজ্য ও অর্থনীতি পশ্চিমা বিশ্বে গড়ে উঠে, তার ভিত্তিতে নির্মিত আর্থনীতিক চিন্তাধারাকে আধুনিক অর্থনীতির সূত্রপাত বলে মনে করা হয়। কিন্তু বাস্তবে কোরআনের নীতির ভিত্তিতে আর্থিক ও বৈষয়িক কাজ পরিচালনার যে সর্বমানবিক কল্যাণবাদী দর্শন গড়ে উঠে, সেটাকে অর্থনীতির সাধারণ পাঠের বাইরে রাখা হয়েছে, যা জ্ঞান ও অনুশীলনের জগতে একটা বিচ্যুতি বললে অত্যুক্তি হয় না। কোরআনের সূত্র ও নির্দেশনা বর্তমান বিশ্বের অনেক জটিল সমস্যার সমাধানের উপায় ধারণ করে। জাগতিক বিষয়ে মনীষীগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আর্থ-সামাজিক সূত্র হিসেবে বিরাজ করছে এবং শিল্প উৎপাদনসমেত বিভিন্ন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিবর্তনশীলতার আলোকে সমকালীন উপযোগিতাসমৃদ্ধ সূত্রাদিকে সমৃদ্ধ করে চলেছে। শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উপরোক্ত কালাম এই রূঢ় পার্থিব-সামাজিক বাস্তবতার প্রতি লোকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

খ. জমি কারো নয়: ১৯৭০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে হাটহাজারী থানার ধলই গ্রামের এক সঙ্গতিপন্ন পরিবারে কিছু জমি নিয়ে চরম বিরোধ দেখা দেয়। শালিস-বিচার-মামলার জটিল প্রক্রিয়ায় সমাধানের পরিবর্তে সমস্যার জট বাড়তেই থাকে। এ

অবস্থায় শাহানশাহ্ হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) একদিন আচমকা অকুস্থলে উপস্থিত হলেন। বিরোধীয় পক্ষগুলো তাঁকে নিজ নিজ ঘরে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। কিন্তু তিনি সব উপেক্ষা করে বিরোধীয় জমির উপরই মাটিতে বসে পড়লেন। একজন প্রবীণ ব্যক্তি তাঁর কাছে গিয়ে সবিনয়ে আরজ করলেন, 'ঐ জমি বিরোধীয় এবং তা অমুকের....।' কথা শেষ না হতেই তিনি প্রশান্ত, সৌম্য, গম্ভীর কণ্ঠে বললেন: "আমি আল্লাহ্র জমিতে বসেছি। আর কারো জমিতে নয়।.." পরে বিরোধীপক্ষগুলো আমানতদার হিসেবে নিজেদের মধ্যে জমি আপসে ভাগ করে নিতে উদ্বুদ্ধ হয়।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এই অভিমত জমি, পৃথিবীসহ সমগ্র সৃষ্ট বস্তুর মালিকানা সংক্রান্ত আল-কোরআনের বস্তুনিষ্ঠ সিদ্ধান্তেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। জমি-সম্পদ প্রভৃতির মালিকানা একান্তভাবেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ্র–এ বিষয়টা নিয়ে ক্রমশঃ বিশদ বিশ্লেষণ চলছে। বৈষম্য-সংঘাত-শোষণ জর্জরিত বিশ্বে শাশ্বত অমুখাপেক্ষী আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের প্রাকৃতিক মালিকানা স্বীকার করে নেবার মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির প্রত্যাশিত শান্তি ও ইপ্সিত সমাধান। কোন সম্পদ উৎপাদনকারী বা সৃজনকারীই সেটার মালিক–আধুনিক অর্থনীতির এই প্রাথমিক সূত্র মতেই পৃথিবীসহ গোটা মখলুকাতের তথা বস্তুসম্পদরাজির সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ই সেগুলোর মৌলিক মালিক। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) বিংশ শতাব্দীর জটিল শোষণমূলক পরিবেশ পরিস্থিতিতে এই মৌলিক বিষয়ের প্রতি সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করেন মাত্র।

গ. টাকা আল্লাহ্র: হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবনে সাধারণভাবে বোধাতীত ঘটনাবলীর হিসাব-নিকাশ নেই। কখন কোথায় যাচ্ছেন, ছুটছেন উল্কার মতো, তা মুহূর্ত আগেও আশে-পাশের কেউ ধারণাও করতে পারতেন না। তেমনিভাবে এক সন্ধ্যায় ছুটলেন গাড়িতে চড়ে ঢাকা ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে। সঙ্গে তাঁর ভক্ত অনুরাগী জনাব বজলুর রহমান চৌধুরী, যিনি 'বজল কোম্পানী' নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর ভাষ্য: শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁকে কিছু টাকা সঙ্গে নিতে বলেছিলেন। কুমিরা পার হবার পর তিনি টাকাগুলো চেয়ে নিলেন এবং গাড়ির জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিতে শুরু করলেন। তা দেখে বজল কোম্পানী ব্যাকুল হয়ে বললেন, "মামু ছাহেব, টাকাগুলো এভাবে উড়িয়ে দিচ্ছেন!" জবাবে শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) গম্ভীর স্বরে বললেন: 'টাকা কার! টাকা আল্লাহ্র!!' জবাব শুনে ভক্ত নীরব হয়ে যান।

উল্লেখ্য যে, 'এভাবে' টাকা উড়ানোর বিষয়টাও খেয়াল-খুশী সুলভ কিছু নয়। এ টাকা অবশ্যই তাৎক্ষণিক অভাবগ্রস্ত কোন লোকের হস্তগত হয়েছে। এ ধরনের দৃশ্যতঃ 'গায়েবী' মদদের একাধিক ঘটনা তাঁর জীবনে রয়েছে।

মহান ওলী-আল্লাহ্ অর্থাৎ লোক-দার্শনিকদের সত্তা ও কাজ-কর্ম লোক-কল্যাণ তথা সৃষ্টি কল্যাণে নিবেদিত। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা অর্থাৎ কেবল ব্যষ্টিক চাহিদা পূরণ নয়, সামষ্টিক মঙ্গলই তাঁদের পরম লক্ষ্য। তাঁরা বিনিময় কিম্বা জাগতিক ফায়দার প্রত্যাশী নন। আল-কোরআনে নবী-রসূলদের বিনিময়-প্রত্যাশা বিমুখতা ও প্রয়োজনহীনতার যে তত্ত্ব ও তথ্য বার বার বর্ণিত হয়েছে, তা তাঁদের ওয়ারেস হিসেবে ওলী আল্লাহ্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) চিন্তা-কর্ম-ব্রতের যে বাস্তব ও চাক্ষুষ বিবরণ পাওয়া যায়, তাতে এ বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, সামষ্টিকভাবে মানবতার ঐহিক ও পারলৌকিক কল্যাণই তাঁর জীবন-সাধনার সার কথা। পৃথিবীতে জমি-সম্পদ-অর্থের কর্তৃত্ব ও মালিকানাই মানুষে-মানুষে দ্বন্দ্বের মূল বিষয়, পার্থিব শান্তির জন্য যার নিরসন প্রয়োজন। মানব সমাজ ও সভ্যতার বিবর্তনের হাজার হাজার বছরের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার আলোকে আল-কোরআনে মহাজগৎ তথা সৃষ্ট সকল পদার্থের মালিকানা স্রষ্টার এক্তিয়ারেই অর্পণ করা হয়েছে এবং পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি 'মানুষকে' পার্থিব সম্পদ-অর্থ-শক্তির আমানতদার এবং সম্মিলিত যৌথ ভোগ-দখলদার হিসেবে সাব্যস্ত করে দ্বন্দ্ব-সংঘাতের গেরো খুলে দিয়ে যুক্তি ও আইনের সুষম পথে অভাবমুক্তভাবে পার্থিব জীবন যাপনের শান্তিপূর্ণ পথ রচনা করে দিয়েছে। এভাবে পার্থিব স্বার্থগত দ্বন্দ্বের অবসানপূর্বক শান্তি-সম্প্রীতিময় সমাজ রচনার পথ সুগম করে দিয়েছে।

ঘ. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আর্থনীতিক দর্শনের রেখাচিত্রঃ সৃজনলগ্ন থেকে শুরু করে মানব সমাজের ইতিহাস ক্রমঃপ্রগতিশীল বিবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ইতিহাস। বিচ্ছিন্ন, পৃথক ও খণ্ড খণ্ড স্বতন্ত্র কোন ঘটনা বা এপিসোড নয়। কোরআনের মতে, মানবজাতি ও মানব সমাজ একটা অভিন্ন একক ইউনিট। জীবন-জীবিকার অধিকারের সমতা এর প্রধান নৈতিক ও জাগতিক ভিত্তি। মানুষের সাধারণ প্রাকৃতিক জীবন, গুহা জীবন, প্রকৃতির রোষ থেকে আত্মরক্ষা করে নিরাপদ জীবনের উপকরণ সৃজন, সমাজবদ্ধতার প্রাকৃতিক অপরিহার্যতা, সংসার ও পারিবারিক জীবন, কৃষি, আগুন, লৌহ, চাকা, পরিবহন, পশু পালন, দাস প্রথাসহ বিভিন্ন জাগতিক প্রথার উদ্ভব, অন্যায়ের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ, সত্যের জন্য আন্দোলন ও ন্যায়যুদ্ধ প্রভৃতি গোটা মানব সমাজকে ক্রমান্বয়ে প্রগতিমূলকভাবে প্লাবিত করে মানব জীবন সমুদ্রে নব নব চরের উদ্ভব ঘটিয়েছে। এক্ষেত্রে মহান সমাজ-বিজ্ঞানী-দার্শনিক-বিজ্ঞানীদের নিরীক্ষামূলক সাধনা ও গবেষণা এবং দূর অতীতের বিভিন্ন মনীষীদের বচন-বাণী, ধর্মগ্রন্থ, চিরায়ত লোকগাথা-ইতিহাস, সর্বশেষ বাইবেল অর্থাৎ তৌরাত, জবুর, ইঞ্জিলে বিবৃত বিবরণাদির মধ্যে বাস্তবতাপুষ্ট সাদৃশ্য দৃশ্যমান। আল-কোরআনে সে সব

বিবরণের যুক্তিসিদ্ধ সিনপসিস বা সারপত্র বিবৃত। সমাজবদ্ধ জীবনের প্রয়োজনে মানুষের সমাজ-বিবর্তনের রূপরেখা এতে অত্যন্ত নিপুণভাবে বিবৃত। সমাজ-জীবনের কার্যকর সংগঠন নির্মাণ করতে গিয়ে মানব-সমাজ আর্থনীতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবন করেছে। কৃষি-পশুপালন-ব্যবসা-বিনিময়-বিনিময় মাধ্যম, ভুগর্ভস্থ দুষ্প্রাপ্য ধাতুর ব্যবহার, মুদ্রা আবিষ্কার, কাগুজে মুদ্রার প্রবর্তন প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের নিরবচ্ছিন্ন রেখার বিভিন্ন পরস্পর সংযুক্ত পর্যায়। বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মুদ্রা অর্থাৎ টাকা প্রভৃতি এখন সহজ প্রচলিত। এই মুদ্রা ব্যবস্থার প্রবর্তন অর্থ-সম্পদের পুঞ্জীভবনের পথ সহজ ও অবাধ করেছে। বিভিন্ন পেশা ও সেবার বিনিময় মূল্য হিসেবে মুদ্রার ব্যবহার সমাজ জীবনকে যেমন সহজতর করেছে, তেমনি আর্থিক বৈষম্য সৃষ্টির সুযোগও সম্প্রসারিত করেছে। মুদ্রার ব্যবহার এবং এর বিবিধ প্রকার আর্থ-সামাজিক প্রভাব-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ সম্বলিত বহু পুস্তক আধুনিক অর্থনীতিবিদ-সমাজতত্ত্ববিদরা রচনা করেছেন এবং মুদ্রার সামাজিক-আর্থিক-রাজনৈতিক চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন। জমি, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর আল্লাহ্ তথা সর্বজনীন মানবিক মালিকানার সূত্র অনুসারে মুদ্রা বা অর্থ-কড়ি-টাকা, যা সরকারীভাবে তৈরী বা মুদ্রিত হয়, তাও-যে কোন সরকার বা দেশ বিশেষের 'প্রাইভেট প্রপার্টি' নয়–ব্যক্তি বিশেষের তো নয়ই, সে বিষয়ের প্রতি সুস্পষ্ট অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.)। এগুলোর মালিকানা সর্বজনীন তথা মানব জাতির।

জমি এবং নগদ অর্থ সম্পর্কে হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এই তথ্য প্রকাশের শেষ কথা হলো: জমি, অর্থ-কড়ি তথা সকল প্রকার সম্পদের মালিকানা একমাত্র আল্লাহ্রই। কেবল জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদ নয়, অর্থ-কড়ি বা কারেন্সী অর্থাৎ মুদ্রারও চূড়ান্ত মালিক তিনি। মুদ্রা যার হাতেই থাকনা কেন, সেটার মালিকানা দৃশ্যতঃ রাষ্ট্রের, তবে চূড়ান্ত মালিকানা কিন্তু মহান স্রষ্টারই। শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এই অভিমতের মর্ম অনুযায়ী মুদ্রা-সম্পদের উপরও আল্লাহ্র মালিকানার বিধি সম্পর্কে আর কোন সংশয় থাকে না। অর্থনীতি-দর্শনের জগতে বিচরণকারীদের জন্য এটা বস্তুনিষ্ঠ এক অভিজ্ঞতা বটে।

শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন থেকে বর্ণিত উপরোক্ত দৃষ্টান্ত থেকে আরো একটা সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় যে, ওলী-আল্লাহ্দের জীবন যুগপৎ রুহানী ও ঐহিক কল্যাণময়তার নুরানী সমন্বয়। তাঁর এই বীক্ষণের মধ্যে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আর্থনীতিক দর্শনের রূপরেখা বিধৃত।

৪. কল্যাণধর্মিতা ওলী-আল্লাহ্দের অন্তর্জাত বৈশিষ্ট্য:

পূর্বেই বলা হয়েছে, আল্লাহ্র প্রেরিত নবী-রসূলগণ কেবল ধর্ম শিক্ষা দেননি, তাঁরা লোকশিক্ষকও বটেন। তাঁরা একাধারে ওলী আল্লাহ্ এবং দার্শনিক। দার্শনিক হিসেবে

তাঁদের অবস্থান কেবল পুস্তক, পাঠাগার কিম্বা ধ্যানের জগতে নয়, বরং লোক-সমাজেই অধিক। বই, কিতাব কিম্বা চিন্তা-ধ্যানের প্রকোষ্ঠের চেয়ে উন্মুক্ত ময়দানে অগণিত মানুষকে নিয়েই তাঁদের কাজ-কারবার, তাঁদের জীবন। গোটা মানব সমাজই তাঁদের পাঠাগার ও কর্মক্ষেত্র। সে হিসেবে তাঁদের কর্ম ও প্রভাব বলয় শুধু পুস্তক-কিতাব-মস্তিষ্কের ভুবনে সীমিত নয়। পৃথিবী ও সমাজের অন্ধি-সন্ধি সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁরা দার্শনিক, তবে শুধু জ্ঞানের সিন্দুকের তালা খুলবার জন্য নন, মানুষের ব্যবহারিক জীবনের সুখ-দুঃখ, কল্যাণ সাধন, আনন্দ-বেদনার উপশমের ক্ষেত্রেও তাঁদের কর্মের বিস্তৃতির সীমা-পরিসীমা নেই। সমাজের যুগোপযোগী প্রগতিশীল উন্নয়নমূলক সংস্কারে তাঁদের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা রয়েছে এবং এই গুরুদায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁরা উপযোগী আইন, বিধি-বিধান ও নৈতিক আচরণ প্রবর্তন করেছেন ও শিক্ষা দিয়েছেন। ইতিহাস ও মানব সমাজ তাই সতত তাঁদেরকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। নবী-রসূল-অবতার আর আসবেন না। কিন্তু তাঁদের শিক্ষাকে যুগে যুগে সময়ের বিবর্তনের সাথে সঙ্গতি রেখে গতিশীলতা দেবার জন্য আউলিয়া, দরবেশ, সিদ্ধ পুরুষদের আবির্ভাব ঘটবে। তাঁরা নবী-রসূলদের ঐশী শিক্ষাকে শাণিত করেন নিজেদেরকে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরেই।

হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) তেমনই একজন আউলিয়া এবং লোক-শিক্ষক। 'ওলী-আল্লাহ্' শব্দটার অর্থ 'আল্লাহ্র বন্ধু'। আল্লাহ্ যেমন সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও বিবর্তনকর্তা এবং সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন, তেমনি আল্লাহ্র বন্ধু, ওলী-আল্লাহ্রাও সকলের সমান বন্ধু। আল্লাহ্ যেমন আলো, বাতাস, পানি প্রভৃতি প্রাকৃতিক জীবনোপকরণ দিয়ে সবাইকে একই নীতিতে প্রতিপালন করেন, তেমনি ওলী-আল্লাহ্রাও সবাইকে সমানভাবে ভালোবাসেন এবং জাত-ধর্ম-বির্নিশেষে সকলের কল্যাণ সাধনে ব্রতী থাকেন। মানুষ অবয়বগতভাবে অভিন্ন। তবে নৈতিক গুণাবলী, শিক্ষা ও জ্ঞানের মানদণ্ডে প্রত্যেক ব্যক্তি মানুষ একান্ত নিজস্ব একটা ভিন্নতার অধিকারী এবং এই ভিন্নতা তার পদমর্যাদার নির্ণায়ক। অবশ্য এই ভিন্নতা সত্ত্বেও একটা প্রাকৃতিক সত্য এই যে, প্রত্যেক মানুষ তথা সৃষ্ট জড় ও জীব নিজ নিজ অবস্থানে এই সংসার, জগৎ তথা মহা বিশ্বের সামগ্রিক কাঠামোর অপরিহার্য সম্পূরক অংশ। অতএব, মহাবিশ্বের ফিজিক্যাল প্রয়োজনীয়তার বিচারে কোন কিছুই ফেলনা নয়। ওলী-আল্লাহ্রা এই সামগ্রিকতাকে আত্মস্থ করে কল্যাণধর্ম পালন করে যান। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) জীবন এই কল্যাণধর্ম পালনের একটা দৃষ্টান্ত। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে কেবল মানুষ নয়, প্রত্যেক প্রাণী, বস্তু, তাঁর কাছ থেকে যথাযোগ্য মর্যাদা, যত্ন ও মমতা লাভ করেছে। তাঁর জীবনী গ্রন্থে এ ধরনের বহু ঘটনার বিবরণ রয়েছে।

কোন শক্তির প্রতিনিধিত্বের জন্য যতটুকু যোগ্যতা অর্জন করা প্রয়োজন, 'বন্ধুত্ব' অর্জনের জন্য তার চেয়ে বেশী যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, ধৈর্য্যের প্রয়োজন। ওলী-আল্লাহ্‌রা অনেক কষ্ট, সাধনা, ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে এই 'বন্ধুত্ব' অর্জন করেন। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.)-ও কঠোর সাধনা, আত্মপীড়ন ও নিগ্রহের যাতনা আত্মস্থ করে এই সাধনায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ ডিসেম্বর তাঁর জন্ম। ছাত্র হিসেবে ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী, বিনয়ী ও সচ্চরিত্র। পারিবারিক ঐতিহ্যের ধারক হিসেবে স্বভাবতই তিনি ছিলেন ধ্যানী ও স্বল্পবাক। ১৯৪৮ খ্রি. তিনি ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৫১ সনে চট্টগ্রাম সরকারি কলেজ থেকে আই-এ পাশ করেন। ১৯৫৩ সনে কানুনগোপাড়ায় স্যার আশুতোষ কলেজে বি.এ. টেস্ট পরীক্ষার তৃতীয় দিনে তাঁর প্রবল জজ্‌বা বা ভাবোন্মাদনার উদয় ঘটে। তিনি পরীক্ষার হল থেকে বের হয়ে পড়েন মহাবিশ্বের কঠিন পাঠশালায়। এরপর থেকে শুরু হয় তাঁর প্রবল আত্মনিগ্রহমূলক অধ্যাত্মসাধনা। খাওয়া-পরা-ঘুমানো-বিশ্রাম সব উধাও। প্রচণ্ড গরমে খোলা গায়ে সূর্যতাপে দগ্ধ হয়ে এবং তীব্র শীতে পুকুরে ও পাহাড়ি খালে আকণ্ঠ ডুবে থেকে নিজেকে প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে দেন এবং হয়ে উঠেন প্রকৃতির নিবিড় আত্মীয়। এভাবে একটানা প্রায় ১৪ বছর চলে তাঁর কঠোর সাধনা। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১৩৭৩ বঙ্গাব্দের ৯ মাঘ তাঁর পিতা অছিয়ে গাউসুল আযম সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারী (ক.) তাঁকে প্রকাশ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আধ্যাত্মিক খেলাফত অর্পণ করেন। ১৯৭৬ খৃস্টাব্দ থেকে পিতার অনুমোদনক্রমে তাঁর খোশরোজ শরিফ বা জন্মদিবস উদ্‌যাপিত হতে থাকে। জীবদ্দশায় 'মারিফাত ভুবনে তাঁর রূহানী' বিচরণ মহান রাব্বুল আলামিন প্রদত্ত সৌকর্য ও সৃজনশীলতার অতি মানবিক বিচ্ছুরণের ঝলক যেন! এসব মুহূর্ত কোন বৈজ্ঞানিক মাধ্যমে ধারণ করা সম্ভব হলে আল্লাহ্‌তায়ালার সৃজন বৈচিত্র্য এবং এর পাশাপাশি মানবের 'আহসানে তকবীমের' প্রত্যক্ষ প্রমাণস্বরূপ সংরক্ষিত হতো! হ্যাঁ, মানুষ যে আশরাফুল মখলুকাত, তার প্রথম নিদর্শন নবী-রসূল এবং তাঁদের নিকট-পরবর্তী স্তরে অবস্থান মহান ওলী-আল্লাহ্‌দের, যাঁদের মাহফিলে সামিল হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীও (ক.)। মানবিক ও রুহানী সৌকর্যের জলোয়া ছড়িয়ে মহান প্রভু সকাশে তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটে ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দের ১২ অক্টোবর বুধবার দিবাগত রাত ১২-২৭ মিনিট। পরদিন বৃহস্পতিবার মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে তিন দফা অনুষ্ঠিত নামাযে জানাযা ছিল বাংলাদেশে স্মরণকালের বৃহত্তম জানাযাগুলোর অন্যতম।

৫. 'শিক্ষামূলক গ্রন্থসুলভ' একটি মহাজীবনঃ

এ নিবন্ধের শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ওলী-আল্লাহ্‌রা প্রভাবশালী লোক-শিক্ষকও বটেন। তাঁরা নিজেরাই উদ্দেশ্য কিম্বা বিধেয় হয়ে সদাচার, দয়া, কল্যাণ

চর্চা করেন ও শিক্ষা দেন। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) অধ্যাত্ম জীবন এই অর্থে একটি 'শিক্ষামূলক গ্রন্থ' বলা যায়। ওলী-আল্লাহ্দের ঐতিহ্যের আলোকে তাঁর মহান জীবনকেও দুটো বিশেষ অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা যায়:

ক. একটি অধ্যায় রুহানী সৌকর্যমণ্ডিত কল্যাণময়তা। আল-কোরআনের সূরা ইউনুসের ৬নং আয়াতের (১০:৬) মর্ম অনুসারে তিনি ওলী-আল্লাহ্ বা আল্লাহ্র বন্ধু। আল্লাহ্ হলেন রাব্বুল আলামিন, রহমানুর রহিম। সূরা আন-আমের ১২নং আয়াতে বলা হয়েছে: "আল্লাহ্ রহমত করাকে নিজের জন্য কর্তব্য করে নিয়েছেন (৬:১২)।" সাধারণভাবে আল্লাহ্র রহমতের নিত্য প্রকাশ ঘটছে প্রাকৃতিক উপাদান বিতরণের মাধ্যমে। বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর রহমত তাঁর ওলী বা বন্ধুদের মাধ্যমে বিতরিত হয়, যা সচরাচর 'কারামত' নামে অভিহিত হয়। অগণিত দুঃখী, প্রত্যাশী, বঞ্চিত, নির্যাতিত, হতাশ মানুষ তাঁর দরবারে গিয়ে উপকৃত হয়েছেন। এগুলো ঘটে দৃশ্যমান কিম্বা অদৃশ্যভাবে এবং এর কোন হিসাব-নিকাশ সম্ভব নয়। তাঁর কাছে দোয়াপ্রার্থী হলে তিনি মিষ্টি স্বরে বলতেন, "আল্লাহ্র কাছে আরজ করুন। আল্লাহ্ মেহেরবান। তাঁর কিছুর কমতি নেই।" অধিকাংশ ক্ষেত্রে হযরত গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ আহমদ উল্লাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) এবং হযরত শাহ্ সুফি সৈয়দ গোলামুর রহমান মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মাজার শরিফ জিয়ারত করে আসতে বলতেন। এসব রুহানী, ঐশী বিষয় সাধারণ মানুষের বোধাতীত। জ্ঞানীরা এগুলোর হকিকত সম্পর্কে অবহিত আছেন।

খ. অপর অধ্যায়টি দৃশ্যমান বাস্তবতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। এগুলো সামাজিক শিক্ষামূলক। তেমনই কয়েকটা তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ের উপর সংক্ষেপে আলোকপাত করা গেলো:

১. শিক্ষা সম্পর্কে: "জ্ঞানের যে সাধনা মনে উদারতা ও চরিত্রে দৃঢ়তা আনে, সেটাই সঠিক জ্ঞান।" জ্ঞান ও শিক্ষা সম্পর্কে সক্রেটিস, এ্যারিস্টটল থেকে শুরু করে আজকের অনেক দার্শনিক ও ধর্মবেত্তাগণ তাৎপর্যপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করছেন। হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এই সংজ্ঞা মানব সম্প্রীতি ও শান্তির পরিবেশ নির্মাণসূচক।

২. আল্লাহ্র কাছে সবাই সমান: "হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃস্টান সকলেই আল্লাহ্র বান্দা। আমার কাছে এদের কোন ভেদাভেদ নেই।" তাঁর এই বাণী ও শিক্ষা মানবিক সমতার তাগিদ দেয়, যা ইসলামী সমাজনীতির মর্মবাণী এবং আধুনিক রাষ্ট্রচিন্তা সম্মত।

৩. সরকার সম্পর্কে: জনগণ সরকারের সন্তানতুল্য। সন্তানের শান্তি যেমন মাতা-পিতার শান্তি, তদ্রূপ জনগণের সুখ-শান্তিতেই সরকারের শান্তি।" এটা প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক সরকারের মূলনীতিসূচক।

৪. বিশ্বশান্তিমুখীনতা: "আমরা কারো অমঙ্গল চাই না। কারো ক্ষতি হউক, তা চাইনা। আমরা সবার শান্তি চাই"। এটা বিশ্বশান্তির প্রতি ইঙ্গিতবহ।

৫. সৎকাজও ইবাদত: "কাজের জন্যই জগৎ, জীবন ও আল্লাহ্-রসূলের বিধান। ভালো কাজও ইবাদত। অলস হয়ে বেকার বসে থেকো না।" তাঁর এই বাণীর মধ্যে বাস্তব জীবন সম্পর্কে কোরআন-হাদিসের শিক্ষার প্রতি মনোযোগী হবার এবং কর্মে-পরিশ্রমে উদ্যমী হবার প্রেরণাদায়ক তাগিদ রয়েছে। উল্লেখ্য, নবীজী (দ.) কাজকে আল্লাহ্র রহমত হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

৬. সমাজ জীবন সম্পর্কে তাঁর শিক্ষা: "কেউ ক্ষতি করলেও তার জন্য ভালো করাটা উচিৎ কোন মানুষই সমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ব্যতীত বাস করতে পারে না।" তাঁর এই উক্তি মানব সমাজের বাস্তব অস্তিত্বের দর্শনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আধুনিক অর্থনীতি বিজ্ঞানের জনক এডাম স্মিথ তাঁর 'দি ওয়েলথ অব নেশনস' গ্রন্থের প্রারম্ভিক আলোচনায় বলেছেন, "মানুষ যে নিজেকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে তার একমাত্র কারণ, তার সামাজিক সত্তা, পারস্পরিক সহযোগিতা।" বস্তুতপক্ষে, হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) আধ্যাত্মিক জবানে মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের এই মৌলিক সত্যই প্রকাশ পেয়েছে।

৭. সর্বজনীন সরল পথ: শাহানশাহ্ মাইজভাণ্ডারী (ক.) সর্বস্তরের ভক্ত ও দর্শনার্থীদেরকে বলতেন, "হালাল খাও, নামায পড়, আল্লাহ্ আল্লাহ্ যিকির কর। সব সমস্যা মিটে যাবে"। এই বারোটা শব্দের মোড়কে শরিয়ত-ত্বরিকত-হকিকত, মানব-জীবনের পরম কাঙ্ক্ষিত সোপান মারিফাত, যে কোন পরিস্থিতিতে স্থিরচিত্ত প্রশান্ত অনাবিল জীবন যাপনের সবক তথা পৃথিবীতে প্রচারিত সকল ধর্মের মৌল শিক্ষা, ধর্মদেশনার সারবস্তু এবং পার্থিব জীবনে সরল পথের রেখা বিধৃত; যার প্রান্তবিন্দুতে স্থিত মহান স্রষ্টা, অনন্ত অসীম সত্তার ধ্যান। সংক্ষেপে, এটাই তো সর্বোত্তম নসিহত!!

৮. আমার দরবার প্রাচ্যের বায়তুল মোকাদ্দাস, সকল জাতের মিলন কেন্দ্র: শাহানশাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ সুফি সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারীর (ক.) এই সরল উক্তিটিতে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের বহুত্ববাদী সমাজতত্ত্বের ব্যবহারিক সূত্র বর্ণিত হয়েছে।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. ইমাম গাজ্জালী: কিমিয়ায়ে সাআদাত, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় পরিচ্ছেদ : সংসার-দর্শন।

২. (ক) হযরত সৈয়দ জিয়াউল হক মাইজভাণ্ডারী (ক.) : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, ১৯৯৭ খ্রি. পৃ. ১২৪, (খ) দ্বীপশিখা, 'দাঁতমারা এ, বি, সিকদার উচ্চ বিদ্যালয়, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম। ২০১৬, পৃ. ২৭।

৩. প্রাচ্যের রাষ্ট্রচিন্তা (oriental political thought), 'ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' অধ্যায় : মোঃ নুরুল ইসলাম, আজিজিয়া বুক ডিপো, ঢাকা।

তৃতীয় ভাগ

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আচার প্রকরণ

[Ritual methodology of Maizbhandari wilayah]

ঊনত্রিংশ অধ্যায়

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের আচার প্রকরণ

[Ritual methodology of Maizbhandari wilayah]

১. মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত তথা বেলায়তে মোত্লাকার সংজ্ঞা ও স্বরূপ চিহ্নিত করার পর একটা ধর্মীয় সামাজিক, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর ন্যূনতম ব্যবহারিক আচরণবিধি প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। হযরত সাহেব কেবলার (ক.) জীবদ্দশায় এই বেলায়তের আচরণবিধি হযরত সৈয়দ আমিনুল হক ওয়াসেল মাইজভাণ্ডারীর (ক.) মাধ্যমে সরাসরি ব্যবহারিকভাবে প্রণীত ও প্রয়োগের রেওয়াজ শুরু হয়, যা ত্বরিকার সুশৃঙ্খল তালীম হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পায়। তবে কালপ্রবাহে তা সুবিন্যস্তরূপে লিখিতভাবে মওজুদ রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ভক্ত-অনুসারীদের জানার ও অনুশীলনের তাগিদ থেকে। এই বেলায়তী ধারায় ত্বরিকাগত তালিম হিসেবে ইতোমধ্যে অনুশীলিত ও ব্যবহারিকভাবে প্রতিষ্ঠিত আচারাদি পুঙ্ক্ষানুপুঙ্ক্ষভাবে চয়ন ও সুবিন্যস্ত করে রাখার গুরুদায়িত্ব এসে পড়ে অছিয়ে গাউসুল আযম শাহ্ সুফি সৈয়দ দেলাওর হোসাইন মাইজভাণ্ডারীর (ক.) উপর। তিনি নিপুণভাবে এ দায়িত্ব পালন করে ত্বরিকার তালিম ও এস্তেমাল প্রক্রিয়ার লিখিত বিবরণ ভক্ত-অনুসারী তথা অনাগত জেনারেশনের জন্য গচ্ছিত রেখে যান।

২. অছিয়ে গাউসুল আযমের (ক.) এই উদ্যোগের ফসল হলো: ক. মুসলিম আচার ধর্ম, খ. মূলতত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছার (প্রথম খণ্ড), গ. মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া, ঘ. গাউসিয়াত নীতি। এসব পুস্তিকায় ত্বরিকার তালিম ও ব্যবহারিক পদ্ধতি অতি সহজ ভাষায় বিবৃত হয়েছে। এগুলো ছাড়াও তাঁর অপরাপর পুস্তকেও প্রসঙ্গক্রমে এই বেলায়তের আচার প্রকরণ বর্ণিত হয়েছে।

৩. ত্বরিকার তালিম ও ব্যবহারিক বিধি প্রণয়নের ঐতিহাসিক, ধর্মীয়, সামাজিক ও মানবিক প্রেক্ষাপট:

বিধান-ধর্মের ধারাবাহিকতায় আল-কুরআন ও হাদিস শরিফের মর্মবাণী অনুযায়ী 'সর্বজনীন কল্যাণব্রতী মানব-ধর্ম' হিসেবে নীতিগতভাবে অধিষ্ঠিত ইসলামের বিশ্বমানবতাবাদী নির্যাসের উপাদানে মাইজভাণ্ডারী বেলায়তী ত্বরিকার আচার ও আচরণবিধি প্রণীত হয়েছে। এসব আচরণবিধি প্রণয়নকালে গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বাণী, কর্ম ও পরম-লক্ষ্যই দিক-নির্দেশিকা হিসেবে কাজ করেছে। আচরণবিধি প্রণয়নকালে যেসব বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, সেগুলোকে এভাবে বিন্যস্ত করা যায়: ১. বাংলা অঞ্চলে শিক্ষা-বঞ্চিত গরিষ্ঠ সংখ্যক মানুষ তথা

মুসলিম সমাজের সদস্যদের সহজবোধ্যতা ও অনায়াসে পালনযোগ্যতা, ২. দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী, যারা বাংলা অঞ্চলে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ; তাদের সাধারণ শিক্ষা দূরে থাক, ন্যূনতম মৌলিক ধর্মীয় ও ধর্মাচার শিক্ষা সুযোগের চরম অপ্রতুলতার যৎকিঞ্চিৎ প্রতিকার, ৩. সামগ্রিক ঐক্য, কল্যাণ ও শৃঙ্খলাবোধে মুসলিমদের সাংস্কৃতিক-সামাজিক উজ্জীবন, ৪. মুসলিমদের পাশাপাশি অন্যান্য সকল ধর্মাবলম্বী মানুষদের স্বধর্মনিষ্ঠা অক্ষুণ্ন রেখে নৈতিক ও মানবিক উন্নয়নের সুযোগের প্রতি সচেতনতা, যা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের ব্যতিক্রমী দিক। একেবারে গোড়া থেকেই নিম্নবিত্ত, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুসলমানদের মতো হিন্দু, বৌদ্ধ, উপজাতীয় সম্প্রদায়ের লোকেরাও মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের সামিয়ানা তলে সমবেত থেকেছেন বিধায় তাঁদেরও কল্যাণ ও মুক্তি প্রয়াসের আত্মিক সমিধ সরবরাহ করা যুগপৎ ধর্মীয় ও নৈতিক কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যা এড়িয়ে যাওয়া কিম্বা পরিহার করা মাইজভাণ্ডারী বেলায়তের চিন্তা-বহির্ভূত, ৫. সমকালে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকোর্সে বাংলা ভাষার অনুপস্থিতির দরুন আরবী-ফার্সী, কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু উর্দু ব্যতীত বাংলা ভাষায় মিলাদ, তাওয়াল্লোদ, জিকির-আজকার, শেয়র-গজল প্রচারিত ছিল না বিধায় সেই অভাব পূরণের প্রয়াস, ৬. মাইজভাণ্ডারী বেলায়তী ত্বরিকার একান্ত নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত মিলাদ, তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া, জিকির-আজকার-সামা পদ্ধতির প্রচলন, ৭. সকল মুরীদ, আশেক-ভক্তদের ধর্মাচারমূলক আচরণ পদ্ধতিতে শৃঙ্খলা, অভিন্নতামণ্ডিত সৌন্দর্য ও সৌকর্য প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি, ৮. পূর্ববর্তী মহান আধ্যাত্মিক ত্বরিকা ও ঘরানার তালিম পদ্ধতির সাথে শরিয়তসম্মত ঐতিহ্যগতভাবে সাযুজ্য বজায় রাখা।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তী ত্বরিকা প্রবর্তনের পূর্বে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ওলী-আল্লাহ্‌দের খানকাহ্ শরিফে নিজস্ব আচার-পদ্ধতি প্রবর্তিত রয়েছে এবং এগুলোর ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক মূল্য রয়েছে। এই ঐতিহ্যকে বাংলা মুল্লুকের নিজস্ব পরিবেশে বিকশিত করে একটা বাঙালি অধ্যাত্ম সংস্কৃতি বিনির্মাণের ক্ষেত্রে এসব তালিম ও ব্যবহারিক বিধির প্রভাবশালী ভূমিকা রয়েছে এবং এটাকে কেন্দ্র ও অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে সম্পূর্ণ বাঙালি ঘরানার মাইজভাণ্ডারী মারিফতি সাংস্কৃতিক ভুবন; যেখানে সাহিত্য, সঙ্গীতকলা, জিকির-আজকারের সুরুচিপূর্ণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত নব নব দিগন্তের আবির্ভাব ঘটেছে।

নামায যেমন মানুষকে বর্ণ, জাত, পাত, ভাষা, বিত্ত-সম্পদের বৈষম্যের ঊর্ধ্বে এক সারিতে দাঁড় করায়, সেই অতুলনীয় মহান আদর্শের অনুসরণে জিকির-আজকার-উরস্ প্রভৃতি অনুষ্ঠানেও বৈষম্যবিহীন সামাজিক সংস্কৃতি প্রচলনের ক্ষেত্রে এসব তালিম নীরবে দিশারী ভূমিকা পালন করে চলেছে, যা ধনী-দরিদ্র-বর্ণ-ভাষা নির্বিশেষে সবাইকে একই শতরঞ্জির আসনে উপবেশন করায়। এই সংস্কৃতি বিশ্বের সব মুসলিম

ওলী-আল্লাহ্-পীর-মাশায়েখের দরবারে অভিন্ন এবং তা মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফেও যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুসৃত।

মাইজভাণ্ডারী বেলায়তী ত্বরিকা অপরাপর বরেণ্য ত্বরিকার সর্বমানবিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রেখে মানবিক অধিকারের সমতার দিকটাও সমুচ্চ রেখেছে। এই ত্বরিকা কেবল মুসলিম অনুসারীদের বিষয়গুলি নয়, ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভক্তদের শান্তি ও মুক্তির বিষয়টাকেও গুরুত্বসহকারে স্থান দিয়েছে তালিম প্রক্রিয়ায়, যার ফলে এটা সর্বমানবিক ত্বরিকার মর্যাদায় আসীন হয়েছে নীরবে, সবার অলক্ষ্যে অথচ দৃশ্যমানভাবে।

৪. তালিম ও আচারবিধি বিষয়ক পুস্তকাদির বিষয়-বিবরণ

অছিয়ে গাউসুল আযম বিরচিত আলোচ্য পুস্তক-পুস্তকাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পূর্বে ইসলামী ধর্মীয় প্রথাগত আচার (ritual) সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করা দরকার। আল-কুরআনের প্রথম মৌলিক ভাষ্যকার, বিশ্লেষক, প্রয়োগকারক, তফসীরকারক নবীজী হযরত মোহাম্মদ (দ.) সমুদয় ব্যবহারিক আচার-পদ্ধতি নির্ধারণ করে গেছেন, যার বিশদ বিবরণ তাঁর পবিত্র হাদিসরূপে সহিহ্ বুখারী শরিফ সমেত সিহাহ্সিত্তায় সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ আছে, যাতে প্রত্যেক আচারের নৈতিক, সামাজিক, রূহানী, আর্থিক প্রভৃতি সব বিষয়ের উপকার, উপযোগিতা, কল্যাণকর প্রভাব ব্যাখ্যাত রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বুখারী শরিফের প্রথম খণ্ডে ঈমান, ইলম, অজু, গোসল বা পবিত্রতা, তায়াম্মুম, নামায, জানাযার বিবরণ সাতটা অধ্যায়ে, দ্বিতীয় খন্ডে যাকাত, হজ্ব, রোজা, ব্যবসা-বাণিজ্য-বেচা-কেনা, কৃষিকাজ, কর্জ-বন্ধক, বিচার-ব্যবস্থা, সাক্ষ্য প্রদান, অছিয়ত প্রভৃতি জাগতিক বিষয়ে কুরআনের আলোকে নবীজীর (দ.) নির্দেশনা বা গাইড-লাইন বর্ণিত হয়েছে; যেসব বিষয় প্রত্যেক মানুষের কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো গুরুত্বপূর্ণ। বুখারী শরিফ ছাড়াও মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত, ইবনে মাজাহ্ তথা সিহাহ্সিত্তাসহ অন্যন্য প্রামাণ্য হাদিস সংকলনে মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াদি, বিয়ে-শাদী, পায়খানা-প্রস্রাব, দাম্পত্য জীবনে আচরণীয় বিধান, সন্তান পালন, শিক্ষা প্রদান, পশু-পাখী পালন, বৃক্ষাদি রোপন, চাষ-বাস, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি প্রতি মুহূর্তের প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সর্বাধিক উপযোগী, যুক্তিসিদ্ধ, প্রকৃতিসম্মত কর্মপন্থা রূপরেখা রয়েছে, যেগুলো জাগতিক সকল ব্যাপারে আইনের উৎস হিসেবে গৃহীত হয়ে চলেছে। এসব প্রামাণ্য সঙ্কলন মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পথ চলাকে মসৃণ ও সংশয়মুক্ত করেছে। কেবল মুসলিম সমাজ নয়, অন্যান্য সমাজের মানুষেরাও এসব প্রকৃতিসম্মত বিধি-বিধান দ্বারা প্রভাবিত ও উপকৃত হচ্ছেন।

এখানে একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এসব পরিশ্রমী মহান হাদিস সঙ্কলকদের অতুলনীয় সাধনার ফলশ্রুতিতে 'ইতিহাস-অন্বেষা' মানব সভ্যতা ও

সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছে। প্রত্যেক মানুষের জীবনের প্রাত্যহিক দিনলিপির রূপরেখা সুবিন্যস্ত হয়েছে হাদিস গ্রন্থসমূহে। ইতিহাস 'জ্ঞানের অন্যতম প্রধান উৎস'–, একথা আল-কুরআনে বিভিন্নভাবে বহুবার বর্ণিত হয়েছে। তবে ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬ খ্রি.) এই শিক্ষাকে প্রথম সুসংহত চিন্তা ও দর্শনে উন্নীত করেন এবং এটাকে বিজ্ঞান ও দর্শনের অংশ হিসেবে প্রতিপন্ন করে 'সামাজিক বিজ্ঞান' হিসেবে ঘোষণা করেন। জর্জ বার্কলে (১৬৮৫-১৭৫৩ খৃ.), ভল্টেয়ার (১৬৯৪-১৯৪১ খ্রি.), মন্টেসক্যু (১৬৮৯-১৭৫৫), হেনরী বার্গসঁ (১৮৫৯-১৯৪১), কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩ খ্রি.) প্রমুখের বহু পূর্বে তিনি সামষ্টিক সমাজ-জীবনের গতি ও বিবর্তনসূত্র আবিষ্কার করেন। বলা বাহুল্য, মহান হাদিস সংগ্রাহক ও সঙ্কলকরা এসব মনীষীর বহু পূর্বেই এমনকি ইবনে খালদুনের প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বেই নিখুঁতভাবে ইতিহাসের ইট-সুরকি-কঙ্কর সংগ্রহ করে ইতিহাসকে জ্ঞানের তৃতীয় উৎস হিসেবে হাতে-কলমে প্রমাণ করে গেছেন। দার্শনিকভাবে জ্ঞানের অপর দুটো উৎস হলো, সংবেদন ও যুক্তিমত্তা। এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বর্তমান কালিক দৃষ্টিকোণ থেকে গবেষণা ও অধ্যয়ন প্রয়োজন।

ক. মুসলিম আচার-ধর্মঃ

পূর্ববর্তী বিভিন্ন অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, মুসলিম সমাজে শীর্ষস্থানীয় সকল ওলী-আল্লাহ্, পীর-মুর্শিদ, আলেম-উলামা সকলেই 'মারিফাত' জ্ঞান অর্জনে আগ্রহীদের জন্য 'শরিয়তের' বিধান শুদ্ধভাবে পালনের তাগিদ দিয়েছেন। তাছাড়া শুধু, পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনের জন্য নবীজীর (দ.) শরিয়ত পালনের যে কোন বিকল্প নেই, তা তাঁরা অসংখ্য দৃষ্টান্তসহকারে দেখিয়ে গেছেন। এই নীতির অনুসরণে অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) মুসলিম আচার-ধর্ম পুস্তিকার দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলেন : "আচার-ধর্ম অবলম্বনে মানুষেরা বাহ্যিক রূপ সংগঠন করিতে সক্ষম হয় এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান অর্জনে খোদাতায়ালার নৈকট্য লাভে সমর্থ হয়।... আধ্যাত্মিক জ্ঞানের রুচি লাভে সমর্থ হওয়ার জন্য আচার ধর্মেরও যথেষ্ট প্রয়োজন রহিয়াছে।... তাই গাউসে মাইজভাণ্ডারীর অনুসারীদিগকে আচার-ধর্ম জ্ঞান দানের জন্য এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা (সম্পাদনাপূর্বক) রচনা করিলাম।" এই পুস্তিকার শুরুতেই মটো হিসেবে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) বাণী উৎকলিত হয়েছেঃ "নামায পড়িও, কুরআন তিলাওয়াত করিও, হারাম খাইও না, কবুতরের মতো বাছিয়া খাও।"

এই পুস্তিকায় নামাযে সাধারণতঃ পঠিত ১১টি ক্ষুদ্র সূরা (সূরা ফাতিহা থেকে সূরা নাস) সূরা ক্বদর, ১৩০ ফরয, চার কুরছি, চার মজহাব, অজুর চার ফরয, পাঁচ ওয়াক্ত, পাঁচ নিয়ত, সপ্ত ঈমান, পঞ্চবেনা, গোসলের তিন ফরয, আহকামের ছয় ফরয, আর্কানের সাত ফরয, সতেরো রাকাত ফরয, তৈয়ম্মুমের তিন ফরয, নামাযের বারো

ওয়াযিব, অজুর এগারো সুন্নত, নামাযের পনেরো সুন্নত, অজু ভঙ্গের চারটি কারণ, নামায ভঙ্গের সাতটি কারণ, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের নিয়ত, পাঁচ কলেমা, প্রধান চার কিতাব, প্রধান চার মোরছেল নবী, ঈমানে মুজমাল, ঈমানে মোফাচ্ছাল, বিতির নামাযের নিয়ত, দোয়ায়ে কুনুত, মুনাজাত, দোয়ায়ে আত্তাহিয়াত বা তাশাহুদ, আত্তাহিয়ার পরের দরূদ শরিফ, দোয়ায়ে মাছুরা, জুমার দুই রাকাত ফরয নামাযের নিয়ত, জানাযার নামাযের নিয়ত, জানাযার দোয়া, ছানা, জানাযার নামাযের নিয়ম, জিয়ারতের নিয়ম, রমযানের রোজার নিয়ত, ইফতারের দোয়া, ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার নামাযের নিয়ত, নামায পড়বার নিয়ম, নামাযের ওয়াক্ত ও রাকাতসমূহ এবং সবশেষে কবিতা আকারে 'মটো' বর্ণিত হয়েছে।

এসব পুস্তিকা রচিত হয়েছে সহজ বাংলা ভাষায়, যাতে সাধারণ বাঙালিরা সহজে ধারণ করতে পারেন। তৎকালীন মাদ্‌রাসাগুলোতে শিক্ষার মাধ্যম ছিল আরবী, ফার্সি ও উর্দু, যা সাধারণ বাংলা ভাষীদের জন্য আয়ত্ত করা সহজ ছিল না। এই প্রেক্ষাপটে এই পুস্তিকার প্রয়োজনীয়তা ও ভূমিকা ঐতিহাসিক, মুসলিম আচার-ধর্ম পালনের তালিমের পূর্ণাঙ্গ সেট এতে বিবৃত।

এসব পুস্তিকার উপস্থিতি, প্রচার ও অনুসরণ মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফ সম্পর্কে মহল বিশেষের অজ্ঞতা ও যাবতীয় অপপ্রচারকে খণ্ডনের বুদ্ধিবৃত্তিক হাতিয়ারও বটে। মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফে শরিয়তের পূর্ণ পায়রবী হয়।

খ. মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়াঃ

কেবল মুসলিম আধ্যাত্মিক ঘরানায় নয়, বিশ্বের সকল ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ কেন্দ্রের নিজস্ব জিকির ও সাধনা পদ্ধতি রয়েছে এবং কালগত, পরিবেশগত, স্থানীয় সংস্কৃতি ও সমাজগত কারণে এই বিভিন্নতার প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য। পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ আধ্যাত্মিক ঘরানা হিসেবে এই মহান দরবারেরও নিজস্ব জিকির-আজকার সাধন পদ্ধতি রয়েছে, যা হযরত সাহেব কেবলার (ক.) জমানা থেকে প্রচলিত। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) এসব পদ্ধতি সহজ বাংলা ভাষায় বিন্যস্ত করেছেন। মুসলিম সমাজে মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া অত্যন্ত সংবেদনশীল ও আবশ্যকীয় ধর্মীয় রেওয়াজ হিসেবে প্রতিদিন অনুশীলিত হয়। তাই এ জিকির পদ্ধতির প্রোফর্মার একটা মডেল বা নমুনা লিখিতভাবে থাকা জরুরী ছিল।

এ ক্ষেত্রেও তিনি বাঙালি মুসলিমদের ব্যবহার্য বাংলা ভাষায় এসব পদ্ধতি-প্রকরণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন। তিনি এই পুস্তিকার সূচনা বক্তব্যে বলেছেন, "বর্তমান যুগে পৃথিবীতে পরম দয়াময় খোদাতালার অনুগ্রহ ও নবী মোস্তফা (দ.) এবং আউলিয়া-কিরামগণের শুভ দৃষ্টিপ্রাপ্ত মহাপুরুষদের উর্দু, ফারসি, আরবী ভাষায় বর্ণিত

মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া শরিফের কেতাবাদি সম্পাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু বাংলা ভাষায় লিখিত ও সম্পাদিত কোন কেতাব না থাকায় বাংলা ভাষাভাষী ত্বরিকতপন্থী আশেকভক্ত-অনুরক্তগণ মিলাদ ও তাওয়াল্লোদ শরিফ পাঠান্তে অপূর্ব নেয়ামত ও ফজিলত হইতে বঞ্চিত রহিয়াছে। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকায় মিলাদে নববী ও তাওয়াল্লোদ শরিফ পাঠ ও পাঠান্তে জিকির-আজকার মাহফিল করার প্রচলন রহিয়াছে। তাই অসংখ্য ভক্ত, অনুরাগী, অনুসারী ও আগ্রহী ব্যক্তিগণের অনুরোধে মিলাদ পদ্ধতি বাংলা অক্ষরে উচ্চারণ করিয়া সম্পাদনা করিলাম, যাহা বর্তমানে হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী (ক.)-এর মাজার শরিফে ও দরবারী মাহফিলে পড়িবার রেওয়াজ বা প্রচলন আছে। ইহাতে মাইজভাণ্ডারীর (ক.) ভক্ত অনুসারী ও আশেক জনগণ উক্ত নেয়ামত ও ফয়জ রহমত অর্জনে সাফল্যমণ্ডিত হইলেই অধীন খাদেম পরম দয়ায় খোদার দরবারে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। সঙ্গে এক সংক্ষিপ্ত জিকির, আদাব ও নিয়ম পদ্ধতিও সংযোজন করিলাম।"

জিকরী মাহ্ফিল কানুন ও শরায়েতঃ

পুস্তিকায় উপরোক্ত শিরোনামে পরিবেশিত তথ্যাদিতে অন্যতম যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তাতে মাইজভাণ্ডারী অনুগ্রহের সর্বজনীনতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে যে; "এই ত্বরিকা কোন ব্যক্তিগত, জাতিগত, সাম্প্রদায়িক ত্বরিকা নহে। এমনকি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণেরও স্ব স্ব ধর্ম অনুযায়ী উপাসনা করিয়া মাইজভাণ্ডারী হইতে অনুগ্রহ বা ফয়জ রহমত অর্জনের অধিকার রয়েছে।" 'জিকরী মাহফিল কানুন ও শরায়েত' শীর্ষক বিবরণে তিনি বলেনঃ

"মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকা সমস্ত ত্বরিকার সমাবেশ ও সর্ববেষ্টনকারী। কাদেরীয়া, চিশ্তিয়া, নক্সবন্দীয়া, কলন্দরীয়া, সরওয়ারদীয়া, তৈফুরীয়া, জোনায়দীয়া ইত্যাদি ত্বরীকা উহার অন্তর্ভুক্ত। সমস্ত ত্বরীকতপন্থীরা মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার মত জিকির আজকার বা স্ব স্ব পীর বুজুর্গ ধ্যানে স্ব স্ব ত্বরিকানুযায়ী জিকির করিয়া মাইজভাণ্ডারী (ক.) হইতে ফয়জ রহমত অর্জন করিবার অধিকার আছে। এমন কি ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণেরও স্ব স্ব ধর্মানুযায়ী উপাসনা করিয়া মাইজভাণ্ডারী (ক.) হইতে অনুগ্রহ বা ফয়জ রহমত অর্জনের অধিকার আছে। কারণ, ইহা কোন ব্যক্তিগত জাতিগত সাম্প্রদায়িক ত্বরিকা নহে। মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকতপন্থী-মুরিদ, ভক্ত-আশেকগণও তাহাদের রুচি অনুযায়ী বা নিজ পীরের সবক ও তালিম অনুযায়ী যে কোন ত্বরিকত পদ্ধতি অনুসারে জিকির করিবার অধিকার রহিয়াছে। যাহারা সেমায় আসক্ত, সেমা বা গান-বাদ্যজনিত জিকির বা জিকিরী মাহফিল করিতে চাহেন, তাহাদের জন্য বাদ্যযন্ত্রসহকারে জিকির বা জিকিরী মাহ্ফিল করিবার অনুমতি ও অনুমোদন আছে। হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারীর (ক.) শুভ দৃষ্টি ও ফয়জ রহমত অর্জনে খোদার

নৈকট্য ও কৃপাবারি হাসেল করতঃ দোজাহানের সরফরাজী ও সফলকাম হইতে হইলে জিকিরী মাহফিলে সকলের জন্য সেমাযুক্ত ব্যক্তিগণেরও নিম্নলিখিত শরায়েত অনুযায়ী আদবের সহিত মাহ্ফিলে মিলাদ, মাহ্ফিলে তাওয়াল্লোদ শরিফ এবং জিকিরী মাহ্ফিল অনুষ্ঠিত করা কর্তব্য।"

শরায়েতঃ

১. "তাহারত" বাহ্যিক পবিত্রতা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ ধর্মীয় বিধান মত অজু করা, কাপড় পাক রাখা, স্থান পবিত্র হওয়া ইত্যাদি শুচি গ্রহণ।
২. মানসিক পবিত্রতা অবলম্বন করিতে হইবে। অর্থাৎ কু-ধারণা, দুনিয়ার ধ্যান বর্জন করতঃ পীর-মুর্শিদ ও আল্লাহ্তায়ালার ধ্যান রাখা।
৩. স্ব স্ব পীরে কামেলের প্রদত্ত সবক মত জিকির করা।
৪. কামেল পীর বা পীরের অনুমতি প্রাপ্ত খলিফার উপস্থিতি।
৫. পবিত্র কুরআনের আয়াত, দরূদ শরিফ ও মিলাদে নববী বা তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া পাঠান্তে জিকিরী মাহ্ফিল আরম্ভ করা। মিলাদ বা তাওয়াল্লোদ শরিফ পাঠে অসমর্থ হইলে কমপক্ষে কুরআন শরিফের একটি সূরা ও দরূদ শরিফ পাঠ করিয়া আরম্ভ করিতে হইবে।
৬. নামায সমাপনীয় কায়দামত আদব ও শৃঙ্খলার সহিত বসিতে হইবে।
৭. ধূমপান বা যে কোন প্রকার পানাহার উক্ত সময় বর্জন করিতে হইবে।
৮. উপস্থিত লোক সমস্ত ত্বরিকতপন্থী হইতে হইবে।
৯. কম বয়স্ক বালক-বালিকার উপস্থিতি নিষেধ। মেয়ে-পুরুষ একত্রিতভাবে বসিতে পরিবে না।
১০. মেয়ে লোকদের জিকিরী মাহফিল, পর্দায় পুরুষ থেকে ভিন্ন হইতে হইবে।
১১. মাহ্ফিল অবস্থায় অজদ প্রাপ্ত বেহুঁশ ব্যক্তিকে ইজ্জত ও হেফাজত করিতে হইবে।
১২. জিকরী মাহফিল নিজ অধিকারী জায়গায় হইতে হইবে।

এই পুস্তিকায় জিকির মাহ্ফিলের পাঁচটি ধাপের সংক্ষিপ্ত তরতীব, মিলাদে নববী, কিয়াম, মুনাজাত, তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া, কসিদা (সহজ আরবী জবানে), মুনাজাত লিপিবদ্ধ হয়েছে। এতে করে জিকির, মিলাদ ও তাওয়াল্লোদে গাউসিয়া শরিফের একটি সুন্দর সংক্ষিপ্ত অভিন্ন পদ্ধতি মাইজভাণ্ডারী ভক্ত-অনুসারীদের জন্য সহজলভ্য হয়েছে। তাঁর এই কাজটা ঐতিহাসিক এবং বাংলাভাষীদের জন্য উপযোগী।

গ. মূল তত্ত্ব বা তজকীয়ায়ে মোখতাছারঃ

এই পুস্তিকা মারিফাত সাধকদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। মাইজভাণ্ডারী ত্বরিকতপন্থীদের আত্মশুদ্ধি বা পবিত্রতা হাসিলের নিয়মিত অনুশীলন পদ্ধতি; পীরি সিলসিলা বা শাজরা, নফ্সে ইনসানী বা মানবীয় সত্তার সাত প্রকার সজাগ প্রকৃতির

বর্ণনা এবং সব শেষে মানবিক গুণাবলী অর্জনের সপ্ত পদ্ধতি পরিবেশিত হয়েছে। এটা বাংলা ভাষায় সংক্ষিপ্ত উচ্চ মার্গীয় রুহানী সাধনার পদ্ধতি। এ বিষয়ে মুসলিম অধ্যাত্ম জগতে হাজার হাজার পুস্তক বিদ্যমান। গ্রন্থের এই অন্তহীন মহাসমুদ্র পাড়ি দেওয়া কয়জনের পক্ষে সম্ভব! এই বিবেচনায় মূলতত্ত্ব পুস্তিকাটি অত্যন্ত উপযোগী ও সহজে ধারণযোগ্য। পুস্তিকার শুরুতে দুটো নক্শায় জ্যামিতিক পদ্ধতিতে রুহে ইনসানী ও নফ্সে ইনসানীর পরিচিতি মুদ্রিত হয়েছে। ভূমিকায় "মাইজভাণ্ডারী" বা "আজমিরী" "তক্মা এঁটে থাকা একশ্রেণীর ভণ্ড পীরী ঠগী ব্যবসায়ীদের" চিহ্নিত করার মানদণ্ড বর্ণিত হয়েছ। এই পুস্তিকা মারিফতপন্থীদের জন্য বাংলা ভাষায় অমূল্য সংযোজন, যা মাইজভাণ্ডারী অধ্যাত্ম সাহিত্যকে বহুভাবে সমৃদ্ধ করেছে।

পুস্তিকার সূচনায় অছিয়ে গাউসুল আযম বলেন: 'এহ্য়াউল উলুম' নামক কেতাবে হযরত ইমাম গাজ্জালী (র.) কোরআন পাকের ছুরা আহজাব ৭২ আয়াতের হাওলা দিয়া লিখেন, আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন, "আমি আমার আমানত আছমান, জমীন এবং পাহাড়ের সামনে ধরিলাম, সকলেই গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিল এবং ভয়প্রাপ্ত হইল। মানবই তাহা গ্রহণ করিল। এই আমানত খোদাতত্ত্ব, আল্লাহ্তায়ালার পরিচয় জ্ঞান এবং তৌহিদ।"... "দুই শক্তিবস্তু 'মালাকুতী বা ফেরেশ্তা প্রকৃতি এবং নাছুতী বা শয়তানী প্রকৃতির সম্মিলনে আহসানে তাকবীম বা শ্রেষ্ঠতম গঠনে সৃষ্ট মানবই খোদার যথাযথ বিকাশস্থলে পরিণত। আদম খোদার খলিফা, খোদায়ী প্রকৃতিতে প্রকৃতিস্থ এবং খোদার স্বভাবে স্বভাবিত। মানব সত্তা দর্পন সদৃশ এবং বহু গূঢ় কারণে এরফানে এলাহী বা খোদা পরিচিতি তত্ত্বের জিম্মাদারী গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এই স্থলে মানবে সঞ্চিত আদি বৈশিষ্ট্য জিবিন্নাতে শয়তানী বা শয়তানী স্বভাবের দরুন নিজের উপর জুলুমকারী জহুল বা অজ্ঞে পর্যবসিত হয়। এই দুই অবস্থা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়ে শুদ্ধ পথের সন্ধান দিতে পীরে কামেলের আনুগত্যের আবশ্যকীয়তা, অপরিহার্যতা ও তথ্য-উপকরণাদি এই পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় ১নং নক্শায় নফ্সে রুহে ইনসানী এবং ২নং নক্শায় নফ্সে ইনসানীর অবস্থা, প্রকৃত মানব বা ইনসানে কামিলের পরিচয়, নিজ পরিচয় ও খোদার পরিচয় বুঝাইতে চেষ্টা করা হইয়াছে। যে বুঝ-ব্যবস্থা ও আনুগত্যের জন্য সুন্নতে মোস্তফা মতেই পীরি-মুরীদি প্রথা প্রচলিত। ত্বরীকা বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভব হতে দেখা গেলেও সকলের মূল উদ্দেশ্য অভিন্ন ও এক।"

এ পুস্তিকায় কাদেরিয়া মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরীকার বায়াত, নিয়ম, দস্তুর আরবী ও বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ এবং লতিফা বা সূক্ষ্মতা নির্দেশক সংস্থাগুলোর নাম, জিকির, ফিকির, স্মরণ পদ্ধতিও বর্ণিত হয়েছে।

১নং নকশা ঃ

রূহে ইনছানীর অবস্থান

فما انت هو بل انت هو وتراه فى ÷ عين الامور مسرحا ومقيداً

২নং নকশা ঃ

নফছে ইনছানী বা মানবীয় সত্তার সাত প্রকার সন্তান প্রকৃতি

		(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১	নফছের নাম	আম্মারা امّارة	লাওয়ামা لوّامة	মোলহেমা ملهمة	মোতমাইন্নাহ مطمئنة	রাজীয়া راضية	মর্জিয়া مرضية	কামেলা كاملة
২	কর্ম	প্রয়োজনা	অনুধাবন	প্রতীয়মানতা	সন্তোষ	সন্তুষ্টি	তৃপ্তিবোধ	পূর্ণমানবতা
৩	অবস্থান ক্ষেত্র	অদৃশ্য জগত عالم شهادت	মধ্য জগত عالم برزخ	বাহ্যের দৃষ্টি শূন্য اعلاج	হাকীকতে মোহাম্মদী حقيقت محمدى ﷺ	রেজা ও তছলিম সম্পন্ন লাহুত বা অসীম দর্শন	যথাযথ দৃষ্টি জ্ঞান شهود ذاتى	রূহের একত্ব দর্শন পূর্ণমানবতা خفاء انسان كامل
৪	প্রকৃতি বা হাল	বাসনা ميل	ভালবাসা محبّت	বাসনা শূন্য প্রেম عشق	মিলন وصلة	বেপরওয়া ও নিশ্চিন্ত غناء	বিস্ময়ের চিত্ত الحيرة	খোদা সম্পত্তি بقاء بالله سير مع الله
৫	অবতীর্ণ ধর্ম	বিধান ধর্ম شريعت	আধ্যাত্মিক ধর্ম طريقت	নিজ পরিচয় **معرفت**	প্রকৃত জ্ঞান حقيقت	খোদা তত্ত্ব জ্ঞান عرفان معرفت	শরিয়ত ধর্ম রহস্য مشيت ايزدى	উপরে বর্ণিত সমস্ত কিছু

৪. গাউসিয়াত নীতিঃ

অছিয়ে গাউসুল আযম (ক.) মাইজভাণ্ডার দরবার শরিফের অনুসারীদের যথার্থ অনুসারী তথা কর্মী হিসেবে নিজেদের গঠন করার ও সর্বক্ষণ মওজুদ রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সংক্ষিপ্ত তিনটি নীতি প্রণয়ন করেন, যা আধুনিক সুশৃঙ্খল, আদর্শবাদী রাজনৈতিক-সামাজিক সংগঠনগুলোতে অনুসৃত হয়। এই তিনটি নীতিকে মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকার অনুসারীর যথার্থতা বিচারের মানদণ্ডরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই গাউসিয়াত নীতি নিম্নে বর্ণিত হলো:

তেলাওয়াত অজুদ ১

নির্জন সময়ে নিজের গত দিনের ভালমন্দ কাজ-কর্মের বিচার, চিন্তা ও ধ্যানের মাধ্যমে মন্দের জন্য অনুতাপ, অনুশোচনা, ভালোর জন্য নিজ পীরের আনুগত্য এবং খোদার সাহায্য কামনা, মোনাজাত, বিনয়ে প্রার্থনা-অনিবার্য। ফলে খোদা পথচারী নাছুত্ভাব কামনার উর্ধ্বে "লাওয়ামা" "মুলুকুত্" শক্তি জগতে উত্থিত হইতে সক্ষম হয়, যাহাকে সুফি পরিভাষায় "ফানা আনিল খাল্ক্" বলে।

অনর্থ পরিহার ২

যাহা না হইলে চলে ও উপকারবিহীন, এহেন কাজ-কর্ম, কথাবার্তা, বাক্বিতণ্ডা ত্যাগ, পরিহার, এড়াইয়া চলা এবং পরের দোষ তালাশ না করা, পরমুখাপেক্ষিতা ও পরশ্রীকাতরতা-বিমুখ হইয়া, নিজ শক্তি সামর্থে হালাল রুজির প্রতি আস্থাশীল হওয়া। অপচয়, অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার পরিহার করা, যথা: পান, বিড়ি-সিগারেট, অলঙ্কার, অঙ্গ বিকৃতকারী পোশাক পরিচ্ছদ, পবিত্র কুরআন যাহাকে অহংকারী, "ফাখুরাণ" গর্বকারী বলে নির্দেশ করেছে, যাহা মানবের দৈহিক, নৈতিক অবনতি ঘটায়, কর্মবিমুখতা, অভাব-অনটন, আর্থিক দুর্গতি আনয়ন করে। ভূষণ, ফ্যাশন, মোহের ফলে আদি অসভ্যতা "পছন্দ" হইয়া পড়ে। সুতরাং, এ সমস্ত পরিহারের ফলে খোদা পথচারী "সালেক" কুরআনের বাণী "মান্নাহান্ নাফ্সা আনিল হাওয়া ফাইন্নাল জান্নাতা হিয়াল মাওয়া" মতে নিশ্চিত স্বর্গবাসী, ইহাকে সুফি পরিভাষায় বলে "ফানা আনিল হাওয়া"।

সন্তোষ ৩

খোদার মঙ্গলদায়ক ইচ্ছা শক্তির নিকট নিজ সংসার স্বার্থবুদ্ধিকে নত করিয়া মঙ্গলদায়ক রূপের ধ্যানে "সাবের" বা ধৈর্য্যের সহিত অপেক্ষা করা। যেহেতু স্রষ্টা সৃষ্টির রক্ষক, পালক, বর্দ্ধক, মঙ্গলদায়ক। ছুফি পরিভাষায় এই গুণজ প্রকৃতিকে বলে "তসলিম" বা "রজা"।

এই ত্রিবিধ নীতিমালাই "ফানায়ে ছালাছা" বা বিনাশ পদ্ধতি, যাহা হযরত গাউসুল আযম মাইজভাণ্ডারী কেবলার সপ্ত পদ্ধতির অন্তর্গত।

প্রথম অংশ, "ইবাদতে মোত্‌নাফিয়া" হিসেবে "সালেক" খোদা পথচারীর জন্য অপরিহার্য।

উপরোক্ত গাউসিয়ত নীতিহীন, বিমুখ ব্যক্তির মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরীকার অনুসারী দাবী করা চলে না।

[বিঃ দ্রঃ- "বেলায়তে মোত্‌লাকা"র দ্বাদশ পরিচ্ছেদে হযরতের বাণী এবং অষ্টম পরিচ্ছেদে বেলায়েত রহস্য অধ্যায় সমূহ।]

এসব নীতি প্রকৃত প্রস্তাবে ভালো ও সৎ মানুষ হবার অনুশীলনী ও পথ নির্দেশক।

৫. উপসংহারঃ

অছিয়ে গাউসুল আযমের (ক.) জীবন-সাধনার অন্যতম ফসল মাইজভাণ্ডারী আচার-প্রকরণ (methodization) চয়ন, সুবিন্যস্ত ও সাংগঠনিকভাবে অনুসারীদের মধ্যে প্রচার ও প্রচলন। শরিয়ত ও মারিফাতের রীতিগুলোকে সহজে অনুধাবন, ধারণ ও প্রয়োগসম্ভব করে তিনি লিখিতভাবে পরিবেশন করে গেছেন, যাতে এগুলো মাইজভাণ্ডারী অনুসারীদের আটপৌরে আচরণ ও অভিন্ন স্বভাবের রূপ পরিগ্রহ করে। এগুলোর সংগ্রহ, গ্রন্থনা ও প্রচার কেবল বাঙালি ত্বরিকতপন্থীগণ কিম্বা মাইজভাণ্ডারীয়া ত্বরিকাকে সমৃদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করেনি, বরং বিশ্বের তাবত আধ্যাত্মিক ঘরানার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেও অনুকরণীয় উল্লেখযোগ্য সংযোজন বটে।

চতুর্থ ভাগ

ঐতিহাসিক মদীনা সনদ : বহুত্ববাদী রাষ্ট্রপ্রকল্প

মাইজভাণ্ডারী বেলায়ত বহুত্ববাদী সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণের দর্শনে বিশ্বাসী। এ বিষয়টা সহজে অনুধাবনের সুবিধার্থে নবীজীর (দ.) বহুত্ববাদী রাষ্ট্র ও মানবিক ভ্রাতৃত্ববাদী সমাজ নির্মাণের নৈতিক ও আইনী নমুনা কাঠামোর স্বরূপ 'মদীনা সনদের' বিবরণী ত্রিংশ অধ্যায়ে প্রদত্ত হলো; যা আল-কোরআনের সার্বজনীন রবুবিয়ত নীতির প্রথম ফলিত রাষ্ট্রতত্ত্বের ভিত্তিও বটে।

মদীনা সনদ রাজনৈতিক–সামাজিক অর্থে তৎকালীন পরিবেশে ব্যক্তিগত ধর্ম বিশ্বাস, আচার-সংস্কৃতি নির্বিশেষে পারস্পরিক সহাবস্থান সমতাপূর্ণ প্রশাসন ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার বিকাশ, সুষম পররাষ্ট্রনীতি সম্বলিত বহুত্ববাদী রাষ্ট্র ও সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যাভিসারী। কিন্তু বনু কায়নুকা, বনু নাজির, বনু কুরাইজা প্রভৃতি তৎকালীন ইহুদী মতবাদী গোত্ররা নিজেদের গোত্রীয় স্বার্থ ও দুরভিসন্ধিমূলক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের বশবর্তী হয়ে মদীনা সনদের একাধিক ধারা চরমভাবে লংঘন করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে বিশ্বাসঘাতকতা করে। তাদের ঐসব অবাঞ্ছিত কর্মের দরুন ঐ সপ্তম শতাব্দীতেই উন্নত মানবতাবাদী আদর্শ সম্বলিত বহুত্ববাদী, পালনবাদী, প্রতিনিধিত্বমূলক গণতান্ত্রিক সমতাবাদী সমাজ বিনির্মাণের সুদূর প্রসারী শুভ পদক্ষেপটি দুঃখজনকভাবে বিঘ্নিত হয়। নইলে বিশ্ব ভ্রাতৃত্বমূলক শান্তিবাদী সমাজ বিনির্মাণের পথে বিশ্বমানবতা বহুপূর্বেই অনেক দূর এগিয়ে যেতো এবং পৃথিবী বহু ধ্বংসযজ্ঞ ও হত্যালীলা থেকে নিষ্কৃতি পেতো। নতুন করে উদ্ভব হবার সুযোগ হতো না নমরুদ-ফোউনী একনায়ক জালেম শাসকচক্রগুলোর।

বহুমুখী প্রতিভাধর কালজয়ী দার্শনিক, চিকিৎসাবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ইবনে রুশ্‌দের (১১২৬-১১৯৮ খ্রিঃ) বিশ্লেষণ মতে; প্লেটো যে আদর্শে প্রজাতন্ত্রের (Republic) স্বপ্ন দেখতেন, তার বাস্তব রূপায়ন হয়েছিল খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে। তাঁর অভিমত "এরপর উমাইয়া পারিবারিক রাজতান্ত্রিক স্বেচ্ছাতন্ত্রের আমলে প্রথম এ আদর্শের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়। তার দরুনই মানুষের ভাগ্যে বিপর্য নেমে আসে।[১] অবশ্য লক্ষ্যনীয় যে, প্লেটোর 'নোবল সিটি' বা অভিজাত নগরীর ধারণা পুরো সমতাবাদী-পালনবাদী নীতির সাথে সাযুজ্যপূর্ণ নয়। তাঁর মতে অভিজাত নগরী তিন শ্রেণীর মানুষ নিয়ে গড়ে উঠবে, যথা: ১. দার্শনিক ও জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গ, ২. সেনা সদস্যরা এবং ৩. শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণী। রাষ্ট্র চালাবেন কেবল দার্শনিকরা। তাতে অপর দুই শ্রেণীর কোন অধিকার থাকবে না। সৈনিকদের মালিকানার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার ছিল না। তাদের স্ত্রী ও সন্তান নিয়ে পরিবার গঠনের সুযোগ ছিল না। ছিল না স্ত্রী-সন্তান। সৈনিকদের জন্য ছিল নির্ধারিত কিছু নারী, যৌথ বা এজমালী ভোগ সম্পত্তি হিসেবে। ঐসব নারীর সন্তানরা হতো পিতৃপরিচয়হীন রাষ্ট্রের

সন্তান। তৃতীয় ক্যাটাগরির নাগরিকদের দায়িত্ব ছিল শাসক ও সেনা শ্রেণীর সেবা নিশ্চিত করা। তারা ছিল দাস (Slave) শ্রেণীভুক্ত। প্লেটোর শিষ্য এ্যারিস্টটলও একই ধরনের অভিমত ব্যক্ত করেন। ফলে সমাজে দুই শ্রেণীর মানুষের উদ্ভব ঘটে–শাসক ও সুবিধাভোগী এবং শাসিত-শোষিত শ্রেণী।

কিন্তু কুরআনী নীতি এর স্পূর্ণ বিপরীত। দাস শ্রেণীর অস্তিত্ব আল-কুরআনে নেই। নেই সুবিধাভোগীর শ্রেণীর অস্তিত্বের সুযোগ। মানুষ হিসেবে মানবিক সকল প্রকার নীতিসিদ্ধ অধিকার নিশ্চিত করা এখানে ফরয। দাসপ্রথাকে অকার্যকর তথা বিলোপ করার কর্মসূচী নবীজীর (দ.) নবুয়ত প্রকাশের পূর্ব থেকেই মক্কায় তাঁর পরিবারেই বাস্তবায়নের মুখ দেখতে শুরু করেছিল। দাসমুক্তিকে অগ্রাধিকার দিয়ে একই সাথে অন্ন দানের তাগিদ দেওয়া হয়েছে। নবীজীর (দ.) ক্বলবে ওহী অবতীর্ণের পর্যায়ের একেবারে গোড়ার দিকে মক্কী সূরা আল বালাদ–এ চারটি প্রধান মানবিক দায়িত্বের মধ্যে দাসমুক্তিকে শীর্ষ কর্তব্য হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে (৯০: ১২-১৬)। তদুপরি এই সূরায় মানুষের বিবেক-বিবেচনা, তার বাঁচবার অবলম্বন শ্রম–সম্পদের অপব্যবহার থেকে বিরত থাকার সতর্কতা জারী করা হয়েছে। বর্ণ-বিশ্বাস নির্বিশেষে গণতান্ত্রিক সমতা, যুক্তিসিদ্ধ মত প্রকাশের স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার হিসেবে গৃহীত। হযরত মুহাম্মদ (দ.)-এর সুষম রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রথম পদক্ষেপ মদীনা সনদ এসব নীতি-দর্শনই ধারণ করে। এখানে বুখারী শরীফে বর্ণিত একটা হাদীস প্রণিধানযোগ্য: "সিজাবের অস্তিত্ব থাকা উচিত নয়"। অত্যাচারী-দুরাচারী, নীতিহীন, স্বৈরাচারী ও 'অসহায় জনগণ কর্তৃক পূজিত' শাসক নিন্দিত। সকল যুগের আলোকিত মানুষরা গণতান্ত্রিক সমতাবাদী, অভাবমুক্ত একটা পালনবাদী সমাজের প্রত্যাশা ব্যক্ত করে গেছেন। মদীনা সনদ এ ক্ষেত্রে প্রথম পথিকৃত।

লক্ষ্যণীয় যে, কাবাশরীফ পুনঃনির্মাণের পর হাজারে আসওয়াদ পুনঃ স্থাপনকালে সংশ্লিষ্ট যে গোত্রীয় বিরোধ দপ্ করে জ্বলে উঠেছিল, নবীজীর (দ.) প্রখর মেধা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, যুক্তিসিদ্ধ নিরপেক্ষতা ও পার্থিব সমতাবাদী পদক্ষেপে তা উবে যায় এবং শান্তি-সম্প্রীতির আবহ রচিত হয়। পরবর্তীতে সাংবিধানিক রাষ্ট্র গঠন পর্যায়ে ঐতিহাসিক মদীনা সংবিধান প্রণয়নকালও তাঁর এই মেধা, পক্ষপাতহীনতা, পার্থিব সমতামূলক আচরণ, ন্যায়-বিচারিক চেতনা ও দর্শনের অতুলনীয় বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল, যা বহুত্ববাদী রাষ্ট্র ও সমাজ সংগঠন ও পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে ক্রিয়াশীল থেকেছে এবং যার আবেদন এখনো সজীব।

টীকা : তথ্য সূত্র

১. মুসলিম মনীষা, ইবনে রুশ্দ অধ্যায়; আবদুল মওদুদ, কলিকাতা, ১৯৫৫ ইং।

ত্রিংশ অধ্যায়

মদীনা সনদ : জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে বহুত্ববাদী রাষ্ট্র ও মানবিক ভ্রাতৃত্ববাদী সমাজ নির্মাণের ফর্মূলা

১। মদীনা সনদ প্রণয়নের কাল: (ক) মদীনা সনদ প্রণীত ও স্বাক্ষরিত হয় ৬২৪ খ্রিস্টাব্দে। এই মহান সনদ প্রণীত হয় কোন রাজা-বাদশাহ-সম্রাট দ্বারা জারীকৃত কোন ফরমান বলে নয়, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-বিশ্বাস নির্বিশেষে নির্দিষ্ট জনমণ্ডলীর প্রতিনিধিদের দ্বারা। এটা ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোন বিধান নয়, বরং তৃণমূল মানুষের প্রস্তাব ও সম্মতির ভিত্তিতে প্রণীত একটি রাষ্ট্র-সমাজ প্রশাসনের আইনী দলিল। এবং তা কালোত্তর একটা অতি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলিল হয়ে আছে। এই সনদ বিশ্বে প্রথম লিখিত সংবিধান হিসেবে বিবেচিত। (এই সংবিধানের মূল আরবী বয়ান, বাংলা ও ইংরেজী অনুবাদ দেওয়া হলো। বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯৪ সনে। ইংরেজী অনুবাদ করেছেন প্রফেসর ডব্লু মন্টগোমারী ওয়াট, যা তাঁর বিখ্যাত 'মুহাম্মদ এ্যাট মদীনা' গ্রন্থে সন্নিবেশিত। এই বই প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সনে গ্রেট বৃটেনে।) বাংলা ভাষায় এই সনদের পূর্ণ-বিবরণী প্রকাশিত হয় প্রণয়নের দীর্ঘ ১৩৭০ বছর পর। ইতিপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সীরাত গ্রন্থগুলোতে মদীনা সনদের সারসংক্ষেপ লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল মাত্র, যাতে পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না।

২. প্রথম সীরাত গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে ইসহাক: পূর্ণাঙ্গ প্রথম সীরাত গ্রন্থ প্রণেতা ইবনে ইসহাক (৭০৪-৭৬৭ খৃ., ৮৫ হি. –১৫১ হি.)। তবে মদীনা সনদ প্রথম লিপিবদ্ধ হয় 'ইবনে হিশাম' প্রণীত সীরাতুন্নবী (দ.) গ্রন্থে। 'সীরাত: ইবনে হিশাম' হচ্ছে নবীজীর (দ.) প্রথম পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ ইবনে ইসহাকের সীরাতে রসূলুল্লাহ্ (দ.) এর কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্তরূপ। ইবনে ইসহাকের পূর্ণ নাম আবু আব্দুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক। জন্ম তাঁর মদীনায়, মৃত্যু বাগদাদে। তিনি শিক্ষামূলক বক্তৃতা দিতেন নবীজীর (দ.) জীবনেতিহাস সম্পর্কে। নবীজীর (দ.) জীবনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর তথ্য সংগ্রহ, সেগুলোর যথার্থতা যাচাই এবং উন্নত মানের বিশ্লেষণমূলক কায়দায় পরিবেশনার মুন্সিয়ানা তাঁকে এক মহৎ সত্যসন্ধানী ঐতিহাসিকের মর্যাদায় আসীন করেছে। বস্তুতঃপক্ষে ইবনে ইসহাক কর্তৃক নবী জীবনের তথ্য সংগ্রহের মাধ্যমে মুসলিমদের জ্ঞান ও ইতিহাস সাধনার যে বর্ণাঢ্য সুবিশাল ধারার সূত্রপাত ঘটে, তার ধারাবাহিকতায় অন্যান্য গুণী ব্যক্তিদের ইতিহাস চর্চা, নবীজীর (দ.) হাদীস সংগ্রহ ও

সংকলনের বিশাল ঐতিহাসিক কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে ইতিহাস-সাধনার এই ঐতিহ্য জ্ঞানের জগতে এক অতুলনীয় কীর্তি হিসেবে পিরামিডের মতো মাথা তুলে আছে।
ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থ আরবী গদ্য সাহিত্যের প্রামাণ্য প্রমিত রূপ হিসেবে বিবেচিত। তাঁর এই মহামূল্যবান প্রথম মৌলিক গ্রন্থের পূর্বে অন্ততঃ নয়জন লেখকের নাম পাওয়া যায়, যারা যুদ্ধে বীরত্বব্যঞ্জক বিবরণী রচনা করে স্থানীয়ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁদের এই ধাঁচের রচনাগুলো আরবী সাহিত্যে 'মাগাযী বিবরণ' কিম্বা তাওয়ারিখ হিসেবে পরিচিত। ইবনে ইসহাক তাঁর 'সীরাতে রসূলুল্লাহ্' প্রণয়ন করতে গিয়ে তাঁদের নোট ও বিবরণী থেকেও প্রামাণ্য বিষয়বস্তু গ্রহণ করেন। তবে ইবনে ইসহাকের 'সীরাত' গ্রন্থটা সম্পূর্ণ নতুন একটা পদ্ধতির দ্যোতক, যা পরবর্তীকালে সীরাতে রসূলুল্লাহ্ বা নবীজীবনী বিষয়ক ইতিহাস-সাহিত্যের পথপ্রদর্শক রূপে অনুসৃত হয়। তিনি নবীজীবনকে একটি ঐতিহাসিক বিবর্তনের অনির্বাণ আলোকবর্তিকা হিসেবে চিহ্নিত করেন, যে প্রগতিশীল বিবর্তন ইসলাম তথা শান্তি-সাম্য ভ্রাতৃত্ব ও রবুবিয়াতের ম্যানিফেস্টেশন রূপে প্রতিষ্ঠালাভ করে। তাঁর গ্রন্থে তিনি প্রথমে আরব ও মক্কা নগরীর ইতিহাস লিখেন। হযরত আদম (আ.) থেকে হযরত ইব্রাহিম (আ.) হয়ে হযরত মুহাম্মদ (দ.) পর্যন্ত বংশক্রমের বিবরণ দেন। অতঃপর নবীজীর (দ.) সংগ্রাম, সাধনা, আদর্শিক অভিযান ও চূড়ান্ত বিজয়ের প্রামাণ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। নবী জীবনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে তাঁর এই পুস্তক ইতিহাসের আকাশে ধ্রুবতারার মতো জ্বল জ্বল করছে। **তবে ইবনে হিশাম এই গ্রন্থে অযাচাইকৃত কিছু তথ্যের অন্তর্ভুক্তি নির্দেশ করেন; যেগুলো সমীক্ষণবাদী ঐতিহাসিকরা গ্রহণ করেননি।**

৩. দ্বিতীয় সীরাত গ্রন্থ ইবনে হিশামের বিখ্যাত 'সীরাতুন্নবী (দ.)': সীরাত গ্রন্থ প্রণীত হবার সময় মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি। হাতে লিখে কপি করা হতো। সংরক্ষণ করা ছিল অতি কঠিন। যে কারণে মুদ্রণ যন্ত্র আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম মনীষীদের অনেক সৃষ্টি মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেছে। ইবনে ইসহাকের "সীরাতে রসূলুল্লাহর" চারটি অনুলিপি করা হয়েছিল, যার মধ্যে দুটো করেছিলেন তাঁর ছাত্র আল-বাক্কাই। এরই একটি সম্পাদনা করেন ইবনে হিশাম (ইন্তি. ২১৮ হিজরী)। তিনি এই বিশাল গ্রন্থের কলেবর হ্রাসের উদ্দেশ্যে কোথাও পাঠ সংক্ষেপ করেছেন, আবার কোথাও বা বিশ্লেষণ কিম্বা নতুন প্রামাণ্য তথ্য সংযোজন করেছেন। যে সব স্থানে তিনি সংক্ষেপ করেছেন সেখানে তা উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন যে, নবী জীবনের সাথে সরাসরি সম্পর্কহীন কিছু কিছু বিবরণ তিনি সংক্ষেপ করেছেন। সীরাতুন্নবী (দ.) চার খণ্ডে সম্পন্ন একটা বিশাল গ্রন্থ।

৪. ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের 'সীরাত' গ্রন্থের ইংরেজী ও বাংলা অনুবাদঃ ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থের প্রথম ইংরেজী অনুবাদ হয় মাত্র ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে। অনুবাদ করেন বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ প্রফেসর এ. গীলাউম (A. Guillaume) এবং প্রকাশিত হয় লন্ডন থেকে। এই ইংরেজী অনুবাদের অনুসরণে বাংলা অনুবাদ করেন শহীদ আখন্দ, যা ১৯৮৭ সনে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত হয়।

ইবনে হিশামের সীরাত বাংলা অনুবাদ প্রকাশ হাতে নেওয়া হয় ১৯৯০-এর দশকের গোড়ার দিকে। চার খণ্ডের এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় আগস্ট ১৯৯৪ সনে, দ্বিতীয় খণ্ড ডিসেম্বর ১৯৯৪ সনে, তৃতীয় খণ্ড জুন ১৯৯৫ সনে এবং চতুর্থ খণ্ড জুন ১৯৯৬ সনে। চারজন বিজ্ঞ আলেম এবং পাঁচজন বিদ্বজ্জনের এক সম্পাদনা পরিষদ এই মূল্যবান গ্রন্থের যথাক্রমে অনুবাদ ও সম্পাদনা করেন। উল্লেখ করা দরকার, ইবনে ইসহাকের 'সীরাতে রাসূলুল্লাহ্ (দ.) প্রণীত হয় আব্বাসীয় শাসক আল- মামুনের সময়কালে (৮১৩-৮৩৩ খ্রিস্টাব্দ)

৫. বাংলা ভাষায় মূল সীরাত গ্রন্থ অনুবাদে বিলম্ব অপূরণীয় ক্ষতিঃ উপরোক্ত তথ্যাবলীতে দেখা যায় যে, বিশ্ববাসী ১৯৫৫ সনে ইবনে ইসহাকের সীরাত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদের পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে অবহিত ছিলেন না। বাংলা ভাষায় ১৯৫০ এর পূর্ব পর্যন্ত একাধিক নবী জীবনী প্রকাশিত হলেও ইবনে ইসহাক ও ইবনে হিশামের সীরাত গ্রন্থদ্বয়ের পূর্ণাঙ্গ বঙ্গানুবাদ লাভের সৌভাগ্য বাংলা ভাষাভাষীদের হয়নি। বাংলাভাষীরা প্রায় ১০০০ বছর পর এই দুই মূল্যবান গ্রন্থের সাথে সম্যক পরিচিত হন। অথচ পূর্বে অনূদিত হলে বাংলাভাষী মুসলিম সমাজসহ অন্যান্যরা সবাই জ্ঞান ও ইতিহাসের ক্ষেত্রে বিপুলভাবে উপকৃত হতেন।

৬. ঐতিহাসিক মদীনা সনদের বিবরণঃ মানব সমাজের ইতিহাসে প্রথম লিখিত সংবিধান 'মদীনা সনদ' প্রথমে লিপিবদ্ধ হয় ইবনে হিশামের সীরাতুন্নবী (দ.) গ্রন্থে। বিখ্যাত প্রাচ্যবিদ ও ইসলাম বিষয়ক বিশেষজ্ঞ গবেষক প্রফেসর ডব্লু মন্টগোমারী ওয়াট ১৯৫৬ সনে তাঁর সুবিখ্যাত 'মুহাম্মদ এ্যাট মদীনা' (W. Montgomery Watt : Muhammad at Medina) গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই সনদের ধারাওয়ারী ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইতোপূর্বে প্রফেসর এ. গীলাউম তাঁর ইংরেজী অনুবাদে (ইবনে ইসহাকের সীরাত) এই সনদের বিবরণ একটি পূর্ণ অনুচ্ছেদে পরিবেশন করেন। ইবনে হিশামের সীরাতুন্নবী (দ.) বঙ্গানুবাদ গ্রন্থে এই মহান সংবিধানের ধারাওয়ারী আরবীর পাশাপাশি বাংলা অনুবাদ মুদ্রিত হয়েছে। ডব্লু মন্টগোমারী ওয়াটের উপরোক্ত গ্রন্থে মদীনা সনদের পূর্ণাঙ্গ ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের পর মাত্র বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্ববাসী এ বিষয়ে সম্যক অবহিত হন। মুসলিম সমাজের এই বদনসীবের কোন জবাব আছে কি?

ইতোপূর্বে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত মোবিনুদ্দিন খান জাহাঁগীর নগরীর 'নবী শ্রেষ্ঠ' (প্রথম সংস্করণ, ১৯২৫), মাওলানা আকরাম খাঁ-র 'মোস্তফা চরিত' (প্রথম সংস্করণ, ১৯৩৪ইং), কবি গোলাম মোস্তফার 'বিশ্বনবী' (প্রথম সংস্করণ, ১৯৪২ইং), কাজী আবদুল ওদুদের 'হযরত মুহাম্মদ ও ইসলাম' (১৯৬৬ ইং) আল্লামা শিবলী নোমানীর সীরাতুন্নবী (দ.) (বঙ্গানুবাদ ১৩৯৪হি/১৯৭৩ ইং), কাজী মুহাম্মদ সুলাইমান মনসুরপুরীর রহমতুল্লিল আলামিন (বঙ্গানুবাদ: ১৯৯৭ ইং) প্রভৃতি গ্রন্থে মদীনা সনদের অতি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশিত হয়। প্রথম তিনজন গ্রন্থকার অবশ্য 'দৌলতুম্ মদীনা' বা 'মদীনা সাধারণতন্ত্র' এবং এই সনদকে একটা 'আন্তর্জাতিক সনদ' এবং স্থায়ী শান্তি স্থাপনের উদ্যোগ হিসেবে অভিহিত করে এই সনদের মহিমাময় রূপ তুলে ধরার চেষ্টা করলেও পূর্ণ বিবরণীর উপযোগিতা এতে মিটে নি। অবশ্য ইংরেজী ভাষায় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে এযাবৎ অমুসলিম-মুসলিম নির্বিশেষে প্রথিতযশা ইতিহাসবেত্তারা নবীজীবনের উত্তরোত্তর নবতর বহুমুখী ভাষ্য রচনা করে মানব জাতির জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলেছেন। অতএব, একথা বলা যায় যে, মদীনা সনদের পূর্ণ বিবরণী বাংলা ভাষায় প্রকাশ না পাওয়ায় বাঙ্গালী মুসলিম সমাজ তথা বাংলাভাষী জনগণ এই সনদের শিক্ষাজাত উপকারিতা থেকে বঞ্চিত থেকেছেন।

৭. মদীনা সনদের চর্চা মুসলিম জাহানে ধামাচাপা পড়ে থাকার কারণ: মদীনা সনদের মাধ্যমে বিশ্বে রবুবিয়াত বা পালনবাদী মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নবীজী প্রণীত উদ্যোগ বহুবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে থাকে। তাঁর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষরা সংকীর্ণ স্বার্থবশতঃ এই শাসনতন্ত্রের বাস্তবায়নে ব্যত্যয় সৃষ্টিতে ব্যস্ত থাকে। খোলাফায়ে রাশেদার মধ্যে শেষোক্ত দুই খলিফার সময়ে তৎকালীন গোত্রীয় দ্বন্দ্বজাত ক্ষমতার দ্বন্দ্বে আদর্শিক নীতিমালা বাস্তবায়নের সড়ক ক্ষত-বিক্ষত হয়। আমীর মুয়াবিয়ার সময়ে বায়তুল মালকে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে ইসলামের অর্থনৈতিক কল্যাণমুখী কার্যক্রম স্তব্ধ হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে উমাইয়া, আব্বাসীয় এবং তৎপরবর্তী সব মুসলিম শাসনই রাজতান্ত্রিক, স্বৈরতান্ত্রিক, বংশগত পারিবারিক। এতে 'দৌলতুম্ মদীনা' সাধারণতান্ত্রিক (Republic) চেতনা ছিল সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। নৈর্ব্যক্তিক ঐতিহাসিকদের কথা বাদ দিলেও প্রখ্যাত মুসলিম ঐতিহাসিকদের ভাষ্য এই যে, উমাইয়া শাসন থেকে শুরু করে কোন রাজতান্ত্রিক পরিবারতান্ত্রিক শাসনই উম্মাহ বা জাতি গঠন তথা বহুজাতিক রাষ্ট্রগঠনের 'মদীনা সনদের' ফর্মূলা মেনে নেননি, যদিও নিজেদের ক্ষমতার প্রয়োজনে তারা খণ্ডিতভাবে ইসলামের অনেক আদর্শ অনুসরণে বাধ্য হয়েছেন।

এতে কেবল মুসলিম সমাজ নয়, সমগ্র বিশ্ববাসী শান্তির আলোকধারা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উগ্র শোষণমূলক জাতীয়তাবাদের

হিংস্রতায় বিক্ষত সময়ে মানবতাবাদীরা যখন 'মানবিক আন্তর্জাতিকতাবাদ' অন্বেষণে তৎপর ছিলেন, তখন ইংরেজী ভাষায় ইবনে ইসহাকের সীরাতের অনুবাদ এবং মদীনা সনদের অনুবাদের মাধ্যমে তারা যেন নতুন দিশা লাভ করেন এবং এসময় থেকে মদীনা সনদের অন্তর্নিহিত উদার বৈভব ও সম্ভাবনা নিয়ে বিশ্বময় ব্যাপক আলোচনা ও গবেষণা চলছে।

৮. মদীনা সনদে কতিপয় কালোত্তর বৈশিষ্ট্য ও সর্বজনীনতা: মদীনা সনদের বহু বিস্তৃত কল্যাণময় শিরা-উপশিরার কার্যকর অস্তিত্ব নজরে পড়লে সত্যিই বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। নিম্নে এই সনদের কতিপয় বিশ্ব-মানবিক, ব্যক্তি-মানবিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য লিপিবদ্ধ করা হলো:

ক. সমাজে শান্তি স্থাপনকারী ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা: মদীনা সনদের সামাজিক ও রাষ্ট্রিক নীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে, কুরআনের এই আয়াতই যেন উদ্ভাসিত: 'লা-তাযলিমুনা ওয়ালা তুযলামুন' (তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না) (২:২৭৯)। এ আয়াত এতই সরল ও স্ব-ব্যাখ্যাত যে, কোন প্রকার আলোচনার অপেক্ষা রাখে না।

খ. বিশ্বে প্রথম বহুত্ববাদী প্রজাতান্ত্রিক জাতি-রাষ্ট্র দৌলতুম্ মদীনা (Pluralistic Republic Nation - state): নবীজীর (দ.) দৌলতুম্ মদীনা বিশ্বে প্রথম বহুত্ববাদী প্রজাতান্ত্রিক জাতি-রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের নাম 'দৌলতুম্ মদীনা'। এই রাষ্ট্রের একটা সীমানা, নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, জনসংখ্যা, লিখিত সংবিধান, নাগরিকদের স্বীকৃত একটা সরকার বা প্রশাসন যন্ত্র এবং একটা সেনাবাহিনী ছিল। রাষ্ট্রভুক্ত ধর্ম-গোত্র-বর্ণ-বিশ্বাস-লিঙ্গ নির্বিশেষে সবাই এই রাষ্ট্রের সংবিধান তথা রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শর্তে সমান অধিকারভোগী। মুক্ত কিম্বা 'দাস' সবাই ছিলেন একই সমতলে। গ্রীক নগর রাষ্ট্র কিম্বা প্লেটোর রিপাবলিকে দাসদের কোন স্বাধীন নাগরিক সত্তা ছিল না। এই বিবেচনায় মদীনা রাষ্ট্র চির আধুনিক ও মানবতাবাদী রাষ্ট্রের প্রতীক হিসেবে বিরাজ করছে। মদীনা সংবিধানের মর্মবাণী পরম মানবতাবাদী ও পালনবাদী। এই রাষ্ট্র মানবজাতির মধ্যে পার্থিব বিষয়ে ভেদাভেদহীন প্রথম রাষ্ট্র, যেখানে সবার ধর্ম, বিশ্বাস, আচার, সংস্কৃতি, ভাষা প্রভৃতি আটপৌরে জাগতিক বিষয়ের সমমর্যাদা ও অনুসরণের স্বাধীনতা লিখিত সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত।

গ. পালনবাদী (রবুবিয়াত) মানবিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন: মদীনায় হিজরতের অব্যবহিত পর মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে অদৃশ্যপূর্ব ভ্রাতৃবন্ধন এবং পরবর্তী পর্যায়ে মদীনা সনদের মাধ্যমে ধর্ম-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিকের মধ্যে সমতাভিত্তিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সাফল্য নবীজীর (দ.) সুউচ্চ নৈতিক ও সাংগঠনিক প্রভাবের পরিচায়ক এবং তা সর্বমানবিক পালনবাদী সমাজ-ব্যবস্থার পথে প্রথম সফল বৈপ্লবিক

পদক্ষেপ। উল্লেখ্য, 'কমিউনিস্ট ইশতেহারের' অন্যতম প্রণেতা ফ্রিডারিক এঙ্গেলস ১৮৫৩ সালের ১৬ মে কার্ল মার্কসকে লিখিত এক পত্রে হযরত মুহাম্মদের (দ.) ধর্মসংগ্রামকে 'বিপ্লব' বলে মন্তব্য করেছিলেন।

ঘ. মদীনা সনদ Fanaticism-এর প্রতিষেধক: চলমান একবিংশ শতাব্দী (২০২০) ও বিগত শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে পৃথিবী বিভিন্ন ধর্মীয় উগ্রতার হিংস্র নখরে ক্ষতবিক্ষত। এই উগ্রতা হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সকল ধর্মাবলম্বীর একটা ভগ্নাংশের মধ্যে দৃশ্যমান। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিয়ানমার, চীনের অংশ বিশেষ, মধ্যপ্রাচ্যের অংশ বিশেষে এই অনাকাঙ্ক্ষিত উগ্রতা লক্ষ্য করা যায়, যা বর্তমান বিশ্বের বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও মানবিক চেতনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অথচ আজ থেকে ঠিক ১৩৯১ বছর পূর্বে নবীজী (দ.) প্রণীত মদীনা সনদ Fanaticism-এর মূলে কুঠারাঘাত করেছে। এই সনদ এমন এক প্রারম্ভিক রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক আচরণবিধি, যাতে কোন মানুষ নিজেকে sectarian না ভাবে, কিম্বা কেউ communal inferiority অথবা superiority complex-এ না ভোগে। কারণ, এ ধরনের কোন complex বা বিভিন্নতা থাকলে সমাজে সমতা ও সৌহার্দ প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং রাষ্ট্রের ভিত মজবুত হবে না। মদীনা সনদ বিচার-সাম্য (আদল), সার্বজনীন পালনবাদের নীতিকে সমুচ্চ রাখে, যার শেকড় তৌহিদের গভীরে প্রোথিত, যে তৌহিদের অন্যতম সোনালী ফসল মানব জাতি ও মানব মণ্ডলীর একতা ও ঐক্য।

ঙ. মদীনা সনদ Federation of Faiths: মদীনা সনদ কেবল বিভিন্ন গোত্র, জাতি গোষ্ঠী, নৃ-গোষ্ঠীর ফেডারেশন বা সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্রসংঘ নয়; বিভিন্ন ধর্ম বিশ্বাসেরও (Faiths) সন্ধিবদ্ধ সংঘের দলিল বটে। এই সনদের বিভিন্ন ধারায় তা সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৯২০ এর দশকে তৎকালীন ভারতের সংঘাতময় রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিখ্যাত খিলাফত-অসহযোগ আন্দোলনের নেতা মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর সাম্প্রদায়িক সমস্যাবলী সমাধানের ভিত্তি হিসেবে 'ফেডারেশন অব ফেইথ' নামে একটা নয়া সিনথেসিস বা সংশ্লেষণ সৃজনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, যার উৎসমূল ছিল মদীনা সনদ।

চ. বিশ্ব মানবিক আন্তর্জাতিকতাবাদ: যন্ত্রশিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপে সঙ্কীর্ণ পুঁজিবাদী জাতীয়তাবাদের বর্জ্য হিসেবে যখন বিপুল শোষিত শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে, তার সুদূরপ্রসারী আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় কমিউনিজম-সোস্যালিজমের আবির্ভাব ঘটে। পৃথিবী সাম্রাজ্যবাদী-উপনিবেশবাদী শোষক ভুবন আর বিপুল শোষিত ভুবনে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এটা আন্তর্জাতিক বিশ্ববীক্ষা Marxist world-vision হিসেবে পরিচিত। অথচ এর প্রায় ১২০০ বছর পূর্বেই নবীজী (দ.) বিশ্বমানবিক

আন্তর্জাতিকতাবাদের তত্ত্ব দিয়েই ক্ষান্ত হননি, তা সফলভাবে প্রয়োগও করেছেন। সীমিত ক্ষেত্রে জাতিগত ও আনুষঙ্গিক পরিচিতির প্রয়োজনীয়তার কথা নবীজী (দ.) যেমন অস্বীকার করেননি, তেমনি অন্যপক্ষে বিশ্বমানবিক ঐক্য ভিত্তিক আন্তর্জাতিকতাবাদের আবশ্যকীয়তা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করেন, "He is not one of us who proclaims the cause of nationalism and he is not one of us who fights for the cause of nationalism and he is not one of us who dies in the cause of nationalism. Nationalism means helping your people in an unjust cause (Source: Muhammad for Beginners; Ziauddin A Malek, 1994. UK; Australia.)

মদীনা সনদটাই যেন মানবিক আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রচারপত্র। একবিংশ শতাব্দীর আঙ্গিনায় বসে মদীনা সনদের কতিপয় মৌলিক বৈশিষ্ট্য এভাবে তালিকাবদ্ধ করা যায়: ১. মদীনা সনদই সর্বপ্রথম অপরাপর ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মপ্রচারকদেরকে প্রতিপক্ষ হিসেবে ধরে না নিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, ২. ধর্ম বিশ্বাস নয়, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের শর্তে বহুমানবিক-জাতিক রাষ্ট্র ও সমাজ গঠনের ভিত্তি এই সনদে উপ্ত, ৩. ধর্ম-বিশ্বাস ও আচার যার যার, রাষ্ট্র সবার – এ নীতির সর্ব প্রথম উদ্ভাস ঘটে মদীনা সনদে; ৪. এই সনদে কুরআনের রূপরেখা অনুযায়ী মানুষকে কেবল ধর্ম বিশ্বাসের আলোকে অবলোকন করা হয় নি, বরং একজন সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীব হিসেবে মূল্যায়ন করা হয়েছে, ৫. নবীজী (দ.) ধর্মীয় বিশ্বাসের মাথায় মানবতাবাদ, বিশ্বপ্রেম ও বিশ্বসাম্যের মুকুট পরিয়ে দিয়েছেন, ৬. কুরআন জাগতিক, সাংসারিক, পারিবারিক ব্যবস্থাপনার শৃঙ্খলার স্বার্থে যেমন প্রত্যেক ক্ষেত্রে পদমর্যাদা Rank-এর আবশ্যকীয়তার ফর্মূলার পাশাপাশি সকলের সাংসারিক, জৈবিক, পার্থিব চাহিদা পূরণে বিচারসাম্য এবং শান্তি ও মমতাপূর্ণ মানবিক বন্ধনের ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করেছে।

২০১৫ সালের আগস্ট/সেপ্টেম্বর মাসেও আব্রাহাম লিঙ্কনের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট বারাক এইচ. ওবামা প্রশাসনের সময়েও চলেছে রক্তক্ষয়ী বর্ণবাদী হাঙ্গামা। ২০২০ সালে ঘটেছে Black Lives Matter আন্দোলন, যা বর্ণবাদ, দাসপ্রথা ও ঔপনিবেশিকতা বিরোধী মহাবিস্ফোরণ বটে এবং থামবার নয়। বৃটেন-ফ্রান্সের মতো দেশও এই অভিশাপ থেকে মুক্ত নয়। অথচ সেই যে সপ্তম শতাব্দীর শুরুতেই নবীজী (দ.) মুসলিম সমাজে বর্ণবাদের যে চির বিলোপ সাধন করেছিলেন, তা এখনো বহাল আছে। ১৪-০৮-২০১৫ ইং তারিখে কিউবার বিপ্লবী নেতা ফিদেল ক্যাস্ট্রো এ সময়ের বিভেদ-সহিংসতায় বিক্ষত মানস নিয়েও তাঁর দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আশাবাদ প্রকাশ করেছেন এই বলে যে, 'গায়ের রং ও জাতীয়তাকে পাত্তা দিয়ে

আমরা কখনো শান্তি ও কল্যাণের জন্য আমাদের লড়াই বন্ধ করবো না।" বলা বাহুল্য, নবীজী সেই ৬২৪ খ্রিস্টাব্দেই মদীনা সনদের মাধ্যমে এই মহান সংগ্রামের সূচনা করে গেছেন সফল ও গতিশীল ভাবে। অথচ ২০২০ সালেও আধুনিক শিক্ষিত ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকার কোন কোন স্থানে বর্ণবাদী ও ধর্মীয় বিদ্বেষের অনাকাঙ্ক্ষিত বহিঃপ্রকাশ ঘটছে, যা মানবতার জন্য গ্লানিকর ও লজ্জাজনক।

সামগ্রিক বিবেচনায় মদীনা সনদঃ জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-ভাষা-সংস্কৃতি নির্বিশেষে বহুত্ববাদী বহুজাতিক রাষ্ট্র ও মানবিক সমাজ নির্মাণের শাশ্বত ফর্মূলা হিসেবে মানব সমাজ ও রাজনীতির আকাশে ধ্রুবতারা হয়ে আছে।

মদীনা সনদসহ সমকালীন এসব চুক্তির ক্ষেত্রে একটা বিষয় সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্যণীয় যে, নবীজী (দ.) **আল্লাহ্‌র মহান রসূল ও নবী হিসেবেই এসব চুক্তি সম্পাদন করেন**। সামাজিক কিম্বা রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবে নয়। এর সাদামাটা অর্থ এই যে, তিনি 'রহমতুল্লিল আলামীন' হিসেবে এক্ষেত্রে প্রকাশিত ও উপস্থাপিত।

[মদীনা সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের পূর্ণ বিবরণী পরবর্তী পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হলোঃ ক. সীরাত ইবনে হিশাম (র.)-এর সীরাতুন্নবী (সা.) দ্বিতীয় খণ্ড থেকে মূল আরবী ও পাশাপাশি বাংলা অনুবাদ (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত ১৯৯৪), খ. W. Montgomery Watt-এর Muhammad at Medina গ্রন্থে মুদ্রিত ইংরেজী অনুবাদ।]

ক. সীরাত ইবনে হিশাম থেকে উদ্ধৃতিঃ

ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে একটি চুক্তিপত্র লিখে দেন এবং এতে ইয়াহুদীদেরকেও এ চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ চুক্তিতে তাদের ধর্ম এবং ধন-সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তাদের অধিকারসমূহের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় এবং তাদের উপর কতিপয় শর্ত শরায়েতও আরোপ করা হয়। চুক্তি পত্রটি ছিল এরূপ ঃ

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহর নামে

بسم الله الرّحمن الرحيم

এটা হচ্ছে নবী মুহাম্মদ (সা.)-এর পক্ষ থেকে লিপি। কুরায়শ ও ইয়াছরিবের মু'মিন ও মুসলমানদের মধ্যে এবং যারা তাদের অধীন, তাদের সাথে শামিল হবে বা তাদের সাথে জিহাদে মিলেমিশে কাজ করবে।

هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مُّحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ -

১. অন্যদের মুকাবিলায় তারা এক উম্মত বলে গণ্য হবে।

١ . انهم امة واحدة من دون الناس

২. কুরায়শের মুহাজিরগণ পূর্ব প্রথানুযায়ী রক্তপণ আদায় করবে। এবং তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করে তাদের মুক্ত করবে। যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

٢. المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون - بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

৩. এবং বনূ আওফের লোকেরা (আনসারগণ) পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক পক্ষ তাদের বন্দীদেরকে বন্দীপণ পরিশোধ করে মুক্ত করবে যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

٣. وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى . وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

৪. আর বনূ সাঈদা তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং

٤. وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون

معاقلهم الاولى . وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

٥. وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى و كل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

৫. বনূ হারিছ তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

٦. وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين

৬. বনূ জুশাম তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে- যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ এবং ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

٧. وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى . وكل طائفة منهم تفدى عانيتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

৭. বনূ নাজ্জার তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের নিজেদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

٨. وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى . وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

৮. বনূ আমর ইব্‌ন আওফ তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় নিজ নিজ বন্দীদের বন্দীপণ পরিশোধ করবে-যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

٩. وبنوا النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

৯. বনূ নাবীত তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী রক্তপণ পরিশোধ করবে এবং প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে যাতে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

١٠. وبنو الاوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولى وكل طائفة منهم تفدى عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين -

১০. বনূ আওস তাদের পূর্ব প্রথানুযায়ী তাদের রক্তপণসমূহ পরিশোধ করবে এবং তাদের প্রত্যেক সম্প্রদায় তাদের বন্দীদের মুক্তিপণ পরিশোধ করবে– যাতে করে বিশ্বাসীদের মধ্যকার পারস্পরিক আচরণ ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ হয়।

١١. وان المومنين لايتركون مفرحا بينهم أن يعطوه بالمعروف فى فداء او عقل -

১১. আর বিশ্বাসীদেরকে নিঃস্ব অভাব গ্রস্তরূপে ছেড়ে দেয়া হবে না– যাতে করে তারা ন্যায়ানুগভাবে মুক্তিপণ ও রক্তপণ পরিশোধ করতে পারে।

ইব্‌ন হিশাম বলেন ঃ المفرح বলে ঋণভারে জর্জরিত এবং পরিবারের লোকসংখ্যার জন্যে অভাবে নুয়ে পড়া লোককে।

কবি বলেন ঃ

اِذَا اَنْتَ لَمْ تَبْرَحْ تُؤَدِّى اَمَانَةً ٭ وَتَحْمِلُ اُخْرَى افْرَحَتْكَ الْوَدَائِعُ

অর্থাৎ যখন তুমি সর্বদা আমানত আদায় করতে থাকবে এবং আরো আমানতের দায়িত্ব কাঁধে নিবে, তখন আমানতসমূহের দায়িত্ব তোমার কাঁধকে নুইয়ে দিবে।

١٢. وان لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه -

১২. কোন মু'মিন ব্যক্তি অন্য চুক্তি মু'মিন ভাইয়ের অনুমতি না নিয়ে অন্য কারো সাথে চুক্তিবদ্ধ হবেনা।

١٣. وأن المؤمنين المتقين على من بغى منهم او ابتغى دسيعة ظلم او اثم او عدوان او فساد بين المؤمنين - وان ايديهم عليه جميعا ولو كان ولو احدهم -

১৩. খোদাভীরু মু'মিনরা ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে থাকবে, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি অন্যায় করবে বা গুরুতর অবিচার, পাপ, সীমালংঘন বা মুসলমানদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে তৎপর হবে। তাদের সকলের সমবেত হস্ত তার বিরুদ্ধে উত্থিত হবে–যদিও তাদের সে কারো আপন পুত্রও হয়।

١٤. ولا يقتل مؤمن مؤمنا فى كافر ولاينصر كافرا على مؤمن -

১৪. কোন মু'মিন ব্যক্তি কোন কাফিরের জন্যে কোন মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যা করবে না বা কোন মু'মিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন কাফিরকে সাহায্য করবে না।

١٥. وان ذمة الله واحدة يجير عليهم ادناهم - وان المؤمنين بعضهم موالى بعض دون الناس -

১৫. নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিষ্ঠা বা অভয় অভিন্ন। তাদের যে কোন সাধারণ ব্যক্তি কাউকে অভয় দিয়ে সকলকে সে চুক্তির মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বে আবদ্ধ করতে পারবে। আর মু'মিনগণ অন্যান্য লোকদের মুকাবিলায় পরস্পর ভাই ভাই।

١٦. وانه من تبعنا من يهود فان له النصر والاسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم -

১৬. আর ইয়াহুদীদের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাদের আনুগত্য করবে, সেও সাহায্য ও সমতার হকদার বলে গণ্য হবে, তাদের প্রতি জুলুমও হবে না আর তাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করাও চলবে না।

١٧. وان سلم المؤمنين واحدة لايسالم مؤمن دون مؤمن فى قتال فى سبيل الله الا على سواء وعدل بينهم -

১৭. আর মুসলমানদের সন্ধিও অভিন্ন সন্ধি। আল্লাহর রাহে যুদ্ধে কোন মু'মিন ব্যক্তি অপর কোন মু'মিন ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে শত্রুর সাথে সন্ধি করবে না– যাবত না এ সন্ধি সকলের জন্যে সমান ও ন্যায়ানুগ হবে।

١٨. وان كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضاً -

১৮. এবং আমাদের পক্ষের শক্তিরূপে যারা আমাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করবে তাদের একে অপরের পিছনে থাকবে।

١٩. وان المؤمنين يبئ بعضهم عن بعض بما نال دمائهم فى سبيل الله -

১৯. আর ঈমানদারগণ আল্লাহর রাহে মরা তাদের একের রক্তের বদলা অপরে নেবে।

٢٠. وان المؤمنين المتقين على احسن هدى واقومه -

২০. আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মু'মিন মুত্তাকিগণ–সব চাইতে সহজসরল ও সঠিক পথে রয়েছে।

٢١. وانه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولايحول دونه على مؤمن -

২১. আর কোন মুশরিক বা পৌত্তলিক ব্যক্তি কোন কুরায়শের সম্পদ বা প্রাণের আশ্রয়দাতা হবে না এবং কোন মু'মিন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে বাধা দিতে পারবে না।

٢٢. وانه من اعتبط مؤمنا قتلا عن

২২. আর যে ব্যক্তি কোন মু'মিন ব্যক্তিকে

بينة فانه قود به الا ان يرضى ولى المقتول وان المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم الا قيام عليه –

হত্যা করবে আর সাক্ষ্য-প্রমাণে তা প্রমাণিতও হয়ে যাবে, তার উপর থেকে কিসাস গ্রহণ করা হবে– হত্যার বদলে তাকে হত্যা করা হবে। হাঁ, যদি নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী রক্তপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিতে রাযী হয় আর সমস্ত মু'মিনদের তাতে সায় থাকে, তাহলে স্বতন্ত্র কথা। এ ছাড়া তার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই। (অর্থাৎ এটা অবশ্যকরণীয়।)

٢٣. وانه لا يحل لمؤمن اقر بما فى هذه الصحيفة وامن بالله واليوم الاخر ان ينصر محدثا ولا يؤويه –

২৩. আর যে মু'মিন ব্যক্তি এই লিপির বক্তব্য স্বীকার করে নিয়েছে। আর সে আল্লাহ্ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস পোষণ করে, তার জন্যে কোন নতুন ফিতনা সৃষ্টিকারীকে সাহায্য করা বা তাকে আশ্রয় দান বৈধ হবে না।

وانه من نصره او اواه فان عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولاعدل –

যে ব্যক্তি তাকে সাহায্য করবে বা আশ্রয় দিবে তার প্রতি আল্লাহ্র লা'নত ও গযব হবে কিয়ামতের দিনে এবং তার থেকে কোন ফিদিয়া (মুক্তিপণ) বা বদলা গ্রহণ করা হবে না।

٢٤. وانكم مهما اختلفتم فيه من شئ فان مرده الى الله عز وجل والى محمد صلى الله عليه وسلم –

২৪. আর যখন তোমাদের মধ্যে কোন বিরোধ উপস্থিত হবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও মুহাম্মদ (সা.)-এর নিকট তা উত্থাপন করতে হবে।

٢٥. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين –

২৫. আর ইয়াহুদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিমগণের সঙ্গে মিলেমিশে যুদ্ধ করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা যুদ্ধের ব্যয়ও নির্বাহ করবে।

٢٦. وان يهود بنى عوف امة مع المؤمنين اليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وانفسهم الامن ظلم اثم فانه

২৬. বনূ আওফের ইয়াহুদীরা মু'মিনদের সাথে একই উম্মতরূপে গণ্য হবে। ইয়াহুদীদের জন্যে তাদের ধর্ম, মুসলমানদের জন্যে তাদের ধর্ম, তাদের

لا يوتغ الا نفسه و اهل بيته –

গোলামদের এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে একথা প্রযোজ্য হবে। তবে যে ব্যক্তি জুলুম বা অপরাধ করবে, সে তার নিজকে ও নিজ গৃহবাসীদেরকে ছাড়া অন্য কাউকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

٢٧. وان ليهود بنى النجار مثل ماليهود بنى عوف –

২৭. এবং বনূ নাজ্জার গোত্রের ইয়াহুদীরাও বনূ আওফের ইয়াহুদীদের মত অধিকার পাবে।

٢٨. وان ليهود بنى الحارث مثل ما ليهود بنى عوف –

২৮. বনূ হারিছের ইয়াহুদীরাও বনূ আওফের ইয়াহুদীদের মত অধিকার লাভ করবে।

٢٩. وان يهود بنى ساعدة مثل ما يهود بنى عوف –

২৯. বনূ সাঈদা গোত্রের ইয়াহুদীরাও বনূ আওফের ইয়াহুদীদের সমান অধিকার পাবে।

٣٠. وان يهود بنى جشم مثل ما يهود بنى عوف –

৩০. বনূ জুশামের ইয়াহুদীদের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহুদীদের মত অধিকার থাকবে।

٣١. وان ليهود بنى الاوس مثل ما ليهود بنى عوف –

৩১. এবং বনূ আওফের ইয়াহুদীদের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহুদীদের মত অধিকার থাকবে।

٣٢. وان ليهود بنى ثعلبة مثل ما ليهود بنى عوف الا من ظلم او اثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته –

৩২. বনূ ছা'লাবার ইয়াহুদীদের জন্যে বনূ আওফের ইয়াহুদীদের মত অধিকার থাকবে। তবে যে যুলুম বা অপরাধ করবে– কেননা সে তার নিজকে ও নিজ পরিবারকে ধ্বংস করবে।

٣٣. وان جفنة بطن من ثعلبة كانفسهم –

৩৩. আর নিঃসন্দেহে জাফনা গোত্রও ছা'লাবার শাখা–গোত্র, সুতরাং তারাও তাদের অর্থাৎ ছা'লাবাদের মত অধিকার ভোগ করবে।

٣٤. وان لبنى الشطيبة مثل ما ليهود بنى عوف وان البر دون الاثم –

৩৪. আর বনূ শুতায়বার লোকজনের জন্যেও বনূ আওফের ইয়াহুদীদের মত অধিকার থাকবে– বিশ্বস্ততায়, বিশ্বাস ভঙ্গে নয়।

٣٥. وان موالى ثعلبة كانفسهم –

৩৫. আর ছা'লাবাদের মাওয়ালীরাও তাদেরই মত অধিকার লাভ করবে।

٣٦. وان بطانة يهود كانفسهم –

৩৬. এবং ইয়াহুদী শাখাগোত্রগুলোও তাদের মূল গোত্রের লোকদের সমান অধিকার লাভ করবে।

٣٧. وانه لا يخرج منهم احد الا باذن محمد صلى الله عليه وسلم –

৩৭. তাদের মধ্যকার কেউই মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুমতি ব্যতিরেকে যুদ্ধার্থে বহির্গত হবে না।

٣٨. وانه لا ينحجز على ثار جرح وانه من فتك فبنفسه فتك واهل بيته الامن ظلم وان الله على ابر هذا –

৩৮. এবং যখমের প্রতিশোধ গ্রহণের পথে কোন বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করা হবে না। যে ব্যক্তি রক্তপাত করবে সে নিজে ও নিজ পরিজনদের জন্য ধ্বংস ডেকে আনবে। অবশ্য, যে অত্যাচারিত হয়েছে এবং (সে হিসাবে) আল্লাহ্র আনুকূল্য পাবে (তার কথা স্বতন্ত্র)।

٣٩. وان على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم –

৩৯. ইয়াহুদীদের উপর তাদের নিজেদের ব্যয় ভার বর্তাবে এবং মুসলিমগণের উপর তাদের নিজেদের ব্যয়ভার বর্তাবে।

٤٠. وان بينهم النصر على امن حارب اهل هذه الصحيفة وان بينهم النصح والنصيحة والبر دون الاثم –

৪০. যে কেউ এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী কোন পক্ষের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করবে তার বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে। এবং তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ ও মঙ্গল কামনার সম্পর্ক থাকবে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে সুপরামর্শ দেবে। বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে, বিশ্বাসভঙ্গ করবে না।

٤١. وانه لم يأثم امرؤ بحليفه وان النصر للمظلوم –

৪১. আর কোন পক্ষ তার মিত্রপক্ষের অপকর্মের জন্যে দায়ী হবে না আর অত্যাচারিতই সাহায্যের হকদার বলে গণ্য হবে।

٤٢. وان اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين –

৪২. আর ইয়াহুদীরা যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বাসীদের সাথী ও সহযোদ্ধারূপে থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারাও যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহ করবে।

٤٣. وان يثرب حرام جوفها لاهل هذه الصحيفة –

৪৩. আর ইয়াছরিব উপত্যকা এই চুক্তিনামার সকল পক্ষের কাছে পবিত্র ভূমি বলে গণ্য হবে।

٤٤. وان الجار كالنفس غير مضار والا اثم –

৪৪. আর কোন পক্ষের অন্তিতরা আশ্রয়দাতার সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে– যে কোন ক্ষতিসাধন করবে না এবং অপরাধ করবে না।

٤٥. وانـــه لا تجار حرمة الابانذن اهلها .

৪৫. আর কোন মহিলাকে তার পরিবারের লোকজনের অনুমতি ব্যতিরেকে আশ্রয় দেয়া যাবে না।

٤٦. وانه ما كان بين هذه الصحيفة من حدث او استجار يخاف فساده فان مرده الى الله عزوجل والى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الله على اتقى ما فى هذه الصحيفة والبره –

৪৬. এই চুক্তিনামা গ্রহণকারী পক্ষসমূহের মধ্যে যদি এমন কোন নতুন সমস্যার বা বিরোধের উদ্ভব হয়– যা থেকে দাঙ্গা বেধে যাওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহলে তা আল্লাহ্ তা'আলা এবং আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মদ (সা.)–এর নিকট মীমাংসার্থে উথাপন করতে হবে। এ চুক্তিনামায় যা কিছু রয়েছে এর প্রতি সর্বাধিক নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততা আল্লাহ্র কাছে পসন্দনীয়।

٤٧. وانه لا تجار قريش ولا من تصرها –

৪৭. কোন কুরায়শকে বা তাদের সাহায্য–কারীকে আশ্রয় দেওয়া চলবে না।

٤٨. وان بينهم النصر على من دهم يثرب –

৪৮. আর চুক্তির সকল পক্ষ ইয়াছরিব আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য করবে।

٤٩. واذا دعوا الى صلح يصلحونه ويلبسونه فانهم يصالحونه ويلبسونه وانهم اذا دعوا الى مثل ذالك فانه لهم على المومنين الامن حارب فى الدين –

৪৯. যখন তাদেরকে সন্ধির জন্য আহবান জানানো হবে, তখন তারা সন্ধিবদ্ধ হবে। অনুরূপ যখন তারা সন্ধির জন্যে আহবান জানাবে তখন মু'মিনদেরকেও সন্ধির আহবানে সাড়া দিতে হবে। তবে, যদি কেউ ধর্মের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তার ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য হবে না।

৫০. প্রত্যেককে তার নিজের দিকের প্রতিরোধের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

٥٠. على كل اناس حصتهم من جانبهم الذى قبلهم -

৫১. আর আওসের ইয়াহুদীরা– তারা নিজেরা হোক বা তাদের মাওয়ালী হোক, এই চুক্তিতে শরীক পক্ষসমূহের সমান অধিকার লাভ করবে– এই চুক্তির পক্ষসমূহের সাথে সুসম্পর্কের ভিত্তিতে।

٥١. وان يهود الاوس مواليهم وانفسهم على مثل مالاهل هذه الصحيفة مع البر المحض من اهل هذه الصحيفة -

ইব্‌ন হিশাম বলেনঃ কেউ কেউ একথাটি বলতে গিয়ে برالمحض স্থলে برالمحسن শব্দ ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ এই চুক্তিতে শরীক পক্ষদের সাথে সুসম্পর্ক থাকলেই তারা এ অধিকার লাভ করবে। ইব্‌ন ইসহাক বলেন ঃ বিশ্বস্ততা বিশ্বাসঘাতকতা থেকে বিরত রাখবে। প্রত্যেকের অপকর্মের ফলাফল তার নিজের উপরই বর্তাবে। আর আল্লাহ্ তারই সহায় যে এ চুক্তিনামার শর্তাবলী পালনে পূর্ণ নিষ্ঠাবান।

৫২. আর এ চুক্তিনামা কোন অত্যাচারী বা অপরাধীর সহায়ক বিবেচিত হবে না। যে ব্যক্তি যুদ্ধে বের হবে এবং যে ব্যক্তি মদীনায় বসা থাকবে উভয়েই নিরাপত্তার হকদার বিবেচিত হবে অত্যাচারী এবং অপরাধী তার ব্যতিক্রম বলে গণ্য হবে।

٥٢. وانه لايحول هذا الكتاب دون ظلم او اثم وانه من خرج امن ومن قعد امن بالمدينة الامن ظلم واثم -

৫৩. আল্লাহ্ তার রাসূল মুহাম্মদ (সা.) ঐ ব্যক্তির স্বপক্ষে রয়েছেন, যে চুক্তিপালনে নিষ্ঠাবান ও আল্লাহ্‌কে ভয় করে।[১]

٥٣. وان الله جار لمن بر واتقى ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم -

---

১. আবূ উবায়দ তদীয় কিতাবুল আমওয়ালে এই চুক্তিপত্রকে জিযিয়া নির্ধারণের পূর্বের মুসলমানরা যখন দুর্বল ছিলেন তখনকার ব্যাপার বলে উল্লেখ করে লিখেছেন, এ চুক্তিনামা অনুযায়ী ইয়াহুদীরা তখন মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হয়ে গনীমত ও লাভ করতো।

VII

THE CHARACTER OF THE ISLAMIC STATE

1. THE CONSTITUTION OF MEDINA

IBN ISḤĀQ has preserved an ancient document commonly known as the 'Constitution of Medina'. Apart from the introductory words, however, he tells us nothing about it, neither how he came by it nor when and how it was brought into force. On the latter points he must be presumed ignorant; its place near the beginning of his account of the Medinan period is simply that called for by logic.

(a) *The text of the document*[1]

Ibn Isḥāq said: The Messenger of God (God bless and preserve him) wrote a writing (*kitāb*) between the Emigrants and the Anṣār, in which he made a treaty and covenant with the Jews, confirmed them in their religion and possessions, and gave them certain duties and rights:

In the name of God, the Merciful, the Compassionate!

This is a writing of Muḥammad the prophet between the believers and Muslims of Quraysh and Yathrib and those who follow them and are attached to them and who crusade (*jāhadū*) along with them.

1. They are a single community (*ummah*) distinct from (other) people.[2]

2. The Emigrants of Quraysh, according to their former condition,[3] pay jointly the blood-money between them, and they (as a group) ransom their captive(s), (doing so) with uprightness and justice between the believers.

[1] III, 341–4. The numbering of the paragraphs follows Wensinck, *Mohammed en de Joden*, 74–81, except that the closing sentence of § 19 has been moved there from the beginning of § 20. Cf. also Wellhausen, *Skizzen*, iv. 65–83, and Caetani, i. 391–408.

[2] The literal translation of the last phrase is 'from the people', which might refer to the Jews; but on the whole this is unlikely.

[3] Lane, *s.v.*, makes it clear that the phrase *'alā rib'ati-him* means 'according to their former or good condition'. There is no reason to suppose any reference to 'quarter'. The interpretation is either that each group remains distinct or that it follows its previous practice. The last clause prescribes a fair apportionment between the various groups within the clan.

3. Banū 'Awf, according to their former condition, pay jointly the previous blood-wits, and each sub-clan (*ṭā'ifah*) ransoms its captive(s), (doing so) with uprightness and justice between the believers.[1]

4. Banū 'l-Ḥārith, according to their former condition, pay jointly . . . (as 3).

5. Banū Sā'idah . . . (as 3).

6. Banū Jusham . . . (as 3).

7. Banū 'n-Najjār . . . (as 3).

8. Banū 'Amr b. 'Awf . . . (as 3).

9. Banū 'n-Nabīt . . . (as 3).

10. Banū 'l-Aws . . . (as 3).

11. The believers do not forsake a debtor among them, but give him (help), according to what is fair, for ransom or blood-wit.

12. A believer does not take as confederate (*ḥalīf*) the client (*mawlā*) of a believer without his (the latter's) consent.

13. The God-fearing believers are against whoever of them acts wrongfully or seeks (? plans) an act that is unjust or treacherous or hostile or corrupt among the believers; their hands are all against him, even if he is the son of one of them.

14. A believer does not kill a believer because of an unbeliever, and does not help an unbeliever against a believer.

15. The security (*dhimmah*) of God is one; the granting of 'neighbourly protection' (*yujīr*) by the least of them (the believers) is binding on them; the believers are patrons (or clients—*mawālī*) of one another to the exclusion of (other) people.

16. Whoever of the Jews follows us has the (same) help and support (*naṣr, iswah*) (as the believers), so long as they are not wronged (by him) and he does not help (others) against them.

17. The peace (*silm*) of the believers is one; no believer makes peace apart from another believer, where there is fighting in the way of God, except in so far as equality and justice between them (is maintained).

18. In every expedition made with us the parties take turns with one another.[2]

19. The believers exact vengeance for one another where a man

[1] "The previous blood-wits' (*al-ma'āqil al-ūlā*) are those according to the principles previously in force. The words 'between the believers' may be intended to exclude unbelievers belonging to B. 'Awf.

[2] This may apply to taking turns at riding a camel (Wellhausen; cf. IH, 433, &c.), or to all military duties (Caetani).

gives his blood in the way of God. The God-fearing believers are under the best and most correct guidance.

20. No idolater (*mushrik*) gives 'neighbourly protection' (*yujīr*) for goods or person to Quraysh, nor intervenes in his (a Qurashī's) favour against a believer.

21. When anyone wrongfully kills a believer, the evidence being clear, then he is liable to be killed in retaliation for him, unless the representative of the murdered man is satisfied (with a payment). The believers are against him (the murderer) entirely; nothing is permissible to them except to oppose him.

22. It is not permissible for a believer who has agreed to what is in this document (*ṣaḥīfah*) and believed in God and the last day to help a wrong-doer[1] or give him lodging. If anyone helps him or gives him lodging, then upon this man is the curse of God and His wrath on the day of resurrection, and from him nothing will be accepted to make up for it or take its place.

23. Wherever there is anything about which you differ, it is to be referred to God and to Muḥammad (peace be upon him).

24. The Jews bear expenses along with the believers so long as they continue at war.

25. The Jews of Banū 'Awf are a community (*ummah*) along with the believers. To the Jews their religion (*dīn*) and to the Muslims their religion. (This applies) both to their clients and to themselves, with the exception of anyone who has done wrong or acted treacherously; he brings evil only on himself and on his household.

26. For the Jews of Banū 'n-Najjār the like of what is for the Jews of Banū 'Awf.

27. For the Jews of Banū 'l-Ḥārith the like . . .

28. For the Jews of Banū Sā'idah the like . . .

29. For the Jews of Banū Jusham the like . . .

30. For the Jews of Banū 'l-Aws the like . . .

31. For the Jews of Banū Tha'labah the like of what is for the Jews of Banū 'Awf, with the exception of anyone who has done wrong or acted treacherously; he brings evil only on himself and his household.

32. Jafnah, a subdivision (*baṭn*) of Tha'labah, are like them.

[1] *Muḥdith*, literally 'innovator', means one who disturbs the existing state of affairs in any way.

33. For Banū 'sh-Shuṭaybah[1] the like of what is for the Jews of Banū 'Awf; honourable dealing (comes) before treachery.[2]

34. The clients of Tha'labah are like them.

35. The *biṭānah*[3] of (particular) Jews are as themselves.

36. No one of them (? those belonging to the *ummah*) may go out (to war) without the permission of Muḥammad (peace be upon him), but he is not restrained from taking vengeance for wounds. Whoever acts rashly (*fataka*), it (involves) only himself and his household, except where a man has been wronged. God is the truest (fulfiller) of this (document).[4]

37. It is for the Jews to bear their expenses and for the Muslims to bear their expenses. Between them (that is, to one another) there is help (*naṣr*) against whoever wars against the people of this document. Between them is sincere friendship (*naṣ'ḥ wa-naṣīḥah*), and honourable dealing, not treachery. A man is not guilty of treachery through (the act of) his confederate. There is help for (or, help is to be given to) the person wronged.

38. The Jews bear expenses along with the believers so long as they continue at war.

39. The valley of Yathrib is sacred for the people of this document.

40. The 'protected neighbour' (*jār*) is as the man himself so long as he does no harm and does not act treacherously.

41. No woman is given 'neighbourly protection' (*tujār*) without the consent of her people.

42. Whenever among the people of this document there occurs any incident (disturbance) or quarrel from which disaster for it (the people) is to be feared, it is to be referred to God and to Muḥammad, the Messenger of God (God bless and preserve him). God is the most scrupulous and truest (fulfiller) of what is in this document.

43. No 'neighbourly protection' is given (*lā tujār*) to Qurayṣh and those who help them.

[1] Wensinck, *Joden*, 79, corrects to Banū 'sh-Shuṭbah; cf. as-Samhūdī, 151.

[2] Or 'honourable dealing without treachery (is demanded)'.

[3] The meaning of *biṭānah* is obscure. It probably means those who were closely connected with some Medinan Jews by ties of friendship, not of blood; cf. Q. 3. 118/114; IH, 519. 4; *Aghānī*, xvii. 56. 22. Wensinck, 78, with some likelihood thinks they may be those Arabs who had been associated with the Jews before the coming of the Aws and the Khazraj.

[4] The second half of this article, and especially the last sentence are uncertain in meaning. The last sentence might mean 'God is very far from this.'

44. Between them (? the people of this document) is help against whoever suddenly attacks Yathrib.

45. Whenever they are summoned to conclude and accept a treaty, they conclude and accept it; when they in turn summon to the like of that, it is for them upon the believers,[1] except whoever wars about religion; for (? = incumbent on) each man is his share from their side which is towards them.

46. The Jews of al-Aws, both their clients and themselves, are in the same position as belongs to the people of this document while they are thoroughly honourable in their dealings with the people of this document. Honourable dealing (comes) before treachery.

47. A person acquiring (? guilt)[2] acquires it only against himself. God is the most upright and truest (fulfiller) of what is in this document. This writing does not intervene to protect a wrong-doer or traitor. He who goes out is safe, and he who sits still is safe in Medina, except whoever does wrong and acts treacherously. God is 'protecting neighbour' (*jār*) of him who acts honourably and fears God, and Muḥammad is the Messenger of God (God bless and preserve him).

(b) *The authenticity, date, and unity of the document*

This document has generally been regarded as authentic, though it has not always been given the prominence appropriate to an authentic document of this sort. The reasons for its authenticity have been succinctly stated by Wellhausen.[3] No later falsifier, writing under the Umayyads or 'Abbāsids, would have included non-Muslims in the *ummah*, would have retained the articles against Quraysh, and would have given Muḥammad so insignificant a place. Moreover the style is archaic, and certain points, such as the use of 'believers' instead of 'Muslims' in most articles, belong to the earlier Medinan period.

[1] This may mean 'it is a debt owed to them by the believers' (cf. W. Wright, *Arabic Grammar*[3], Cambridge, 1896–8, ii. 169 a), or 'it is for them to conclude without taking notice of the believers' (cf. ibid. 172 a). The interpretation of this article is obscure.

[2] Cf. Q. 4. 111, cited by Wensinck.

[3] *Skizzen*, iv. 80; cf. Caetani, i. 403.

[4] *Muhammed*, Munster, 1892, i. 76.

একত্রিংশ অধ্যায়

খ্রিস্টান ও ইহুদীদের সাথে নবীজীর (দ.) ঐতিহাসিক চুক্তিনামার বয়ান

ক. নাজরানের খ্রিস্টানদের সাথে নবীজীর (দ.) ঐতিহাসিক চুক্তিনামা

নাজরানের খ্রিস্টানরা নবীজীর (দ.) সাথে ধর্ম বিষয়ে বহু আলোচনা ও বিতর্ক করেন। তাঁহারা নিজ ধর্ম বিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলেন না। তবে তাঁহারা মদীনার সাধারণতন্ত্রভুক্ত হইতে আগ্রহান্বিত হওয়ায় হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (দ.) নাজরানের খ্রিস্টানদিগকে এক উদারনীতিপূর্ণ সনদ প্রদান করিয়া সকলকে মদীনার সাধারণতন্ত্রভুক্ত করিয়া লইলেন। সনদে লেখা হইল ঃ-

"মদীনার সাধারণতন্ত্রভুক্ত কেহ এই সনদের কোন শর্ত ভঙ্গ করিলে, তাহাকে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গকারী, আমার অঙ্গীকারের বিরুদ্ধবাদী ও ইসলামের বিরুদ্ধাচারী মনে করা হইবে, সে অভিশাপের যোগ্য।"

"কোন খ্রিস্টান সন্ন্যাসী (Monk) পর্বতে, দ্বীপে, মরুভূমিতে, লোকালয়ে বা অন্য কোন বাসযোগ্য স্থানে, কিংবা কোন অনাথাশ্রমে, গির্জায় কি উপাসনাগৃহে, যে স্থানেই বাসস্থান নির্দেশ করুক না কেন, আমি আমার সাধারণতন্ত্রভুক্ত সকলের সহিত একযোগে ও একপ্রাণে তাহার ধনপ্রাণ রক্ষা করিব।"

"আমার কোন কর্মচারী তাঁহাদিগকে জিযিয়া বা অন্য কোন কর প্রদানে বাধ্য করিবে না।"

"কেহ তাঁহাদের কোন বিচারপতি কিম্বা শাসনকর্তার পদচ্যুতি করিতে পারিবে না, তাঁহারা স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।"

"কোন মঙ্ক পথভ্রমণে বহির্গত হইলে, কেহ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিবে না।"

"যে সকল গির্জা মঙ্কদের অধিকারে আছে, কেহ উহা হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না।"

"মঙ্কদের বিচারক, শাসনকর্তা, ভৃত্য, শিষ্য অথবা তাঁহাদের আশ্রিত কোন ব্যক্তি জিযিয়া কর প্রদান করিবে না, কিংবা তজ্জন্য উৎপীড়িত হইবে না।"

"মঙ্কদের যাঁহারা শান্তভাবে, নির্জন-শৈলবাস অবলম্বন করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে জিযিয়া বা অন্য কোন কর সংগ্রহ করা হইবে না।"

"প্রচুররূপে ভূমিজাত শস্য উৎপন্ন হইলে, অধিবাসিগণ উহার এক নির্দিষ্ট অংশ মঙ্কদিগকে দান করিবে।"

"যুদ্ধের সময় মঙ্কদিগকে আশ্রম হইতে বহির্গত করা হইবে না, তাঁহাদিগকে যুদ্ধে যোগ দিতে বাধ্য করা হইবে না এবং তখনও তাঁহাদের নিকট হইতে জিযিয়া সংগ্রহ করা হইবে না।"

"যে সকল স্থানীয় খ্রিস্টান-অধিবাসী ধন ও বাণিজ্যবলে জিযিয়া কর দিতে সমর্থ তাহারা বার্ষিক দ্বাদশ দিরহামের অতিরিক্ত জিযিয়া কর দিবে না এবং জিযিয়া ব্যতীত তাহাদের নিকট হইতে অন্য কোন কর সংগ্রহ করা হইবে না।"

"কোন খ্রিস্টান-রমণী কোন মুসলমানকে পতিত্বে বরণ করিলে, মুসলিম স্বামী খ্রিস্টান-পত্নীকে গির্জা, উপাসনা ও ধর্মানুষ্ঠান হইতে বিরত রাখিবে না।"

"কোন ব্যক্তি খ্রিস্টানদিগের গির্জার জীর্ণ-সংস্কারে বাধা দিবে না।"

"কোন মুসলমান তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিবে না; পক্ষান্তরে মুসলিমগণ তাহাদের শত্রু পক্ষের প্রতিকূলে যুদ্ধ করিবে।"

"এতদ্বারা আমি এই আদেশ করি যে, কোন মুসলমান জগতের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই অঙ্গীকারের অন্যথাচরণ করিবে না।"

"যে ব্যক্তি আমার এই সকল অঙ্গীকারের কোনও একটি রহিত করিবে, সে নিশ্চয় জানিবে, সে আল্লাহ্‌র বিধি বিলোপ করিতেছে। যে ব্যক্তি প্রদত্ত এই অনুজ্ঞাপত্রের অন্যথাচরণ করিবে তাহাকে আল্লাহ্‌দ্রোহী, রসূলদ্রোহী মনে করা হইবে।" (Compare J. Davenport. pp. 142-44)

এই সনদ লক্ষ্য করিয়া স্যার উইলিয়াম মুর বলিয়াছেন, "এই সনদ অনুসারে তাহাদিগকে সর্ববিধ ধর্মানুষ্ঠানে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, যে পর্যন্ত তাহারা তাহাদের কার্যকলাপে শান্তি-প্রবণ ও অকপট থাকিবে, তাহাদের কর্তৃত্বে, অধিকারে ও কোন আচার-পদ্ধতিতে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।" [Thereupon they were given a pledge by which they were free to practise their religion: Their authority and rights shall not be in.erfered with, nor anything that is customary amongst them, so long as they conducted themselves peaceably and uprightly. (Sir Willium Muir)]

নাজরানের খ্রিস্টানদের যে প্রতিনিধি দল মদীনায় এসেছিলেন, নবীজী (দ.) তাঁদেরকে মসজিদে নববীতেই অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দেন, নিজেই তাঁদের মেহমানদারীর দায়িত্ব পালন করেন। এমনকি তাঁদের উপাসনাদিও মসজিদেই সমাধা করার ব্যবস্থাও করে দেন। কিছু সাধারণ মুসলিম তাঁদের উপাসনায় বাধা দিতে চাইলে তিনি তাদের থামিয়ে দেন। [যাদুল মাআদ সূত্রে সীরাতুন্নবী (দ.): শিবলী নোমানী]।

খ. মদীনার ইহুদীদের সাথে চুক্তিনামা

বনী ইসরাঈল ইহুদী নামে খ্যাত। বাইবেলের ভাষায়– তাহারা "তাহাদের প্রভু পরমেশ্বরের সর্ববিধ আদেশ প্রতিপালনে বিমুখ হইয়াছিল। তাহারা ছাঁচে ঢালিয়া প্রতিমূর্তি নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এমন কি, দুইটি গোবৎস ও একটি কুঞ্জ-কানন নির্মাণ করিয়াছিল, এবং তাহারা গগনমণ্ডলের যাবতীয় বস্তুর উপাসনা ও বালের (Sun-god) পূজা করিত। "তাহারা আল্লাহ্‌র রসূলগণকে বিদ্রূপ করিত। তাহারা আল্লাহ্‌র বাণী অবজ্ঞা এবং নবীগণের প্রতি অসদ্ব্যবহার করিত। তাহারা অবশেষে আল্লাহ্‌র কোপানলে পতিত হইল, পরিত্রাণের কোন উপায় রহিল না।" (2 Chronicles 36: 16) অধর্মাচার, অত্যাচার ও আত্মকলহের ফলে তাহারা স্বাধীনতা হারাইল। তাহারা বাবেলাধিপতি বখ্‌তনসর এবং গ্রীক ও রোম সম্রাটগণের অত্যাচারে জর্জরিত হইয়া বাত্যাবিতাড়িত শুষ্কপত্রের ন্যায় মাতৃভূমি কেনান হইতে বিতাড়িত হইয়া ইউরোপ ও এশিয়ার নানাস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিল। কতিপয় ইহুদী হেজাযের উত্তরাংশে এক উপনিবেশ স্থাপন করিল। এই প্রসঙ্গে মদীনার আওফ, নাজ্জার, হারিছ, জশম, সালাব প্রভৃতি সম্প্রদায় এবং মদীনার পার্শ্ববর্তী বনী-নাজীর, বনী-কোরায়জা ও বনী-কায়নোকা সম্প্রদায়ত্রয় বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

মদীনার ইহুদীরা কুরআন গ্রহণ করিল না। হযরতকে নবী বলিয়া স্বীকার করিল না। আঁ-হযরত পাশবিক শক্তিবলে তাহাদিগকে পদানত বা ইসলামে দীক্ষিত করিতে প্রয়াসী হইলেন না। দয়া, সৌজন্য ও সাম্যবাণী দ্বারা তাহাদের হৃদয় জয় করিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাহাদিগকে এক উদারনীতিপূর্ণ সনদ (In.ernational Liberal Charter) প্রদান করিয়া তাহাদিগকে মদীনার ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। এই সনদে (ইবনে হিশাম ৩৪১-৪৩ পৃ.) লেখা হইল:

১. এই সনদের অন্তর্ভুক্ত মুসলমান ও ইহুদী এক রাষ্ট্রজাতিতে পরিণত হইবে।
২. হত্যার বিনিময়ের পূর্ববৎ 'দিয়াত' অর্থাৎ নিহত ব্যক্তির আত্মীয়কে অর্থপ্রদান প্রথা প্রচলিত থাকিবে।
৩. ইহুদিগণ ধর্মে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিবে। তাহাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না।
৪. ইহুদী ও মুসলমান পরস্পর বন্ধুভাবে থাকিবে এবং সকলে সমান অধিকার ভোগ করিবে।
৫. ইহুদী কি মুসলমানের প্রতিকূলে যুদ্ধ বিঘোষিত হইলে এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে সাহায্য করিবে।
৬. ইহুদী কি মুসলমান শত্রুপক্ষীয় কোন কোরেশকে আশ্রয় দিতে পারিবে না।

৭. মদীনা শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে উভয়ই মদীনা রক্ষা করিবে।

৮. এক সম্প্রদায় কোন শত্রু-পক্ষের সহিত সন্ধি করিলে অন্য সম্প্রদায়ও ঐ সন্ধিতে যোগ দিবে।

৯. মদীনার সাধারণতন্ত্রের অন্তর্গত সকলে তাহাদের ভবিষ্যতে বিবাদ-বিসংবাদ নিষ্পত্তিভার হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার উপর অর্পণ করিবে।

এই সনদ নবীবরের উদারতার এক অতুল আদর্শ ও জাতিগঠন প্রণালীর এক প্রশস্ত পন্থা। এক দেশের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং পরস্পর বিরোধী ভাবাপন্ন ও বিপরীত রুচিবিশিষ্ট জনবৃন্দ স্ব স্ব সামাজিক ও ধর্মগত স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া কি প্রকারে এক জাতিতে পরিণত হইতে পারে ও দেশ মাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করিতে পারে, এই সনদে উহা সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

মদীনার ইহুদী অতীব আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত এই সনদ গ্রহণ করিল এবং অনতিবিলম্বে মদীনার নিকটবর্তী বনী-নাজীর, বনী কোরায়জা ও বনী কায়নুকা ইহুদী সম্প্রদায়ত্রয়ও তাহাদের অনুবর্তী হইল।

রসূলুল্লাহ্ ইহুদীর সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া মদীনায় এক রাজনৈতিক শক্তির ভিত্তি পত্তন করিলেন এবং মদীনাবাসী সকলের সম্মতিক্রমে তিনি এই ক্ষুদ্র সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট পদে বৃত হইলেন। শত্রুর আক্রমণ হইতে মদীনা ও ধর্ম রক্ষা করা এই রাজশক্তির প্রধানতম উদ্দেশ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইল।"

[মোবিন উদ্দিন আহমদ খান জাহাঁগীর নগরী রচিত 'নবীশ্রেষ্ঠঃ কুরআন-তত্ত্বঃ' (তৃতীয় খণ্ড থেকে) ৩য় সংস্করণ, ১৯৮১]।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়

উপসংহার

হযরত মুহাম্মদ (দ.) তথা ইসলামের শাশ্বত আধুনিক বহুত্ববাদী পালনবাদী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে চারজন মনীষীর অভিমত

ইসলাম একটা সর্বব্যাপী রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মানবতাবাদী আদর্শ এবং এভাবেই এর আবির্ভাব। সেটিকে ধর্মীয় আচারের মোড়কে মোড়ানো অবস্থায় রাখা যায় না এবং রাখতে যাওয়াটা অসঙ্গত। মদীনা সনদে নবীজী (দ.) সেটি হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছেন।

পালনবাদী-সমাজবাদ মানুষের জাগতিক চাহিদা (অর্থাৎ যে প্রাণীর যে পরিমাণ খোরাক ও অধিকার প্রদান করার ব্যবস্থা) পূরণের নিশ্চয়তা বিধানের পাশাপাশি আধ্যাত্মিক শূন্যতা অর্থাৎ হৃদয়ের চাহিদা পূরণ করে মানুষকে পারস্পরিক বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বন্ধনে আবদ্ধ করতে পারে। বিগত শতাব্দীর দুটো বিশ্বযুদ্ধ, অব্যাহত আঞ্চলিক সংঘাত ও হানাহানি, বিবেক বিবর্জিত অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং উম্মত্ত ভোগবাদ যেভাবে মানবিক মূল্যবোধকে ধ্বংস করেছে ও করছে, ভেঙ্গে ফেলেছে ও ভাংছে; তার প্রতিকারের সূত্র নিহিত রয়েছে পালনবাদী সমাজ ব্যবস্থায়। বিশ্বের বহু বরেণ্য মনীষী বহু পূর্বেই এ ব্যাপারে তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেছেন:-

১. "The idea of a league of Human Races has indeed been approached by Islam more nearly than by any other; for the league of nations founded on the basis of Mohammedi religion takes the principle of the equality of all human races so seriously as to put other communities to shame."

– Prof. Snouck Hurgronje (The Muslim world of To-day).

২. "Islam has still the power to reconcile apparently irreconcilable elements of race and tradition. If ever the opposition of the great societies of the East and the West is to be replaced by co-operation, the mediation of Islam is an indispensable condition" – **Prof. H R Gibb. (Whither Islam)**.

৩. "We cannot deny that the conception of brotherhood in Islam transcends all barriers of race and nationality, a feature which does not characterize any other religion." – **Bharat Ratna Dr. Sir Sarbapalli Radhakrishnan. [East and West in Religion]**
৪. "Islam...is the only solution for all the ills of the world....For it is in Islam only the idea of a real material league of nations had been approached in the right and practicable way. – **Sir Thomas Arnold."**

অতএব; সামগ্রিক দার্শনিক, রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক মূল্যায়নে এ তথ্যই বিতর্কাতীতভাবে প্রকাশিত যে; আল-কুরআনে পরিবেশিত সমাজ-চেতনা এবং স্বয়ং নবীজী (দ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'মদীনা সাধারণতন্ত্রে'র সমসাময়িক প্রশাসনিক বিধি হিসেবে প্রণীত ও অনুসৃত 'মদীনা সংবিধানে' অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বহুত্ববাদী পালনবাদী সমাজ বিনির্মাণের মূলনীতি, লক্ষ্য এবং তাগিদ সক্রিয়; যা এই একবিংশ শতাব্দীর সুস্থ সমাজ ও রাষ্ট্র সাধনার অন্যতম স্পন্দন। মদীনা সংবিধানের মঞ্জুষায় রক্ষিত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানমূলক সমতাবাদী মানব-সমাজ নির্মাণের এই প্রকৃতিসম্মত রসায়ন অতীতে বিভিন্ন অবাঞ্ছিত রাজনৈতিক-সামাজিক দুর্যোগের কারণে দীর্ঘদিন বিস্মৃতপ্রায় থাকলেও বিগত দুই শতাব্দীর শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞ মনীষীবৃন্দ নতুন করে এই সার্বজনীন কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধায়ক সমাজবিজ্ঞান সূত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, যা বহুল আকাঙ্খিত ভারসাম্যমূলক বিশ্বসমাজ নির্মাণে আন্তর্জাতিক পরিসরে প্রয়োগের অপেক্ষায়। মাইজভাণ্ডারী বেলায়তে-ও এই প্রত্যাশার প্রতিধ্বনি অনুরণিত।

সমাপ্ত

macademy2002@gmail.com
/alokdharabooks

ISBN 978-984-8083-18-5